অধ্যাপক গোলাম আযম

জীবনে যা দেখলাম

চতুর্থ খণ্ড

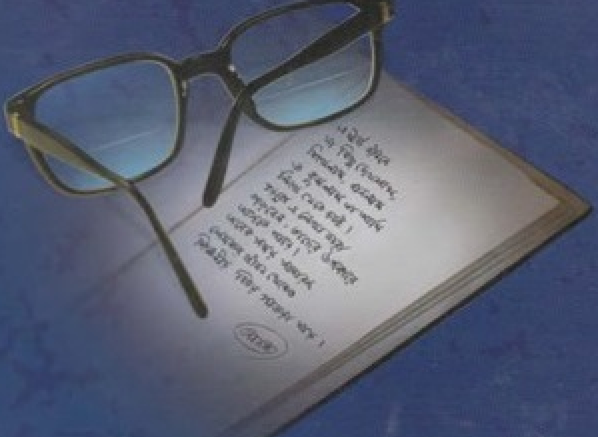

জীবনে যা দেখলাম

চতুর্থ খণ্ড

(১৯৭২-১৯৭৫)

অধ্যাপক গোলাম আযম

www.bjilibrary.com

জীবনে যা দেখলাম

চতুর্থ খণ্ড

(১৯৭২-১৯৭৫)

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.bjilibrary.com

চতুর্থ মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : মে ২০০৭

জীবনে যা দেখলাম (চতুর্থ খণ্ড) ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ৯৫৬০১২১, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ: দি ডিজাইনার, বাংলাবাজার, ঢাকা ❖ মুদ্রণ : জননী প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১,৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯০
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯১
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯২
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০১৭৫০০৩৬৭৯৩

নির্ধারিত মূল্য : একশত ষাট টাকা মাত্র
ISBN-984-8285-34-7

www.bjilibrary.com

চতুর্থ খণ্ড সম্পর্কে

'জীবনে যা দেখলাম' ১ম খণ্ডে আমার জন্মসাল ১৯২২ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত বিবরণ রয়েছে। ২য় খণ্ডে ১৯৫২ থেকে ১৯৬২ এবং তৃতীয় খণ্ডে ১৯৬২ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। ৪র্থ খণ্ডে ১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল মাত্র। এর মধ্যে ১৯৭৫ সালের কথাই ১৮টি কিস্তিতে বিস্তৃত। মুজিব হত্যা ও পরবর্তী ঘটনাবলির কারণে '৭৫ সালটিকে ঘটনাবহুলই বলতে হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে '৭৫ সাল আদর্শিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। তাই এ সালের ঘটনাবলির বিবরণ এতো দীর্ঘ হয়েছে।

১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল শেখ মুজিবের শাসনকাল। এ সময়ে আওয়ামী লীগের কুশাসন, শেখ মুজিবের স্বৈরাচার এবং এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার তথ্যাবলি পরিবেশন করতে গিয়ে আমাকে নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলির সাহায্য গ্রহণ করতে হয় ঃ

১. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ।

২. রাজনীতির তিন কাল ঃ সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও এরশাদ আমলের প্রধানমন্ত্রী জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী।

৩. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫ ঃ প্রখ্যাত ভাষা সৈনিক, সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা ও ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি জনাব অলি আহাদ।

৪. একশ' বছরের রাজনীতি ঃ দৈনিক সংগ্রাম সম্পাদক ও রাজনৈতিক গবেষক জনাব আবুল আসাদ।

৫. যা দেখেছি, যা বুঝেছি ও যা করেছি ঃ আগস্ট-বিপ্লবের নেতা মেজর ডালিম।

৬. তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা ঃ লে. কর্নেল (অব) এম. এ. হামীদ।

৭. আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিন কাল ঃ অধুনালুপ্ত ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান, প্রখ্যাত এডভোকেট, সাবেক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সা'দ আহমদ।

আমি এসব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে আমার নিজের ভাষায় পরিবেশন না করে প্রয়োজনে দীর্ঘ উদ্ধৃতিও দিয়েছি। আমি তথ্যসমূহের সত্যতার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করার চেয়ে লেখকগণের উপর সে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যথার্থ মনে করেছি।

আশা করি পাঠক-পাঠিকাগণ এ বই থেকে দেশের ইতিহাসের অনেক অজানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্য অবগত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

গোলাম আযম
আগস্ট ২০০৪

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

হজ্জের পর জেদ্দায় ১৫
দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ ১৬
আমার ভিসা সংগ্রহের অভিযান ১৭
বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা ১৮
বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎকার ১৯
ওয়ামীর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন ২১
রিয়াদ গমন ২১
সম্মেলনের প্রথম ডেলিগেট অধিবেশন ২২
সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য ২৩
এ সম্মেলনের গুরুত্ব ২৩
এ সম্মেলন আমাকে কী দিয়েছে? ২৪
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরিচয় ২৫
আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ব্যবহার শুরু ২৮
আবুধাবী সফর ২৯
দুবাই পৌঁছলাম ২৯
বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভাবনা ৩০
আব্বার ইন্তিকালের খবর ৩১
আমার আফসোস ৩১
মৃতের জন্য করণীয় ৩২
কুয়েত রওয়ানা ৩৩
আমার আব্বার অসুস্থতা ৩৪
আমার ছেলেদের দাদাই ছিলেন আসল অভিভাবক ৩৫
মুত্তাওয়া সাহেবের অফিসে ৩৬
শায়খ আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ ৩৭
জমিয়তুল ইসলাহ অফিসে ৩৮
কুয়েত দর্শন ৩৯
মুত্তাওয়া সাহেবের বাড়িতে রাতের খাবার ৪০
ওমরাহ করে বৈরুত গমন ৪০
বৈরুতের দু'দিন ৪০
লিবিয়ার বেনগাযীতে ৪১
সম্মেলনের সময় আমাদের তৎপরতা ৪২
লিবিয়ার কথা ৪২
গাদ্দাফীর তিন দফা কৌশল ৪৪
লন্ডন রওয়ানা ৪৫

www.bjilibrary.com

লন্ডন পৌঁছলাম ৪৫
লন্ডনে আমার সোয়া ৫ বছর অবস্থান ৪৭
ইংল্যান্ডে থাকার ব্যবস্থা ৪৭
লন্ডনে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন ৪৮
এ পুস্তিকাটি সম্পর্কে অভিমত ৪৯
পুস্তিকাটির পরিচিতি ৫১
ইয়াহইয়া-মুজিব আলোচনায় ভুট্টো ও অন্যান্য নেতার ভূমিকা ৫১
আত্মঘাতী লড়াইয়ের পরিণাম ৫১
বর্তমান সমস্যার কারণ ৫৩
সমাধানের উপায় ৫৩
বাঙালি মুসলমানদের করণীয় ৫৪
মুক্তির একমাত্র পথ ৫৫
জনগণের দাবি ৫৬
সফরসাথীরা লন্ডনে ৫৬
লন্ডনে বাংলাদেশীদের বিভিন্ন মত ৫৭
ব্যারিস্টার আবুল আব্বাসের প্রবাসী সরকার ৫৯
ত্রিপোলিতে ইসলামী যুব সম্মেলন ৬০
গাদ্দাফীর থার্ড থিওরি ৬১
পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকে আরব বিশ্ব ৬১
ত্রিপোলি ইসলামী যুব সম্মেলন ৬২
আগত মেহমানদের সাথে পরিচয়ের পালা ৬৩
সম্মেলনের উদ্বোধন ৬৪
প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর অনুপস্থিতি ৬৫
গাদ্দাফীর আজব আচরণ ৬৫
গাদ্দাফীর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ ৬৬
সম্মেলনের শেষ দিন ৬৭
ত্রিপোলি সম্মেলন ৬৯
শায়খ মাহমূদ এলেন ৬৯
লন্ডন ফেরত গেলাম ৭০
ত্রিপোলি সম্মেলন ও গাদ্দাফীর প্রতিক্রিয়া ৭১
উত্তর আমেরিকার MSA ৭১
আমার আমেরিকা সফরের প্রস্তুতি ৭২
বর্তমানে নর্থ-আমেরিকা Umbrella Organization ৭৩
ইংল্যান্ডে দুটো সম্মেলনে যোগদান ৭৪
Fosis Conference ৭৪
U.K. Islami Mission ৭৪
আমেরিকা পৌঁছলাম ৭৫
শিকাগোতে আমার অবস্থান ৭৫

www.bjilibrary.com

MSA সম্মেলন ৭৭
মুসলিম সংগঠনের ৬ দফা কর্মসূচি থাকতে হবে ৭৮
সম্মেলনের ডেলিগেটদের সাথে পরিচয় ৭৯
সম্মেলন শেষে আমেরিকা ভ্রমণ ৮০
নিউইয়র্কে তিন দিন ৮১
কালো মুসলিমদের সংগঠন ৮১
ইসলামিক পার্টির সাংগঠনিক বৈঠক ৮২
আমেরিকার কালো মুসলমান ৮৩
অপরাধ জগতে কালোদের অবস্থান ৮৪
কালোদের উত্থানে ইসলামের অবদান ৮৫
Malcom-X ৮৬
নেশন অব ইসলাম নেতা লুই ফাররা খান ৮৬
ফাররা খানের সফরের প্রতিক্রিয়া ৮৭
লন্ডন প্রত্যাবর্তন ও আবার সফর ৮৮
সৌদি আরবে রামাদান ৯০
মদীনা শরীফে ৯১
লন্ডন প্রত্যাবর্তন ৯২
ছেলেদের বাংলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থা ৯২
ইংল্যান্ডে যা শিক্ষণীয় ৯৩
লেখার ধারাবাহিকতা ১০২
আমার পাকিস্তান সফর ১০৩
করাচি রওয়ানা ১০৩
করাচি থেকে লাহোর পৌঁছলাম ১০৪
মাওলানা মওদূদীর কবর যিয়ারত ১০৫
মানসূরাহ গমন ১০৭
আমীরে জামায়াতের সাথে সাক্ষাৎ ১০৮
উপহার সামগ্রী ১০৯
সম্মেলনে আগত মেহমান ১১০
সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন ১১১
সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ ১১৫
কাযী হোসাইন আহমদের কৃতিত্ব ১১৬
পাকিস্তানি ইসলামী শক্তির ঐক্য ১১৭
কাযী হোসাইন আহমদের ব্যক্তিগত পরিচয় ১১৭
বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে মূল্যায়ন ১১৯
শায়খ ড. ইউসুফ আল কারদাভী ১১৯
রাশেদ আল গানুশী ১২০
মুস্তাফা মুহাম্মদ তাহ্যান ১২১
আয়াতুল্লাহ তাসখীরী ১২২

www.bjilibrary.com

ডাক্তার তোয়াহা রামলী	১২৩
মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক মাদানী	১২৩
আমার মনে বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো	১২৪
আরও একটা প্রশ্ন	১২৪
আবার হায়রে মৃত্যু	১২৫
তিন বোনেরই হঠাৎ মৃত্যু	১২৫
আমার সাথীহারা ভাই	১২৬
আমার ভাইটি অসহায় নয়	১২৭
হাসিনার জানাযা ও দাফন	১২৮
আব্বার বংশধরদের বৈঠক	১২৯
মগবাজার ও সোবহানবাগ	১৩০
লাহোর সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আমার বক্তৃতা	১৩১
মুসলিম জাতি ক্ষমতাহীন কেন?	১৩২
কুরআন ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক	১৩৩
ইসলামের সঠিক পরিচয়	১৩৩
কুরআন বুঝার তাগিদ	১৩৩
সংগঠক মাওলানা মওদূদী	১৩৩
ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ছাত্র সংগঠন	১৩৪
এখন প্রয়োজন ইসলামী হুকুমত	১৩৫
বাংলাদেশে ইসলামের সম্ভাবনা	১৩৬
মুসলিমদের আত্মসমালোচনা জরুরি	১৩৬
মুসলিম উম্মাহর আসল সমস্যা	১৩৭
লাহোর সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের পটভূমি	১৩৭
গণতান্ত্রিক বিশ্ব ইসলামকেই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মনে করে	১৩৮
ইসলাম দুশমনীর প্রতিক্রিয়া	১৩৯
মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী আখ্যাদান	১৩৯
পরীক্ষামূলক গেরিলা যুদ্ধ	১৪১
আত্মঘাতী হামলা	১৪১
ঐতিহাসিক ২২ দফা ঘোষণা	১৪২
পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ সফর	১৪৬
কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী সফর	১৪৭
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক অবস্থা	১৪৮
জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থান	১৫০
পেশোয়ার সফর	১৫১
প্রাদেশিক সরকারের পরিচয়	১৫২
জামায়াতের ৬ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ	১৫২
ইসলামী সরকারের এ যাবৎ অর্জন	১৫৩
জামায়াতের মন্ত্রীদের নিজস্ব কর্মসূচি	১৫৪

www.bjilibrary.com

প্রাদেশিক সরকারের সমস্যা ১৫৪
পাকিস্তানের রাজনীতিতে এমএমএ জোটের অবস্থান ১৫৫
প্রেসিডেন্টের গোঁয়ার্তুমি ১৫৬
পাকিস্তান থেকে ফিরে এলাম অসুস্থ হয়ে ১৫৬
অসুস্থতার পটভূমি ১৫৭
হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন ১৫৯
অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ১৫৯
মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ১৬১
মিনা ও আরাফায় ১৬২
মাস্টার সাহেবের বিলম্বে পৌঁছার কারণ ১৬২
আরাফার ময়দানে বাংলাদেশী খাদ্য ১৬৩
আমার প্রিয় মেরা পিঠা ১৬৪
মিনায় বাংলাদেশী নারিকেল ১৬৪
আমার বাগান করার হবি ১৬৫
স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতের পুনর্গঠন ১৬৬
হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার পর ১৬৭
১৯৭৪ সালের কথা ১৬৮
১৯৭৪ সালের দ্বিতীয় হজ্জ ১৬৮
দেশের একটি চিত্র ১৬৮
১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের হজ্জ ১৭০
বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ ১৭১
বিদায়ের পালা ১৭১
১৯৭৪ সালের কয়েকটি সম্মেলনের কথা ১৭২
রাবেতা সম্মেলন ১৭৩
রাবেতা সম্মেলনের কার্যক্রম ১৭৪
সম্মেলনের প্রস্তাবাবলি ১৭৪
মদীনা যিয়ারত ১৭৫
বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ ১৭৫
ঘটনাবহুল '৭৫ সাল ১৭৭
খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন ১৭৭
বাদশাহ ফায়সালের শাহাদাতের দিন ১৭৯
শেখ মুজিব হত্যা ১৮০
লন্ডনে মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া ১৮১
আমি কীভাবে খবর পেলাম ১৮১
১৬ আগস্টের পত্রিকা ১৮২
মুজিব হত্যার পটভূমি ১৮৩
শেখ মুজিবের ব্যর্থতার কারণ ১৮৩
শেখ মুজিবের কুশাসন ১৮৬

www.bjilibrary.com

প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ মুজিব ১৮৬
কল-কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ ১৮৭
যুব সমাজের অধঃপতন, দেশময় নৈরাজ্য ১৮৭
আওয়ামী লীগের অবিবেচক রাজনৈতিক পদক্ষেপ ১৮৯
শেখ মুজিবের দাসখত ১৮৯
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ১৯০
কলঙ্কময় অধ্যায় ঃ ব্যক্তিশাসন প্রতিষ্ঠা ১৯০
বাকশাল গঠন ১৯১
আবুল মনসুর আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ১৯৩
নির্বাচনে আশা-প্রত্যাশা ১৯৪
হিসাবে ভুল ১৯৫
নির্বাচন ফল ও কুফল ১৯৬
আওয়ামী-নেতৃত্বের ভ্রান্তনীতি ১৯৭
জাতীয় ক্ষতিকর বিভ্রান্তি ১৯৮
লেজের বিষ ১৯৯
জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর রাজনীতির তিনকাল গ্রন্থ থেকে ২০০
মাওলানা ভাসানীর মন্তব্য ২০২
আর্মি অফিসারদের শেখ মুজিবের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি ২০২
রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ২০৩
শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ ঃ দুঃখজনক পরিণতি ২০৩
কুশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ২০৫
স্বৈরশাসনের ভয়ানক পরিকল্পনা ২০৫
আওয়ামী লীগের তৈরি লোকদের চরিত্র ২০৬
শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি ২০৭
১৫ আগস্ট ('৭৫) এবং ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ২০৮
বিদেশীদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের পতনের কারণ ২০৯
আগস্ট বিপ্লবের সুফল ২১০
১৯৭৫-এর সামরিক বিপ্লব ২১২
মুজিব হত্যার বিচার ২১৩
খন্দকার মোশতাক আহমেদের মন্ত্রীসভা ২১৪
শেখ হাসিনার ভুল হিসাব ২১৪
সব ভালো যার শেষ ভালো ২১৫
শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে বিদেশী কলামিস্টদের মন্তব্য ২১৬
মুজিব নিজেই দায়ী —*মার্টিন উলাকট* ২১৬
অবশ্যম্ভাবী পতন—*কেভিন রেফার্টি* ২১৮
কসে ভুল হলো? —*এন্থনি মাসকারেনহাস* ২১৯
শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে—*অমিত রায়* ২২০
স্বৈরাচারী শাসনই দায়ী—*লুই সিমনস্* ২২১

www.bjilibrary.com

শেখের ট্রাজেডি—*হার্ভে স্টকউইন* ২২২
ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফের প্রতিবিপ্লব ২২৩
৩ নভেম্বরের বিদ্রোহের পর্যালোচনা ২২৬
শেখ মুজিবের কুশাসনের আরও কতক তথ্য ২২৬
প্রথম ঘটনা ২২৮
দ্বিতীয় ঘটনা ২৩০
তৃতীয় ঘটনা ২৩১
বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনা ২৩৭
শেখ মুজিবের আজব সুবিচার ২৪৮
শেখ মুজিবের ইমেজ খতম ২৫৩
৩ থেকে ৭ নভেম্বরের নাটকীয় ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহ ২৫৪
ঘটনাবলির বিশ্লেষণের ভিত্তিমূলক তথ্যাবলি ২৫৫
নভেম্বরের পয়লা সপ্তাহের ঘটনাবলির পটভূমি ২৫৬
সরকারের পদক্ষেপসমূহ ২৫৭
সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন ২৫৮
সেনা পরিষদের কর্মসূচি ২৫৯
আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি ২৫৯
সর্বদলীয় অস্থায়ী/নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব ২৬০
খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের সূচনা ২৬০
ব্রিগেডিয়ার খালেদ অনমনীয় ২৬৪
ডালিম-খালেদ আলোচনা ২৬৬
আলোচনায় বিরতির পর আবার শুরু ২৬৭
বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কামরায় ২৬৮
সেনা-সদরে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নিকট ২৬৯
৩ নভেম্বর দিবাগত রাত ২৭০
৩ ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ঃ এক প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয় ২৭১
তাঁর বইটির পরিচয় ২৭১
বইটিতে লেখকের ভূমিকা ২৭২
লেখকের নিরপেক্ষতা ২৭৪
বিপ্লবের তথ্যাবলির উৎস ২৭৪
আগস্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায়ই ৩ নভেম্বর বিপ্লব ২৭৪
আগস্ট পরবর্তী অবস্থা ২৭৫
ভগ্নহৃদয় খালেদ ২৭৬
নাখোশ জিয়া ২৭৬
জিয়া বনাম মোশতাক-ওসমানী ২৭৮
২ নভেম্বর দিবাগত রাত ২৮০
৪ নভেম্বর ২৮১
মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক কর্নেলের হুমকিতে খালেদ ক্ষমতা পেলেন ২৮২

www.bjilibrary.com

সশস্ত্র শাফায়াতের অনুপ্রবেশ ২৮২
আওয়ামীপন্থিদের মিছিলের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া ২৮৪
কর্নেল তাহেরের পৃথক বিপ্লব ২৮৪
৫ নভেম্বরের অবস্থা ২৮৫
৬ নভেম্বরের পরিস্থিতি ২৮৬
বাংলাদেশের ভাগ্য-রজনী ২৮৬
রাত ১২টা বিদ্রোহ শুরু ২৮৭
মুক্ত জিয়া ২৮৮
বন্দি জিয়াকে যেভাবে উদ্ধার করা হলো ২৮৮
তাহেরের ক্ষমতা দখল-প্রচেষ্টা ২৮৯
মধ্যরাতে ক্ষমতার লড়াই ২৯০
সেপাই-জনতার বিপ্লব ২৯২
খালেদ আসলেন ২৯২
৩ থেকে ৬ নভেম্বর দেশবাসী অন্ধকারে ২৯৩
ঢাকায় জাগ্রত জনতার প্রচারপত্র ২৯৪
ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ ২৯৪
খালেদ কিভাবে নিহত হলেন ২৯৬
খালেদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের-একটি পর্যালোচনা ২৯৭
কেন ব্যর্থ হলো অভ্যুত্থান? ২৯৭
সিপাই জনতা ভাই ভাই ৩০০
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলছেন ৩০১
লক্ষ লোকের আনন্দ মিছিল ৩০২
১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর ৩০২
তাহের ও জিয়ার ক্ষমতার লড়াই ৩০৩
টু-ফিল্ড ব্যারাক ৩০৩
কর্নেল হামীদের দেখা সিপাহী-জনতার উল্লাস ৩০৪
ঢাকা শহরে জনতার উল্লাস (৭ নভেম্বর) ৩০৫
৭ তারিখ বিকেল থেকেই সেনানিবাসে শঙ্কা ৩০৫
৭ থেকে ১৩ নভেম্বর ৩০৬
৭/৮ নভেম্বর ঃ রক্তাক্ত রাত ৩০৮
৮ নভেম্বর ৩১০
৯ নভেম্বর ৩১৪
১০ নভেম্বর ৩১৫
কমান্ডার লগ এরিয়া ৩১৭
এবার সেপাই-অফিসার ভাই ভাই ৩১৯
ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল তাহের ৩১৯

www.bjilibrary.com

১৩১.

হজ্জের পর জেদ্দায়

হজ্জ সমাধা করার পর আমি, মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও ব্যারিস্টার কুরবান আলী জেদ্দায় পৌঁছে সৌদি আরবে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিনিধি রাও মুহাম্মদ আখতারের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি আমাদেরকে জামায়াতের মেহমানখানায় থাকার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যখন পিআইএ'র বিমান ঢাকার বদলে নিরাপত্তার জন্য জেদ্দায় পৌঁছলো তখন আমি রাও সাহেবের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হই। মাওলানা আবদুস্ সোবহান ও ব্যারিস্টার কুরবান আলীরও হজ্জের আগে তাঁর সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয়। ঐ বছর ইখওয়ানুল মুসলিমূনের মুরশিদুল আম (প্রধান) ড. হাসানুল হুদাইবী ও সুদানের ইখওয়ানী নেতা ড. হাসান তোরাবী হজ্জ করতে এসেছিলেন। জেনারেল নুমেরী তখন সুদানের মিলিটারি ডিক্টেটর। তিনি ইখওয়ানের বহু লোককে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ড. তোরাবী মুক্তি পেয়েই হজ্জ করতে এলেন। পরে জানতে পেরেছি যে, হজ্জের পর দেশে ফিরে গেলে আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

রাও সাহেব জেদ্দায় ঐ দু'জন ইখওয়ানী নেতাকে জামায়াতে ইসলামীর লোকদের সাথে মিলিত করার ব্যবস্থা করেন এবং আমাদেরকেও এতে শরীক হবার সুযোগ দান করেন। তাই এ উপলক্ষে রাও সাহেবের সাথে আমার দু'সাথীরও পরিচয় হয়।

ড. হুদাইবীর সাথে হজ্জের সময় মিনায় তাঁর ক্যাম্পে যেয়ে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করি। ড. তোরাবীর সাথে আর দেখা হয়নি। জেদ্দায় এ দু'নেতার সাথে সাক্ষাতের সময় মিসর ও সুদানে ইসলামী আন্দোলনের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মুখে বিস্তারিত জানা গেলো। দু'দেশেই সামরিক স্বৈরশাসনের নির্যাতনে ইসলামী আন্দোলনের প্রায় সকল নেতা ও বিরাটসংখ্যক কর্মী কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। এ সত্ত্বেও দু'নেতাই দৃঢ়তার সাথে জানালেন যে, দীনে বাতিলের পক্ষ থেকে পরীক্ষার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই মানুষ ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়। তাই দীর্ঘকাল নির্যাতন সত্ত্বেও কেউ বাতিলের নিকট আত্মসমর্পণ করার মতো দুর্বলতার পরিচয় দেননি। ড. হুদাইবী বললেন, বাতিল শক্তির হাতে কত নবী পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন। আমরা তো শহীদ হওয়ার আশায়ই এ পথে এসেছি। তাই আমাদের কোন পরাজয় নেই।

ড. তোরাবী বললেন, "মিসর ও সুদানে সশস্ত্র বাহিনী ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে রেখেছে। প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াত দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ইসলামী আন্দোলনের তরুণদেরকে পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র বাহিনীতে অফিসার ও জোয়ান হবার জন্য ভর্তি করতে হবে, যাতে ২০/২৫ বছরের মধ্যে ইসলামী মন-মগজের লোক এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে, সশস্ত্র বাহিনী ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয়।

আমাদের সাথে পরিচয়ের পর দু'নেতাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁরা 'পূর্ব-পাকিস্তানে' (তাদের ভাষায়)

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের বর্তমান অবস্থা জানতে চাইলেন। কিছু ধারণা দেওয়া হলো। তারা মন্তব্য করলেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু থাকলে পরিস্থিতি অল্প সময়েও বদলে যেতে পারে। বিশ্বের সর্বত্র মুসলিম জনগণ ইসলামের সমর্থক; ইসলামবিরোধী নয়। তাই ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী হিকমতসহকারে দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করতে থাকলে আল্লাহ তাআলা পথের বাধা দূর করে দেন। হতাশ হয়ে দাওয়াতের কাজ করা বন্ধ করলে আল্লাহর সাহায্যও বন্ধ হয়ে যায়। একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে দায়ী ইলাল্লাহর পবিত্র দায়িত্ব পালন করতে থাকলে আল্লাহর সাহায্য আসবে। তাঁদের মূল্যবান কথায় আমরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলাম।

দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ

জনাব রাও আখতার আমাদেরকে এমন দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন, যারা মাওলানা মওদূদীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন এবং ইসলামী আন্দোলন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখেন। তাদের একজন হলেন, বাদশাহ ইবনে সৌদের মন্ত্রিসভার বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম এবং অপরজন দৈনিক মদীনা পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মুহাম্মদ সালাহুদ্দীন।

আমরা তিনজনই জামজুম সাহেবের সাথে দেখা করতে গেলাম। রাও সাহেব থেকে জানা গেলো যে, জামজুম সাহেব পাকিস্তানের অত্যন্ত শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি যখন সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রী ছিলেন তখন সৌদি এয়ারলাইন্সকে গড়ে তুলবার ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের বিরাট সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। আমাদের পরিচয় জানার পর তিনিও পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম যে, মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো ক্ষমতায় যাবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে যোগসাজশ করে পাকিস্তান ভেঙে দিলেন।

প্রথমে পরিচিতির সময় শায়খ জামজুম মাওলানা আবদুস্ সুবহানের নাম শুনে একটু হালকা রসিকতা করলেন। মাওলানা যখন নিজের পুরো নাম 'আবুল বাশার মুহাম্মদ আবদুস্ সুব্হান' বললেন তখন তিনি হেসে বললেন, "আবুল বাশার তো হযরত আদম, আর সুব্হান তো আল্লাহর কোন গুণবাচক নাম নয়, যার সাথে আবদ শব্দ যোগ করা যায়।"

আমি বললাম, আমাদের দেশে বহু আলেমের নামও আবদুস্ সুব্হান।

যা হোক, তিনি জানতে চাইলেন যে, হজ্জের পর আমরা বাংলাদেশে ফিরে যাচ্ছি কিনা। তখন তাঁকে জানানো হলো যে, আমাদের কারো পক্ষেই এ সময় বাংলাদেশে যাবার উপায় নেই। আমরা বাংলাদেশ থেকে আসিনি। আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পাকিস্তান থেকে এসেছি এবং ব্যারিস্টার কুরবান সাহেব দুবাই থেকে হজ্জে এসেছেন।

আমরা দু'জন কেমন করে পাকিস্তানে আটকা পড়লাম এবং ব্যারিস্টার সাহেব কেন দুবাই আসতে বাধ্য হলেন সে কথা সংক্ষেপে জানাবার পর তিনি অত্যন্ত সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। আমরা পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি জেনে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কেও তিনি জানতে চাইলেন। বলা হলো যে, মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পাকিস্তানে ফিরে যাবেন ও ব্যারিস্টার সাহেব দুবাই চলে যাবেন। আমার সম্বন্ধে বললাম যে, বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্বশীলদের সাথে যোগাযোগের

www.bjilibrary.com

সুযোগ গ্রহণের জন্য আমি লন্ডন যাবার চেষ্টা করছি। আমি পাকিস্তান থেকে ঢাকায় সামান্য কিছু টাকা পাঠিয়েছিলাম, যা আন্দোলনের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। কিন্তু সেখান থেকে যোগাযোগ সবচেয়ে কঠিন। টাকা পাঠানো আরও দুরূহ। বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে সংগঠিত করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো আর্থিক সংকট। তাই আমি পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছি না। অর্থ সংগ্রহ করে সেখানে পাঠাবার ও যোগাযোগ করার সবচেয়ে বেশি সুবিধা হবে লন্ডন থেকে। ইংল্যান্ডে বাংলাদেশী অনেক লোক আছে এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত বেশকিছু দীনী ভাই আছেন।

তাঁর কাছ থেকে দোয়া চেয়ে বিদায় হবার সময় তিনি আবেগের সাথে বললেন যে, বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমি সামান্য কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে দিতে চাই, আশা করি গ্রহণ করবেন। এ কথা বলে তিনি একটা ছোট খাম আমার হাতে দিলেন। আমি শুকরিয়ার সাথে গ্রহণ করলাম। পরে খাম খুলে দেখলাম যে, দু'হাজার রিয়াল তাতে রয়েছে।

এরপর দৈনিক মদীনার প্রধান সম্পাদকের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি অত্যন্ত দরদের সাথে বাংলাদেশে সার্বিক অবস্থা জানতে চাইলেন। তাঁর সাথে এ পরিচয় পরবর্তী বছর বেশ কাজে লেগেছে।

আমার ভিসা সংগ্রহের অভিযান

জেদ্দায় কয়েকদিন থাকার পর মাওলানা আবদুস্ সুব্হান স্টিমারে করাচি চলে গেলেন। ব্যারিস্টার কুরবান আলীও দুবাই ফিরে গেলেন। আমি জেদ্দায় জামায়াতের মেহমানখানায় থেকে আমার পাকিস্তানি পাসপোর্টে বিভিন্ন দেশের ভিসা লাগাবার অভিযান চালালাম। পাকিস্তান থেকে 'পিলগ্রিম পাস' নিয়ে এসেছিলাম, আমার ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট ব্যবহার করিনি। আমি যে পাকিস্তান থেকে বের হয়ে আসলাম এর কোন সিলও পাসপোর্টে নেই। ১৯৭২ সালের জুন মাসে পাকিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নূরুল আমীনের সাহায্যে ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট যোগাড় করা হয়েছিলো। কিন্তু মি. ভুট্টো পাকিস্তান থেকে বের হতে না দেওয়ায় তা ব্যবহার করা শুরুই হয়নি। তাই একেবারে আনকোরা নতুন পাসপোর্টে ভিসা পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

এ বিষয়ে রাও আখতার সাহেব কতক অভিজ্ঞ লোকের সাথে পরামর্শ করে জানতে পারলেন যে, লেবাননের ভিসা পাওয়া সবচেয়ে সহজ। কারণ সেখানে চাকরি তালাশ করতে কেউ যায় না; শুধু পর্যটকরাই বেশি সংখ্যায় যায়। এরপর দুবাই যাবার ভিসাও পাওয়া কঠিন নয়। কারণ আরববিশ্বে দুবাইই ফ্রি মার্কেট হিসেবে খ্যাত। বিনা অনুমতিতে যে-কোন দেশের লোক সেখানে ব্যবসার পণ্য নিয়ে যেতে পারে এবং যে-কোন জিনিস কিনে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ দুবাইতে 'স্মাগলিং' জায়েয, বেআইনি নয়। ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট লাইসেন্স ছাড়াই সেখানে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করা যায়। তাই ভিসা দিতে কোন কড়াকড়ি করে না।

পরিকল্পনা করা হলো যে, কয়েকটি দেশের ভিসা সংগ্রহ করার পর ইংল্যান্ডের ভিসার জন্য চেষ্টা করা হবে। প্রথমেই লেবাননের ভিসা পেয়ে গেলাম। দুবাই'র ভিসাও হয়ে গেলো। এ দুটো ভিসা পাসপোর্টে দেখে কুয়েতও ভিসা দিয়ে দিলো। এরপর লিবিয়ার

www.bjilibrary.com

ভিসাও নেওয়া হলো। সর্বশেষে ব্রিটিশ দূতাবাসে ভিসার দরখাস্ত দিলাম। চারটি আরব দেশের ভিসা দেখে বেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করেই ভিসা লাগিয়ে দিলো। এ ভিসাটি পাওয়ার জন্যই আগের ভিসাগুলোর প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য ঐ কয়টি ভিসা লন্ডন যাবার আগেই কাজে লেগেছে।

বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের চেষ্টা

হজ্জের মওসুমে বাদশাহ্ হজ্জের পর কিছুদিন জেদ্দার প্রাসাদে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরকে সাক্ষাৎদান করেন। আমি ঐ পর্যায়ের কেউ না হলেও বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাতের অত্যন্ত প্রয়োজনবোধ করলাম। বাংলাদেশ নামের নতুন রাষ্ট্রটি সম্পর্কে বাদশাহ্‌র মনোভাব জানার খুব আগ্রহ মনে জাগলো। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের অগ্রণী ভূমিকার পেছনে যে তার কোন নেক নিয়ত ছিলো না, সে কথা তিনি উপলব্ধি করেন কিনা তাও আমার জানা জরুরি মনে করলাম।

প্রশ্ন দাঁড়ালো যে, সাক্ষাতের সুযোগ কেমন করে পেতে পারি। সরকারি লোকেরা তো তাদের দূতাবাসের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন। আমি কার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারি? এ বিষয়ে পরামর্শের জন্য শায়খ আহমদ সালাহ্ জামজুমের সাথে দেখা করলাম। তার সাথে প্রথম সাক্ষাতে যে দরদের পরিচয় পেলাম তাতে বড় আশা নিয়েই তার কাছে গেলাম। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমাকে গ্রহণ করে প্রথমেই জানতে চাইলেন যে, আমি ব্রিটিশ ভিসা পেয়েছি কিনা। এটা জানতে চাওয়ার পেছনেও দরদের পরিচয় পেলাম। আমার লন্ডন যাবার ইচ্ছা প্রথম সাক্ষাতে প্রকাশ করেছিলাম। তিনি সে কথা মনে রেখেছেন দেখে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম।

আমি জানতাম যে, জামজুম সাহেব বাদশাহ্ ফয়সালের বড় ভাই বাদশাহ্ সৌদের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। বাদশাহ্ ফয়সালের সাথে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকার কথা। কারণ ঐ কেবিনেটে ফায়সালও মন্ত্রী ছিলেন। আমি বাদশাহ ফয়সালের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তার কারণ তার নিকট পেশ করলাম। এ বিষয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন কিনা তা জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি ফোনে বাদশাহ্‌র চিফ প্রটোকল অফিসার আবদুল ওহাবের সাথে কথা বললেন। আমার সামনেই ফোনে কথা হচ্ছে বলে অপর প্রান্ত থেকে কী বলা হচ্ছে তা আমি শুনতে না পেলেও জামজুম সাহেবের কথা থেকে তা বুঝতে পারলাম।

তারা আরবীতে কথা বলছিলেন। আমি টের পেলাম যে, প্রটোকল অফিসার ওযর পেশ করছেন যে, বাদশাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের দীর্ঘ তালিকার কারণে কোন সময় বের করা কঠিন। জামজুম সাহেব জওয়াবে বললেন, "আমি একজন গুরুত্বপূর্ণ লোককে নিয়ে বাদশাহ্‌র সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। আমার জন্য আগামীকাল একটা সময় করিয়ে দিতেই হবে।" বাধ্য হয়ে প্রটোকল অফিসার পরের দিন সকাল দশটায় মাত্র দশ মিনিটের একটা ফাঁক বের করে দিলেন।

ফোন ছেড়ে দিয়ে তিনি খুশি হয়ে বললেন, "সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ভিড়ের কারণে আগামী কয়েক দিনের সিডিউল চূড়ান্ত হয়ে আছে। আমি চাপ দিয়ে একটা সময় যোগাড় করে নিলাম।

www.bjilibrary.com

আপনি আগামীকাল সকাল সাড়ে ৯টায় এখানে পৌঁছে যান। আমি নিজেই আপনাকে নিয়ে যাবো এবং বাদশাহর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবো।" আমি রীতিমতো অভিভূত হলাম। আমি এতোটা আশা করিনি। এ অপ্রত্যাশিত সাফল্যে তার মতো দরদি মুরুব্বী পেয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি শুকরিয়ার অনুভূতিতে আমার হৃদয় প্লাবিত হয়ে গেলো।

বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎকার

পরদিন যথাসময়ে জামজুম সাহেবের অফিসে হাজির হলাম। তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি আমাকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। বিস্মিত হলাম যে, তিনি নিজেই ড্রাইভারের আসনে বসে আমাকে পাশের আসনে বসালেন। নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললেন। আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি মাত্র দশ মিনিট সময় দিয়েছে বলে কোন অসুবিধাবোধ করবেন না। বাদশাহ যদি আপনার কথা শুনতে থাকেন তাহলে আপনি বলে যাবেন। তিনি ইচ্ছা করলে বেশি সময় দিতে পারেন।

প্রাসাদের হলরুমের সামনে গাড়ি থেকে নেমে তিনি আমাকে হাতে ধরেই হল রুমে ঢুকলেন। দেখলাম বিরাট হল। চারপাশে সোফা সাজানো রয়েছে। হলের শেষ প্রান্তে বাদশাহ বসে আছেন। জামজুম সাহেবকে দেখেই চিফ প্রটোকল অফিসার দ্রুত এগিয়ে এসে জামজুম সাহেবকে স্বাগত জানালেন এবং বাদশাহর কাছে নিয়ে গেলেন। বাদশাহ অত্যন্ত সম্মান দেখিয়ে দাঁড়িয়ে জামজুম সাহেবের সাথে হাত মিলিয়ে আরব ঐতিহ্য অনুযায়ী গালে গাল লাগিয়ে সংবর্ধনা জানালেন। জামজুম সাহেব আমাকে দেখিয়ে বাদশাহকে বললেন, "ইনি প্রফেসর গোলাম আযম। পাকিস্তানের উস্তায আবুল আ'লা মওদূদীর নায়েব হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানে দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি আপনাকে সেখানকার হাল অবস্থা জানাতে চান।"

বাদশাহ আমার সাথে হাত মিলিয়ে হাত ধরে রেখেই তার পাশে নিয়ে বসালেন। আমি অনুভব করলাম যে, মাওলানা মওদূদীর প্রতিনিধি হিসেবেই এ মর্যাদা পেলাম। জামজুম সাহেব আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বেশ দূরে গিয়ে সোফায় বসলেন। হলের দেয়াল ঘেঁষে চারদিকেই সোফা পাতা আছে। হলের মাঝখানে মেঝেতে কার্পেট ছাড়া আর কিছুই নেই। সবটুকু হলই খালি। একসাথে অনেক লোক সমবেত হলে হয়তো তাদের চলাচলের জন্য মাঝখানটা খালি রাখা হয়েছে।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমি কিছু বলার আগেই বললেন, "আমি নিয়মিত বিবিসি'র খবর শুনি। বিশেষ মনোযোগ সহকারে বাংলাদেশ সম্পর্কিত খবরগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি। আপনি যা বলতে চান বলুন।"

বাদশাহ ফায়সাল বহু বছর সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ইংরেজি বলার যোগ্যতা অবশ্যই রাখেন। তবু তিনি আরবীতেই বললেন। রয়াল চিফ প্রটোকল আবদুল ওহাব চমৎকার ইংরেজিতে তা অনুবাদ করে শুনালেন।

আমি আরবীতে বলতে অক্ষম বলে ইংরেজিতে বলতে বাধ্য হলাম। আমি ইয়াহিয়া খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবের উল্লেখ করে কোন মন্তব্য করলাম না। আমার আসল বক্তব্য ছিলো ভারত সম্পর্কে। আমাকে সাক্ষাতের সুযোগ দেবার জন্য আন্তরিক গভীর শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, ভারত সব সময়ই পাকিস্তানের সাথে

www.bjilibrary.com

দুশমনি করে এসেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। এর আসল উদ্দেশ্য ঐ দুশমনি। পূর্ব-পাকিস্তানের চারদিকে ভারতের সাতটি প্রদেশ রয়েছে। ঐসব প্রদেশে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলনও রয়েছে। ঐ প্রদেশসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার পথে পূর্ব-পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থান বিরাট বাধা। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাহায্য করার বাহানায় ভারত অতি উৎসাহের সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনকে সর্বদিক দিয়ে সংগঠিত করেছে এবং ত্বরান্বিত করেছে। আমরা আশঙ্কা করি যে, ভারত বাংলাদেশের উপর যে চরম আধিপত্য বিস্তার করেছে তাতে বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পারবে কিনা। বাংলাদেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলমান। আপনি হারামাইন শরীফাইনের মহান খাদিম। আপনার উপর বিশ্বের সকল মুসলমানেরই হক আছে। আমি কোটি কোটি বাংলাদেশী মুসলমানের পক্ষ থেকে এ আবেদন জানাতে এসেছি যে, "ভারত কাশ্মীরের মতো বাংলাদেশকে যেন নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে সেদিকে আপনি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন। সে দেশের মুসলমানরা ভৌগোলিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন। দেশটি তিন দিক দিয়ে ভারত দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় আছে। দক্ষিণ দিকে সমুদ্র, কিন্তু সে সমুদ্রও ভারতের নিয়ন্ত্রণে। ভারতের মুসলমানদের প্রতি ভারত সরকারের আচরণ কেমন তা আপনার অজানা নয়। বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারতের আধিপত্যের পরিণাম সম্পর্কে শঙ্কিত।"

এ কথাগুলো আমি একটানা বলিনি। একেকটি বাক্য বলার পরই চিফ প্রটোকল আরবীতে অনুবাদ করে বাদশাহকে শুনান। তিনি আমার পাশেই দাঁড়িয়ে অনুবাদ করছিলেন। আমার কথার ফাঁকে তিনি হাতে ইশারা করে আমাকে থামিয়ে অনুবাদ করতে থাকেন। আমার কথা বলার সময় বাদশাহ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার ইংরেজি ভাষায় বক্তব্য যে তিনি বুঝতে পারছেন তা স্পষ্টই টের পেয়েছি। কিন্তু তাদের নিয়ম পালনের জন্য আমার সব কথারই আরবীতে অনুবাদ করে শুনালেন।

আমার কথাগুলো শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, "পশ্চিম-পাকিস্তানের সাথে আপনারা যে রাজনৈতিক ঝগড়া করেছেন সে বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। একত্র থাকতে পারলেন না বলে আলাদা হয়ে গেলেন, এতেও আমার আপত্তি করার অধিকার নেই। এটা আপনাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু পাকিস্তান বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও যদি আপনারা ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবেই ঘোষণা করতেন তাহলে আমরা দুঃখবোধ করতাম না। আমি বিবিসি'র মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, বাংলাদেশের যে শাসনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে তাতে সেক্যুলারিজম ও সোস্যালিজমকে রাষ্ট্রের আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত মানসিক যাতনাবোধ করছি। যে রাষ্ট্রটি পূর্বে ইসলামী রাষ্ট্রের অংশ ছিলো তা এভাবে ঘোষণা দিয়ে ইসলাম ত্যাগ করার ঘটনাটি অত্যন্ত বড় দুর্ঘটনা।"

তাঁর এ কথাগুলো একটানা বলেননি। একটু বলে তিনি থামলে ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়। এভাবে তার বক্তব্য শেষ হলে আমি আবার বললাম, "পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রতি আপনার সুদৃষ্টি কামনা করি। সেক্যুলারিজম ভারতীয় আদর্শ। ভারতের আধিপত্যের কারণেই ঐ আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই ভারত ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।"

www.bjilibrary.com

তিনি বললেন, "আপনি বলছেন যে, সে দেশে শতকরা ৮৫ জন মুসলিম। আপনারা যদি নিজেরা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলাম ত্যাগ না করেন তাহলে ভারত শক্তি প্রয়োগ করে কিছুই করতে পারবে না। মুসলিম নেতারাই যদি ভারতীয় আদর্শ মেনে নেয় তাহলে বাইরে থেকে আমরা কী করতে পারি? তবে ভারত যদি কাশ্মীরের মতো দখল করতে চায় তাহলে মুসলিম বিশ্ব চুপ করে থাকবে না। আমি ভারতকে এতো বোকা মনে করি না। ভারত সরাসরি এমন কিছু করবে না। ভারত এটাই চাইবে যে, বাংলাদেশে তাদের তল্পীবাহক সরকার কায়েম থাকুক।"

তাঁর এ যুক্তিপূর্ণ কথার পর আমার বলার আর কিছুই থাকলো না। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর কাছে দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম।

এ সাক্ষাতে ২৫ মিনিট সময় লেগেছে।

প্রটোকল অফিসার বাদশাহর দৃষ্টি গোচর হওয়ার মতো করে কয়েকবার হাতের ঘড়ির দিকে তাকালেও বাদশাহ আমার কথা শুনতে থাকলেন এবং তিনিও বলতে থাকলেন।

১৩২.

ওয়ামীর প্রতিষ্ঠা সম্মেলন

১৯৭২ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রিয়াদে একটি আন্তর্জাতিক মুসলিম যুব সম্মেলন হয়। ঐ সম্মেলনের মাধ্যমেই WAMY (World Assembly of Muslim Youth) নামে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সংগঠনটির শাখা বাংলাদেশেও আছে। এক সময় এর বাজেট বিরাটই ছিলো। ১৯৯০-এর গালফ-ওয়ারের পর এর বাজেট সংকুচিত হয়।

ঐ প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে আমিও ঘটনাক্রমে আমন্ত্রিত হই বলেই এ প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। আমি যদি ঐ সময় সৌদি আরবে উপস্থিত না থাকতাম তাহলে হয়তো তাতে যোগদানের কোন সুযোগই পেতাম না।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে মসজিদে নববীর অতি নিকটে পাকিস্তান সরকারের যে মেহমানখানায় ছিলাম, সে পরিচয়সূত্রেই সেখানে থাকার সুবিধা পেয়ে গেলাম। সে মেহমানখানার ঠিকানায় একটি দাওয়াতনামা পেয়ে বিস্মিত হলাম। তাতে আমাকে অবিলম্বে রিয়াদ পৌঁছার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে যে, সেখানে বিশ্ব মুসলিম যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং আমাকে একজন ডেলিগেট সদস্য হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

আমি যে 'পিলগ্রিম পাস' নিয়ে হজ্জে এসেছি তা নিয়ে জেদ্দাহ, মক্কা ও মদীনা ছাড়া আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। অবশ্য সরকারি উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বলে আমার রিয়াদ যাবার ব্যবস্থা সরকারই করে দিলেন।

রিয়াদ গমন

সৌদি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা মদীনা থেকে বিমানে আমাকে রিয়াদ নিয়ে গেলেন। রিয়াদ বিমানবন্দরে আমাকে যিনি অভ্যর্থনা জানালেন তিনি সম্মেলন উপলক্ষে

www.bjilibrary.com

বিদেশী মেহমানদের জন্য গঠিত রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান ড. আবদুল্লাহ ওমর নাসীফ, অধ্যাপক রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়। আমাকে যে হোটেলে থাকার জন্য নিয়ে গেলেন সেখানে যোহরের নামাযের সময় অনেক মেহমানের সাথে দেখা হলো। নামাযের পর অনেকের সাথেই পরিচয় হলো। ড. আহমদ তুতুনজি নামে এক ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এসে হাত মিলালেন। তিনি রিয়াদ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষক। তিনি সম্মেলনের অর্গানাইজিং কমিটির সহকারী সেক্রেটারি। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে, রিয়াদে কর্মরত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ভাইদের কাছে তিনি আমার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। তাই সম্মেলনে আমাকে দাওয়াত দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ড. তুতুনজি সেখানেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা হামাদ ইবরাহীম আল সুলাইফীহের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি ইংরেজি বলায় অভ্যস্ত না থাকায় আরবীতে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আমি ইখওয়ানুল মুসলিমূনের লোক নই, আমি জামায়াতে ইসলামীর লোক।" আমি বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানতে পারলাম যে, মন্ত্রণালয়ে তাঁর সহকর্মী ওমর ফারুক মওদূদী থেকে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পেয়েছেন। তাই তিনি অন্তর থেকে জামায়াতে ইসলামীকে ভালোবাসেন। ওমর ফারুক মওদূদী মাওলানা মওদূদীর বড় ছেলে। তিনি অনেক বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেছেন। তিনি রিয়াদে পাকিস্তানিদের মধ্যে দক্ষতার সাথে দারসে কুরআন পেশ করতেন।

সম্মেলনের প্রথম ডেলিগেট অধিবেশন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সম্মেলনে ৮৩টি দেশের ইসলামী যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ডেলিগেট হিসেবে হাজির হন। বিদেশী ডেলিগেটদের সংখ্যা প্রায় দু'শ ছিলো। সৌদি আরবের ডেলিগেটসহ সম্মেলনে আড়াই'শ লোক যোগদান করেন।

ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে ড. আহমদ তুতুনজি ও ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী আমার সাথে একান্তে কথা বললেন। তাঁরা বললেন, "সম্মেলনে ডেলিগেট হিসেবে যারা এসেছেন তারা সবাই যুব বয়সের। সবার মধ্যে আপনিই বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশনে আপনাকে সভাপতিত্ব করার অনুরোধ জানাচ্ছি। ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী অভ্যর্থনা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান। অধিবেশনের শুরুতে তিনি সভাপতিত্ব করার জন্য আমার নাম প্রস্তাব করলেন। সবাই সমর্থনসূচক আওয়াজ দিলেন।

আমি সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর তিলাওয়াতে কুরআন দিয়ে অধিবেশন শুরু করা হলো। এ অধিবেশনের যে এজেন্ডা আমার সামনে টেবিলে রাখা হয় তাতে সম্মেলনের সভাপতি ও সহ-সভাপতির নির্বাচনই প্রথম দু'আইটেম।

আমি সম্মেলনের সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করলাম। ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শায়খ হাসান আলে শায়খের নাম প্রস্তাব করলে ডেলিগেটগণ এক আওয়াজেই সমর্থন জানালেন। আমি ঘোষণা করলাম যে, সর্বসম্মতিক্রমে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

www.bjilibrary.com

এরপর আমি সম্মেলনের সহ-সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করলাম। ডেলিগেটদের একজন সহ-সভাপতি পদের জন্য ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার ড. আহমদ মুহাম্মদ আলীর নাম প্রস্তাব করলেন। আমি ডেলিগেটদেরকে আর কোন প্রস্তাব থাকলে পেশ করতে আহ্বান জানালাম। আর কোন প্রস্তাব কেউ উত্থাপন না করায় আমি ঘোষণা করলাম, ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হলেন।

উক্ত অধিবেশনে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। তাই আমি নির্বাচিত সহ-সভাপতিকে অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানালাম এবং আমাকে ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে প্রথমে সভাপতির দায়িত্ব দিয়ে সম্মানিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানালাম। সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমি সভাপতির আসন ত্যাগ করে ডেলিগেটদের মধ্যে আমার আসনে ফিরে গেলাম।

সম্মেলনের প্রধান আলোচ্য

প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো, 'ইসলামী যুব সংগঠনসমূহের আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠন'। দেড় দিন এ বিষয়ে বিভিন্ন দেশের যুব নেতৃবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবাই এমন একটি ফোরাম গঠনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন এবং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্যোগ নেবার জন্য সৌদি আরব সরকারের প্রতি গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

সম্মেলনে সব কয়টি অধিবেশনেই ভাইস চেয়ারম্যান ডেপুটি শিক্ষামন্ত্রী ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যান মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী যে-কোন কারণেই হোক সম্মেলনে হাজির হননি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, "ওয়ার্ল্ড এসেম্বলি অব মুসলিম ইউথ" (WAMY) নামে একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব ফোরাম গঠন করতে হবে এবং এর কেন্দ্রীয় অফিস রিয়াদেই থাকবে।

এ সম্মেলনের গুরুত্ব

এ সম্মেলনে ৮৩টি দেশের ইসলামী আন্দোলনের যুব নেতারা তিন দিন পর্যন্ত হোটেলে ও সম্মেলনস্থলে মিলিত হবার যে সুযোগ পেলেন, এমন কোন ব্যবস্থা করার সাধ্য তাদের কারো ছিলো না। ইসলামী আন্দোলনমূলক সংগঠন ছাড়াও ইসলাম প্রচারমূলক এবং বিভিন্নভাবে ইসলামের খিদমতমূলক সংগঠনের নেতৃবৃন্দও সম্মেলনে এসেছেন।

তাদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক পরিচয় এবং বিভিন্ন দেশের অবস্থা জানার এমন দুর্লভ সুযোগ পেয়ে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সবাই সবার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তৎপর দেখা যায়।

তাদের মধ্যে যারা ইকামাতে দীনের আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা ইতঃপূর্বে পাননি তারা জানতে পারলেন যে, শুধু খিদমতে দীনের দ্বারা ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে কায়েম হতে পারে না। অথচ আল্লাহ তাআলা দীনকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। দীনে বাতিলের অধীনে দীনের কিছু খিদমত করা যায় বটে; দীনকে বিজয়ী করা যায় না। তাই খিদমতে দীনেই সন্তুষ্ট থাকলে দীনের প্রতি দায়িত্ব পালন করা হয় না এবং ঈমানের দাবি যথাযথ পূরণ করা যায় না।

www.bjilibrary.com

ইসলামী আন্দোলনের যুব নেতৃবৃন্দ পরস্পর মতবিনিময় ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছেন। এ সম্মেলনে ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ সম্পর্কে বেশ কয়টি মূল্যবান প্রস্তাব পাস হয়, যা ডেলিগেটদেরকে গুরুত্বপূর্ণ চেতনা দান করে। এ সম্মেলন দ্বারা বহু দিক দিয়ে ইসলামী আন্দোলন বিরাটভাবে উপকৃত হয়েছে।

এ সম্মেলন আমাকে কী দিয়েছে?

এ সম্মেলনে যোগদান করার সুযোগ পাওয়াকে আমি আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ নিয়ামত মনে করি। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর আমার বিমান ঢাকায় পৌঁছতে না পারার ফলে আমাকে বাধ্য হয়ে যে সাত বছর নির্বাসন জীবনযাপন করতে হয় তাতে ঐ সম্মেলন বিরাট অবদান রেখেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ ও বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য আমার নির্বাসিত জীবনে যতটুকু সামান্য খিদমত করতে সক্ষম হয়েছি, ঐ সম্মেলন এর ভিত্তি রচনা করেছে। এর কয়েকটি পয়েন্ট এখানে পেশ করছি ঃ

১. বাংলাদেশ একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র এবং বিশ্বে বিরাটসংখ্যক মুসলিম অধ্যুষিত দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী হিসেবে পরিচিত করার প্রথম মহাসুযোগ লাভ। সম্মেলনে উপস্থিত ৮৩টি দেশের ইসলামী যুব নেতাগণ এই প্রথম এ পরিচয় জানতে পারলেন।

২. জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বে মোটামুটি পরিচিত ছিলো। কেন্দ্রীয় জামায়াতের পক্ষ থেকে মাওলানা মওদূদী (র) রচিত সাহিত্যের আরবী ভাষায় অনুবাদক হিসেবে মাওলানা মাসউদ আলী নদভী, মাওলানা আসেম আল হাদ্দাদ ও মাওলানা খলিল হামেদী আরব বিশ্বসহ মুসলিম দুনিয়ায় ব্যাপক সফর করে মাওলানার চিন্তাধারা ও জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানকে পরিচিত করেছেন। পাকিস্তানের রাজধানী প্রথমে করাচি এবং পরে ইসলামাবাদ, আর জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র লাহোর হওয়ায় পশ্চিম-পাকিস্তানই পাকিস্তান হিসেবে মুসলিম বিশ্বে পরিচিত ছিলো। সে তুলনায় বর্তমান বাংলাদেশ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে অপরিচিতই ছিলো। ঐ সম্মেলনে মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশ একটি মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন হিসেবে পরিচিত হলো।

৩. বাংলাদেশ এলাকার ইসলামী আন্দোলনের কোন প্রতিনিধি এর আগে বহির্বিশ্বে সফর করেনি বলে ওখানকার ইসলামী আন্দোলনের কোন ব্যক্তিত্ব মুসলিম বিশ্বে পরিচিত ছিলো না। এ সম্মেলনে ৮৩টি দেশের ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধিরা এই প্রথম জানলো যে, গোলাম আযম নামে এক ব্যক্তি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর ছিলো। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা আমাকে ডেলিগেটদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্বের দায়িত্ব দিয়ে আমার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণের মহাসুযোগ করে দিলো। এ পরিচিতি আমার প্রবাস জীবনে বিরাট সহায়ক হয়েছে। এর উপকারিতা আমি এখনও ভোগ করছি।

www.bjilibrary.com

এ পরিচিতির সুবাদেই ১৯৭৩ সালে আমেরিকা ও লিবিয়ায় আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন এবং ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত সকল ইসলামী সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদান করেছি। তা ছাড়া ১৯৭৪ সালে মক্কায় রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলনে, ১৯৭৬ সালে রিয়াদে আন্তর্জাতিক ইসলামী ফিক্‌হ সম্মেলনে, ১৯৭৭ সালে মক্কায় আন্তর্জাতিক ইসলামী শিক্ষা সম্মেলনে অতিথি হিসেবে গিয়েছি।

১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত নাগরিক সমস্যার কারণে বিদেশে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার নাগরিকত্ব বহাল হবার পর পূর্বপরিচিতির জের ধরেই বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদানের জন্য বিদেশে যেতে হয়েছে।

জন্মভূমিতে ১৭ বছর জেলে ও জেলের বাইরে অবরুদ্ধ থাকার সময় বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে এসেছেন তারা আমার সাথে দেখা করে জিজ্ঞেস করেছেন যে, আমি বিদেশে কেন যাচ্ছি না। আসল কারণ জানাবার পর তাদের নিকট মন্তব্য করেছি, "আমাকে সাত বছর দেশে আসতে দেয়নি। আসার পর আর যেতে দিচ্ছে না।" এ মন্তব্য তাঁরা বেশ উপভোগ করতেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে পরিচয়

ঐ সম্মেলন উপলক্ষে পরিচিতদের মধ্যে এমন কয়েকজন ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যা এখনও বহাল আছে। তাদের কয়েকজনের পরিচয় দিচ্ছি ঃ

১. ড. আব্দুল্লাহ ওমর নাসীফ। '৭২ সালে তিনি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালে ঐ সম্মেলনের রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। '৭৪ সালে তিনি জেদ্দাস্থ কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর হন। ঐ বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি লন্ডন যান। আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনের স্টেশনে হঠাৎ দেখা হয়। মহব্বতের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর লন্ডন যাবার উদ্দেশ্য জানতে চাইলাম। বললেন, "ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের হেড হিসেবে একজন অভিজ্ঞ প্রফেসরের তালাশে এসেছি।" বললাম, "আমি এমন একজনের নাম বলতে পারি, যিনি করাচি ইউনিভার্সিটিতে ১৮ বছর ইংরেজি বিভাগের হেড ছিলেন।"

   তিনি প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, "এক্ষুণি কি তাঁর নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর দিতে পারেন?" আমি অতি উৎসাহের সাথে হ্যান্ডব্যাগ থেকে ফোন ইনডেক্স বের করে নাম ও ফোন নম্বর দিলাম। তিনি জানতে চাইলেন যে, ঐ লোক প্রেকটিসিং মুসলিম কিনা? আমি বললাম, "তিনি ছাত্রজীবন থেকেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি একজন সুফিও বটে। আপনি আবার তা অপছন্দ করেন কিনা জানি না।" তিনি বললেন, "এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এতে আমি আপত্তি করবো কেন?"

   আমি তাঁর নাম বললাম ড. সৈয়দ আলী আশরাফ। তিনি ক্যামব্রিজে আছেন। ফোন নম্বর দিলাম। আমি বাসায় ফিরে গিয়ে ড. আশরাফকে ফোন করে জানালাম যে, ড. নাসীফ ইতোমধ্যেই তাঁর সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং আগামীকাল ক্যামব্রিজে যাচ্ছেন। পরের দিন ড. আশরাফ খুব খুশি হয়ে জানালেন যে, তিনি

www.bjilibrary.com

জেদ্দা ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করতে সম্মত হয়েছেন। ড. নাসীফের সাথে আমার পরিচয়ের এতো বড় সুফলে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানালাম।

ড. নাসীফ ৮/১০ বছর রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল থাকাকালে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে গেলো। তিনি ঢাকায় এলে যোগাযোগ করতেন। একবার আমার বাড়িতেও এসেছেন।

আমি সৌদি আরব গেলে তাঁর বাড়িতে যাই। সৌদি পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার থাকাকালেও তাঁর বাড়িতে গিয়েছি। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় তাঁকে আন্তরিকভাবে মহব্বত করি।

তিনি ড. আশরাফের প্রতিষ্ঠিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টের সদস্য হিসেবে বহুবার ঢাকা এসেছেন। গত বছর চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানেও তিনি এসেছিলেন। সেখানেও তাঁর সাথে নিবিড় আলাপের সুযোগ পেয়েছি।

২. ড. আহমদ মুহাম্মদ আলী। তিনি মুসলিম বিশ্বের গৌরব 'ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের' চেয়ারম্যান হিসেবে এ ব্যাংককে গড়ে তুলবার জন্য অত্যন্ত যোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরপর তিনি রাবেতা আলমে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত করা অপরিহার্য মনে করে। বর্তমানে তিনি ঐ পদই অলংকৃত করে আছেন।

এ সম্মেলনের সহ-সভাপতি হিসেবে তার সাথে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কায়েম হয় তা পরবর্তী সময়ে আরও মযবুত হয়েছে। আমার বড় ছেলে মামুন ঐ ব্যাংকে কর্মরত। ঢাকাস্থ সৌদি দূতাবাস সৌদি আরব থেকে কেউ স্পন্সর না করলে ভিজিট ভিসা দেয় না। মামুন চায় যে তার পিতা-মাতা যেন বার বার এবং যখন ইচ্ছা তখনই তার বাসায় বেড়াতে যেতে পারেন। এ উদ্দেশ্যে সে আমাদের দু'জনের জন্য ইকামার (রেসিডেন্ট ভিসা) ব্যবস্থা করার জন্য চেয়ারম্যান সাহেবের নিকট অনুমতি চাইলো। চেয়ারম্যান সাহেব তাকে পরামর্শ দিলেন, "ইকামা করা হলে তো প্রতি ছয় মাসের মধ্যে একবার বাধ্য হয়েই সৌদি আরবে আসতে হবে। প্রয়োজনবোধ না করলেও ইকামা বহাল রাখার জন্যই আসতে হবে। তাঁরা যখনই আসতে চান আমাকে ই-মেইল করে দিলেই আমি ভিজিট ভিসা পাঠিয়ে দেবো।" এ বছর জানুয়ারিতে তাঁর প্রেরিত ভিসা পেয়েই গিয়েছি। ২০০০ সালেও তিনি ভিসা পাঠিয়েছিলেন। সদাশয় আওয়ামী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার পাসপোর্ট আটক করায় যেতে পারলাম না। সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ পাসপোর্ট ফেরত দেবার নির্দেশ দেবার পরও বিচারপতিদেরকে লাঠির ভয় দেখাবার যোগ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমার পাসপোর্ট ফেরত দিতে এতো বিলম্ব করলেন যে, হজ্জের সময় পার হয়ে যাওয়ায় আর গেলাম না।

৩. ড. আহমদ তুতুনজি। তিনি জন্মগতভাবে ইরাকী। বর্তমানে তিনি সৌদি নাগরিক। '৭২ সালের ওয়ামী সম্মেলনে তিনিই প্রধান সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি রিয়াদে তখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ওয়ামী প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি

www.bjilibrary.com

এর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে এটাকে কার্যকর সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ঐ সম্মেলনে আমি দাওয়াত পাই। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামী যুব সম্মেলনে তাঁরই সাথে পরিচয়ের কারণে দাওয়াত পেলাম। তখন তিনি ত্রিপোলিতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক।

দুনিয়ার যেখানেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন ইসলামী সম্মেলন হয় ড. আহমদ তুতুনজি অবশ্যই সেখানে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। আরবী ও ইংরেজিতে চমৎকার ভাষণ দেন। সর্বত্র তিনি একজন অতি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। বাংলাদেশে ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মেলনেও তিনি ঢাকায় এসেছেন।

৪. ড. আবদুল হামীদ আবূ সুলায়মান। তিনি সৌদি নাগরিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ছিলেন। তিনি ওয়ামীর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল। তিনি বেশ কয়েক বছর মালয়েশিয়াস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি বেশ কতক মূল্যবান বই লিখেছেন এবং আমাকে পাঠিয়েছেন।

৫. '৭২ সালের ঐ সম্মেলনেই আমার সাথে মালয়েশিয়ার প্রখ্যাত ইসলামী যুব নেতা আনোয়ার ইবরাহীমের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। ত্রিপোলি সম্মেলনে তার সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মে। আমি বিদেশে থাকাকালে একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন। '৭৮ সালে আমি দেশে আসার পর আশির দশকের শুরুতে আরও একবার ঢাকায় এলেন। তখন আমার সাথে দেখা হয়। তিনি বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী।

৬. মাওলানা সিবগাতুল্লাহ মুজাদ্দেদী। ঐ সম্মেলনে তিনি আফগানিস্তানের প্রতিনিধি ছিলেন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁর মাতৃভাষা পুশতু ছাড়াও আরবী, ইংরেজি ও উর্দুতে বক্তব্য রাখতে সক্ষম ছিলেন। সম্মেলনে তিনি আরবীতেই বক্তৃতা করেন। '৭৩ সালে ত্রিপোলি সম্মেলনে আবার তার সাথে দেখা হয়। ১৯৭৬ সালে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন হেগেনে পাকিস্তানিদের এক সম্মেলনে গেলে সেখানে তাঁর সাথে সর্বশেষ দেখা এবং তাঁর বাসায় দাওয়াত খেতে হয়।

আফগানিস্তানের যে সাতটি ইসলামী গ্রুপ এক জোট হয়ে পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করে দখলদার রুশ বাহিনীর সাথে জিহাদ করে, তাদের সবচেয়ে ছোট গ্রুপের নেতা ছিলেন মুজাদ্দেদী সাহেব। রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর ইসলামী দলগুলোর কোয়ালিশন সরকারের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন তিনি। যুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ সীমান্ত প্রদেশে গেলে তাঁর সাথেও তাঁর পরিচয় হয়।

১৯৭২ সালের রিয়াদ সম্মেলনের পর আরও যত সম্মেলনে গিয়েছি তাতে বিশ্বের বহু দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে। এ সবের সূচনা ওয়ামীর সম্মেলন। তাই আমার ইসলামী আন্দোলনের দীর্ঘ ৩০ বছরের জীবনে ঐ সম্মেলনের অবদান অবিস্মরণীয়।

www.bjilibrary.com

১৩৩.

আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ব্যবহার শুরু

আগেই বলেছি যে, আমি পাকিস্তান থেকে বের হবার সময় আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ব্যবহার করিনি, যাতে সরকার বাইরে যেতে বাধা দিতে না পারে। কিন্তু 'পিলগ্রিম পাস' নিয়ে যেতেও বাধা পেলাম। অবশ্য শেষ পর্যন্ত হজ্জে যেতে সক্ষম হলাম। পিলগ্রিম পাস নিয়ে আসায় আমি পাকিস্তান ফিরে যেতে বাধ্য। কারণ এ পাস দিয়ে আর কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। এটা শুধু হজ্জে যাওয়া ও আসার একটা দলিল মাত্র।

যেহেতু পাকিস্তান ফিরে না যাবার উদ্দেশ্যেই আমি হজ্জের সুযোগটা গ্রহণ করেছি, সেহেতু ঐ 'পিলগ্রিম পাস' আর কোন কাজে লাগলো না। লেবানন, আমিরাত, কুয়েত, লিবিয়া ও ইংল্যান্ডের ভিসা পাসপোর্টে লেগে যাবার পর আমার পাসপোর্ট ব্যবহার করে তখনই লন্ডন রওয়ানা হতে পারতাম। কিন্তু দুবাই ও কুয়েত যাওয়া জরুরি হয়ে পড়লো। ব্যারিস্টার কুরবান আলীও হজ্জে এলে তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে, পূর্বপাকিস্তান জামায়াতের প্রাদেশিক প্রচার বিভাগীয় সেক্রেটারি জনাব মুহাম্মদ নূরুযযামান দুবাই পৌছেন।

তাই কুয়েত যাবার আগে দুবাই যাওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। আমার পাসপোর্টে সর্বপ্রথম দুবাই-এর ভিসাই লেগেছে এবং সে ভিসাই পয়লা ব্যবহার করবো বলে ধারণা ছিলো।

সৌদি আরবে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের প্রতিনিধি রাও মুহাম্মদ আখতারের পরামর্শে কুয়েত যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। রাও সাহেব বললেন, কুয়েতে এমন একজন বিরাট ব্যবসায়ী আছেন, যিনি প্রতি বছর বিরাট অংকের টাকা ইসলামী আন্দোলনের জন্য খরচ করেন। দুনিয়ায় বহু দেশ থেকেই তাঁর কাছে লোক যায় এবং তিনি সবাইকে সাধ্যমতো দান করেন। রাও সাহেব আমার পরিচয় দিয়ে একটা চিঠি লিখে দিলেন।

কুয়েত যাবার পথে দুবাই আগে যাবো বলে ঠিক করলাম। কিন্তু এর আগে দু'দিনের জন্য বাহরাইনে যেতে হলো। হজ্জের সময় বাহরাইনের প্রবাসী কয়েকজন পাকিস্তানির সাথে পরিচয় হয়, যারা জামায়াতে ইসলামীর রুকন ও কর্মী। আমার দুবাই যাবার কথা জানতে পেরে আমাকে বাহরাইনে বেড়িয়ে যাবার জন্য এক রকম বাধ্য করেই রাজি করলেন। তাই বাহরাইনের ভিসাও নিতে হলো।

পাসপোর্ট ব্যবহার শুরু

প্রবাস জীবনের সাত বছর কোন্ তারিখ থেকে কোন্ তারিখ কোথায় ছিলাম এর তারিখওয়ারি ক্রমিক হিসাব লিখা নোটবই থেকে জানা গেলো যে, ১৯৭৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান বাহরাইন গেলাম। সেখান থেকে ১৭ ফেব্রুয়ারি আমরা আরব আমীরাতের রাজধানী আবুধাবী পৌছলাম। ইউএই (ইউনাইটেড আরব আমীরাত) সাতটি রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত ফেডারেশন। দুবাই এর মধ্যে একটি।

জেদ্দাহ থেকে আমার প্রথম সফর হলো বাহরাইন। অর্থাৎ বাহরাইনের ভিসা দিয়েই আমার পাসপোর্ট ব্যবহার করা শুরু হলো। বাহরাইন শব্দের অর্থ হলো দুই সমুদ্র।

www.bjilibrary.com

বাহরাইন আসলে আরব সাগরের একটা দ্বীপ। লম্বা আকারের দ্বীপটির দু'দিকেই সমুদ্র আর মাঝখানে ছোট্ট দেশ বাহরাইন। এ কারণে আরব দেশগুলোর মধ্যে এ দেশটি সবচেয়ে বেশি সবুজ। সমুদ্রের পানি লবণমুক্ত করে ব্যবহার করার জন্য সহজেই কাছে পাওয়া যায়।

মাত্র দু'দিন সেখানে থেকে পাকিস্তানি দীনী ভাইদের মেহমানদারী উপভোগ করলাম। তারা ছোটখাটো সমাবেশ করে আমাকে দীনের দাওয়াত দেবার ব্যবস্থা করলেন, যাতে জামায়াতের সংগঠন সম্প্রসারিত হয়।

আবুধাবী সফর

ব্যারিস্টার কুরবান আলী হজ্জ থেকে দুবাই ফিরে গিয়ে আমাকে জেদ্দার ঠিকানায় জানালেন যে, আমি যেন দুবাই যাবার আগে আমিরাতের রাজধানী আবুধাবীতে পৌঁছি। তিনিও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান বাহরাইন থেকে আবুধাবী পৌঁছে বিমানবন্দরেই কুরবান সাহেবকে পেলাম। তিনি আমাদের দু'জনকে নিয়ে এক হোটেলে তুলে বললেন, "আপনি এখানকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপদেষ্টা ড. ইয্যুদ্দীন ইবরাহীমের মেহমান।" এ ব্যবস্থা কুরবান সাহেব করেছেন। ড. ইয্যুদ্দীন মিসরের লোক এবং ইখওয়ানুল মুসলিমুনের তৈরি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

আমি বাংলাদেশ সম্পর্কে বাদশাহ ফায়সালের সাথে যা বলেছি সে কথাই আমীরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলার উদ্দেশ্যেই কুরবান সাহেব এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঐ সময় বিদেশে থাকায় তাঁর উপদেষ্টার সাথেই সাক্ষাৎ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মাসখানেক পরই ওআইসি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক হওয়ার কথা। তাই অন্তত কোন একজন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে মন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখার কথা বলা প্রয়োজন। ড. ইয্যুদ্দীন ইবরাহীমের সাথে খুবই আন্তরিকপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা হয়। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার বক্তব্য শুনলেন এবং এর গুরুত্ব অনুভব করলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে ভারতের বিরাট ভূমিকার নিয়ত যে মহৎ ছিলো না সে কথা ঐতিহাসিক যুক্তি ও কতক বিশিষ্ট ঘটনা দ্বারা আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে, বিষয়টির গভীরতা যথার্থভাবে তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছেন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে তা মন্ত্রী সম্মেলনে তুলে ধরার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বিষয়টি আমি বাদশাহ ফায়সালকে অবহিত করেছি বলে জেনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সব শেষে আমাকে সরকারি মেহমানের মর্যাদা দেওয়ায় তাঁর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। তিনি এটাকে দীনী কর্তব্য মনে করেছেন বলে জানিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন।

দুবাই পৌঁছলাম

১৯৭৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমি, মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ও কুরবান সাহেব আবুধাবী থেকে দুবাই পৌঁছলাম। জনাব মু. নূরুয্যামানের বাসায় উঠলাম।

আমরা তিন জন নূরুয্যামান সাহেবের বাসায় দীর্ঘ বৈঠক করেছি। প্রথমে দেশ থেকে

www.bjilibrary.com

তাঁর চলে আসার চমকপ্রদ কাহিনী শুনলাম। ব্যারিস্টার সাহেবের কাহিনী মক্কা শরীফেই তার মুখে শুনেছি। সশস্ত্র মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে যারা উগ্র ইসলামবিরোধী ও হিংস্র বামপন্থি, তারা ১৬ ডিসেম্বরের পর অরাজক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে নির্মূল করার লক্ষ্যে যে হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছিলো তা থেকে আত্মরক্ষার জন্য আত্মগোপনের পথ ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না। আত্মগোপন করার কৌশল বামপন্থিদের ভালোভাবেই জানা ছিলো। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের কারোই এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা ছিলো না। যারা দেশে আত্মগোপন করেছেন তাদেরকে সব সময় আতঙ্কে থাকতে হয়েছে। যারা বিদেশ পাড়ি জমিয়েছেন তারা অনেক কষ্ট ভোগ করলেও অবিরাম শঙ্কায় ছিলেন না। ভারত ও নেপালে জামায়াতে ইসলামীর লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা তাদের জন্য আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত ছিলো। ইসলামী আন্দোলন দুনিয়ায়ও যে আল্লাহর মহান রহমত তা আমি সব দেশেই বাস্তবে অনুভব করেছি। আল্লাহর দীনের জন্য যারা নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তাদের অভিভাবকত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে যারা শহীদ হন তারা তো আল্লাহর সরাসরি আশ্রয়েই চলে যান। যারা দুনিয়ায় থেকে যান তাদেরকে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে ও অযাচিতভাবে সহায়তা করতে থাকেন।

বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে ভাবনা

আমরা তিন জন দুবাইতে যতবার বৈঠকে বসেছি, এর মধ্যে একবারও আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কোন আলোচনা করা হয়নি। আমরা জন্মভূমি থেকে দূরে প্রবাসজীবন কাটাচ্ছি এবং পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছি। এ সত্ত্বেও আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা কখনো আলোচ্য বিষয় ছিলো না। আমরা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কেই আলোচনা করেছি। বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা করেছি এবং বাংলাদেশে ইকামাতে দীনের অগ্রগতি কীভাবে হতে পারে, এসব ভাবনা-চিন্তাই আমাদের প্রধান আলোচ্য ছিলো।

আমি তাঁদের সামনে আমার তৎপরতার বিবরণ দিলাম এবং এ পর্যন্ত সামান্য যা কিছু করা সম্ভব হয়েছে এর রিপোর্টও পেশ করলাম। আমি জানালাম যে, ১৯৭১-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২-এর নভেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানে আটকা পড়ে থাকা অবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর বাইতুল মাল থেকে '৭২-এর ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে মাত্র দু'কিস্তিতে কিছু টাকা ঢাকায় সংগঠনের ভাইদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছি। পাকিস্তানে থাকাকালে আমি তীব্রভাবে অনুভব করেছি যে, নতুন করে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হলে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো টাকার। যোগাযোগের জন্য জেলায় জেলায় সফর করা প্রথম করণীয়। কিন্তু পাকিস্তান থেকে টাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এক বছরে মাত্র দু'বার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানে টাকা যোগাড় করা কঠিন হতো না। কিন্তু পাঠাবার উপায় খুঁজে পাওয়াই সবচেয়ে দুরূহ ছিলো। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও চলেনি। লন্ডনের মাধ্যমে চিঠি পাঠালে জওয়াব পেতে কমপক্ষে এক মাস লেগে যেতো। আমি এ সিদ্ধান্ত নিয়েই পাকিস্তান থেকে কোন রকমে বের হয়েছি যে, লন্ডন পৌঁছে ঢাকার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবো এবং সাধ্যমতো অর্থ সংগ্রহ করে পাঠাবো। আমার এ সিদ্ধান্তকে তারা সঠিক বলে মন্তব্য করায় আমার এতমিনান হলো।

www.bjilibrary.com

আব্বার ইন্তিকালের খবর

'৭২ সালের ২৮ নভেম্বর দুবাই পৌছার পর পরই ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার থেকে আমার কনিষ্ঠ ভাই ড. মু. মাহদীউযযামানের চিঠি পাই। তখন নূরুযযামান সাহেবের বাসায় কুরবান সাহেবসহ আমরা আলোচনায় ছিলাম। আলোচনা মুলতবি রেখে চিঠিটা পড়ছি, আর চোখে পানি পড়ছে দেখে তারা দু'জনই বুঝতে পারলেন যে, কোন গুরুতর দুঃসংবাদ এসেছে। জানতে চাইলেন, কিন্তু আমি তখন কথা বলতে পারছিলাম না বলে চিঠিটা কুরবান সাহেবের হাতে দিলাম। চিঠির মর্ম জানার পর দু'জনেই আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন।

চিঠিতে জানতে পারলাম যে, আব্বা ১৯ ফেব্রুয়ারি ইন্তিকাল করেছেন। তখন তাঁর বয়স ৭৬ বছর। আমি '৭১-এর ২২ নভেম্বর ঢাকা থেকে লাহোর যাবার সময় সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় দেখে গেছি। হজ্জের সময় জামায়াতের শহর আমীর মাওলানা নূরুল ইসলাম থেকে জানতে পারলাম যে, আব্বার প্যারালাইসিস এবং তিনি হাসপাতালে আছেন, খুব ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। আমি মক্কা শরীফ থেকেই অত্যন্ত আবেগময় এক দীর্ঘ চিঠি আব্বাকে সম্বোধন করে লিখলাম। আমি কোন এক জায়গায় না থাকার কারণে আব্বার ইন্তিকালের খবরের আগে আর কোন খবর পাইনি।

আমি নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রবোধ দেবার মতো কতক কথা পেলাম। প্রথমত তিনি পরিণত বয়সেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন। তিনি তাঁর ছেলেদের জন্য কোন লায়েবিলিটি বা দায়-দায়িত্ব রেখে যাননি। তিনি সবাইকে উচ্চশিক্ষিত করে রেখে গেছেন এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত দেখে গেছেন। সব মেয়েকে বিয়ে দিয়ে গেছেন এবং তারা অত্যন্ত সন্তোষজনক অবস্থায় আছে বলে দেখে গেছেন। তিনি এমন কোন ধার-কর্জ রেখে যাননি, যা আমাদের আদায় করতে হবে। কোন সময়ই তিনি কোন ব্যাপারে ছেলেদের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। তিনি আমাদেরকে আজীবন শুধু দিয়েই গেছেন। তাঁর কোন প্রয়োজনে তাঁর ছেলেদের থেকে কিছুই নিতে হয়নি। তিনি হামেশা দোয়া করতেন যেন আল্লাহ ছাড়া আর কারো মুখাপেক্ষী হতে না হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর এ দোয়া এমনভাবে কবুল করেছেন যে, নিজের ছেলেদের কাছ থেকেও কিছু নেবার প্রয়োজন হয়নি। আমরা যেন খাঁটি মুসলিম হই সেজন্য সব সময় তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁকে একজন আদর্শ ও সফল পিতা হিসেবে পেয়েছি। এসব কথা স্মরণ করে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম।

আমার আফসোস

আমি একটি কারণে অত্যন্ত গভীরভাবে বেদনাবোধ করেছি। আমি আব্বার সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। অথচ আমি আব্বার কোন খিদমত করতে পারলাম না। ইন্তিকালের পূর্বে যে আড়াই মাস তিনি অসুস্থ ছিলেন, বিদেশে থাকার কারণে সামান্য একটু সেবা করার সুযোগও পেলাম না। অসুস্থ অবস্থায় তিনি অসিয়ত করলেন যে, তাঁর জানাযায় আমি যেন ইমামতি করি। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে লক্ষ্মীবাজারস্থ মিয়া সাহেবের ময়দানের গদ্দিনশীন পীর সাইয়েদ আহমাদুল্লাহ যেন জানাযা পড়ান। ঐ পীর সাহেব আব্বার ছাত্র এবং আমার আপন মামাতো ভাই। আব্বা যখন ঢাকা মুহসিনিয়া মাদরাসার ছাত্র ছিলেন তখন ঐ বাড়িতে লজিং ছিলেন এবং আহমাদুল্লাহকে পড়াতেন।

www.bjilibrary.com

আমার আফসোস যে, আব্বার জানাযায় শরীক হবার সৌভাগ্যও হলো না। আব্বা এ মহল্লায় যে মসজিদ নির্মাণ করলেন এরই পাশে তাঁর ও আমার আম্মার কবর। পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে নামাযে যাবার সময় কবরের পাশ দিয়েই যাই। ফজরের সময় কবরের সামনে থেমে যিয়ারত করি। অন্যান্য নামাযের সময় শুধু সালাম দিয়ে চলে যাই। এভাবে আমার আবেগ তৃপ্তি পায়।

আমার পরিবার সব সময়ই আব্বার উপর নির্ভরশীল ছিলো। ১৯৫৫ সালে রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে বিদায় হবার পর আর চাকরি করবো না বলে সিদ্ধান্ত নেই। জামায়াতে ইসলামী এক বছর আগে থেকেই আমাকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলো। আমি এ প্রস্তাব অনুযায়ী বিলম্বে হলেও দায়িত্ব নিলাম। আমি জামায়াত থেকে যে সামান্য ভাতা নিতাম তা থেকে অর্ধেকের বেশি আব্বার হাতে তুলে দিতাম। পৃথক পরিবার হিসেবে চললে এ টাকায় আমার পরিবারের খরচ চলার কথা নয়। আব্বার ইন্তিকাল পর্যন্ত আমার পরিবার আব্বা-আম্মার সাথে একান্নই ছিলো।

আমার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করলে, আমি তাঁর কোন সামান্য খিদমতও করতে না পারার জন্য আফসোস আরও বেড়ে যায়। মগবাজারে ১৯৪৮ সালে আব্বার কেনা জমি তিনি আমাদের ভাই-বোনদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। আমার ছোট দু'ভাই ডাক্তার গোলাম মুয়াযযাম ও ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররাম নিজস্ব বাড়ি তৈরি করতে চায়। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় থাকার জায়গা সংকুলানও হচ্ছিলো না। বণ্টননামা তৈরি করার আগে আব্বা আমার ঐ দু'ভাইকে ডেকে বললেন, "তোমাদের বড় ভাইতো মনে হয় তোমাদের মতো নিজস্ব বাড়ি নির্মাণ করতে পারবে না। তাই জমি কেনার সময় যে মযবুত টিন ও সেগুন কাঠের ঘরটি কেনা হয়েছিলো সে ঘরটি যে জায়গায় আছে সে জায়গাটা ওর জন্য বরাদ্দ করতে চাই।" ভাইয়েরা খুশি হয়ে সম্মতি দিলো। আমার প্রতি এ বিশেষ মেহেরবানী না করলে বিরাট সমস্যা হতো। অবশ্য ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ করায় বিনা সুদে টিনের ঘরের জায়গায় বিল্ডিং করা সম্ভব হয়েছে। আব্বার জন্য প্রাণভরে দোয়া করে তৃপ্তিবোধ করি। রাসূল (স) ইরশাদ করেন, "জীবিত লোকের পক্ষ থেকে মৃতের জন্য হাদিয়া বা উপহার হলো তাঁর জন্য গুনাহ মাফ চাওয়া।" এ সুখবরটি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ।

মৃতের জন্য করণীয়

সাধারণত মৃতের জন্য সওয়াব পাঠাবার উদ্দেশ্যে অনেক রকম নেক আমল করা হয়। কুরআন তিলাওয়াত, দান খয়রাত ও বিভিন্ন রকম খতম পড়ে এর সওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছাবার জন্য অনুষ্ঠানও করা হয়। অথচ সবচেয়ে জরুরি হলো গুনাহ মাফ চাওয়া। গুনাহ মাফ হলে তো অতিরিক্ত সওয়াব না হলেও চলে। কিন্তু যত সওয়াবই পাঠানো হোক গুনাহ মাফ না হলে তো নাজাতের আসল উদ্দেশ্যই সফল হবে না। তাই রাসূল (স) উপদেশ হিসেবে জানালেন যে, মৃতের জন্য আসল হাদিয়া হলো তার জন্য গুনাহ মাফ চাওয়া।

মৃতের সন্তানাদি, পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব পৌঁছানো অবশ্যই ভালো কাজ। কিন্তু কিছু লোককে ভাড়া করে এনে পয়সার বিনিময়ে কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাঠাবার যে প্রথা চালু আছে এটা কোন কাজে আসে কিনা

www.bjilibrary.com

সেটা ভাববার বিষয়। কারণ যারা পয়সার বিনিময়ে তিলাওয়াত বা কোন খতম পড়ে এর কোন সওয়াব হয় কিনা সেটাই বড় প্রশ্ন। তারা তো আল্লাহর ওয়াস্তে পড়ে না, পয়সা পাওয়ার জন্য পড়ে। যদি সওয়াবই না হয় তাহলে মৃতের নিকট পৌঁছার প্রশ্নই উঠে না। সারা বছরই প্রতি নামাযের পর মৃত পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও অন্যান্য আত্মীয়ের জন্য গুনাহ মাফের দোয়া করা উচিত। তা না করে বছরে একবার মৃত্যু দিবসের অনুষ্ঠান করা হয়। এ আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে সারা বছর নামাযের পর দোয়া করার মূল্য অনেক বেশি বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের দেশে আজব ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হয়। পিতা-মাতার মৃত্যু দিবস পালনকে দোয়ার মাহফিল না বলে মিলাদ মাহফিল বলা হয়। অথচ মিলাদ শব্দের অর্থ হলো জন্মদিবস। মৃত্যু দিবসকে জন্মদিবস নামে পালন করা কি হাস্যকর নয়? মৃত্যুর তৃতীয় দিনে কুলখানি ও চল্লিশতম দিনে চেহলাম বা চল্লিশা পালন করা হয়। এসব রেওয়ায কেমন করে চালু হলো তা গবেষণার বিষয়। রাসূল (স) এ জাতীয় কোন শিক্ষা দেননি। দোয়ার মাহফিল যে-কোন দিনই করা যায় এবং সব দিনের মর্যাদাই সমান। তৃতীয় দিন বা চল্লিশের দিন দোয়া করলে বেশি সওয়াব মনে করলে অবশ্যই গুনাহ হবে। কারণ এমন কোন কথা কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণ করার সাধ্য কারোই নেই।

আমার আব্বার ইন্তিকালের পর তাঁর জন্য দোয়া করার কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে দোয়া সংক্রান্ত প্রচলিত প্রথার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করলাম। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদেরকে সমবেত করে মৃতের জন্য দোয়া করার প্রথাকে আমি পছন্দ করি। আমি এ ধরনের দোয়ার মাহফিলে কথা বলার সুযোগ পেলে বলি যে, এ জাতীয় মাহফিলে যারা হাজির হন তাদের মৃত্যুর কথা স্মরণ হয় এবং পিতা-মাতা মারা গেলে তাদের জন্য দোয়া করা কর্তব্য বলে সবাই অনুভব করে। কিন্তু মৃত্যুদিবস, কুলখানি ও চল্লিশার অনুষ্ঠানগুলোকে মিলাদ মাহফিল না বলে দোয়ার মাহফিল বলাটাই সঠিক ও যুক্তিপূর্ণ।

কুয়েত রওয়ানা

১৯৭৩ সালের ১০ মার্চ দুবাই থেকে আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান কুয়েত গেলাম। জেদ্দার রাও আখতার সাহেব যার কাছে আমার ব্যাপারে চিঠি লিখে দিয়েছিলেন তিনি আমাকে আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মেহমান হিসেবে বিমানবন্দরে আমাদেরকে অভ্যর্থনা করে হোটেলে নেবার ব্যবস্থা করলেন। মন্ত্রণালয়ের 'ইসলামী এফেয়ার্স (শুউনুল ইসলামী)' এর ডেপুটি ডাইরেক্টর ইমিগ্রেশনেই অপেক্ষা করছিলেন। আমার নাম আগেই ইমিগ্রেশন অফিসারকে বলে রাখায় আমার পাসপোর্ট পেশ করার সাথে সাথেই অফিসারের ইশারা পেয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর সাহেব আমার পাশে এসে পরিচয় দিলেন। তিনি আমাদেরকে বিমানবন্দর থেকে সাথে করে নিয়ে মোটরগাড়িতে উঠলেন। তিনি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন বলে কোন সমস্যা হয়নি। তিনি নিজেকে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের লোক বলে পরিচয় দিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো খোলামেলা কথাবার্তা বললেন। গাড়িতে চলার সময়ই তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, যে-কোন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা কুয়েতে এলে 'শুউনুল ইসলাম' বিভাগ তাঁকে মেহমান হিসেবে গণ্য করে, তাকে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে ও তাঁর জন্য একটি সরকারি গাড়ি বরাদ্দ করে।

www.bjilibrary.com

যার সাথে সাক্ষাতের জন্য আমি কুয়েত গেলাম তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী হলেও ইখওয়ানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। উক্ত ডেপুটি ডাইরেক্টর থেকে জানা গেলো যে, তিনি দেশে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি এবং প্রভাবশালী। দুনিয়ার বহু দেশ থেকে ইসলামী ব্যক্তিত্ব তাঁর কাছে আসেন। তাঁর নাম শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুত্তাওয়া। তিনি তখন 'জমিয়তুল ইসলাহ কুয়েত' নামক একটি দীনী ও সামাজিক সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল।

হোটেলে পৌঁছার পর ডেপুটি ডাইরেক্টর হোটেল থেকেই ফোন করে মুত্তাওয়া সাহেবকে আমার আগমন সংবাদ জানালেন। মুত্তাওয়া সাহেব মাগরিবের পর তাঁর অফিসে যাওয়ার জন্য দাওয়াত দিলেন। ডেপুটি ডাইরেক্টর সাহেব বিদায় হয়ে যাবার পূর্বে আমাকে বললেন যে, হোটেলে আমার থাকা, খাওয়া, লন্ড্রি সার্ভিস ইত্যাদির বিল তাঁরাই পরিশোধ করবেন। আমার জন্য বরাদ্দ গাড়িটি ২৪ ঘণ্টা আমার কাছেই থাকবে এবং যখন যেখানে যেতে চাই ড্রাইভারকে আমি যেন তা বলে দিই, যাতে যথাসময় গাড়ি প্রস্তুত থাকে।

১৩৪.

আমার আব্বার অসুস্থতা

আমার স্বাস্থ্যবান আব্বার অল্প সময়ের অসুস্থতায় ইন্তিকাল হবার খবর আমার অন্তরে এতোটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে যে, তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য অস্থির হয়ে গেলাম। ইসলামাবাদে থাকাকালে তাঁর সর্বশেষ চিঠি যে প্রেরণা দান করেছিলো তা স্মরণে এলো। তিনি '৭২ সালের অক্টোবরে ঐ চিঠিটি লিখেছিলেন। তাঁর হাতের লেখা খুবই সুন্দর ছিলো। চিঠিটি হেফাযত করেই রেখেছিলাম। আমার প্রবাস জীবনে প্রাপ্ত মাওলানা মওদূদীর বেশ কয়টি চিঠির সাথে আব্বার লেখা ঐ চিঠিটি যে ব্রীফকেসে রাখা ছিলো তা চুরি হয়ে গিয়েছিলো বলে খুবই দুঃখিত।

আমার স্ত্রী থেকে আব্বার অসুস্থতার বিবরণ যা জানতে পেরেছি তা আমার সন্তানদের জন্য রেকর্ডভুক্ত করে রাখার উদ্দেশ্যে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করছি। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে আমার পরিবারের উপর হামলা হবার আশঙ্কায় আমার স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিয়ে আব্বা অন্যত্র আশ্রয় নেন। আব্বা তখন আমার ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররমের বাড়িতে থাকতেন। ঐ বাড়িতে হামলার আশঙ্কা ছিলো না বলে আমার ভাই কোথাও সরে যায়নি। আব্বারও কোথাও যাবার প্রয়োজন ছিলো না। আমার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রী ও ছয় ছেলের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনের তাগিদেই ৭৬ বছর বয়সে এখান থেকে ওখানে কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এ কারণে আব্বাকে চরম মানসিক পেরেশানী ও বেশ দৈহিক কষ্ট সহ্য করতে হয়। কিছুদিন পর আমার শ্বশুর সাহেব এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে আব্বা বাড়িতে ফিরে আসেন। বাড়িতে এসেও তিনি পেরেশানমুক্ত হননি। দৌড়াদৌড়ির ঝামেলা থেকে মুক্তি পেলেও তাঁর প্রিয় নাতিদের নিরাপত্তার জন্য পেরেশান রইলেন।

১৯৫৫ সালে চাকরি থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিন বছরের বড় ছেলে মামুন ও দেড় বছরের দ্বিতীয় ছেলে আমীনকে নিয়ে মগবাজারে আব্বার বাড়িতে এসে উঠলাম। '৭০ সাল

www.bjilibrary.com

পর্যন্ত ১৬ বছর আব্বার সাথে এ বাড়িতেই থাকলাম। এর মধ্যে আমার আরও চার ছেলে পয়দা হলো। ভাইদের মধ্যে একমাত্র আমিই আব্বার উপর নির্ভরশীল ছিলাম।

আমার ছেলেদের দাদাই ছিলেন আসল অভিভাবক

আমি মাসের বেশির ভাগ সময়ই সাংগঠনিক সফরে কাটাতাম। ঢাকা থাকাকালেও ছেলেদেরকে দেবার মতো সময় পেতাম না। সকালে সবার আগে নাশতা করে জামায়াত অফিসে চলে যেতাম। দুপুরে বাড়িতে এসে গোসল ও খাওয়া সেরে আবার অফিসে চলে যেতাম। ঢাকা শহরে জামায়াতের কোন প্রোগ্রাম থাকলে অফিস থেকেই যেতে হতো। রাতে বাসায় ফিরে আসতে প্রায়ই ১০টা বেজে যেতো।

আব্বা সকালে নাশতা ও দু'বেলা তাঁর নাতিদেরকে সাথে নিয়ে খেতেন। ছোটদেরকে লুকমা তুলে খাওয়াতেন। নাতিদেরকে ছাড়া তিনি খেতেই পারতেন না। আমি আমার কোন ছেলের মুখে লুকমা তুলে দিয়েছি বলে মনে পড়ে না। ওরা দাদার অভিভাবকত্ব সব সময় উপভোগ করেছে। ওদের বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার জন্য এক কারী সাহেবকে তিনি লজিং রাখলেন, যাতে দু'বেলাতেই পড়ানো হয়। ওদেরকে স্কুলে ভর্তি করা, ভালো স্কুল বাছাই করা, শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা ইত্যাদি অবশ্য আমিই করেছি। আর সবই আব্বা করতেন।

আব্বার সন্তানদের মধ্যে আমিই সবার বড়। পরবর্তী প্রজন্মে, অর্থাৎ আমাদের ভাইদের সন্তানদের মধ্যে আমার বড় ছেলে মামুনই সবার বড়। বড় নাতির সাথে দাদার সম্পর্ক বেশি গভীরই হয়ে থাকে। '৭২ সালে নিরাপত্তার কারণে আমার বড় দু'ছেলে মামুন ও আমীন আব্বার কাছে না থাকায় তাদের অভাব তিনি খুবই বোধ করতেন। নিরাপত্তার স্বার্থেই তাদের লেখাপড়াও বন্ধ ছিলো। তাই আমার বড় দু'ছেলে এবং আমার ভাই গোলাম মুয়ায্যামের বড় ছেলে সোহায়লকে আমার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার ড. মাহদীউয্যামানের নিকট ম্যানচেস্টারে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো। সব শেষে '৭২ সালের ডিসেম্বরে আব্বার বড় নাতি মামুন গেলো।

মামুন তার বড় চাচা সিলেট মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ড. গোলাম মুয়ায্যামের বাসায় আত্মগোপন করেছিলো। বিদেশে পাঠাবার প্রয়োজনে তাকে ঢাকা আসতে হলো। ম্যানচেস্টার রওয়ানা হবার দিন পর্যন্ত আব্বা ১৩ দিন ওর সাথেই বেশি সময় কাটাতেন। ওকে বাইরে ঘুরাফেরা করতে দেওয়া হয়নি। মহল্লার কেউ জানতে পারেনি যে, মামুন মগবাজারে এসেছে। বাড়ির একেবারে ভেতরের দিকে এক কামরায় সে থাকতো ও খেতো। তার অবিরাম সঙ্গী তার দাদাই ছিলেন। তাকে একা থাকতে দেননি।

মামুনকে বিদায় করার সময় আব্বা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে বলেন, "দু'ভাই তো আগেই চলে গেলো। তুমিও চলে যাচ্ছো। তোমরা কেউ আমার জানাযায় থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।" নিরাপত্তার কারণেই আমার চতুর্থ ছেলে আমান বাড়িতে ছিলো না। যাদেরকে সাথে না নিয়ে তিনি খেতেন না তারাও তাঁর থেকে দূরে আছে। আব্বা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতে লাগলেন। আমি তো বিদেশেই। ডাক্তার ভাই সিলেট এবং ইঞ্জিনিয়ার ভাই ঘোড়াশাল সার-কারখানায়। আম্মা ও আমার স্ত্রী ছাড়া বাড়িতে কোন পুরুষ নেই। আমার তৃতীয় ছেলে মুমিন এবং পঞ্চম ছেলে নোমান ও কনিষ্ঠ ছেলে সালমান বাড়িতেই ছিলো।

www.bjilibrary.com

মামুন '৭২ সালের ডিসেম্বরের প্রথম দিকেই বিদেশে চলে যাবার পর আব্বা অত্যন্ত মনমরা অবস্থায় ছিলেন। স্বাভাবিক হাসি-খুশির কোন লক্ষণ ছিলো না। মামুন যাবার ষষ্ঠ দিনে শাওয়ালের রোযা থাকা অবস্থায় আব্বা বাথরুমে পড়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলেন। আমার ভাইদের কেউ ঢাকায় ছিলো না। আমার বোন জাহান আরার স্বামী ঢাকা আলীয়া মাদরাসার আরবীর অধ্যাপক মাওলানা আলাউদ্দীন আযহারী আব্বাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। সালমানের বয়স তখন ছয় বছর। আব্বা তাকে অনেক দোয়া মুখস্থ করিয়েছিলেন। আব্বার অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালেও সালমান খাবারে দোয়া পড়ে ফুঁ দিলে পরে তিনি খেতেন। এ থেকে নাতিদের ব্যাপারে আব্বার আবেগের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়।

আশা করি আমার লেখা পড়ে আমার ছেলেরা আব্বার জন্য দোয়া করা কর্তব্য মনে করবে।

মুত্তাওয়া সাহেবের অফিসে

শুউনূল ইসলামের ডেপুটি ডাইরেক্টর চলে যাবার পর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়ার জযবায় আমি আপ্লুত হয়ে গেলাম। ইসলামী আন্দোলন যে আল্লাহ্ তাআলার কত বড় নিয়ামত তা আবার উপলব্ধি করলাম।

এ মহাসত্যের বাস্তব প্রমাণ পেলাম যে, মুসলিম উম্মাহ এক বিশ্বজোড়া উম্মত। আল্লাহর রাসূল (স) যে উম্মত গড়ে দিয়ে গেলেন তা বিশ্বজনীন ও আন্তর্জাতিক। রাসূল (স) পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে যে দীন ইসলামকে রেখে গেলেন এবং এ দীনকে বিজয়ী করার জন্য যে আন্দোলন ও সংগ্রাম করে গেলেন, যারা রাসূল (স)-কে আদর্শ হিসেবে অনুকরণ ও অনুসরণ করে ঐ ইসলামকে কায়েম করার জন্য সংগঠন ও আন্দোলন করেন তাঁরা সবাই আসলে একই জামাআতভুক্ত। সে হিসেবে ইসলামী জামাআতও আন্তর্জাতিক জামাআত। অবশ্য তাদের সাংগঠনিক কাঠামো ও নেতৃত্ব ভিন্ন ভিন্ন। কারণ ভাষার পার্থক্য ছাড়াও প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক পরিবেশ ভিন্ন। তাই ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে গেলে সাংগঠনিকভাবে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ থেকে পাকিস্তান এলাকায় ভিন্ন সংগঠন গড়তে হলো এবং নেতৃত্বও আলাদা হয়ে গেলো। তেমনিভাবে '৭১ সালে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে ভিন্ন সংগঠন গড়তে হলো।

আমি ইউরোপ, আমেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের যত দেশেই গিয়েছি সর্বত্রই ইসলামী আন্দোলনের সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দীন ইসলাম সম্পর্কে চিন্তার চমৎকার মিল পেয়েছি। প্রতিটি আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে আগত বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক মহব্বত দেখে মনে হয়েছে যে, আমরা সবাই একই জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম সম্পর্কে সব নেতার বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলাম সম্পর্কে ধারণাও সবার একই। আল্লাহর কুরআন, রাসূলের হাদীস, রাসূল (স)-এর জীবন ও তাঁর ইসলামী আন্দোলনকে যারা আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাদের চিন্তাধারায় পার্থক্য না থাকাই স্বাভাবিক।

কিন্তু যারা ইসলামকে শুধু ধর্ম মনে করেন তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে এতো বিভিন্ন ও বিচিত্র ধারণা পাওয়া যায়, যার সংখ্যা হিসাব করাই কঠিন। ইসলাম তো এতো রকম

www.bjilibrary.com

হতে পারে না। রাসূল (স) তো এক রকম ইসলামই রেখে গেছেন। বিশুদ্ধ ইসলাম তো এক রকমই হওয়ার কথা। অশুদ্ধ ইসলাম অনেক রকমই হওয়া স্বাভাবিক। একটি অংক (গণিত) যারা শুদ্ধভাবে কষে তাদের সবার অংক একই রকম হয়ে থাকে। যাদের অংক ভুল কষা হয় তাদের ভুল অনেক রকম হতে পারে।

একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি তার জন্য ঐ রকমই।" আল্লাহ সম্পর্কে সকল নবী একই রকম ধারণা দিয়েছেন। আল্লাহর সঠিক পরিচয় সেটাই। যারা নবীদের শেখানো ধারণা রাখে, তাদের আল্লাহ একই রকম এবং সেটাই সঠিক ধারণা। আল্লাহ সম্পর্কে ঐ ধারণা যাদের নেই তাদের একেকজনের আল্লাহ এক-এক রকম।

শায়খ আব্দুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ

শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুত্তাওয়ার অফিস সংলগ্ন মসজিদেই তিনি নামায আদায় করেন বলে ড্রাইভার থেকে জানলাম। তাই ওখানে গিয়েই মাগরিব পড়া সঠিক মনে করলাম। সরকারি গাড়ির ড্রাইভার দেখলাম খুব চালু। সে বহু বিদেশী মেহমানের খিদমত করেছে বলে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানালো। আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান মাগরিবের সামান্য আগেই মসজিদে পৌঁছলাম। ড্রাইভারকে বললাম, যেন সে আমাকে মসজিদেই দেখিয়ে দেয় যে, কোন্ লোকটি মুত্তাওয়া সাহেব। আযান শেষ হবার আগেই তিনি পৌঁছবেন মনে করে আমি দরজার দিকে লক্ষ্য রাখলাম। অল্পক্ষণ পরেই ড্রাইভার আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দিলো। ফরযের পর দু'রাকাআত সুন্নত পড়েই লক্ষ্য রাখলাম যে, তিনি কখন উঠেন। ড্রাইভার আমার আগেই এগিয়ে গিয়ে তাঁর সাথে হাত মিলালেন। তিনি তাকে চিনলেন বলে মনে হলো। জিজ্ঞেস করলেন, "মেহমানকে নিয়ে এসেছো নাকি?" আমি কাছে যেতেই বললেন, "আহলান সাহলান প্রফেসর গোলাম।" আরবদের মধ্যে এটাই ঐতিহ্য যে, নামের প্রথম শব্দটিকেই আসল নাম ধরা হয়। দু'শব্দবিশিষ্ট নামের দ্বিতীয় শব্দটি পিতার নাম মনে করা হয়। তাদের নাম তিন শব্দে হয়ে থাকে, যার শেষ শব্দটি দাদার। তাই নাম ধরে সম্বোধন করতে গিয়ে তিনি শুধু গোলাম বললেন। তার পুরো নাম আবদুল্লাহ আলী আবদুল ওয়াহ্হাব। আল মুত্তাওয়া তার পারিবারিক নাম। আমি মাওলানা আবদুস্ সুব্হানকে তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলাম।

তিনি হাত মিলিয়ে আমার হাত ধরেই মসজিদ থেকে আমাদেরকে নিয়ে বের হলেন। আমি আরবীতে কথা বলায় অভ্যস্ত নই বুঝতে পেরে ইংরেজিতেই জানতে চাইলেন, সফরে কোন কষ্ট হয়নি তো, হোটেলে কেমন লাগছে, শরীর কেমন ইত্যাদি। মসজিদের অতি নিকটেই তার অফিস দোতলায়। আমার হাত ধরা অবস্থায়ই তিনি অফিসের দিকে এগুলেন, সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন এবং অফিসে ঢুকে টেবিলের সামনের দিকে এক চেয়ারে বসিয়ে হাত ছাড়লেন এবং টেবিলের পেছনে গিয়ে বসলেন। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান আমার পাশেই বসলেন।

মানুষটি দেখতে সুপুরুষ ও হাসিমুখ। প্রথমেই তিনি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, ইমাম শহীদ হাসানুল বান্না রাহেমাহুল্লাহকে আমি যে কারণে ভালোবাসি, একই কারণে

www.bjilibrary.com

উস্তাদ মওদূদীকেও ভালোবাসি। আমি বুঝে নিলাম যে, মাওলানা মওদূদীর ইসলামী আন্দোলনের সাথে আমার সম্পর্কের কারণেই এমন আন্তরিক সমাদর পেলাম। তার জানা ছিলো যে, আমি পূর্ব-পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলাম। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে বিরোধী দলের ডেপুটি লিডার ছিলেন, এ পরিচয় পেয়ে তিনি আবার হাত মিলালেন।

তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা শুনলেন। মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের মতোই বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী গোপনে সংগঠন গড়ে তুলছে। কারণ ইখওয়ানের মতোই জামায়াতকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি জানালেন যে, কুয়েতেও ইখওয়ানের নামে সংগঠন করা যায় না। 'জমিয়তুল ইসলাহ' নামে একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা দীনের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি এর সেক্রেটারি জেনারেল।

তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে আশাতীতভাবে ব্যবসায় উন্নতি দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, আমি দাওয়াতে দীনের জন্য দান করি বলেই তিনি আমাকে এভাবে আরও বেশি ব্যয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। তাই আমি ঐ উদ্দেশ্যেই আপনার হাতে কিছু দিতে চাই।"

আমি বললাম, "আল্লাহ তাআলা আমাকে বাংলাদেশে যেতে না দিয়ে বাইরে রেখেছেন, যাতে দেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য কিছু খিদমত করার সুযোগ পাই। আমার জন্মভূমিতে যারা চরম বিরোধী পরিবেশে আমার প্রিয় সংগঠনকে গোপনে পুনরুজ্জীবিত করছেন তাদের সাথে সহযোগিতা করার জন্যই হয়তো আল্লাহ পাক আমাকে আপনাদের মতো লোকের কাছে পৌছার তাওফীক দিয়েছেন।"

পরের দিন সন্ধ্যায় জমিয়তুল ইসলাহ-এর অফিসে জমিয়তের নেতৃস্থানীয় লোকদের সাথে পরিচয়ের জন্য দাওয়াত দিলেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে এ ব্যবস্থা করার জন্য আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম।

জমিয়তুল ইসলাহ অফিসে

পরদিন ড্রাইভার আমাদেরকে যথাসময়েই জমিয়তের অফিসে পৌছিয়ে দিলো। মুত্তাওয়া সাহেব অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের মিটিং রুমে নিয়ে গেলেন। তিনি সর্বপ্রথম জমিয়তের সভাপতি শায়খ ইউসুফ জাসেম আল হিজ্জির সাথে পরিচয় করালেন এবং তাদের দু'জনের মাঝখানে আমাদেরকে বসালেন। জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটির ৮/১০ জন সদস্যের সাথে পরিচয় হলো। তাদের বেশির ভাগই শিক্ষক। বাকিরা ব্যবসায়ী। তাদের কারো বয়স ৪০-এর বেশি মনে হলো না।

তারা পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করলেন। আমি জওয়াব দিলাম। আরবীতে অনূদিত মাওলানা মওদূদীর বই পড়ে তারা অত্যন্ত উদ্বুদ্ধ হয়েছেন বলে জানলাম। মুত্তাওয়া সাহেব তাদেরকে বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করার পরামর্শ দিলেন। বুঝতে পারলাম যে, তাঁরা পাকিস্তানকে ভালো করেই চেনেন। কিন্তু বাংলাদেশ যে বিরাটসংখ্যক মুসলমানদের একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র, সে কথা তাদের জানা নেই বলেই মনে হলো।

www.bjilibrary.com

আমার কাছ থেকে তারা প্রথম জানলেন যে, ভারতকে বিভক্ত করে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েমের ব্যাপারে বাঙালি মুসলমানদের বিরাট অবদান রয়েছে এবং পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ জন মানুষ বর্তমান বাংলাদেশের নাগরিক।

কেন বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে গেলো সে প্রশ্নের জওয়াবে পরিষ্কার করে বললাম যে, ইসলামের দোহাই দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র কায়েম হলেও পাকিস্তানের শাসকদের ইসলামবিরোধী ভূমিকার কারণেই বিচ্ছিন্নতার সূচনা হয়।

কুয়েতে জনসংখ্যার বিরাট অংশ শিয়া। কুয়েত ও ইরান আরব সাগরের এপার ও ওপারে অবস্থিত। কুয়েতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই শিয়া। তারা জানতে চাইলেন যে, বাংলাদেশে শিয়া আছে কিনা। আমি বললাম এতো অল্পসংখ্যক শিয়া আছে, যার কারণে জনগণ জানেই না যে শিয়াও একটা ফিরকাহ্।

তাঁরা মাওলানা মওদূদীর রচিত ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন করলেন এবং আমার জওয়াব শুনে উৎসাহিত হয়ে বললেন যে, তাঁর সাহিত্য সবই আরবী ভাষায় রূপান্তরিত হওয়া অতিপ্রয়োজন। তিনি আধুনিক যুগের উপযোগী ভাষায় ইসলামকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করেছেন। তাদের এ উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

এ বৈঠক শেষে জামাআতে ইশার নামায আদায় করে তাদের সাথেই রাতের খানা খেলাম। মুত্তাওয়া সাহেব একজন শিক্ষককে দায়িত্ব দিলেন, যেন পরের দিন তিনি আমাদেরকে কুয়েতের দর্শনীয় যা কিছু আছে তা দেখান।

কুয়েত দর্শন

সকাল ৯টায় ঐ শিক্ষক হোটেলে আমার কামরায় হাজির হলেন। শুউনুল ইসলামীর ডেপুটি ডাইরেক্টর রোজই ফোনে আমার খোঁজ খবর নিতেন। গতকাল তাঁকে জানালাম যে, একদিন পরই আমি সৌদি আরব চলে যাবো। তাই যাবার আগের দিন শুউনুল ইসলামীর ডাইরেক্টরের সাথে তিনি আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন। সে হিসেবে হোটেল থেকে বের হয়ে প্রথমেই ডাইরেক্টরের অফিসে গেলাম, তিনি আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। মেহমানদারির জন্য তাঁকে আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। তিনি বাংলাদেশ সম্পর্কে যা জানতে চাইলেন তা জানালাম। আবার কুয়েতে আসবার দাওয়াত দিয়ে আমাদেরকে বিদায় করলেন।

এরপর আমাদের শিক্ষক গাইড কুয়েতের দর্শনীয় বেশ কয়টি জায়গায় নিয়ে গেলেন। আমার নিকট সবচেয়ে ভালো লেগেছে আরব সাগরের তীরে দীর্ঘ রাস্তা গাড়িতে চলার সময় সমুদ্রের দৃশ্য। কোথাও কোথাও গাড়ি থেকে নেমে সাগরের ঢেউকে তীরে আছড়ে পড়ার দৃশ্য উপভোগ করেছি। পরে ঐ সমুদ্র সৈকতকে আরও অনেক আকর্ষণীয় করা হয়েছে বলে শুনেছি। '৭৩ সালে তেমন কিছু দেখিনি বটে, কিন্তু সমুদ্র তো নিজেই নৈসর্গিক সৌন্দর্য।

কুয়েত ছোট্ট দেশ। বলতে গেলে বর্তমানে সবটুকুই শহর। তখনও শহর এতোটা বিস্তৃত হয়নি। কয়েকটি মসজিদ খুবই সুন্দর। বিশেষ করে ফাতেমা মসজিদ। কুয়েত টিভিতে এ মসজিদটিকে সবচেয়ে বেশি দেখানো হয়। সুন্দর সুন্দর মসজিদগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগেই নির্মিত।

সমুদ্রের কিনারায় পাশাপাশি দুটো সুউচ্চ পানির ট্যাংক, দেখতে খুবই সুন্দর।

www.bjilibrary.com

মুত্তাওয়া সাহেবের বাড়িতে রাতের খাবার

ঐ দিনটিই আমাদের কুয়েত অবস্থানের শেষ দিন। রাতের দাওয়াতে আমরা মুত্তাওয়া সাহেবের বাড়িতে গেলাম। তাঁর বাড়িটি সমুদ্রের তীরেই অবস্থিত। দালানের সাথেই সমুদ্রের দিকে ছাদবিহীন এলাকায় খাবারের টেবিল সাজানো পেলাম। খাওয়ার সময় আলোকমণ্ডিত অবস্থায় সমুদ্রের বাতাসের আমেজ ভোগ করলাম। পরের দিন সকালেই সৌদি আরব চলে যাবো বলে মুত্তাওয়া সাহেব থেকে রাতেই বিদায় নিলাম।

১৯৭৮ সাল পর্যন্ত আমার বাধ্যতামূলক প্রবাস জীবনে আরও কয়েকবার কুয়েত গিয়েছি। তিনিই প্রত্যেকবার লন্ডনে ভিসা পাঠিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে আমার নাগরিকত্ব বহাল হবার পর আরও দুবার কুয়েতে গিয়েছি। সেখানে তিনিই আমার প্রধান আকর্ষণ। এ মানুষটিকে দীনী ভাই হিসেবে অত্যন্ত ভালোবাসি। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে তিনি এতো মহব্বত করেন যে, সরেজমিন দেখার জন্য তিনি বাংলাদেশে দু'বার আসেন। তিনি আমার সমবয়সী। দু'বার তার ওপেন হার্ট সার্জারি হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহর রহমতে এখনও সক্রিয় আছেন।

১৩৫.

ওমরাহ্ করে বৈরুত গমন

কুয়েত থাকাকালেই জানা গেলো যে, লিবিয়ার দ্বিতীয় বড় শহর বেনগাযীতে ওআইসি (Organisation of Islamic Conference)-এর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন হচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এই সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতের আচরণ সম্পর্কে মন্ত্রীগণকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য বলা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে হলো। আবুধাবীতে আমীরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মাধ্যমে এ বিষয়টা উত্থাপনের ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট মনে হয়নি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান বৈরুত পৌছবো এবং কুরবান সাহেব দুবাই থেকে বৈরুত পৌছবেন। আমরা সেখান থেকেই লিবিয়ায় একসাথে যাবো।

বৈরুত যে তারিখ পৌছা প্রয়োজন, এর আগে আমাদের হাতে তিন-চার দিন সময় আছে। কুয়েতের কাজ শেষ হয়ে গেলে মক্কা শরীফে ওমরাহ করেও বৈরুত যাওয়ার সময় থাকে। তাই কুয়েত থেকে ১৪ মার্চ ('৭৩) আমরা দু'জন সৌদি আরব চলে গেলাম। জেদ্দাহর যে রাও আখতার সাহেব আমাকে কুয়েতের মুত্তাওয়া সাহেবের নিকট চিঠি দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর কাছে কুয়েত সফরের বিবরণ দিলাম। মক্কা শরীফে ওমরাহ্ সমাপ্ত করে ১৭ মার্চ আমরা দু'জন লেবাননের রাজধানী বৈরুত রওয়ানা হলাম। বিমানবন্দরেই কুরবান সাহেবকে পেলাম। তাঁর কাছে জানতে পারলাম যে, করাচি থেকে চৌধুরী মুঈনুদ্দীন পরদিন বৈরুত পৌছবেন। অপেক্ষাকৃত সস্তা যে হোটেলে কুরবান সাহেব উঠেছেন আমরা সেখানেই পৌছলাম।

বৈরুতের দু'দিন

বেরুতের জনগণ আরবী ভাষাভাষী হলেও চালচলনে ইউরোপের মতো। পোশাকে তো বটেই। জনগণের অর্ধেক মুসলমান ও অর্ধেক খ্রিস্টান। নাম থেকে তাদের পার্থক্য বুঝা

www.bjilibrary.com

যায় না। খ্রিস্টানদের ভাষাও আরবী। ইউসুফ, ইবরাহীম, ঈসা, মূসা জাতীয় প্রচুর নাম খ্রিস্টানদের রয়েছে। কথা বলার সময় ইনশাআল্লাহ। মা-শা-আল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি খ্রিস্টানরাও বলে। আরবী ভাষার প্রভাবে আরবীভাষী খ্রিস্টানদের মধ্যে এ জাতীয় মুসলিম কৃষ্টি ব্যাপকভাবে চালু আছে।

যে হোটেলে ছিলাম তার কাছেই মসজিদ ছিলো, যেখানে আমরা নামায আদায় করতাম। ইমাম স্যুট পরা অবস্থায় একটা আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে নামায পড়ালেন। আমাদের দৃষ্টিতে বিস্ময়কর যে, ইমাম সাহেবের দাড়ি নেই। চমৎকার কিরাআত পড়লেন।

ইসলামী পুস্তক প্রকাশক একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান চোখে পড়লো। ভেতরে গেলাম। ম্যানেজারের সাথে পরিচয় হলো। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, লেবাননে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের লোকদের সংগঠন আছে, যার নাম 'আল জামায়াতুল ইসলামিয়াহ'। এর মুরশিদ (সভাপতি) ফায়সাল মৌলভী। তাঁর সাথে দেখা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা তো আসলে ইখওয়ানুল মুসলিমুন, অথচ নাম রাখলেন জামায়াতে ইসলামী।" তিনি হেসে বললেন, "ইসলাম কায়েমের উদ্দেশ্যে যে জামায়াত এর সবচেয়ে উপযোগী ও সুন্দর নাম আর কী হতে পারে?" আমরা মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামীর সাথে সম্পর্কিত জেনে তিনি আমাদের সাথে অতি মহব্বতের আচরণ করলেন। আবার প্রমাণ পেলাম, ইকামাতে দীনের সংগঠনের সবাই একই জামায়াতের।

লেবাননের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদ দু'টির একটি মুসলিম ও অপরটি খ্রিস্টানের হাতে থাকবে। এভাবে এ দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সমঝোতামূলক শাসনব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৪ সালের মে মাসে আমি সর্বশেষ বৈরুত যাই। এর কিছুদিন পর থেকে একটানা ১০/১২ বছর মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলে। শেষ পর্যন্ত আবার পূর্বের মতোই সমঝোতামূলক শাসনব্যবস্থা চালু হয়েছে। দেশটি ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরে অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশটি বিদেশী পর্যটকদের নিকট অত্যন্ত প্রিয়।

লিবিয়ার বেনগাযীতে

১৮ মার্চ ('৭৩) চৌধুরী মুঈনুদ্দীন বৈরুত এসে পৌঁছলেন। পরের দিন আমরা চারজন একসাথে বেনগাযীতে পৌঁছলাম। লিবিয়া ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। বেনগাযী শহরটি সমুদ্রের কিনারায়ই রয়েছে। সমুদ্র তীরে একটি হোটেলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনের স্থান।

আমরা প্রথমে একটা ছোট হোটেলে উঠলাম। সৌভাগ্যক্রমে টেলিভিশনে কর্মরত দু'জন পাকিস্তানির সাথে পরিচয় হয়। তারা আমাদেরকে মেহমান হিসেবে একটি মধ্যম ধরনের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন, যেখান থেকে সম্মেলনস্থল বেশি দূরে না হওয়ায় হেঁটেই পৌঁছা যায়।

আমরা আমাদের বক্তব্য ইংরেজিতে একটা কাগজে সংক্ষিপ্ত আকারে তৈরি করে নিয়েছিলাম, যাতে সম্মেলনের প্রবেশপথেই তা বিলি করা যায়।

সম্মেলনের আগেই টেলিভিশনে আমার একটা প্রোগ্রাম হলো। বাংলাদেশ সম্পর্কে আমার বক্তব্য সেখানে এলো। পরদিন সম্মেলনস্থলে আগত মেহমানদের সাথে হোটেলের লাউঞ্জে দেখা করতে গেলাম। সম্মেলন এর পরের দিন শুরু হবার কথা। ঐ সময়

www.bjilibrary.com

ওআইসি'র সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান। সৌভাগ্যক্রমে তাঁকেও লাউঞ্জে দেখা গেলো। এগিয়ে গিয়ে তাঁর সামনে যেয়ে সালাম দিতেই তিনি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আরে, গত রাতেই তো টেলিভিশনে আপনাকে দেখলাম এবং আপনার বক্তব্য শুনলাম।"

সুযোগ পেয়ে তাঁর পাশেই বসে গেলাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে বক্তব্যের কাগজ তাঁর হাতে দিয়ে বললাম, "১৯৭১ সালে আপনি ঢাকা গিয়েছিলেন। তখন হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম ইস্ট-পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর হিসেবে। আপনার হয়তো মনে নেই।" তিনি বললেন, "একটু একটু মনে পড়ছে।"

সম্মেলনের সময় আমাদের তৎপরতা

সম্মেলনের ভেন্যুতে তো আমাদের প্রবেশাধিকার থাকার কথা নয়। ভেন্যুর বাইরে হোটেলের লাউঞ্জে যাদেরকে নাগাল পাওয়া যায়, তাদের সাথে লবী করার চেষ্টা করা ছাড়া আর বড় কিছু করা সম্ভব ছিলো না। সম্মেলনের এজেন্ডা আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকে। বাংলাদেশকে তখনো সৌদি আরবসহ অনেক মুসলিম দেশই স্বীকৃতি দেয়নি। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলনে কোন আলোচনা হওয়ার সুযোগ থাকতেই পারে না।

আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিলো, যে কয়জনকে সম্ভব বাংলাদেশ সম্পর্কে এতোটুকু অবহিত করা যে, দেশটিতে বিরাট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনই মুসলিম। রাজনৈতিক সংঘাতের ফলে দেশটি পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছে। পাকিস্তানের চির দুশমন ভারত এ মহাসুযোগে পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রকাশ্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছে, যাতে বাংলাদেশের উপর স্থায়ী আধিপত্য বিস্তার করা সহজ হয়। ভারত তার মুসলিম নাগরিকদের সাথে যে আচরণ করছে তাতে ভারতকে মুসলিম-বিদ্বেষী রাষ্ট্র না বলে উপায় নেই। তাই বাংলাদেশের মতো একটি বিরাট মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশকে কুক্ষিগত করে ভারতীয় পণ্যের বাজার হিসেবে ব্যবহার করার আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। মুসলিম দেশ হিসেবে এ দেশটিকে ওআইসি-এর সদস্য করে ভারতের খপ্পর থেকে হেফাযত করার জন্য ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

আল্লাহর শোকর যে এ মহান উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আমরা যতটুকু করতে পেরেছি তাতে আমাদের লিবিয়া সফরকে সার্থক বলা যায়।

সম্মেলন উপলক্ষে বিরাটসংখ্যক সাংবাদিক হোটেলের লাউঞ্জে আসা-যাওয়া করায় তাদের সাথেও আমরা কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদেরকে যতটুকু বলা সমীচীন মনে করেছি, বলেছি, যাতে তারা মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারে।

লিবিয়ার কথা

লিবিয়া আকারে আফ্রিকা মহাদেশের বড় দেশগুলোর একটি। তবে নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া ও মিসরের তুলনায় লিবিয়ার লোকসংখ্যা অনেক কম। দেশটি আফ্রিকার উত্তর প্রান্তে এবং ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রাজধানী ত্রিপোলী এবং বেনগাযী এ প্রধান দুটো শহরই সাগর তীরে। সাগরের কাছাকাছি এলাকায় প্রচুর গাছপালা আছে। যাইতুন গাছই সবচেয়ে বেশি। প্রচুর ফলন হয় এবং গাছের নিচেই পচে শেষ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

যাইতুন সারা মধ্যপ্রাচ্যে সালাদে প্রচুর ব্যবহার করা হয়। যাইতুনের তেল সকল প্রকার রান্নায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। শুধু এ তেল ও রুটি দিয়ে নাশতা হয়ে যায়। এককালে এ তেলের চেরাগই রাতে আলো দিতো ঘরে ঘরে। শীতকালে এ তেল গায়ে মাখা হয়। রাসূল (স) এ তেলকে চমৎকার সালুন বলে মন্তব্য করেছেন। ঢাকার প্রখ্যাত হারবাল চিকিৎসক ও মডার্ন হারবালের মালিক ডাক্তার আলমগীর মতি ১৯৯৫ সালে আমাকে কোষ্ঠ-কাঠিন্যের ওষুধ হিসেবে এ তেল খেতে পরামর্শ দেন। তখন থেকে আমি খাবার আগে দু'বেলা এ তেল চামচ দিয়ে মুখে তুলে খাই। এ তেল ব্যবহার শুরু করার এক বছর পর বিশেষ আরও একটা উপকার লক্ষ্য করলাম। শীতকালে আমার হাত ও পায়ের চামড়া এতোটা শুষ্ক হয়ে যেতো যে, কোন তেল বা লোশন মেখে নিতে বাধ্য হতাম। আল্লাহর মেহেরবানী যে, এখন আমার হাত-পায়ে কোন কিছুই আর মাখাতে হয় না। বুঝলাম যে, চামড়ার উপর তেল না মেখে পেটে পাঠিয়ে দিলে এর সুফল চামড়ায় পৌঁছে যায়।

বাংলাদেশে এ তেল কিনতে পাওয়া যায়। ৫০০ গ্রামের এক শিশি ১৪০ টাকায় কিনতাম। এখন দাম বাড়তে বাড়তে ১৮০ টাকায় পৌঁছেছে। এ তেল স্পেন থেকে আসে। সৌদি আরবেও তেল কিনেছি। তা-ও স্পেনে তৈরি।

আমি জানি না, লিবিয়ায় বর্তমানে যাইতুনের মতো মূল্যবান তৈল উৎপাদন করা হয় কিনা। পেট্রোলের টাকার পর এসব করার প্রয়োজন হয়তো বোধ করা হয় না।

লিবিয়ার বিশাল এলাকা মরুভূমি। তাই লু হাওয়ার আঘাত বেনগাযীতেও টের পেলাম। আমরা বেনগাযীতে ১৯৭৩ সালের ৮ এপ্রিল পর্যন্ত ছিলাম। এপ্রিলেরই কোন এক তারিখে লু হাওয়ার প্রকোপে প্রচণ্ড ধূলিঝড় হলো। সকল দরজা-জানালা বন্ধ করেও কামরার ভেতরে নাকে-মুখে কাপড় দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে রইলাম। একটানা দু'আড়াই ঘণ্টা এ ঝড়ের তাণ্ডব চললো। শোঁ শোঁ বিকট আওয়াজে ঘরে কাছের মানুষের কথাও বুঝার উপায় নেই। আমরা যে দালানের দোতলায় ছিলাম এর কামড়াগুলো এয়ারটাইট নয় বলে দরজা-জানালার ফাঁক ও ভেন্টিলেটার দিয়ে এতো ধুলা কামরায় ঢুকতে পারলো।

ঝড় থামার পর দেখা গেলো যে কামরার মেঝে ও বিছানায় বালি এক ইঞ্চি পুরু হয়ে আছে। আমাদের জামা-কাপড়েও অনেক ধূলি। যাদের মাথা কাপড়ে ঢাকা ছিলো না তাদের চুলের ফাঁকে মাথাভর্তি ধূলি। অবশ্য শুকনা ধূলি সহজেই ঝেড়ে ফেলা গেলো। লিবিয়ার সামরিক শাসক কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফী বাদশাহ ইদরিসকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। মিসরের কর্নেল নাসের আরব জাতীয়তাবাদের হিরোর ভূমিকায় অভিনয় করে আরব বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত করার আবেগময় আহ্বান জানান। এ ডাকে সারা দিয়ে বেশ কয়টি আরব রাষ্ট্রে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করে। লিবিয়া এর মধ্যে একটি। সব ক'জন সামরিক স্বৈরশাসকই সোশালিজমকে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করে। তাই কর্নেল গাদ্দাফী রাষ্ট্রের নাম দেন 'পিপলস্ সোশালিস্ট বিপাবলিক অব লিবিয়া'।

বাদশাহ ইদরিস খুবই ধার্মিক, জনপ্রিয় ও প্রজাবৎসল শাসক ছিলেন। গাদ্দাফী সরকারি ক্ষমতা দখল করলেও জনগণের মন জয় করতে পারেননি বলে বুঝতে পারলেন। তাই দেশবাসীর জনপ্রিয়তা অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করলেন।

www.bjilibrary.com

গাদ্দাফীর তিন দফা কৌশল

১৮ শতাব্দীতে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ইউরোপের কয়েকটি দেশ এশিয়া ও আফ্রিকার বহুদেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদের সাম্রাজ্য কায়েম করে। এর মধ্যে লিবিয়াও অন্যতম। ইটালি ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর থেকে নৌ-অভিযান চালিয়ে সাগরের দক্ষিণ তীর লিবিয়ায় হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নেয়। দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর দেশটি যখন স্বাধীন হয় তখন আগ্রাসী ইটালীয় সকলেই নিজ দেশে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ভূমধ্যসাগরের উত্তর অঞ্চলে ইটালি একটি দ্বীপ। ইটালির রাজধানী রোমের একাংশে খ্রিস্টানদের ভ্যাটিকান সিটি অবস্থিত। জন পোপ পল ক্যাথলিক খ্রিস্টান বিশ্বের ধর্মীয় নেতা এবং ভ্যাটিকান সিটি স্টেটের প্রধান। ইটালীয়রা প্রায় সবাই খ্রিস্টান।

এই খ্রিস্টান ইটালীয়রা লিবিয়া দখল করে রাজধানী ত্রিপোলি ও অন্যান্য শহরে বড় বড় গির্জা নির্মাণ করে। বিরাটসংখ্যক ইটালীয় খ্রিস্টান লিবিয়ায় কর্তৃত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনে বসবাস করতো। যখন লিবিয়া স্বাধীনতা অর্জন করলো তখন সব খ্রিস্টান ইটালিতে ফিরে আসায় গির্জাগুলো বিরান হয়ে পড়ে রইলো।

লিবিয়ার অধিবাসীরা সবাই মুসলমান ছিলো। ইটালীয় খ্রিস্টানরা কোন মুসলমানকেই খ্রিস্টান বানাতে সক্ষম হয়নি। পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার পর ইংরেজ পাদ্রিরা অমুসলিম সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বিশেষ করে তফসিলী হিন্দু ও উপজাতীয়দের অনেককে শিক্ষা, চাকরি ও স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়। এরই ফলে এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পরও খ্রিস্ট ধর্মের প্রসার চলছে এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায় এ এলাকায় একটি স্বীকৃত শক্তি এবং গির্জা আগের চেয়েও বেশি আবাদ।

কর্নেল গাদ্দাফী বিরাট বিরাট বিরান গির্জাগুলো দখল করার জন্য একটি চমৎকার কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি ভ্যাটিকানের পোপের নিকট দরখাস্ত করলেন যে, ভ্যাটিকানের মুসলিম অধিবাসীদের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চাই। পোপ জওয়াবে জানালেন যে, ভ্যাটিকান সিটি একটি খ্রিস্টান ধর্মীয় এলাকা। এখানে অন্য কোন ধর্মের কোন উপাসনালয় নির্মাণের অনুমতি দেওয়া সম্ভবপর নয়। গাদ্দাফী এ জওয়াবের ব্যাপক প্রচার করলেন এবং ঘোষণা দিলেন যে, লিবিয়া একটি মুসলিম দেশ, এখানে কোন খ্রিস্টান নেই। তাই বিরান গির্জাগুলো খ্রিস্টান উপাসনালয় হিসেবে গণ্য হতে পারে না। তাই গির্জাগুলো সরকারি সম্পত্তি হিসেবে অধিগ্রহণ করা হলো।

এ ঘোষণাটি লিবিয়ার মুসলিম সেন্টিম্যান্টকে তীব্রভাবে আকৃষ্ট করলো এবং গোটা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। কর্নেল গাদ্দাফীর উদ্দেশ্য সফল হলো এবং তাঁর সস্তা জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলো।

তাঁর দ্বিতীয় কৌশল হলো মসজিদে মসজিদে জুমুআর নামাযে হাজির হয়ে খুতবা দেওয়া ও নামাযে ইমামতি করা। গাদ্দাফীর পিতা একজন ভালো আলেম ছিলেন। তিনি ছেলেকে এ পরিমাণ ধর্মীয় শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে কুরআন শুদ্ধ করে পড়তে পারেন এবং ধার্মিক হতে পারেন। আরবী মাতৃভাষা হবার কারণে কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতিসহ খুতবা দেওয়া মোটেই কঠিন ব্যাপার নয় এবং কির৷ ত শুদ্ধ থাকলে ইমামতি করায়ও কোন

www.bjilibrary.com

সমস্যা নেই। নামায শেষে মুসল্লিদের সাথে হাত মিলান ও গলাগলি করে জনগণের কাছে পৌছার বিরাট সুযোগ তিনি কাজে লাগান।

তাঁর তৃতীয় কৌশল ছিলো, তিনি রাজা-বাদশাহদের মত বা সাদ্দাম হোসেনের মতো রাজপ্রাসাদে বাস করেন না। বিলাসিতাও করেন না। জনগণ তাঁর সহজ-সরল জীবনে প্রভাবান্বিত। ক্ষমতা তাঁরই হাতে কুক্ষিগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি দাবি করেন যে, তাঁর সরকার জনগণের সরকার। জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে জাতীয় সম্পদ ব্যাপক পরিমাণে ব্যয় করেন। এভাবে তিনি জনপ্রিয়তা বহাল রেখে চলেছেন। তাই তিনি কোন রাজনৈতিক শক্তি জেগে উঠতে চাইলে সহজেই তা অঙ্কুরেই ধ্বংস করতে সক্ষম হন। জনগণের নামে তিনি যোগ্যতার সাথে ডিক্টেটরি চালিয়ে যাচ্ছেন। বিদেশে রাষ্ট্রদূতদের উপাধিও তিনি 'জনগণের প্রতিনিধি' দিয়েছেন। তাদেরকে রাষ্ট্রদূত বলা হয় না।

লন্ডন রওয়ানা

লিবিয়ায় যে উদ্দেশ্যে আমরা গেলাম সে কাজ শেষ হওয়ার পর আমাদের লন্ডন যাওয়ার কথা। মাওলানা আবদুস্ সুবহান, ব্যারিস্টার কুরবান আলী ও চৌধুরী মুঈনুদ্দীন লিবিয়া থেকেই লন্ডন চলে গেলেন। আমি ৯ এপ্রিল আবার বৈরুত গেলাম। অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার (যিনি ঢাকা শহরে খুররাম মুরাদ সাহেব আমীর থাকাকালে জামায়াতে ইসলামীর শহর শাখার সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯৭১-এর শেষ দিকে আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন) ইংরেজিতে একটি পুস্তিকা রচনা করে আমার কাছে পাঠান। বইটি বৈরুতে মুদ্রণের জন্য দিয়েছিলাম। মুদ্রিত পুস্তিকাটি নেবার জন্যই আমাকে আবার বৈরুত যেতে হলো।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে একশ্রেণীর হিংস্র লোক প্রকাশ্যে দিনের বেলায় যে হত্যাকাণ্ড চালায় এসবের কতক ফটোসহ ঐ লেখাটি পাঠান। লেখাটিতে '৭১-এর সংক্ষিপ্ত পটভূমি ও ১৬ ডিসেম্বরের পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

লিবিয়া থেকে ৯ এপ্রিল বৈরুত পৌঁছে মুদ্রিত পুস্তিকাগুলো নিয়ে পরের দিনই জেদ্দায় পৌঁছলাম। মক্কা, মদীনা ও জেদ্দায় বিশিষ্ট লোকদের নিকট পুস্তিকাটি বিতরণ করে এবং ওমরাহ্ সমাধা করে ২১ এপ্রিল লন্ডন পৌঁছলাম।

হিথ্রো বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনে আমার পাসপোর্ট বেশ কিছুক্ষণ উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করলো, এদেশে কতদিন থাকতে চান? বললাম, চার মাস। ছয় মাস থাকার অনুমতির সীলমোহর দিলো। অনেক আরব দেশে আমার সফর হয়েছে দেখে হয়তো মনে করেছে যে, আমি এখানে চাকরি তালাশ করতে আসিনি। আমার নামের শুরুতে প্রফেসর লেখা দেখে ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্ট ফেরত দেবার সময় হাসি মুখে বললো, 'ওয়েলকাম প্রফেসর'।

লন্ডন পৌঁছলাম

বিমানবন্দর থেকে বের হতেই জনাব আবদুস সালাম হাত উঁচিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যাবার জন্য ইশারা করলেন। এতো লোকের মধ্যে তাঁকে তালাশ করতে আমার সময় লেগে যেতো, যদি তিনি ইশারা না করতেন। তিনিই সেই আবদুস সালাম, যার মাধ্যমে ইসলামাবাদ ও ঢাকার মধ্যে চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হতো। তাঁর সাথে আমার আত্মিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে ঢাকায়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে তিনি জগন্নাথ

www.bjilibrary.com

কলেজের ছাত্র ছিলেন। জামায়াতে ইসলামী তখন অপ্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতা চালাতো। ঐ সময় জামায়াতের সপ্তাহব্যাপী ট্রেনিং ক্যাম্প দু'বার অনুষ্ঠিত হয়। আব্দুস সালাম ছাত্র হলেও ঐ দুটো প্রশিক্ষণ শিবিরে সিরিয়াসলি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। শিবির পরিচালনার দায়িত্ব আমি পালন করায় আমাদের মধ্যে দীনী মহব্বত গভীর হয়। দীর্ঘদিন পর তাঁর সাথে দেখা হলো। তাই স্বাভাবিক কারণেই আমাদের আলিঙ্গনও দীর্ঘ হয়।

তিনি আমাকে নিয়ে একটি হোটেলে উঠান। দু'দিন পর এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে আমার জন্য একটি কামরা ভাড়া নেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার দূর সম্পর্কের ভাতিজা রিয়াজুদ্দীন এসে আমাকে তার বাসায় নিয়ে যায়। রিয়াজুদ্দীনের সাথে আত্মীয়তার চেয়েও আদর্শিক সম্পর্কই অধিক ঘনিষ্ঠ। সে যখন ষাটের দশকে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে বিএসসি পড়ে তখন সে ইসলামী ছাত্র সংঘের দায়িত্বশীল ছিলো। কুমিল্লায় জামায়াতের সাংগঠনিক সফরে গেলে তার সাথে পরিচয় হয় ছাত্র সংগঠনের দায়িত্বশীল হিসেবেই। তারই উদ্যোগে ছাত্রদের প্রোগ্রামে আমি শরীক হই। এরপর জানতে পারলাম যে, সে সম্পর্কে আমার ভাতিজা।

বিএসসি পাস করার পর সে ঢাকায় 'বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (সাইন্স ল্যাবরেটরি)-এ চাকুরিরত থাকাকালে ঢাকা শহরে জামায়াতের অগ্রসর কর্মী ছিলো। শহর আমীর খুররম মুরাদ সাহেব তাকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে বিদেশে যাবার জন্য প্রয়োজনীয় অংকের টাকা ধার দেন। সে লন্ডন যাওয়ার পর ওয়াদা অনুযায়ী ধার নেওয়া টাকা যথাসময়ে শোধ করে। মুরাদ সাহেব তার প্রশংসা করে আমাকে বলেন যে, ধার নিয়ে যথাসময়ে ফেরত দেবার নযীর বিরল। রিয়াজুদ্দীন ঐ বিরল লোকদেরই একজন।

১৯৮৯ সালে রিয়াজুদ্দীনের বড় মেয়ে পারভীনের সাথে আমার পঞ্চম ছেলে নোমানের বিয়ে হয়। আমি লন্ডনে ওর আব্বার বাসায় ছয় বছর ছিলাম। তখন আমি পারভীনের দাদা ছিলাম এবং সে আদরের নাতনী ছিলো। এখন ওর ছেলে ১৩ বছরের ইউসুফ ও মেয়ে ৮ বছরের নাওমী আমাকে দাদা ডাকে। কিন্তু পারভীনের আব্বা রিয়াজুদ্দীনের সাথে আমার সম্পর্ক পূর্ববৎ কায়েম আছে। সে আমাকে আগের মতোই চাচা ডাকে। পারভীনের বড় ভাই ড. শাহীন আহমদ আমাকে এখনও দাদাই ডাকে। শাহীনদের লন্ডনের বাসায় থাকাকালে ওকে আমি কুরআন পড়া শিখিয়েছি। ওর সাথে স্নেহের এমন গভীর সম্পর্ক যে, ২০০১ সালে আমি যখন নিউইয়র্কে ছিলাম, তখন শাহীন ক্যালিফোর্নিয়া থেকে বিমানে ৬ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে আমার সাথে দেখা করে।

আমার বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনের এক বছর (১৯৭২ সাল) পাকিস্তানে এবং সোয়া পাঁচ বছর (১৯৭৩ থেকে '৭৮ সাল) লন্ডনে কাটে। ইস্ট লন্ডনের '৮৭ নং লুই শ্যাম ওয়ে' নামক বাড়িতেই আমার ঠিকানা ছিলো। এখন এ বাড়িটি রিয়াজুদ্দীনের ক্রয় করা সম্পত্তি। ওর স্ত্রী মমতায বেগম আমাকে পিতার মতো যত্ন করেছে। আমার মনে হয়েছে যে, আমি যেন আমার ছেলের বাড়িতে আছি, যার ছেলে-মেয়েরা আমার নাতী-নাতনী এবং যার স্ত্রী আমার বৌমা। আমি এদের সাথে না থাকলে প্রবাস জীবনে এতোটা প্রশান্তি বোধ করতাম না। এদের ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারবো না। দুনিয়া ও আখিরাতে এদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দোয়া করি।

www.bjilibrary.com

১৩৬.

লন্ডনে আমার সোয়া ৫ বছর অবস্থান

১৯৭৩ সালের ২১ এপ্রিল জেদ্দা থেকে লন্ডন পৌঁছলাম। আর ১৯৭৮ সালের ১০ জুলাই লন্ডন থেকে ঢাকা রওয়ানা দিলাম। পাঁচ বছরের মধ্যে কোন বছরই পূর্ণ পাঁচ মাসও একটানা ইংল্যান্ডে থাকিনি। লন্ডন অবশ্যই আমার অবস্থানকেন্দ্র ছিলো এবং এ কয় বছর 87, Luisham way, East London আমার স্থায়ী ডাক-ঠিকানা ছিলো। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের দাওয়াতে সৌদি আরবে কয়েকবার এবং আমেরিকা, তুরস্ক ও লিবিয়ায় গিয়েছি। প্রত্যেক বছর হজ্জের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের দায়িত্বশীলদের সাথে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে মক্কা যেতে হয়েছে। বিভিন্ন স্থানীয় সংগঠনের দাওয়াতে আমীরাত, কুয়েত, বাহরাইন, জর্দান, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে বহুবার গিয়েছি। এসব দেশে বারবার যাওয়ার কারণেই ইংল্যান্ডে একটানা পাঁচ মাসও থাকা হয়নি। আমি মন্তব্য করতাম, "আল্লাহ তাআলা আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ভেগাবন্ড বানিয়ে দিলেন। জন্মভূমি ছাড়া দুনিয়ার সব দেশেই যেতে পারছি। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও নিঃসঙ্গ নই। নিজের বাড়িতে থাকতে না পারলেও কোন দেশেই অনাদরে থাকতে হয় না।"

প্রতি বছর ইংল্যান্ডে জুন, জুলাই ও আগস্টের গ্রীষ্মকালীন অবকাশে বহু ইসলামী সংগঠন বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান করে থাকে। এসব সম্মেলনেই আমি অতিথি বক্তা হিসেবে দাওয়াত পেতাম। একটি ইসলামী সংগঠনকে কয়েকবারই সময় দিতে হতো। এর নাম হচ্ছে ইসলামী মিশন ইউ.কে.। পঞ্চাশের দশকে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান, ইসলামী জমিয়তে তালাবা ও ইসলামী ছাত্র সংঘের সাথে সম্পর্কিত যারা লন্ডনে ছিলেন তাদেরই উদ্যোগে এ ইসলামী সংগঠনটি কায়েম হয়। খুশির বিষয় যে, এর প্রথম উদ্যোক্তা ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি মাওলানা কুরবান আলী। তিনি তখন লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ছেন। ইসলামী মিশনে স্বাভাবিক কারণেই আমাকে বেশ সময় দিতে হতো।

ইংল্যান্ডে থাকার ব্যবস্থা

আমি লন্ডন পৌঁছার পরপরই বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার ২২ এপ্রিলের কপি থেকে জানতে পারলাম যে, শেখ মুজিব সরকার ৩৯ জন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করেছেন। ঐ তালিকার প্রথম নাম জনাব নূরুল আমীন। আমার নাম ৩ নম্বরে। এ তালিকায় যাদের নাম ছিলো তাদের দু'জন এ তালিকা প্রকাশিত হবার আগেই পলিটিকেল এসাইলাম (রাজনৈতিক আশ্রয়) নিয়ে লন্ডনে সপরিবারে নিশ্চিন্তে বসবাস করছেন। এ দু'জনই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন। একজন আমার পুরাতন বন্ধু ইয়াহইয়ার আমলের মন্ত্রী ড. জি ডব্লিও চৌধুরী ও অপরজন আইয়ুব আমলের মন্ত্রী মুসলিম লীগ নেতা জনাব ওহীদুয্যামান।

ব্রিটিশ সরকারের এটা দীর্ঘ ঐতিহ্য যে, বহু দেশের রাজনৈতিক নেতা নিজ দেশের সরকারি নির্যাতন থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে ইংল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে সরকার আশ্রয় দেয়। ঐ সময় সেখানে সুদানের সামরিক শাসক নুমেরীর হাত থেকে

www.bjilibrary.com

রক্ষা পাওয়ার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদী রাজনৈতিক আশ্রয় উপভোগ করছিলেন। বর্তমানেও বেশ কয়েকজন এভাবে সেখানে আছেন বলে জানি। আমার ঘনিষ্ঠ পরিচিত তিউনিসিয়ার ইসলামী নেতা শায়খ রাশেদ গনৌশী একজন, যার সাথে ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে লন্ডনে যোগাযোগ হয়।

আমি ভিজিট ভিসা নিয়ে সেখানে গিয়েছি। এ ভিসায় একটানা অনেকদিন থাকা যায় না। এ ভিসার মেয়াদ বাড়িয়ে বাড়িয়ে বছরের পর বছর একটানা থাকতে দেয় না। আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাবার সম্ভাবনা কবে হতে পারে তা জানারও উপায় নেই। এ অবস্থায় ভিজিট ভিসার ভিত্তিতে আমার দীর্ঘদিন থাকা কেমন করে সম্ভব এ বিষয়টা সতর্ক বিবেচনার দাবি রাখে।

অনেকেই পরামর্শ দিলেন যে, আমাকে বাংলাদেশ সরকার নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করায় সঙ্গত কারণেই পলিটিকেল এসাইলাম চাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই আমার দরখাস্ত করা উচিত। কিন্তু একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করার জন্য আমার মনকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না। আমি আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করছি। আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর আশ্রয় নিয়েই আছি। আমি পাকিস্তানে থাকতে পারি, ইচ্ছা করলে সৌদি আরবেও থাকার অনুমতি নিতে পারি। কিন্তু বাংলাদেশের সাথে সহজে যোগাযোগের জন্য ইংল্যান্ডে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। আপাতত অক্টোবরের ২১ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের ভিসার মেয়াদ তো আছেই। আরও কিছুদিন যাক। ভেবে-চিন্তে দেখার সময় যথেষ্ট আছে।

জুন মাসের শেষদিকে লিবিয়ার ত্রিপোলিতে এক আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলনে গেলে ফিরে আসার সময় আবার ছয় মাসের ভিসা পেয়ে গেলাম, যা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। আগস্টের শেষদিকে আমেরিকার শিকাগোতে এক ইসলামী সম্মেলনে যেতে হলো। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ফিরে আসার সময় আবার ছয় মাসের ভিসা লাগিয়ে দিলো, যার মেয়াদ ১৯৭৪ সালের মার্চ পর্যন্ত থাকবে। এক সপ্তাহ পরই আমাকে কুয়েত ও সৌদি আরব যেতে হলো। '৭৩-এর নভেম্বরের প্রথম দিকে লন্ডন ফিরে আসার সময় আবার ছয় মাসের ভিসা পেলাম। কিন্তু ডিসেম্বরের মাঝামাঝি হজ্জের জন্য সৌদি আরব যেতে হলো। '৭৪-এর ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি লন্ডন ফিরে আসার সময় আবার ছয় মাসের ভিসা লাগিয়ে দিলো। এখন অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে, ইমিগ্রেশন অফিসার পাসপোর্ট দেখে আমাকে জিজ্ঞেস না করেই ছয় মাসের ভিসা দিয়ে দেয়। পাসপোর্ট দেখেই বুঝে নেয় যে, আমি এখানে বেশিদিন থাকার উদ্দেশ্যে আসি না। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ভিজিট ভিসা নিয়েই আসা-যাওয়া করা যাবে। স্থায়ী ভিসার প্রয়োজন নেই।

লন্ডনে স্বাধীন বাংলা আন্দোলন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈদেশিক কেন্দ্র ছিলো লন্ডন। বিশেষ করে বিবিসি'র সংবাদ পরিবেশনা ও পর্যালোচনা স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলো। ইয়াহইয়া খানের ভ্রান্তনীতির পক্ষে পাকিস্তান সরকারের কোন ভূমিকাই আন্তর্জাতিক ময়দানে ছিলো না। তাই ভারতীয় রেডিও-টিভি, বিবিসি ও স্বাধীন বাংলা বেতারের একতরফা প্রচারণায় ইংল্যান্ডে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে বিরাটসংখ্যক লোক স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

www.bjilibrary.com

'৭১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে পাকিস্তান থেকে যে ডেলিগেশন পাঠানো হয়, নূরুল আমীন সাহেবের ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল জনাব মাহমুদ আলীকে এর লিডার নিয়োগ করা হয়। ঐ ডেলিগেশনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীও শামিল ছিলেন। চৌধুরী সাহেব পাকিস্তান ডেলিগেশন থেকে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে লন্ডনকে তার কেন্দ্র হিসেবে বাছাই করে নেন। তিনি লন্ডন উপস্থিত হলে স্বাভাবিকভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনে জোয়ার আসে। বাংলা ভাষাভাষীরা পরম উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তার নেতৃত্বে আন্দোলনে আরও সক্রিয় হয়। স্বাধীনতা তহবিলে লাখ লাখ পাউন্ড সংগ্রহ হয়।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে তথ্য মাধ্যমগুলো অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবং লন্ডন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। চৌধুরী সাহেবের এ বিরাট ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্টের মর্যাদা দেন। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের স্বৈরশাসনসুলভ আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে পদত্যাগ করেন। শেখ মুজিবের একজন 'জী হুযুর' মার্কা প্রেসিডেন্ট প্রয়োজন ছিলো। এ প্রয়োজন বিচারপতি চৌধুরীর মতো লোক দ্বারা পূরণ হওয়া সম্ভব ছিলো না। তাই শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারি মুহাম্মদুল্লাহকে প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করে ঐ প্রয়োজন পূরণ করলেন।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের শতকরা ৯০ জনই ইস্ট লন্ডনে থাকেন। আমি যে বাড়িতে থাকি, সেটাও ঐ এলাকায় অবস্থিত। জুমুআর নামাযের সময় ইস্ট লন্ডন মসজিদে অনেক বাংলাদেশীর সাথে দেখা হয়। দেশের খবর তারা আমার চেয়ে বেশি পান। তাদের মধ্যে কেউ না কেউ প্রতি মাসেই দেশে যান এবং যারা ফিরে আসেন তাদের কাছ থেকে সরকার ও জনগণ সম্পর্কে মতামত শুনতে পান। যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে তারা স্বাধীনতার পক্ষে ভূমিকা পালন করেন, সে উৎসাহে ভাটা পড়েছে। তারা যে প্রত্যাশা করেছিলেন এর বিপরীত অবস্থার খবর জেনে অনেকেই মনমরা হয়ে গেছেন বলে প্রকাশ করেন।

মাত্র পাঁচ মাস আগে '৭২ সালের ডিসেম্বরে হজ্জের সময় বাংলাদেশ থেকে আগত হাজীদের কাছ থেকে আমি যা জেনেছি, '৭৩-এর মে মাসে যারা দেশ থেকে লন্ডন ফিরে গেছেন, তাদের কাছ থেকে আরো খারাপ অবস্থা জানতে পারলাম। আমি '৭৩-এর জুন মাসেই 'বাঙালী মুসলমান কোন্ পথে' নামে একটা পুস্তিকা রচনা করলাম। কিন্তু কোন প্রেসে বাংলা ভাষায় বই প্রকাশের সুযোগ সেখানে নেই। তখনো কম্পিউটার পদ্ধতি চালু হয়নি। তাই আমার লেখাটা বই-এর আকারে বাংলায় টাইপ করে বাঁধাই করে নিতে হলো। ১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে এ পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি ইংল্যান্ডে প্রবাসী বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বিলি করা হয়। পরবর্তী হজ্জের সময় (১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর) বাংলাদেশ থেকে আগত হাজীদের নিকট তা পৌছানো হয়।

এ পুস্তিকাটি সম্পর্কে অভিমত

লন্ডনে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এমন অনেক লোকও এ বইটি পড়েছেন, যারা স্বাধীনতা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য পেয়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যারা মুসলিম চেতনা হারিয়ে

www.bjilibrary.com

শুধু বাঙালি জাতীয়তার জয়বায় আচ্ছন্ন ছিলেন, এ বইটি তাদের মধ্যেও মুসলিম চেতনা জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে দেখে আমি আল্লাহর প্রতি গভীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

১৯৭৬ সালের মে মাসে প্রখ্যাত কলামিস্ট ও বাংলাদেশী জাতীয়তার পক্ষে বলিষ্ঠ লেখক খন্দকার আবদুল হামিদ লন্ডন গিয়ে আমার খোঁজ করে আমার বাসায় দেখা করতে গেলেন। এর ক'দিন আগে আমার স্ত্রী ঢাকা থেকে পৌঁছলেন। সাড়ে চার বছর পর আমাদের দেখা হয়। তিনি বড় রুই, পাঙ্গাশ, চিংড়ি রান্না করে নিয়ে গেলেন। খন্দকার সাহেব লন্ডনে বসে এসব খেয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করলেন। আমিও খাওয়াতে পেরে খুশি হলাম।

খন্দকার সাহেব তখন দৈনিক আজাদে নিয়মিত উপসম্পাদকীয় লিখতেন। 'মর্দে মোমেন' ছদ্মবেশে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের বদলে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের পক্ষে যেসব বলিষ্ঠ যুক্তি পেশ করতেন, তা ঐ পরিবেশে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করে। জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান। তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করেন। তাই খন্দকার আবদুল হামিদ জিয়াউর রহমানের নৈকট্য লাভ করেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে তিনি শেরপুর থেকে এমপি নির্বাচিত হন এবং জিয়ার মন্ত্রিসভায় যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

খন্দকার সাহেব আমার বাসায় দীর্ঘ সময় কাটান এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের মধ্যে মতবিনিময় চলতে থাকে। আমাদের মধ্যে চিন্তার মিল প্রকাশ পাওয়ার পর আমরা রীতিমতো ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হলাম।

আমি 'বাঙালী মুসলমান কোন্ পথে' নামক ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি তার হাতে দিলাম। তিনি তখন তখনই বইটি পড়া শুরু করলেন। বৈঠকখানায় তাকে রেখে আমি ভেতরে কিছুক্ষণ ছিলাম। ফিরে তার সামনে যেতেই তিনি আমাকে আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরে বইটির জন্য প্রাণঢালা মুবারকবাদ জানালেন। তিনি মন্তব্য করলেন, "আপনার মুসলিম চেতনাবোধে আমি উদ্দীপিত হলাম। আমরা '৭৫-এর নভেম্বরে সিপাহীজনতার সংহতির মাধ্যমে যে মুসলিম চেতনার দিশা পেলাম, আপনি '৭৩-এ-ই সেই চেতনাবোধ করতে সক্ষম হয়েছেন দেখে বিস্মিত হলাম।" তার মন্তব্যে আমি অভিভূত হলাম। তিনি আরো বললেন, "আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমের চমৎকার মূল্যায়ন করেছেন এবং রাজাকারদের দেশপ্রেমকেও স্বীকৃতি দিয়েছেন। এ উদার মনোভাব আমার অন্তর স্পর্শ করেছে। আপনাকে ভালোবাসতে বাধ্য হলাম।"

আমি '৭৮ সালে দেশে ফিরে এলাম। '৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের পর '৮০ সালে সংসদে ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, 'নাগরিকত্ব না থাকা সত্ত্বেও গোলাম আযম বাংলাদেশে কেমন করে আছে' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এ প্রশ্ন করলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল (অব.) মুস্তাফিজুর রহমান জওয়াব দিলেন, "তিনি নাগরিকত্বের জন্য দরখাস্ত করেছেন, যা বিবেচনাধীন আছে।" ঐ সময় খন্দকার আবদুল হামিদ দৈনিক আজাদে এক উপসম্পাদকীয়তে আমার ঐ পুস্তিকাটি সম্পর্কে অত্যন্ত প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিখেন।

খন্দকার সাহেব মন্ত্রী থাকাকালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইনতিকাল করেন। ইন্টেনসিভ কেয়ারে থাকা অবস্থায় আমি তাকে দেখতে গেলাম। ভেতরে কাছে যাওয়া নিষেধ বলে দরজায় দাঁড়িয়েই সালাম দিলাম। হৃদরোগীদেরকে

www.bjilibrary.com

কথা বলতে নিষেধ করা হয়, বললে যেন খুব আস্তে বলে সে নির্দেশও ডাক্তাররা দেন। কিন্তু তিনি আমার সালামের জওয়াব বেশ স্পষ্ট আওয়াজেই দিলেন। মেশিনে তার হার্টের চিত্রের দিকে তাকালাম। তিনি হাল্কা রসিকতা করে বুকে হাতের ইশারা করে হাসি মুখে বললেন, "মেশিন এখনও চলছে, এটা বন্ধ হলেই সব শেষ।" এমন অবস্থায়ও এভাবে কথা বলায় বিস্মিত হলাম। তার হাসিমুখ দেখে খুবই ভালো লাগলো। তার বিছানার পেছনে তার কন্যা বসা। তিনি ডান কাতে দরজার দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন। তার পিঠের দিকে তার কন্যার চেহারাও একই দিকে। রসিকতার সুরে তার ঐ কথাটি শুনে তার কন্যাও মুচকি হাসছিলেন। আমি তাঁর কন্যাকে লক্ষ্য করে বললাম, "এমন প্রাণবন্ত মানুষটিকে কি ভালো না বেসে পারা যায়? এ অবস্থায়ও রসিকতা করতে পারলেন।" তখনও তার মুখে হাসির ভাব মিলিয়ে যায়নি। "আল্লাহ্ আপনাকে সুস্থ করুন" এ কথা বলেই বিদায় হচ্ছি, এমন সময় তিনি স্পষ্ট আওয়াজে বলে উঠলেন, "You are a great man." আমি নীরবে চলে এলাম।

পুস্তিকাটির পরিচিতি

'বাঙালী মুসলমান কোন্ পথে' নামক চটি বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৪ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বইটিতে বাঙালি মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস, ইংরেজ শাসনামলে মুসলিমদের উপর ব্রিটিশদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও হিন্দুদের অর্থনৈতিক প্রভুত্বের বিবরণ, পাকিস্তান আন্দোলনে বাঙালি মুসলমানদের বিরাট অবদান, পাকিস্তান আমলের কুশাসন, ১৯৭০-সালের নির্বাচন ও নির্বাচিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি সম্পর্কে আলোচনার পরবর্তী অংশটুকু হুবহু এখানে উদ্ধৃত করছি, যাতে আমার আত্ম-জীবনীতে এ কথাগুলো রেকর্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

ইয়াহইয়া-মুজিব আলোচনায় ভুট্টো ও অন্যান্য নেতার ভূমিকা

ইয়াহইয়া-মুজিব আলোচনা যখন সন্তোষজনকভাবে চলছে বলে সংবাদপত্রে প্রতিদিন আশাপ্রদ খবর প্রকাশিত হচ্ছিলো, তখন ভুট্টো সাহেব ও জাতীয় পরিষদে কয়েকটি দলের পশ্চিম পাকিস্তানি বড় বড় নেতা ঢাকায় এলেন। ইয়াহইয়া খানকে তারা কি পরামর্শ দিলেন জনগণ তা জানে না। কিন্তু রাজনৈতিক আলোচনা ব্যর্থ হবার পরিণাম কি তারা জানতেন না? ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করার পর দিন ইয়াহইয়া খান রেডিওতে ঘোষণা করলেন যে, শেখ মুজিবের আপস প্রস্তাব রাজনৈতিক নেতারা মানতে রাজি নয় বলেই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে একথা প্রমাণিত হয় যে, এ ব্যর্থতার জন্য অনেকেই দায়ী।

ব্যালটের সিদ্ধান্তকে বুলেটের দ্বারা প্রতিহত করার এ আত্মঘাতী ফায়সালা থেকে দেশকে রক্ষার জন্য ঐসব নেতার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো উচিত ছিলো। তাদের এ ব্যর্থতা অমার্জনীয়।

আত্মঘাতী লড়াইয়ের পরিণাম

অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস! কতক লোকের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হয়ে গেলো এবং চির দুশমন ভারত এক ভাইয়ের বন্ধু সেজে

www.bjilibrary.com

উভয়কেই সর্বনাশ করার সুযোগ পেলো। দু'ভাইয়ের সম্পত্তি নিয়ে ঝগড়ার সুযোগে উভয়ের দুশমন এক পক্ষের বন্ধু সেজে গোটা সম্পত্তিই আত্মসাৎ করার নযীর বিরল নয়। পাকিস্তানের ব্যাপারে ভারত ঠিক সে ভূমিকাই গ্রহণ করার মহাসুযোগ পেয়েছে। দুশমন তার কাজ ঠিকই করেছে। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার এ মহাসুযোগ ভারত কেন ছেড়ে দেবে? দোষ দুশমনের নয়। দুশমনকে সে সুযোগ দেওয়াটাই প্রকৃত অন্যায়। আমাদের নির্বাচিত সব নেতাই এর জন্য কম বেশি দায়ী। এ আত্মঘাতী লড়াই চলাকালে সত্যিকারের প্রতিটি দেশপ্রেমিকের প্রাণ কেঁদেছে। কি মারাত্মক পরিস্থিতি তখন! সেনাবাহিনী দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আপন দেশবাসীকেই মারলো। আর বাঙালি মুসলমানদের দুর্দশার অন্ত থাকলো না। একদল মুসলমান ভারতের গোলামির ভয়ে সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করলো। আর একদল পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য ভারতের মতো দুশমনের সাহায্য গ্রহণ করতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করলো। হিন্দুদের তো এতে কোন মানসিক অসুবিধা ছিলো না। কিন্তু দু'পক্ষেই বাঙালি মুসলমান দেশপ্রেমের তাগিদে যেসব কাজ করলো তার পরিণাম কত করুণ।

একদল ভারতের দেওয়া বোমা দিয়ে নিজের দেশেরই পুল উড়ায়, আর একদল পুল রক্ষার জন্য প্রাণ হারায়। দু'পক্ষেই দেশপ্রেম। কুশাসন ও রাজনৈতিক ভ্রান্তি এমনিভাবেই দেশের জন্য আত্মত্যাগীদেরকে এমন আত্মঘাতী লড়াইয়ে লিপ্ত করে থাকে। একদলকে ভারতের দালাল, আর অন্যদলকে পাকিস্তানের দালাল বলে গালি দিলেই কি এদের দেশপ্রেম মিথ্যা হয়ে যাবে?

এর পরিণামে কত দেশপ্রেমিক উভয় পক্ষে খতম হয়ে গেলো। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গত ২৫ বছরে যা কিছু অগ্রগতি হয়েছিলো তা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। অরাজকতার সুযোগে সমাজবিরোধী ও উচ্ছৃঙ্খলদের হাতে কত নিরীহ নাগরিক জানমাল হারালো। যে শোষণ থেকে বাঁচার জন্য এতো কিছু হলো তার চেয়ে কত বেশি গুণ শোষণ তথাকথিত বন্ধু রাষ্ট্র জঘন্য ও ব্যাপকভাবে চালাচ্ছে! সমস্ত সামরিক জিনিসপত্র তারা নিয়ে গেলো। দেশে আজ খাবার নেই, কাপড় নেই, ওষুধ নেই, নিরাপত্তা নেই; আছে শুধু হাহাকার। জনগণ কি এ অবস্থার আশায় গত নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলো? বিজয়ী দল কি দেশকে এ অবস্থায় দেখতে চেয়েছিলো? নিশ্চয়ই নয়। কেউই ধ্বংসের নিয়তে কাজ করেনি। কিন্তু যে নিয়তেই করা হোক ভুলের পরিণাম ভোগ করতেই হবে। ভুলের ক্ষতি অনিবার্য। ব্যক্তিগত ভুলের ফল এতো বড় ব্যাপক হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেসব ভ্রান্তি শাসকরা ও রাজনৈতিক নেতারা করে থাকেন তার পরিণাম যে কত বেদনাদায়ক ও মারাত্মক হয় বাংলার মুসলমান তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের ফলে বাংলাদেশ আপাতত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে এসেছে বটে, কিন্তু এ কলঙ্ক কি বাঙালি মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনে কালিমা লাগায়নি? ইতিহাস তো এ কথা বলবে না যে, পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। ইতিহাস জোর গলায় বলবে যে, এক লাখ মুসলিম সশস্ত্র বাহিনী হিন্দুদের সেনাপতির নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। এ কালিমা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে যে

www.bjilibrary.com

গৌরব অর্জন করা হয়েছিলো তা যেমন বাঙালি মুসলমানদের জন্যও সম্মানজনক ছিলো তেমনি এ অপমানও তাদেরকে স্পর্শ করবে।

এমনিভাবে এ আত্মঘাতী লড়াই সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এবং বিশেষভাবে গোটা উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য আর্থিক, নৈতিক ও মানবিক দিক দিয়ে বাঙালি মুসলমানদের জন্য যে কত মারাত্মক পরিণতি বয়ে এনেছে তা কদ্দিন ভোগ করতে হবে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে।

বর্তমান সমস্যার কারণ

অদ্ভুত জনপ্রিয়তা, একদলীয় একচ্ছত্র ক্ষমতা ও বিশ্বের ব্যাপক সমর্থন এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারতের ব্যাপক সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিব দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা দূরের কথা, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা এবং কোন রকমে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করতেও ব্যর্থ হলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা হিসেবে নতুন দেশ গড়ার সমস্যা অনেক–এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু দিন দিন অবস্থা ক্রমে উন্নতির দিকে কেন যাচ্ছে না? দেশের সম্পদ বিদেশে ব্যাপকহারে চলে যাচ্ছে। চাউল, কাপড়, মাছ, খাবার, তেল, কেরোসিন, ঔষধ ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কেবল বেড়েই চললো। অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলায় দেশে নিরাপত্তাবোধ খতম হয়ে গেলো।

সত্যিই যদি আমরা এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি চাই তাহলে বর্তমান অবস্থার মূল কারণ তালাশ করতে হবে। রোগের কারণ না জানলে সুচিকিৎসা অসম্ভব। যারা এখন দেশ শাসন করছে তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ সব রকম লোকই হয়তো আছেন। কিন্তু আগে থেকে তাদের আন্দোলনে কর্মীদেরকে শৃঙ্খলা শিক্ষা দেবার পরিবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতা, বেআদবি, অশালীনতা, এমনকি গুণ্ডামি করতে পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে দেশে বিক্ষোভ সৃষ্টি করা যেতে পারে, শান্তিপ্রিয় নাগরিকদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা যেতে পারে, জোর করে ক্ষমতা দখলও সম্ভব, নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করাও সহজ, কিন্তু এ ধরনের শিক্ষার মাধ্যমে তৈরি লোকদের দ্বারা দেশ শাসন ও জনসেবা কিছুতেই সম্ভব নয়।

যে কর্মী বাহিনীকে এক সময়ে বিরোধী দলের সভায় লাঠি ও ইট-পাটকেল দিয়ে আক্রমণের প্রেরণা যোগানো হয়েছে আজ তাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। সুতরাং সে হারেই অরাজকতা বাড়ছে। এক পক্ষ এ পথে গেলে অপর পক্ষও বাধ্য হয়েই সে পথে যাবে। তাছাড়া "বন্দুকের নল থেকে বিপ্লব"-এর নীতিতে যারা বিশ্বাসী এবং "জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো" যাদের কর্মসূচি তারা এ ধরনের পরিবেশেই এগিয়ে আসার সুযোগ পায়। তাই বর্তমান অরাজক পরিবেশের পরিবর্তন সহজে হবে না।

সমাধানের উপায়

যদি জনগণ চায় তাহলে বেসরকারিভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অস্ত্রের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। আইন ও শৃঙ্খলার দায়িত্বশীলগণ একমাত্র শান্তিরক্ষার জন্য অস্ত্র ব্যবহার করবেন। সরকারি ও বিরোধী রাজনৈতিক দলের সবাইকে অস্ত্রের ভাষায় রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। এমন রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে, যাদের নেতৃবৃন্দ ভদ্র ও শালীন ভাষায় সমালোচনা করতে সক্ষম। গালিগালাজের পরিবর্তে যারা যুক্তির অস্ত্রে প্রতিপক্ষকে মোকাবিলা করবে এমন কর্মীদল গঠন করতে হবে। যারা

www.bjilibrary.com

গুণ্ডামিকে ঘৃণা করে, গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাখে, শৃঙ্খলাকে ভালোবাসে এবং আইনের শাসন কায়েমের জন্য বদ্ধপরিকর। বর্তমান রাজনৈতিক দলগুলো যদি এসব নীতি পালন করতে রাজি না হয় তাহলে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদেরকে দেশ ও জনগণের কল্যাণের খাতিরে শত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে হলেও এ ধরনের দল গঠন করতে হবে। আর না হলে মারামারি কাটাকাটি করে ধ্বংস হতে হবে। এ পথে দেশকে ধাবিত করতে সময় লাগবে নিশ্চয়ই। যারা এ নীতিতে চলবেন তাদের বহু বিপদ পোহাতে হবে। কিন্তু জনগণ শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে তাদের সাথেই মিলবে। জনগণ কখনো অরাজক পরিবেশ ভালোবাসে না। দুনিয়ায় কোন দেশই উচ্ছৃঙ্খলতার মাধ্যমে উন্নতি করেনি। তাই শৃঙ্খলা বা ধ্বংস এ দু'পথের একটা জনগণ বেছে নেবেই।

বাঙালি মুসলমানদের করণীয়

বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঙালি মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ রয়েছে ঃ

১. ভারতের সাহায্যে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবার ফলে সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এমনকি সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও স্বাভাবিকভাবে ভারতের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রায় চারদিক থেকে ভারতের মতো একটা রাষ্ট্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকে ভাগ্যের দান বলে মেনে নিয়ে ভারতের একটি উপরাষ্ট্র হিসেবে বেঁচে থাকা।

   কিন্তু ঐতিহাসিক কারণে এবং আযাদী পাগল মনস্তত্ত্বের দরুন বাঙালি মুসলমান এ অবস্থাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। নিজেদের পূর্ণ অধিকার হাসিলের জন্য যারা মুসলমান ভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তারা ভারতীয় প্রাধান্যকে মেনে নিতে পারে না।

২. রাশিয়া বা চীনের সহায়তায় ভারত থেকে মুক্ত একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র গড়ে তোলা।

   এ পথ বিভিন্ন কারণে বাঙালি মুসলমানদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য তো নয়ই; বরং এ পথে এ অঞ্চলে আর একটি ভিয়েতনামই সৃষ্টি হবে মাত্র। ভারত কেরালা এবং পশ্চিমবঙ্গে যেমন কমিউনিস্ট শাসন বরদাস্ত করেনি, এখানেও তা করবে না। এটা ভারতের অস্তিত্বের পক্ষেও বিপজ্জনক বলে তারা মনে করবে। সুতরাং এ পথ চির অশান্তির পথ এবং বৃহৎ শক্তিসমূহের আখড়ায় পরিণত হবার পথ। রাশিয়া বা চীন যদি ভারতের মর্জির বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে তাহলে আমেরিকাও ভারতকে সাহায্য করবে। সুতরাং বাঙালি মুসলমানদের এ এলাকাকে অবিরাম যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হতে দেওয়া আত্মহত্যারই শামিল।

৩. বাঙালি মুসলমানদের জন্য একমাত্র পথ হলো ভারতের প্রভাবমুক্ত অকমিউনিস্ট সরকার গঠন করে সত্যিকার স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা অর্জন করা। পাকিস্তানের অংশ হিসেবে যেটুকু আযাদী ছিলো তার চেয়েও বেশি রাজনৈতিক স্বাধীনতা হাসিল করতে না পারলে এতোসব খুইয়ে কি লাভ হলো? দেশের মানুষের জন্য ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা না করতে পারলে আযাদীর কি মূল্য রইলো? বাঙালি মুসলমান যদি নিজস্ব মুসলিম সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টি হারিয়ে হিন্দুদের সাথে এক হয়ে যায় তাহলে ভারতের গোলামি আরও স্থায়ী হবে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু এসব কিভাবে সম্ভব? আজ এটাই বাঙালি মুসলমানদের মনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। যারা দেশের ভিতর বর্তমান অরাজক ও সমস্যা জর্জরিত পরিবেশে জীবন কাটাচ্ছে তাদের আজ দিশেহারা অবস্থা। আমরা যারা বিদেশে আছি ভিতরের আগুন এসে বাইরেও আমাদেরকে অস্থির করে তুলেছে। প্রিয় জন্মভূমিকে কীভাবে স্থিতিশীল করা যায়, দেশবাসী কীভাবে নিরাপত্তাবোধ নিয়ে বাঁচতে পারে এবং জনগণ কি প্রকারে স্থায়ী শান্তি ভোগ করতে পারে এ চিন্তা প্রতিটি দেশপ্রেমিককে দেশের ভিতরে ও বাইরে অস্থির করে তুলেছে। দেশ ও দেশবাসীর জন্য যাদের প্রাণ কাঁদে, অনাগত ভবিষ্যতে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বপ্ন যারা দেখে এবং সত্যিকারের আযাদীর জন্য যাদের পিপাসা রয়েছে তাদের জন্য কি কোন পথই নেই? ভারতের গোলামি থেকে মুক্তির কোন উপায়ই নেই?

মুক্তির একমাত্র পথ

মানুষের সত্যিকারের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানসিক মুক্তি চেতনার উপর। মন যদি গোলাম না হয় তা হলে সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এবং অন্য সকল প্রকার গোলামি থেকে মুক্তি সম্ভব। বাঙালি মুসলমানদেরকে আজ মনের গভীরে নেমে খুঁজতে হবে মুক্তির উৎস কোথায়।

শুধু বাঙালি হওয়ার মনোভাব নিয়ে আমরা কোনক্রমেই হিন্দুর প্রভাব থেকে মুক্তি পাবো না। আর হিন্দু থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে চিন্তা করা ছাড়া ভারতের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। বাঙালি মুসলমান হিসেবে আমাদের পৃথক সত্তাকে জাগ্রত না করে আমরা মুক্তির পথে পা-ই দিতে পারবো না।

ভারত আমাদের মনে এ চিন্তা ঢুকাবার চেষ্টা করছে যে, পাকিস্তান হওয়াটাই ভুল হয়েছে। কারণ, এ চিন্তা না ঢুকালে গোলামির জিঞ্জির মযবুত হতে পারে না এবং 'হিন্দু মুসলমান এক জাতি' একথা মুসলমানরা স্বীকার না করলে ভারতের প্রভাব স্থায়ীও হতে পারে না।

কিন্তু বাঙালি মুসলমানরা এ কথা ভালো করে জানে যে, পাকিস্তান না হলে অবিভক্ত বাংলা ভারতের একটি প্রদেশ হতো মাত্র। আজ বাঙালি মুসলমান প্রধান একটি পৃথক দেশ কায়েম হবার কি কোন সুযোগ হতো, যদি পাকিস্তান না হতো? সুতরাং দূরপ্রাচ্যের এলাকায় সাত কোটি মুসলমানের একটি নিজস্ব দেশ গঠনে পাকিস্তানের জন্ম অপরিহার্য ছিলো। অবশ্য এখনো সে নিজস্ব দেশটি হাসিল হয়নি; হওয়ার পথে এক ধাপ অগ্রসর হয়েছে মাত্র।

একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, হিন্দু ও মুসলমান যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পৃথক দুটো জাতি তা পাক-ভারতের ইতিহাসের এক অমোঘ সত্য। পৌত্তলিক ও তাওহীদবাদী কোন দিন এক হতে পারে না। উপমহাদেশে ১২শ' বছরের বেশি হলো হিন্দু-মুসলমান বাস করছে। জাতি হিসেবে উভয়ই এতো আত্মসচেতন যে, কোন দিন এরা এক হতে পারেনি। ব্যক্তি হিসেবে কোন হিন্দু মুসলমান হয়ে গেলেও বা কোন মুসলমান হিন্দু মেয়ে বিয়ে করলেও বা হিন্দু কৃষ্টি গ্রহণ করলেও জাতি হিসেবে দুটো পৃথক সত্তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

ভারতীয় সভ্যতার নামে 'শকহুন দল-পাঠান-মোঘল'কে এক দেহে লীন করার যত মিষ্টি বুলিই আওড়ানো হোক, বাদশাহ আকবরের মতো দীনে এলাহী কায়েম করে এ দু'জাতিকে এক করার যত চেষ্টাই করা হোক, এ দুটো জাতির মানসিক চেতনা ও কৃষ্টির

www.bjilibrary.com

মধ্যে এতো মৌলিক তফাৎ রয়েছে যে, তাদেরকে এক জাতি বানাবার কোন উপায়ই নেই।

মুসলিম জাতীয়তাবোধ যেমন একদিন ইংরেজ ও কংগ্রেসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত বিভাগ সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিলো, আজও আবার ঐ চেতনাবোধই সত্যিকারের আযাদীর পথে এগিয়ে নেবে। যারা এটাকে সাম্প্রদায়িকতা বলে, তারা ভারতের মানসিক গোলাম। এটা সাম্প্রদায়িকতা নয়; সচেতন জাতীয়তা। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এটা নয়; ভারতের মানসিক গোলামি থেকে মুক্ত হয়ে সত্যিকারের স্বাধীনতারই এটা উদাত্ত আহ্বান। স্বাধীন হয়ে বাঁচতে হলে এ ডাকে সাড়া দিতেই হবে।

জনগণের দাবি

বর্তমান দুরবস্থায় জনগণ কিছুতেই উদাসীন থাকতে পারে না। বর্তমান অবস্থাকে পরিবর্তনের চেষ্টা না করে ঘরে বসে থাকা এক মারাত্মক নৈতিক অন্যায়। তাই আশাহত দেশবাসীর উচিত, তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করার জন্য সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। শান্তিপূর্ণ উপায়ে দাবি জানাতে হবে ঃ

১. আমরা সত্যিকার স্বাধীনতা চাই। আযাদীর সুফল আমাদের ঘরে ঘরে পৌছাতে হবে। প্রতিটি বাঙালি মুসলিম পরিবারকে খেয়ে-পরে ইজ্জত নিয়ে বাঁচতে দিতে হবে। ক্ষমতার বলে, অস্ত্রের বলে শাসক সেজে রাতারাতি বড় লোক হবার নীতি বর্জন করতে হবে।

২. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুণ্ডামি, অস্ত্র প্রয়োগ ও গায়ের জোরে সরকারি ক্ষমতা দখলের চেষ্টা বন্ধ করতে হবে। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। আইনের শাসন চালু করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক মতবিরোধ গণতন্ত্রের পরিচায়ক। তাই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিরোধী দলকে দালাল বলে গালি দেবার ঘৃণ্য অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। গালাগালির রাজনীতি দেশকে ধ্বংস করতে পারে; গড়তে পারে না।

৪. ভারতের গোলামি থেকে মুক্তির সংগ্রাম চলবেই চলবে।

৫. ভারতের প্রভাবমুক্ত গণতান্ত্রিক সরকারই আমাদের একমাত্র কাম্য। অন্য কোন সরকার জনগণের কল্যাণ করতে পারে না।

১৩৭.

সফরসাথীরা লন্ডনে

আমার তিন সফরসাথী মাওলানা আবদুস্ সুব্হান, ব্যারিস্টার কুরবান আলী ও চৌধুরী মুঈনুদ্দীন লন্ডনস্থ ইউ.কে. ইসলামী মিশনের অফিসেই গিয়ে উঠেন। ব্যারিস্টার কুরবান আলী ইসলামী মিশনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সেখানে সমাদৃত মেহমান ছিলেন। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ইসলামী আন্দোলনের নেতা হিসেবে এবং চৌধুরী মুঈনুদ্দীন ইসলামী ছাত্র সংঘের সাবেক নেতা হিসেবে সম্মানিত মেহমানের মর্যাদা পেলেন।

www.bjilibrary.com

ইউ.কে. ইসলামী মিশনে উর্দুভাষী ও বাংলাভাষীর সমন্বয় ঘটেছিলো। কারণ পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলনের লোক মিলেই এ সংগঠনটি গড়ে তুলেছিলেন। ইসলামী আন্দোলনে যারা শরীক হন তারা জামাআতবদ্ধ হয়ে দীনের কাজ করা ফরয মনে করেন। তাই তারা যেখানেই থাকেন সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেন, ইউ.কে. ইসলামী মিশন এ জযবারই ফসল।

আমি লন্ডন পৌছার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার আত্মীয় রিয়াজুদ্দীন আহমদের বাসায় উঠার পর আমার ঐ তিন সাথীও ঐ বাসায় চলে আসেন। বেশ কিছুদিন রিয়াজুদ্দীন আমাদের চারজনের মেহমানদারি করে। তিনজনের মধ্যে চৌধুরী মুঈনুদ্দীন লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে চেষ্টা চালান। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান পাকিস্তানি পাসপোর্টে সফর করছিলেন বলে তাঁকে সেখানেই ফিরে যেতে হলো। আর ব্যারিস্টার কুরবান আলী দুবাই ফিরে গেলেন।

ব্যারিস্টারি পড়ার সময় ৭/৮ বছর কুরবান আলী সাহেব লন্ডন ছিলেন বলে তাঁর পুরানা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করলেন। মাওলানা ও ব্যারিস্টার সাহেব লন্ডন থাকাকালে আমরা একসাথে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে গিয়েছি। একসাথে চলাকালে আমাদের পোশাক সম্পূর্ণ একরকম ছিলো না। তখনো শীত শেষ হয়নি বলে গরম প্যান্ট পরতে হতো। যারা প্যান্ট পড়ে তারা লম্বা শার্ট পরে না; এমন খাটো শার্ট পরে, যা প্যান্টের ভিতর ঢুকিয়ে রাখা যায়। কুরবান সাহেব তো আগে থেকেই এ পোশাকে অভ্যস্ত। আমি খাটো শার্ট পরায় অভ্যস্ত নই। প্যান্টের ভিতর শার্ট ঢুকিয়ে পরা আমার মোটেও পছন্দ নয়। তাই আমার শার্ট প্যান্টের উপরই ঝুরিয়ে রাখি। কুরবান সাহেব বললেন, এভাবে শার্ট পরলে এখানে লোকেরা হাসবে। আমি বললাম, লন্ডনে এ কয়দিন কত বিচিত্র পোশাক দেখলাম। কোন কোন পোশাক দেখে আমার হাসি পায়। কেউ যদি আমার পোশাক দেখে হাসে তাতে আমি মাইন্ড করবো না।

আমরা চারজন আমাদের জন্মভূমিতে ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার জন্য কয়েকটি বৈঠকে বসেছি। আমরা এ বিষয়ে একমত হয়েছি যে, আমাদের জন্মভূমি বর্তমানে আলাদা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেখানে নতুন করে জামায়াতে ইসলামী সংগঠিত হয়েছে। '৪৭ সালে ভারত থেকে পাকিস্তান একটি আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার সাথে সাথেই জামায়াতে ইসলামী হিন্দ দু'ভাগ হয়ে গেলো। তেমনিভাবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীও পাকিস্তান থেকে আলাদা সংগঠনে পরিণত হয়েছে। আমরা যেখানেই থাকি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে থাকবো।

লন্ডনে বাংলাদেশীদের বিভিন্ন মত

বিদেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের কেন্দ্র ছিলো লন্ডন এবং সেখানকার প্রবাসী পূর্ব-পাকিস্তানিরা অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ঐ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক এমন লোক অবশ্যই ছিলো, যারা ভারতের সাহায্যে পাওয়া স্বাধীনতাকে সত্যিকার স্বাধীনতা বলে বিশ্বাস করতে পারেনি। ভারতের আধিপত্যের আশঙ্কায় তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় হতে পারেনি। কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরে (১৯৭১) ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে যখন স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিলো, তখন তাদের প্রায় সবাই তাদের জন্মভূমি হিসেবে বাংলাদেশকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হলো।

যারা মনের দিক দিয়ে তা মেনে নিতে পারলো না তারা অবশ্য চুপ করে রইলো। কারণ তারা করণীয় কিছুই চিন্তা করা সম্ভব মনে করলো না। আমি শুনতে পেলাম যে, পাবনার অধিবাসী সিনিয়র ব্যারিস্টার আবুল আব্বাসের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন ব্যারিস্টার ও বিভিন্ন পেশার লোক পাকিস্তানের বিভক্তিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। অবশ্য তাঁরা দীর্ঘদিন থেকে সে দেশেই আছেন এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্বও পেয়ে গেছেন। তাঁদের কয়েকজন ছাত্রজীবনে পাকিস্তান আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তাদের মতে, পূর্ব-পাকিস্তান ভারতের দখলে চলে গেছে এবং ভারতের কবজা থেকে উদ্ধার করার জন্য তারা আন্দোলন করতে চান।

ইউ.কে. ইসলামী মিশনের একজন জোশীলা কর্মী ছিলেন জনাব আবদুর রশীদ। তিনি ফোনে আমাকে যা বললেন তাতে বুঝা গেলো যে, তিনিও উপরিউক্ত মত সমর্থন করেন। আমার সাথে এ বিষয়ে আলাপ করার জন্য সময় চাইলেন। পরের দিন আমার ট্রেনে ম্যানচেস্টার যাবার কথা। তিনি অবিলম্বে দেখা করতে চান বলে চাপ দেওয়ায় তাঁকে আমার সাথে ম্যানচেস্টার যাবার জন্য পরামর্শ দিলাম। তিনি যথাসময়ে রেলস্টেশনে হাজির হয়ে গেলেন। লন্ডন থেকে ম্যানচেস্টার ১৮৫ মাইল। ট্রেনে যেতে আড়াই ঘণ্টা লাগে। ট্রেনে আমরা সামনা-সামনি দু'আসনে বসলাম। ট্রেন ছাড়ার আগেই তিনি কথা শুরু করলেন। আমি কিছু কথা আগে বলার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন না। অগত্যা আমাকেই তাঁর কথা আগে শুনতে হলো। আমি ভাবলাম, তাঁর মনের আবেগ প্রকাশ হয়ে যাক, পরে বুঝাবার চেষ্টা করবো।

তিনি একটানা বক্তৃতা করেই চললেন। তিনি তেমন শিক্ষিত না হলেও পাকিস্তানের আদর্শ ও অখণ্ডতায় অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বিশ্বাসী হওয়ায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত অবিরাম বললেন। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের চরম দুশমনির মনোভাব, ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে ভারতীয় নেতাদের জঘন্য আচরণ ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনা করার পর তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, ভারতের খপ্পর থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করতে না পারলে বাঙালি মুসলমানরা হিন্দুদের গোলাম হতে বাধ্য হবে। এতোটুকু বলে তিনি থামলেন।

আমি বললাম, বাংলাদেশ যাতে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে টিকে থাকতে পারে সে উদ্দেশ্যে আমাদের সবাইকে সিরিয়াসলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিনি তীব্র প্রতিবাদ করে বললেন, পাকিস্তানের সাথে আবার মিলিত হওয়া ছাড়া আমরা ভারতের কব্জা থেকে রেহাই পাবো না। বললাম, আমরা তো পাকিস্তানের সাথেই মিশে ছিলাম। ভুট্টো ও ইয়াহইয়া খান আমাদেরকে ধাক্কা মেরে আলাদা করে দিলো। এখন কেমন করে আবার মিলিত হওয়া সম্ভব?

তিনি জোর দিয়ে বললেন, পাকিস্তানের জনগণ আমাদেরকে ফিরে পেতে চায়।

www.bjilibrary.com

আমি বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে জানতে চাইলাম যে, কিভাবে আবার মিলিত হওয়া সম্ভব? বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মাঝখানে হাজার মাইল দূরত্ব। ভারতের মতো একটি মুসলিমবিরোধী দেশ মাঝে থাকা অবস্থায় আপনি এমন অবাস্তব চিন্তা কেমন করে মগজে পোষণ করেন?

তিনি এরপর এমন সব উদ্ভট কথা বলতে লাগলেন যে, আমার ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে গেলো। বাংলাদেশ যাতে ভারতের গোলাম হওয়া থেকে রক্ষা পায় সে উদ্দেশ্যে আমাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু কথা তাঁকে বলার ইচ্ছে ছিলো। এ পর্যায়ে আর তা বলা চলে না বলে বুঝতে পারলাম।

শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমার দৃঢ়কণ্ঠে বলতে হলো, বাংলাদেশ সম্পর্কে আমরা দু'জন বিপরীত মতামত পোষণ করছি। আপনাকে বুঝাবার সাধ্য আমার নেই। আপনার চিন্তা-ভাবনা আপনার কাছেই থাক। আমার সাথে এ বিষয়ে আর আলাপ করবেন না। দীনী ভাই হিসেবে যে সম্পর্ক আগে থেকেই আছে সেটা বহাল থাক। রাজনৈতিক চিন্তায় আমরা দু'মেরুতে অবস্থান করছি।

ইতোমধ্যে ট্রেন ম্যানচেস্টার পৌঁছে গেলো। ট্রেন থেকে নামার পর তিনি ফেরৎ গাড়িতেই লন্ডন চলে গেলেন, আমার সাথে আমার ছোট ভাই মাহদীউয্যামানের বাসায় যেতে কিছুতেই রাজি হলেন না।

আমি রশীদ সাহেবের ব্যক্তিগত আবেগ ও বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করিনি। কিন্তু তাঁর অবাস্তব চিন্তার কারণে তাঁর প্রতি করুণাবোধ করেছি। অন্ধ আবেগ যুক্তি ও বাস্তবতার ধার ধারে না। আমি শুনেছি যে, কিছুদিন পর তিনি পাকিস্তান গিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমার ঢাকা রওয়ানা হবার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে চার বছরের মধ্যেও আর দেখা হয়নি।

ব্যারিস্টার আবুল আব্বাসের প্রবাসী সরকার

ব্যারিস্টার আবুল আব্বাস তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে ভারতীয় দখল থেকে 'পূর্ব-পাকিস্তান'-কে উদ্ধার করার জন্য আন্দোলন করবেন বলে শুনেছিলাম। কিন্তু আন্দোলনের প্রক্রিয়া কী হবে তা তখনও জানতে পারিনি।

একদিন আমার লন্ডনস্থ ঠিকানায় একটা চিঠি এলো। চিঠিতে স্বাক্ষরকারী জনৈক ব্যারিস্টার ছিলেন, যার নাম স্মরণে আসছে না। ব্যারিস্টার আবুল আব্বাসের পক্ষ থেকেই চিঠিটি লেখা। চিঠির বক্তব্য হলো, 'পূর্ব-পাকিস্তান' ভারতের দখলে রয়েছে। এ দখলদারিত্ব থেকে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ব্যারিস্টার আবুল আব্বাস 'প্রবাসী পূর্ব-পাকিস্তান সরকার' গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি এ সরকারের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি আপনাকে প্রবাসী সরকারের কেবিনেটে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে আগ্রহী। আপনি সম্মতি দিলে তিনি আপনার সাথে আলোচনা করবেন।

আমি এ প্রয়াসকে হাস্যকর পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে করিনি। প্রবাসী সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে কোন পরামর্শ সভায়ও আমাকে ডাকলেন না। সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাকে মন্ত্রী হবার দাওয়াত দিলেন। বৈঠক ডাকলে হয়তো এ পাগলামি করা থেকে বিরত করার চেষ্টা করতাম। আমি এ চিঠির কোন জওয়াব না দেওয়াই সঠিক মনে

www.bjilibrary.com

করলাম। কেউ আমাকে এ বিষয়ে কোন ফোনও করেননি। এ জাতীয় কোন সরকার গঠন করা হয়েছে বলেও আর জানতে পারিনি।

পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলো নিয়ে ১৯৪৭ সালে কায়েদে আযমের নেতৃত্বে সকল প্রদেশের মুসলিম লীগ নেতাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই পাকিস্তান রাষ্ট্রটি কায়েম হয়। যে মুসলিম জাতীয়তাবোধ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করলো, ২৫ বছরে ঐক্যের ঐ ভিত্তিকে রাষ্ট্রনায়করাই ধ্বংস করলেন। এক হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থিত দু'অঞ্চলকে আবার এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার চিন্তা কোন সুস্থ মস্তিষ্কে স্থান পেতে পারে না। এ দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে নিজেদের স্বার্থেই এবং ভারতের আধিপত্য থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই সুসম্পর্ক গড়ে তুলবার চেষ্টা করাই বাস্তবমুখী পথ হতে পারে।

ত্রিপোলিতে ইসলামী যুব সম্মেলন

'৭৩ সালের ২১ এপ্রিল লন্ডনে প্রথম পৌঁছলাম। ভিসার মেয়াদ ছিলো ছয় মাস। কিন্তু দু'মাস পার হবার আগেই জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের দাওয়াত পেলাম। সম্মেলনটি লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত হবার কথা। জুলাইর প্রথম সপ্তাহে তিন দিনব্যাপী ইসলামী যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আমাকে একজন অতিথি বক্তা হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

যে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এর প্যাডেই দাওয়াতনামা এলো। আরবী ও ইংরেজিতে প্রতিষ্ঠানটির নাম লেখা ছিলো 'আল-জাময়েইয়্যাতুদ দাওয়াতুল ইসলামিয়া' ও 'Islamic call society'. প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফী সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বলে দাওয়াতনামায় উল্লেখ ছিলো।

আমি ভেবে পেলাম না যে, আমার নামে কেমন করে দাওয়াত এলো। আমার ঠিকানাই বা তাঁরা কোথা থেকে পেলেন। দাওয়াতনামায় দস্তখত করেছেন জাময়েইয়্যাতের সেক্রেটারি জেনারেল শায়খ মাহমূদ (পুরো নাম মনে নেই)। খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, ইউ.কে. ইসলামী মিশনকে চিঠি লিখে পরামর্শ চেয়েছে যে, লন্ডন থেকে কোন্ কোন্ ইসলামী ব্যক্তিত্বকে দাওয়াত দেওয়া যায়। মিশনই আমার নাম-ঠিকানা দিয়েছে।

আমি ৩০ জুন ত্রিপোলি পৌঁছলাম। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা কমিটির সেক্রেটারি হিসেবে ড. আহমদ তুতুনজীকে দেখে বিস্মিত হলাম। ১৯৭২-এর ডিসেম্বরে রিয়াদে অনুষ্ঠিত ইসলামী যুব সম্মেলনে তুতুনজী সাহেবের প্রচেষ্টায়ই আমি দাওয়াত পেয়েছিলাম। জানতে পারলাম যে, তিনি ত্রিপোলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রফেসর হিসেবে কয়েক মাস আগে যোগদান করেছেন। বুঝতে পারলাম যে, তিনিই হয়তো ইউ.কে. ইসলামী মিশন থেকে আমার ঠিকানা যোগাড় করেছেন।

ড. তুতুনজী আমাকে নিয়ে তাঁর গাড়িতেই উঠলেন। আমি বললাম, রিয়াদ সম্মেলনেও আপনার প্রধান উদ্যোগী ভূমিকা ছিলো। আমার মনে হয়, এখানেও সে ভূমিকাই পালন করছেন। তিনি মুচকি হেসে বললেন, কর্নেল গাদ্দাফী সৌদি আরবের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে চান। সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলন হয়ে গেলো। লিবিয়াতেও অনুরূপ সম্মেলন করা তিনি প্রয়োজন মনে করলেন। রিয়াদ সম্মেলনের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা কাজে লাগিয়ে ত্রিপোলিতে একটি সফল সম্মেলন করার

www.bjilibrary.com

জন্য আমার সহযোগিতা চাইলে আমি সম্মত হই। যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে এর সেক্রেটারি জেনারেল শায়খ মাহমূদ অত্যন্ত মুখলিস ব্যক্তি। সম্মেলনের ব্যাপারে তিনি আমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখেন বলে আমি যে পরামর্শ দেই তা তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

তাঁর এ কয়টি কথা থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, সম্মেলনের আয়োজনে তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আমার ধারণা যথার্থ।

গাদ্দাফীর থার্ড থিওরি

সম্মেলনের যে দাওয়াতপত্র লন্ডনে পৌছেছিলো তার সাথে পাসপোর্ট সাইজ থেকে একটু বড় একটা ইংরেজি পুস্তিকাও পেয়েছিলাম। বইটির নাম "Ghaddafi's Third Theory—Islam, Socialism and Nationalism".

বইটি পড়ে বুঝতে পারলাম যে, আহূত সম্মেলনে তথাকথিত থার্ড থিওরির পক্ষে সমর্থন নিতে চাইবে। তাই সম্মেলনে পেশ করার জন্য একটা পেপার ইংরেজিতে তৈরি করে নিলাম। মাও সেতুং-এর রেড বুকের আদলে কর্নেল গাদ্দাফী তার 'থার্ড থিওরি' নামক পুস্তিকাকে কেন্দ্র করে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন।

ইসলাম, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ে তিনি যে থিওরি পেশ করলেন, এর নাম কেন থার্ড থিওরি হলো, সে বিষয়ে আমি জানতে পারলাম যে, মুসলিম বিশ্বে সৌদি আরবের বাদশাহ ফায়সাল ইসলামকে একমাত্র থিওরি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান। মিসরের প্রেসিডেন্ট কর্নেল নাসের আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হিসেবে আরব বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ দুটো থিওরির বদলে গাদ্দাফী থার্ড থিওরি দিলেন।

পঞ্চাশ থেকে সত্তর দশকে আরব বিশ্ব

রাসূল (স)-এর যুগে আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মাঝে অবস্থিত বদ্বীপটিতেই আরবী ভাষা সীমাবদ্ধ ছিলো। ইসলামী শাসনব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে আফ্রিকা মহাদেশের গোটা উত্তরাঞ্চল মিসর, সুদান, লিবিয়া, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো থেকে স্থানীয় সকল ভাষা উৎখাত হয়ে কুরআনের ভাষা জনগণের একমাত্র ভাষায় পরিণত হয়। তাই আরবী ভাষাভাষী সকল দেশকে মিলিয়েই বর্তমানে আরব বিশ্ব নামে পরিচিত। এসব দেশই 'আরব লীগ' নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য।

মিসর গোটা আরব বিশ্বে গৌরবময় প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র। ইসলামের বিস্তারের পর মিসর সর্বদিক দিয়ে আরব বিশ্বে সবচেয়ে উন্নত দেশ হিসেবে স্বীকৃত। মিসরের রাজধানী কায়রোই বাস্তবে আরবী ভাষার রাজধানী। হযরত ইউসুফ (আ)-এর রাজত্ব মিসরেই ছিলো। মানব সভ্যতার ইতিহাসে মিসর প্রাচীনতম দেশগুলোর মধ্যে গণ্য। মিসরের স্থাপত্যশিল্প বর্তমান উন্নত বিশ্বেরও বিস্ময়। মিসরের পিরামিড অত্যন্ত উন্নত স্থাপত্যের উজ্জ্বল সাক্ষ্য বহন করে।

মিসরের বাদশাহ ফারুক বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর শাসক ছিলেন। ক্ষমতা থাকলে সীমালঙ্ঘন হয়েই থাকে। মিসরে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ হাসানুল বান্নাকে বাদশাহ ফারুকের শাসনামলেই দিনের বেলা গুলি করে হত্যা করা হয়। বাদশাহ ফারুকের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে ক্ষোভ থাকলেও তা প্রকাশের উপায় ছিলো না। এ

www.bjilibrary.com

পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করার সুযোগ গ্রহণ করে। জেনারেল নজীবের ইসলামী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিও ছিলো। তার ইখওয়ানদের সমর্থন পাওয়া স্বাভাবিক।

সেনাবাহিনী বাদশাহ ফারুককে ক্ষমতাচ্যুত করার পর জেনারেল নজীব মিসরের প্রেসিডেন্ট হন। কিছুদিন পরই উচ্চাভিলাষী কর্নেল নাসের সেনাবাহিনীতে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে জেনারেল নজীবকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি মিসরের ইসলামের উত্থানকে ঠেকাবার উদ্দেশ্যে আরব জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা সেজে আরব বিশ্বে হিরো হবার চেষ্টা করেন।

আরব জাতীয়তার এ শ্লোগান আরব বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মিসরের অনুকরণে সর্বত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইরাক ও সিরিয়ায় সেনা বিপ্লবের পর লিবিয়ায় কর্নেল গাদ্দাফী ক্ষমতা দখল করেন। ঐ সময় সামরিক স্বৈরশাসকরা সমাজতন্ত্রকে ক্ষমতায় স্থায়ী হবার জন্য সহায়ক মনে করেন। সমাজতন্ত্র মানে দেশের গোটা অর্থনৈতিক শক্তিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে নিরঙ্কুশ করা।

আরব জাতীয়তাবাদের প্লাবন থেকে আত্মরক্ষার জন্য সৌদি বাদশাহ ফায়সাল ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহীর ভূমিকা পালন করেন। আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলন করে WAMY (World Assembly of Muslim Youth) নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। মরক্কোর রাজধানী রাবাতে বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদদের সম্মেলন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'রাবেতায়ে আলমে ইসলামী' নামে একটা বিশ্ব ইসলামী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর কেন্দ্র মক্কায় স্থাপন করেন।

সৌদি আরবের সেনাবাহিনীর বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে মিসরীয় নাগরিক ছিলো। সেনাবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য ট্রেনিং দেবার উদ্দেশ্যে মিসর থেকেই সামরিক প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিলো। প্রেসিডেন্ট নাসের সৌদি আরবে সামরিক বিপ্লবের জন্য সেখানে কর্মরত মিসরী সেনা অফিসারদের উপর চাপ প্রয়োগ করলে বাদশাহ ফায়সাল পাকিস্তান থেকে সেনা অফিসার নিয়োগ করে হঠাৎ একদিন সকল মিসরীয় সেনা অফিসারকে একসাথে বিমানে তুলে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন। সৌদি আরবে কর্মরত এক পাকিস্তানি সেনা অফিসার থেকে এ তথ্য জানতে পাই। এ কারণেই বাদশাহ ফায়সাল পাকিস্তানের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যান। পাকিস্তান সরকার লায়ালপুর জেলার নাম ফায়সালাবাদ রেখে বন্ধুত্বের স্বীকৃতি দেয়। বাদশাহ ফায়সাল পাকিস্তানের জন্য অনেক কিছু করেন। পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে তিনি বিশাল ও পরম সৌন্দর্যমণ্ডিত মসজিদটি নির্মাণ করেন, যার নাম পাকিস্তানিরা 'বাদশাহ ফায়সাল মসজিদ' রেখেছেন।

১৩৮.

ত্রিপোলি ইসলামী যুব সম্মেলন

আমার ত্রিপোলি পৌঁছার দু'দিন পর তিন দিনব্যাপী সম্মেলন শুরু হওয়ার কথা। পরের দিন ড. তুতুঞ্জী আমাকে সম্মেলনের উদ্যোক্তা সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল শায়খ মাহমূদের সাথে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে নিয়ে গেলেন। বিরাট এক বিল্ডিং-এর সামনে পৌঁছলাম। বিশাল সাইনবোর্ডে আরবীতে লেখা 'আল-জামইয়্যাতুদ্ দাওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্'। আর ইংরেজিতে লেখা 'Islamic call office'.

www.bjilibrary.com

ড. তুতুনজী থেকে জানতে পারলাম, অফিসের এ বিরাট দালানটি এক সময়ে গির্জা ছিলো। কর্নেল গাদ্দাফী কৌশল করে লিবিয়ায় অবস্থিত সকল গির্জা সরকারি সম্পত্তি হিসেবে দখল করে নেন।

অফিসের ভেতরে সেক্রেটারি জেনারেলের প্রশস্ত কামরায় শায়খ মাহমূদ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি ইংরেজি বলায় অভ্যস্ত নন। আর আমি আরবী বলায় অভ্যস্ত নই। তাই ড. তুতুনজীর মাধ্যমেই কথার আদান-প্রদান করতে হলো। ড. তুতুনজী বাধ্য হয়ে উভয়ের কথার অনুবাদ করলেন। শায়খ মাহমূদ দেখতে চমৎকার সুপুরুষ এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়স। সাদা-কালো দাড়িতে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তদুপরি মানুষটি হাসিমুখী হওয়ায় দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়। আমরা পরস্পর মহব্বতের বন্ধন অনুভব করলাম।

এখান থেকে বিদায় নেবার পর ড. তুতুনজী আমাকে ত্রিপোলি শহরটা একটু ঘুরিয়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য স্থান ও বিল্ডিং দেখালেন। এ সবের মধ্যে ত্রিপোলির সবচেয়ে বড় গির্জাটিতে প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসের বিশাল সাইনবোর্ড ঝুলানো দেখা গেলো। হোটেলে ফেরার আগে শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদে যোহরের নামায আদায় করা হলো। হোটেলে পৌঁছে রিসিপশন অফিসে বিদেশ থেকে আগত ডেলিগেটদের ভিড় লক্ষ্য করলাম।

আগত মেহমানদের সাথে পরিচয়ের পালা

দুনিয়ার সকল এলাকার ৭৩টি দেশের ইসলামী যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলন উপলক্ষে ত্রিপোলিতে সমবেত হচ্ছেন। তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়াকে আমি সবচেয়ে বড় অর্জন মনে করে সাধ্যমতো যোগাযোগ করতে সচেষ্ট হই। জামায়াতে নামাযের সময়, নাশতা ও খাবার সময়, লাউঞ্জে বিভিন্ন টেবিলের চারপাশে, সোফায় উপবিষ্ট অবস্থায় নতুন মুখ দেখলেই এগিয়ে হাত বাড়িয়ে পরিচয় করতে চেষ্টা করি। পরিচয় করার নেশায় যেন আমাকে পেয়ে বসলো।

দেড় বছর আগে রিয়াদ সম্মেলনে যাদের সাথে পরিচয় হয় তাদের মধ্যে বেশকিছু ডেলিগেট এ সম্মেলনেও উপস্থিত হন। তাদের সাথে আবার দেখা হওয়ায় উষ্ণ আলিঙ্গন চলে। আরব বিশ্বের ডেলিগেটদের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার পথে বড় বাধা হলো ভাষার ব্যবধান। তাদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলার লোক খুবই কম। যারা শুধু আরবীতেই কথা বলেন তাদের সাথে পরিচয়মূলক কয়েকটি কথা আরবীতে বলার পর আর এগুতে পারি না বলে ঘনিষ্ঠভাবে ভাবের আদান-প্রদান করা চলে না। 'আপনি কোন্ দেশ থেকে এসেছেন', 'আপনার সংগঠনের নাম কি', 'সংগঠনের কোন্ দায়িত্বে আছেন'– এ জাতীয় কয়েকটি কথা আরবীতেই আদান-প্রদানের মধ্যেই পরিচয় পর্ব শেষ হয়ে যায়।

যারা ইংরেজিতে ভাব প্রকাশে সক্ষম তাদের সাথে স্বাভাবিকভাবেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে বিলম্ব হয় না। দু'পক্ষই প্রাণখুলে আলাপে মগ্ন হয়ে যায়। আরবী ও ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারলে দুনিয়ার কোথাও ভাষার সমস্যায় পড়তে হয় না। আমার দুর্ভাগ্য যে আরবী বক্তৃতা শুনে মূল বক্তব্য বুঝতে পারি বটে, কিন্তু বলার অভ্যাস গড়ে তুলবার সুযোগ পেলাম না। এ কারণেই আমার বহু হিতকামী আরব বন্ধুর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে ব্যর্থ

www.bjilibrary.com

হলাম। বলার অভ্যাসটা আলাদা ব্যাপার। আমাদের দেশে এমন বহু আলেম আছেন, যারা আরবী ভাষায় লেখা তাফসীর পড়েন, কিন্তু আরবীতে বক্তৃতা করতে পারেন না। বলার অভ্যাসের সুযোগ না পেলে তা শেখার উপায় নেই।

সম্মেলনের উদ্বোধন

সম্মেলন উদ্বোধনের তারিখের পূর্বে দু'দিন আগত ডেলিগেটদের সাথে পরিচিতিমূলক সাক্ষাৎ ও যোগাযোগের ব্যস্ততার মধ্যেই কাটলো।

সম্মেলন শুরুর আগের দিনই উদ্বোধনী অধিবেশনের দাওয়াতপত্র ডেলিগেটদের মধ্যে বিলি করা হয়। দাওয়াতপত্রটি অত্যন্ত সুন্দর একটি কার্ডের আকারে আমার হস্তগত হয়। পরদিন সকাল ১০টায় প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফী উদ্বোধন করবেন বলে কার্ডে উল্লেখ করা হয়। লিবিয়ার বিপ্লবী পরিষদের সদস্য মেজর শাহাতী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন বলে কার্ডে ঘোষণা দেওয়া ছিলো।

সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ডেলিগেটদের মধ্যে উদ্বোধনী অধিবেশনের যে কর্মসূচি বিলি করলেন, তাতে সকাল সাড়ে নয়টায় সবাইকে সম্মেলনের হলে আসন গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়। যথাসময়ে সম্মেলনস্থলে পৌঁছার জন্য যানবাহনের যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়। আমরা ঠিক সময়েই হলে আসন গ্রহণ করলাম।

হলে ডেলিগেটদের পারস্পরিক আলাপের মৃদু গুঞ্জরণ ছাড়া পূর্ণ নীরবতা বিরাজ করছিলো। সবার অপেক্ষমাণ দৃষ্টি মঞ্চের দিকে নিবদ্ধ।

দশটা বাজার কয়েক মিনিট আগেও সম্মেলনের মঞ্চ সম্পূর্ণ খালি দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগলেন। হলে পূর্ণ নীরবতা চলছে। দশটা বেজে গেলো। অনুষ্ঠান শুরুর কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। মঞ্চ থেকে বিলম্ব হওয়ার কোন কৈফিয়তও শোনা গেলো না। সবাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজনে এমন অবস্থা কল্পনাতীত। ৭৩টি দেশের ইসলামী যুব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সম্মেলন কক্ষে যথাসময়ে আসন গ্রহণ করে আছেন। কোন বিশেষ কারণে বিলম্ব হতেই পারে। কিন্তু উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বা মঞ্চ থেকে কিছুই জানানো হবে না কেন? ডেলিগেটগণের চেহারায় ক্ষোভের লক্ষণও দেখা গেলো।

পনেরো-বিশ মিনিট পর হঠাৎ কয়েকজন দ্রুত মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। তাদের চেহারায় বিব্রতভাব সুস্পষ্ট মনে হলো। তাদের একজন ডেলিগেটদের দিকে তাকিয়ে হাত তুলে আস্‌সালামু আলাইকুম উচ্চারণ করে সভাপতির আসনে বসলেন। আমরা বুঝে নিলাম যে, তিনিই মেজর শাহাতী। গাদ্দাফীর চেয়ে তিনি আকারে বেশ খাটো বলে মনে হলো। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে মাইকে ঘোষণা করা হলো যে, সম্মেলন শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় তারা অত্যন্ত দুঃখিত। এ দুঃখ প্রকাশ করাটা তো আরও আগে হওয়া উচিত ছিলো। যথাসময়ে মঞ্চে কেউ উপস্থিত হয়ে বিলম্বের কারণ জানালে এতোটা অস্বস্তির কারণ ঘটতো না।

এর পরের ঘোষণা আরও বিস্ময়কর। বলা হলো যে, অনিবার্য কারণে প্রেসিডেন্ট সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারায় সম্মেলনের সভাপতিই উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করবেন।

মেজর শাহাতী আরবীতে ভাষণ দিলেন এবং একজন ইংরেজিতে এর অনুবাদ করলেন।

www.bjilibrary.com

ভাষণে তিনি প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু অনুপস্থিতির কোন কারণ উল্লেখ করলেন না। তাই ডেলিগেটদের মনে স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন জাগলো- প্রেসিডেন্ট কি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন? কোন দুর্ঘটনা ঘটলো?

সাধারণত সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ লিখিত আকারে বিলি করা হয়ে থাকে। যদি তা লিখিত থাকতো তাহলে তা সম্মেলনে পাঠ করে শুনিয়ে দেওয়া হতো। এতে বুঝা গেলো যে, ভাষণটি লিখিত আকারে ছিলো না।

মেজর শাহাতী সম্মেলনে ডেলিগেটদেরকে স্বাগত জানিয়ে তাদের দাওয়াত কবুল করার জন্য শুকরিয়া জানালেন। গাদ্দাফীর থার্ড থিওরির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে এ বিষয়ে ডেলিগেটগণকে মতামত প্রকাশের আহ্বান জানালেন।

প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর অনুপস্থিতি

উদ্বোধনী অধিবেশনের পর ডেলিগেটদের মধ্যে প্রধান আলোচ্য বিষয়ই ছিলো প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীর অনুপস্থিতির কারণ বিশ্লেষণ। এমন কী অঘটন ঘটলো, যার কারণে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে তিনি উপস্থিত হলেন না? সম্মেলনের উদ্যোক্তারা কি তাঁর সম্মতি ছাড়াই কার্ডে তাঁর নাম প্রকাশ করলেন? এটা কী করে হতে পারে? একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলন তো কোন ছেলেখেলা নয়। অনুপস্থিতির কারণটা জানানো হলো না কেন? তাহলে তো এতো রকম প্রশ্ন সৃষ্টি হতো না।

সম্মেলনের উদ্যোক্তা, আয়োজক ও ডেলিগেটদের মেহমানদারিতে নিয়োজিত যাকেই কাছে পেয়েছেন তাকেই ডেলিগেটরা পাকড়াও করে জানতে চেয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট কেন সম্মেলনে উপস্থিত হলেন না। সম্মেলনের দায়িত্বশীলদেরকেও ধরা হলো যে, প্রেসিডেন্ট উদ্বোধন করবেন বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে হাজির করতে কেন সক্ষম হলেন না?

ডেলিগেটরা এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা হয়ে প্রশ্ন করতে থাকলেন। অনুপস্থিতির কোন সঙ্গত কারণ থাকতেই পারে। কিন্তু কারণটা জানাবেন না কেন? কারণটা জানাতে আপত্তি কেন? জানালে আর কোন প্রশ্ন জাগবে না। সবাই জানার জন্য অব্যাহতভাবে চাপ দিলেন। যাকে যখন যেখানে পাওয়া গেলো তাকেই ধরা হলো।

এটা না জানালে ডেলিগেটরা সম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান করবেন না বলেও আভাস দেওয়া হলো। শেষ পর্যন্ত আসল কারণ যা জানা গেলো, তাতে সবাই স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে গেলেন। সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য বিরাট অংক খরচ করে ডেলিগেটদের যাতায়াত ও থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করায় প্রেসিডেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞতার যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিলো তার পরিবর্তে ডেলিগেটদেরকে অবজ্ঞা করায় তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পেলো।

গাদ্দাফীর আজব আচরণ

জানা গেলো যে, প্রেসিডেন্ট হঠাৎ গতকাল সন্ধ্যায় কায়রো চলে গেছেন। সরকারিভাবে সফরের কোন প্রোগ্রাম করা ছিলো বলে কারো জানা নেই। এমন কোন ঘোষণাও দেওয়া হয়নি। এ কথা জানার পর ডেলিগেটদের ধারণা হলো যে, গাদ্দাফী কোন স্থিরচিত্তের মানুষ নন। তিনি খামখেয়ালি রোগগ্রস্ত। তিনি সম্মেলন উদ্বোধন করে ঐ দিনই যেতে

www.bjilibrary.com

পারতেন। উদ্বোধন করার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত না থাকাও স্বাভাবিক নয়। তিনি কেন সম্মেলনকে গুরুত্ব দিলেন না তা বোধগম্য নয়। তিনি কেন সম্মেলনে তাঁর থার্ড থিওরিকে নিজে বলিষ্ঠভাবে পেশ করা প্রয়োজন মনে করলেন না, তাও বোঝা গেলো না। অথচ এর সমর্থন হাসিলের উদ্দেশ্যেই এতো ঘটা করে সম্মেলন ডাকা হলো। সবার নিকট তাঁর এ আচরণ আজব ও রহস্যময় মনে হলো। গাদ্দাফীর এ আচরণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্মেলনে ডেলিগেটদের বক্তব্যেও স্পষ্ট বুঝা গেলো।

ডেলিগেটরা সবাই বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের যুবনেতা। ইসলামকে তাঁরা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। সব রকম জাতীয়তাবাদকেই তাঁরা ইসলামবিরোধী চিন্তা বলেই জানেন। ভৌগোলিক, ভাষাগত, বর্ণভিত্তিক বা যে ধরনের জাতীয়তাবাদই হোক, ইসলাম কোনটাকেই সমর্থন করে না। মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিরোধ সৃষ্টিকারী হিসেবে ইসলামপন্থিরা জাতীয়তাবাদকে পরিত্যাজ্য মনে করেন। সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমকে তাঁরা ইসলামের চরম দুশমন বলে ঘৃণা করেন। অথচ গাদ্দাফী তাঁর থার্ড থিওরিতে ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের তালি লাগিয়ে এক আজব মতবাদ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন। প্রথম দিন একবেলা এবং দ্বিতীয় দিন দু'বেলা ডেলিগেটগণ তাদের বক্তৃতায় কেউ মোলায়েম ভাষায় আবার কেউ কঠোর ভাষায় থার্ড থিওরিকে বাতিল বলে মন্তব্য করেছেন।

গাদ্দাফীর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমরা জানতাম যে, মিসরের সামরিক স্বৈরশাসক কর্নেল নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদের একজন উগ্র সমর্থক হলেন লিবিয়ার কর্নেল গাদ্দাফী। গাদ্দাফী বারবার নাসেরের নিকট প্রস্তাব দিয়েছেন যে, মিসর ও লিবিয়াকে মিলিয়ে একটি ফেডারেল আরব রাষ্ট্র গঠন করা হোক। নাসের এ প্রস্তাবে কোন সাড়া না দিলেও গাদ্দাফী বারবার এ প্রস্তাবের পক্ষে জোর দাবি জানিয়ে এসেছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা গাদ্দাফীর এ প্রস্তাব এবং এর প্রতি নাসেরের অনীহা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। আমি লন্ডনের একাধিক পত্রিকায় মনোযোগ দিয়ে তা পড়েছি। ঐসব আলোচনার সার কথা হলো ঃ

মিসর আরব বিশ্বে সম্পদের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ না হলেও রাজনৈতিক বিবেচনায় সবচেয়ে উন্নত। আধুনিক শিক্ষায় সবচেয়ে অগ্রসর। আরবী ভাষা চর্চার দিক দিয়ে নেতৃত্বের অধিকারী। প্রাচীন সভ্যতার ধারক হিসেবে আরব বিশ্বে শ্রেষ্ঠতম। আধুনিক সভ্যতার দৃষ্টিতে মিসর সবচেয়ে অগ্রগামী।

লিবিয়া আয়তনে মিসরের প্রায় দ্বিগুণ হলেও জনসংখ্যায় অনেক কম। আধুনিক শিক্ষা ও উন্নয়নের দিক দিয়ে লিবিয়া অনেক পেছনে। আয়তন ছাড়া কোন দিক দিয়েই মিসরের সাথে লিবিয়ার কোন তুলনা হয় না।

তাই লিবিয়াকে মিসরের সাথে এক রাষ্ট্রভুক্ত করতে নাসের মোটেই আগ্রহী নয়। এক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হলে লিবিয়া উন্নয়নের দায়িত্বেও মিসরকে শরীক হতে হবে। লিবিয়ার তৈল সম্পদ থাকলেও মিসরের মানব সম্পদ ছাড়া লিবিয়ার উন্নয়ন সম্ভব হবে না। তাই নাসেরের দৃষ্টিতে লিবিয়া এসেট না হয়ে লায়েবিলিটি হবে।

www.bjilibrary.com

তাছাড়া নাসের একথা বুঝেন যে, এক রাষ্ট্রে পরিণত হলে রাজনৈতিক নেতৃত্বে গাদ্দাফীকে অবশ্যই শরীকানা হিস্যা দিতে হবে। গাদ্দাফীকে ফেডারেশনের দ্বিতীয় প্রধান নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। গাদ্দাফী যে এ মর্যাদা হাসিলের উদ্দেশ্যেই এ প্রস্তাব অব্যাহতভাবে দিয়ে চলেছেন, সে কথা নাসেরের অজানা নয়। নাসের আরব বিশ্বে একচ্ছত্র হিরো হতে চান। এতে আর কাউকে শরীক করতে চান না। তিনি গাদ্দাফীকে উৎসাহী সমর্থক হিসেবে তো পেয়েই গেছেন। তাকে তিনি ঐ পর্যায়েই রেখে দিতে চান।

বিশ্লেষকরা এ বিষয়েও একমত যে, গাদ্দাফী আরব বিশ্বে রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের চরম আকাঙ্ক্ষী। গাদ্দাফী মিসর-লিবিয়া ফেডারেশনের নামও প্রস্তাব করেছেন, 'ইউনাইটেড আরব ফেডারেশন'। নাসের এর প্রেসিডেন্ট হলে তিনি অবশ্যই ভাইস প্রেসিডেন্টের পদবি পাবেন এবং ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট পদটিও দখল করার সুযোগ পেতে পারেন।

ত্রিপোলি সম্মেলনের সময় গাদ্দাফীর হঠাৎ মিসরে যাওয়ার বিস্তারিত বিবরণ লন্ডনে ফিরে গিয়ে জানা গেলো। নাসেরকে না জানিয়েই হঠাৎ তিনি কায়রো বিমানবন্দরে পৌঁছলেন এবং আবেগের সাথে নাসেরকে জানালেন, ভাই-এর কাছে ভাইকে আসার জন্য দাওয়াতের অপেক্ষা করতে হয় না, ফরমালি জানাবারও প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন মেহমানের দাবি নিয়ে আমি আসিনি। আমার অভ্যর্থনারও কোন প্রয়োজন নেই। নাসের বিব্রত হয়ে নিজে বিমানবন্দরে পৌঁছে তার 'পাগলা' ভাইকে নিয়ে গেলেন এবং তিন দিন মেহমানদারি করলেন।

ত্রিপোলি সম্মেলন শেষ হওয়া পর্যন্তও তিনি মিসর থেকে ফিরে আসেননি। নাসেরের ছোট ভাই হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার নেশায় তিনি নিজের ডাকা সম্মেলনকেও ভুলে গেলেন। এমনকি তিনি তার প্রিয় থার্ড থিওরিকে সম্মেলনে পাস করাবার গুরুত্বও খেয়ালে রাখতে পারলেন না।

সম্মেলনের শেষ দিন

সম্মেলনের শেষ দিনে একটি প্রস্তাব পেশ করার জন্য মেজর শাহাতীকে চেয়ারম্যান করে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। আমাকেও কমিটির একজন সদস্য রাখা হয়। শেষ দিনের আগের রাতে ঐ কমিটির বৈঠক বসে। মেজর শাহাতী প্রস্তাবের খসড়া বৈঠকে পেশ করেন। থার্ড থিওরিকে সমর্থন করেই প্রস্তাবটির খসড়া রচনা করা হয়। সম্মেলনে বিগত দু'দিন লিবিয়ার দু'জন ডেলিগেট ছাড়া সবাই থার্ড থিওরিকে সমর্থনযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করা সত্ত্বেও এমন একটি খসড়া প্রস্তাব কেমন করে বৈঠকে পেশ করা হলো তা সত্যিই বিস্ময়কর।

কমিটির একজন সদস্যও প্রস্তাবটি সমর্থন করতে সম্মত না হওয়ায় মেজর শাহাতী ক্ষুব্ধ হলেন। আমি প্রস্তাব করলাম যে, সম্মেলনে ইসলামের পক্ষে একটি প্রস্তাব পাস হওয়া উচিত এবং এ উদ্দেশ্যে আর একটি প্রস্তাবের খসড়া তৈরি করা হোক। "আর কোন প্রস্তাবই প্রয়োজন নেই" বলে শাহাতী বৈঠক থেকে উঠে গেলেন।

শেষদিন আমার বক্তৃতা দেবার কথা। আধঘণ্টা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ যে প্রস্তাব পাস করাতে চেয়েছিলো তা কমিটিতে গৃহীত না হওয়ায় পরিবেশ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তাতে আমার বক্তব্য পেশ করায় কোন সমস্যা হয় কি না সে ব্যাপারে আমি

www.bjilibrary.com

আশঙ্কা বোধ করছিলাম। কমিটির বৈঠকে মেজর শাহাতীর সাথে ব্যক্তিগত যে পরিচয় হয়েছে তাতে সুসম্পর্ক গড়ে উঠার কথা নয়।

সম্মেলন মেজর শাহাতীর সভাপতিত্বে যথাসময়েই শুরু হলো। আমার আগে একজনের বক্তৃতা হয়ে গেলো। তিনি থার্ড থিওরি সম্পর্কে যে বক্তব্য রাখলেন তা পক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। তিনি একটি আপসমুখী ভাষণ দিলেন। ডেলিগেটরা কোন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি।

এরপরই বক্তব্য রাখার জন্য আমার নাম ঘোষণা করা হয়। লন্ডন থেকে আগত মেহমান বলে পরিচয় দেওয়া হয়। আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আমার আলোচনা শুরু করলাম। প্রথমে এমন একটি বিরাট সম্মেলনের আয়োজন করে বিশ্বের ইসলামী যুব নেতাদেরকে পারস্পরিক পরিচয়ের এবং মতবিনিময়ের সুযোগ দেবার জন্য লিবিয়ার সরকারকে আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম।

আমি লক্ষ্য করলাম যে, সভাপতি একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এবং মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। মূল আলোচ্য বিষয়কে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ভূমিকা হিসেবে একটা থিওরি পেশ করলাম। এর মূল কথা হলো, যারা বিশ্বস্রষ্টার নিকট থেকে কোন গাইডেন্স বা হেদায়াত গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করে না তারা এমন সব থিওরি, মতবাদ ও চিন্তা পেশ করে, যা মানবজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধান পেশ করেন, একমাত্র তাই আদম সন্তানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী প্রথমে শতধা বিচ্ছিন্ন আরববাসীদেরকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি এমন এক জীবন বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখান, যা মানব সমাজকে সুখ, শান্তি ও নিরাপত্তা দান করে। আরবে ইসলামের বাস্তব রূপ দেখে তদানীন্তন মানব সমাজ এর প্রতি স্বাভাবিক কারণেই আকৃষ্ট হয়। চারপাশের সকল দেশেই জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসুক্য জেগে উঠে। যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কায়েমী স্বার্থের ধারক, বাহক ও সুবিধাভোগী, তারা তাদের নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির সর্বাত্মক চেষ্টা করেও এর অগ্রগতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়। আরবের একদিকে পারস্য সাম্রাজ্য এবং অপরদিকে রোম সাম্রাজ্য বিরাট বিরাট বাহিনী নিয়েও ইসলামী শক্তিকে ঠেকাতে পারেনি। সর্বত্র নিপীড়িত, নির্যাতিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণ ইসলামী শক্তিকে মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

ইসলাম আদম সন্তানদেরকে ভাষা, বর্ণ, ধনী, গরীব, এলাকা ইত্যাদিতে বিভক্ত হতে দেয় না। সকল ভাষা, বর্ণ, গোত্র, ধনী, দরিদ্র ও সকল ভৌগোলিক এলাকার মানুষকে আল্লাহর প্রভুত্ব ও নবীর নেতৃত্ব এবং আল্লাহর আইনের আনুগত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে। ইসলাম মানুষকে শুধু দু'ভাগে বিভক্ত করে, আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত এবং এর বিরোধী। বিরোধীরাও যাতে অনুগত হয়ে যায়, সে বিষয়ে ইসলাম সব রকম সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে।

এ ভূমিকাটুকু দশ মিনিটে পেশ করার সময় ডেলিগেটদের বারবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি আমাকে উৎসাহিত করে।

www.bjilibrary.com

সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে ইসলাম সম্পর্কে আরও বললাম, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ মতবাদ ও চিন্তাধারা, যা সরাসরি আল্লাহর রচিত। মানব রচিত কোন মতবাদকেই ইসলামের সাথে লাগাবার কোন জায়গাই নেই। লাগাতে চাইলেও তা কোথাও ফিট হবে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, ঐসব মতবাদ মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং ঐক্য বিনষ্ট করে।

১৩৯.

ত্রিপোলি সম্মেলন

জড়বাদ বা বস্তুবাদ (Materialism) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জন্ম দেয়। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পুঁজিবাদ কায়েম হবার সুযোগ দেয়। পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ায় সমাজতন্ত্র পয়দা হয়। সমাজতন্ত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদেরকে অর্থনৈতিক শক্তি কুক্ষিগত করে চরম স্বৈরাচার চালু করার সুযোগ করে দেয় এবং জনগণকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গোলামে পরিণত করে।

এটুকু বলার সাথে সাথে সভাপতি দাঁড়িয়ে বললেন, "সম্মেলন এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করলাম।" ডেলিগেটরা হতভম্ব হয়ে গেলেন। আমি মাত্র ১৫ মিনিট বলেছি। আরও ১৫ মিনিট বলার সময় রয়েছে। অথচ সম্মেলন এভাবে সমাপ্ত ঘোষণা করায় ডেলিগেটগণ ক্ষুব্ধ হয়ে দাবি জানালেন, বক্তৃতা সমাপ্ত হতে দিন। সভাপতি ভাষণ দেবার সময় যা ইচ্ছা বলবেন। এভাবে সম্মেলন সমাপ্ত করা যায় না।

সভাপতি উত্তেজিত অবস্থায় দ্রুত পদে বের হয়ে গেলেন। আমি অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বসে রইলাম। জীবনে এমন পাগলা সভাপতি কোথাও দেখিনি। সামরিক শাসন হয়তো শাসকদের মধ্যে এমন অহংকারী মেজাযই সৃষ্টি করে।

ডেলিগেটরা পরস্পর তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে করতে হোটেলে ফিরে গেলেন। সভাপতি যদি ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করার যোগ্য হতেন তাহলে তিনি শালীনতা, শিষ্টতা দেখিয়ে এবং সরকারের সম্মান বহাল রেখে সম্মেলন সমাপ্ত করতেন। বক্তাদের বক্তব্য নাকচ করে থার্ড থিওরির পক্ষে কথা বলেই সমাপনী ঘোষণা করতে পারতেন।

লিবিয়া সরকার এ সম্মেলন থেকে যা অর্জন করতে চেয়েছিলেন তা তো ব্যর্থ হলোই; তদুপরি ডেলিগেটরা এ ধারণাই নিয়ে গেলেন যে, লিবিয়া চরম স্বৈরশাসনের শিকলে আবদ্ধ। গাদ্দাফী সম্পর্কে এবং লিবীয় সরকার সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব নিয়েই বিশ্বের ৭৩টি দেশের ইসলামী যুব নেতারা বিদায় হয়ে গেলেন।

শায়খ মাহমূদ এলেন

হোটেলে আমার কামরায় রাত ১০টার পর বিনা খবরে সম্মেলনের উদ্যোক্তা সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল শায়খ মাহমূদ হাজির হলেন। সম্মেলনের অসুন্দর সমাপ্তিতে তো ক্ষুব্ধ ছিলামই, তাই তাঁকে দেখে বিব্রতবোধ করলাম। কিন্তু তাঁকে খুবই স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে বিস্মিত হলাম। আমার ধারণা ছিলো যে, তিনি লজ্জিত হয়ে সভাপতির আচরণের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন। তিনি সহাস্য বদনে আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং অত্যন্ত শান্তভাবে বসলেন। আমার সাথে খোলা মনে কথা বলার উদ্দেশ্যে তিনি

www.bjilibrary.com

একজন বিশ্বস্ত অনুবাদক সাথে নিয়ে এসেছেন বলে আমাকে জানালেন। তিনি বললেন, আমরা কেমন পরিবেশে আছি তাতো বুঝতেই পেরেছেন। ইসলামী আন্দোলন এখানে প্রকাশ্যে তো দূরের কথা গোপনেও কোন রকম তৎপরতা চালাতে পারে না। এখানকার কমিউনিস্ট নেতারাও যেমন জেলে, ইখওয়ান নেতারাও জেলে। সম্মেলনে লিবীয়ান ডেলিগেশনের সদস্যরাও আপনার বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন। এ সম্মেলনে বড় অর্জন এটাই যে, বিশ্বের সকল ইসলামী নেতা সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে ইসলামবিরোধী মতবাদ মনে করেন বলে প্রমাণিত হলো। থার্ড থিওরি বাতিল বলে সাব্যস্ত হলো। আশা করি এরপর এ থিওরি নিয়ে সরকার আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করবে না।

শায়খ মাহমূদের কথা শুনে অত্যন্ত তৃপ্তিবোধ করলাম। সম্মেলনের সভাপতির আচরণে যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছিলো তা দূর হয়ে গেলো। সরকার যে উদ্দেশ্যে সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলো তা সফল হয়নি এবং এ ব্যর্থতাই ইসলামের সাফল্য বলে প্রমাণিত হলো। লিবিয়ার খাঁটি ইসলামপন্থিরা সরকারের এ ব্যর্থতায় অত্যন্ত খুশি। সম্মেলনে ইসলামের বিজয় হয়েছে এবং সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ইসলামবিরোধী বলে ঘোষিত হয়েছে। লিবিয়ার কোন লোক ঐ দুটো মতবাদের বিরোধিতা করতে পারছিলো না। এ সম্মেলন তাদের একটা বড় অভাব পূরণ করেছে।

লন্ডন ফেরত গেলাম

১৯৭৩ সালের ১৪ জুলাই আবার ছয় মাসের ভিসা নিয়ে লন্ডন পৌছলাম। পৌছেই আমেরিকার এক ইসলামী সম্মেলনের দাওয়াতনামা পেলাম। জানা গেলো যে, এ সম্মেলন ইলিয়নয়েস স্টেটের মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের উদ্যোক্তা MSA (Muslim Student Association) নামক একটি সংগঠন। MSA প্রতি বছরই বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে থাকে। এবার তাদের 11th Annual convention-এ আমাকে Chief Guest হিসেবে দাওয়াত দিয়েছেন। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় : Education and the maintenance of social values in the changing society.

যে কোন সম্মেলনেরই একটা প্রতিপাদ্য বিষয় থাকে, যাকে Theme বলা হয়। উপরিউক্ত Theme বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বহু বিচিত্র কারণে সমাজের মানুষের আচরণ, অভ্যাস ও চরিত্রে পরিবর্তন আসে। কিন্তু সুসভ্য সমাজের এমন কতক স্থায়ী মূল্যমান (Permanent Values) থাকে, যাকে রক্ষা করা না হলে সমাজের চরম অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। যেমন দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনে বর্তমানে বাড়ির বাইরে মহিলাদেরকেও অনেক কর্মকাণ্ডে শরীক হতে হচ্ছে। পারিবারিক আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য স্বামীর আয় যথেষ্ট হয় না বলে স্ত্রীকেও আয়-রোজগারের উদ্দেশ্যে কর্মরত থাকতে হয়। এ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষের অবাধ দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশার সুযোগ হয়। এর ফলে পর্দার সীমা মেনে চলা কঠিন, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করার যোগ্যতা সৃষ্টির পরিকল্পনা থাকলে পরিবর্তিত পরিবেশেও তা রক্ষা করা সম্ভব। এটা সম্ভব করার জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থা ও গণমাধ্যমকে সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন সত্ত্বেও সামাজিক মূল্যবোধের সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবনের উদ্দেশ্যেই এ বিষয়টি সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে বলে আমার ধারণা হলো।

www.bjilibrary.com

ত্রিপোলি সম্মেলন ও গাদ্দাফীর প্রতিক্রিয়া

আমার আমেরিকা সফরে যাবার আগেই লন্ডন থেকে প্রকাশিত Impact International নামক প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে একটা খবর দেখলাম। ত্রিপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফীর একটি বক্তৃতার বিবরণ তাতে প্রকাশিত হয়েছে। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লাম।

তিনি দাবি করেছেন যে, কুরআন ও হাদীস আরবী ভাষায় রচিত। যাদের মাতৃভাষা আরবী তারাই তা বুঝবার অধিকতর যোগ্য। আরবীভাষী হিসেবে তিনি এবং তাঁর মতো অন্য আরবগণ স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী।

এ উদ্ভট দাবি করার পর তিনি ত্রিপোলিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী যুব সম্মেলনে ইংল্যান্ড ও আমেরিকা থেকে আগত মেহমানদের ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার তীব্র সমালোচনা করে বলেন, "আমাদেরকে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতদের নিকট থেকে ইসলামের জ্ঞান আহরণের কোন প্রয়োজন নেই। তাদের কাছে আমাদেরকে ইসলাম শিখতে হবে না। আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস আমরা সরাসরি বুঝবার যোগ্যতা রাখি।"

তাঁর এ বক্তব্য পড়ে আমি ভাবলাম, তাঁর নিকট আরব জাতীয়তাবাদের চেতনা এতোই প্রবল যে, তিনি ইসলামী সম্মেলন উদ্বোধনের দায়িত্বকে অবহেলা করে আরবী ভাষার হিরো হবার জযবায় কায়রো চলে গেলেন। তিনি এ কথাই প্রমাণ করলেন যে, ইসলামের চেয়েও আরব জাতীয়তাবোধ তাঁর মধ্যে অনেক বেশি প্রবল। তাই তিনি এমন আজব দাবি করতে পারলেন যে, আরবীভাষী হওয়ার কারণেই তিনি ইসলামকে বুঝবার যোগ্যতা বেশি রাখেন। সে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে গিয়েই তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে স্বীকার না করে সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদকে ইসলামের সাথে শামিল করে থার্ড থিওরি রচনা করলেন।

আবূ জাহল ও আবূ লাহাব আরবী ভাষায় গাদ্দাফীর চেয়ে দুর্বল ছিলো না। কুরআনের ভাষা বুঝবার যোগ্যতার কোন অভাব তাদের ছিলো না। তাদের কায়েমী স্বার্থ তাদেরকে কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে দেয়নি। গাদ্দাফীও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্রের মতো মতবাদের উপর ইসলামের লেবেল লাগাতে চেয়েছেন এবং আরব জাতীয়তার হিরো সাজবার উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মাহকে আরব ও অনারবে বিভক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। তাই আরবী ভাষাভাষী হওয়া সত্ত্বেও কায়েমী স্বার্থের কারণে ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ত্রিপোলি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর বক্তৃতায় গাদ্দাফীর থার্ড থিওরির কোন উল্লেখ উক্ত খবরে না দেখে সন্তোষবোধ করলাম যে, তাঁরই আয়োজিত সম্মেলন তাঁর থার্ড থিওরিকে বাতিল ঘোষণা করায় তিনি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐ সম্মেলনের পর ঐ থিওরি নিয়ে আর তিনি অগ্রসর হননি। তাই ইসলামী সম্মেলন হিসেবে ঐ সম্মেলন সফল হয়েছে বলেই স্বীকার করতে হয়।

উত্তর আমেরিকার MSA

যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে একসাথে নর্থ-আমেরিকা বলা হয়। এ দুটোই বিশাল রাষ্ট্র। তাদের নাগরিকরা বিনা ভিসায়ই উভয় রাষ্ট্রে যাতায়াত করে। তাই বহু প্রতিষ্ঠান, সমিতি ও সংস্থা

www.bjilibrary.com

উভয় রাষ্ট্রেই বিস্তৃত। তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম দু'রাষ্ট্রেই চালু আছে। তারা যখন কোন সাংগঠনিক সম্মেলন করে তখন উভয় রাষ্ট্রে কর্মরত সদস্য ও কর্মীগণ দু'রাষ্ট্রের যে কোন শহরেই সমবেত হয়। ভিসার ঝামেলা নেই বলে এতে তাদের কোন সমস্যা হয় না।

MSA (Muslim Student Association) তেমনি একটি সংগঠন, যা উভয় রাষ্ট্রে বিস্তৃত।

MSA উত্তর-আমেরিকায় শিক্ষারত সকল ভাষা ভাষী মুসলিম ছাত্রদের বিরাট সংগঠন। যে সম্মেলনের দাওয়াত পেলাম তা ঐ সংগঠনের ১১তম বার্ষিক সম্মেলন।

ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গ্রীষ্মকালে প্রায় তিন মাস বন্ধ থাকে। জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে তখন সেখানে বিভিন্ন সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের MSA সম্মেলন শিকাগোর নিকটে অবস্থিত মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নর্থ-আমেরিকায় বাংলাদেশী প্রবাসীদের মধ্যে যারা ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত. তাদের সংগঠনের নাম মুসলিম উম্মাহ আমেরিকা। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের যারা আমেরিকা ও কানাডায় আছেন তাদের উদ্যোগেই এ সংগঠনটি গড়ে উঠেছে। তারাও প্রতি বছর গ্রীষ্মের মৌসুমে বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। বাংলাদেশ থেকে কোন একজন নেতাকে এতে অতিথি হিসেবে যেতে হয়। আমিও কয়েকবার তাদের বার্ষিক সম্মেলনে গিয়েছি।

আমার আমেরিকা সফরের প্রস্তুতি

আগস্টের ৩০ তারিখে (১৯৭৩) আমাকে আমেরিকা রওয়ানা হতে হবে। সম্মেলনের বক্তব্য লিখিত আকারে তৈরি করতে লাগলাম। এর মধ্যে লিস্টার থেকে ফোন আসলো। ঐ প্রান্ত থেকে যিনি কথা বললেন, তিনি জনাব আনীস আহমদ, বর্তমানে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের অন্যতম নায়েবে আমীর এবং ১৯৩২ সালে মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত মাসিক তারজুমানুল কুরআনের সম্পাদক প্রফেসর খুরশীদ আহমদের ছোট ভাই। তাঁর সাথে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। তিনি আমেরিকায় পিএইচডি ডিগ্রির চেষ্টায় অধ্যয়নরত এবং MSA-এর অন্যতম কর্মকর্তা। তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে সম্মেলন সম্পর্কে জরুরি আলোচনা করতে চান। তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানালাম। পরের দিনই তিনি এলেন।

তিনি বললেন, "আমি পাকিস্তান যাচ্ছি। কয়েক সপ্তাহ বাড়িতে কাটিয়ে MSA সম্মেলনের আগেই আমাকে আমেরিকায় ফিরে যেতে হবে। আমি আমেরিকা থেকে সরাসরি পাকিস্তান না গিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই ইংল্যান্ড আসলাম।" আমি তাকে আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম।

তিনি আমাকে MSA সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দিতে গিয়ে জানালেন, নর্থ-আমেরিকার সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই MSA-এর চ্যাপ্টার আছে। তাদের পরিভাষার শাখাকে চ্যাপ্টার বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সব শহরে এর চ্যাপ্টার আছে। যদিও সংগঠনের নাম মুসলিম স্টুডেন্টস এসোশিয়েশন, শহরের চ্যাপ্টারগুলোতে অছাত্র

www.bjilibrary.com

পেশাজীবী মুসলিমরাও এর সদস্য আছে। ফলে এ সংগঠনটি আমেরিকা ও কানাডার সকল মুসলিমের একটি সর্বজনীন সংস্থা।

MSA-এর বার্ষিক সম্মেলনে ছাত্ররা ছাড়াও মুসলমানরা সপরিবারে বিরাট সংখ্যায় সমবেত হয়। অছাত্রদের দেশব্যাপী আর কোন সংগঠন নেই বলে MSA-কেই Umbrella Organization-এর দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এ কারণেই এবারের বার্ষিক সম্মেলনে এমন একটি বিষয় রাখা হয়েছে, যা ছাত্রদের চেয়ে অভিভাবকদেরই বেশি উপযোগী। বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বের যেসব পরিবার নর্থ-আমেরিকার বিরাট দুটো রাষ্ট্রে বসবাস করছে তাদের সন্তানরা এমন একটি সমাজে গড়ে উঠছে, যা মুসলিম সমাজ নয়। অথচ তাদের অভিভাবকরা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামী মূল্যবোধকে সন্তানদের মধ্যে চালু দেখতে অত্যন্ত আগ্রহী।

আনিস সাহেব আরও বললেন, "এ সম্মেলনে আপনাকে প্রধান অতিথি হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। তাই আলোচ্য বিষয়টি যাতে আপনার আলোচনায় যথাযথ গুরুত্ব পায় সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যেই আমাকে আপনার সাথে সাক্ষাতের দায়িত্ব MSA-এর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে।"

আমি আন্তরিক শুকরিয়া জানিয়ে বললাম, আমেরিকা ও কানাডায় মুসলিম পরিবারের সন্তানদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধের যে সংকট সৃষ্টি হয়েছে এ বিষয়ে আমার কোন ধারণাই ছিলো না। আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে সঠিক ধারণা পাওয়ায় বিষয়টি যথাযথরূপে উপস্থাপন করায় যথেষ্ট সহায়ক হবে।

আনিস আহমদ সাহেব আমার হাতে শিকাগো বিমানবন্দরে পৌছার টিকেট দিলেন। আমার একটি ফটো চেয়ে নিয়ে বললেন, বিমানবন্দরে এক ইরাকী পিএইচডি'র ছাত্র আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবেন, এ ফটো তাঁর কাছেই পাঠাচ্ছি।

আনিস সাহেব পরবর্তীতে ডক্টরেট ডিগ্রি হাসিল করেন। বর্তমানে তিনি ইসলামাবাদ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। বছর দুই আগে তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রামের এক প্রোগ্রামে এসেছিলেন এবং ফেরার পথে আমার বাড়িতেও এসেছিলেন।

বর্তমানে নর্থ-আমেরিকা Umbrella Organization

১৯৭৫ সালে আমেরিকার সকল ইসলামী ও মুসলিম সংগঠন মিলে নতুন একটি Umbrella Organization গড়ে তোলে। এর নাম রাখা হয় ISNA (Islamic Society of North America)। এটাকে সকল ইসলামী সংগঠনের বিরাট এক ফেডারেশন বলা হয়। এর সাথে সম্পর্কিত যত সংস্থা ও সংগঠন আছে তাদের শাখা বা চ্যাপ্টার বিভিন্ন শহরে আছে এবং তাদের কাজ সারা বছরই চলে। কিন্তু ISNA একটি কেন্দ্রীয় ফেডারেল প্রতিষ্ঠান। এ নামে কোন শাখা কোথাও নেই। এর প্রয়োজনও নেই। সকল সংগঠনই এর প্রাণশক্তি। ISNA বার্ষিক এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। এ ছাতার ছায়াতলে হাজার হাজার পরিবার নিজের খরচে সম্মেলনস্থলে হোটেল ভাড়া ও ডেলিগেট ফি দিয়ে সমবেত হয়। এটাকে আমেরিকা ও কানাডায় বসবাসরত বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মুসলমানদের এক বিশাল মেলা বা মিলনক্ষেত্র বলা যায়।

www.bjilibrary.com

১৯৯৯ সালের জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে ISNA-এর ২৪তম বার্ষিক সম্মেলনের একটি অধিবেশনে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়। তিন দিনে তিনটি প্রধান অধিবেশনের প্রত্যেকটিতেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় এবং আলাদা আলাদা প্রধান অতিথি থাকে।

২০০১ সালের আগস্টের শেষ দিকে জামায়াতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক সফরে আমাকে আমেরিকা যেতে হয়। আমার সফরের খবর জানতে পেরে ISNA অতিথি বক্তা হিসেবে দাওয়াত দেয়। এটা ছিলো তাদের ২৬তম বার্ষিক সম্মেলন।

সম্মেলনের মূল কয়েকটি অধিবেশন প্রধান হলে অনুষ্ঠিত হয়। এ বিশাল হল ছাড়া আরও অনেক বড় কামরায় অন্য সময় বিভিন্ন সংগঠন তাদের পৃথক সম্মেলন করে নেয়। তাছাড়া অন্য অনেক বিষয়ে একই সাথে বিভিন্ন হলে আলোচনা হয়।

১৯৭৫ সালের পূর্বে MSA-কেই Umbrella Organization-এর ভূমিকা পালন করতে হয়। ISNA কায়েম হবার পরে MSA শুধু ছাত্রদের সংগঠন এবং ISNA ফেডারেশনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

ইংল্যান্ডে দুটো সম্মেলনে যোগদান

আমার আমেরিকা সফর ছিলো আগস্টের একেবারে শেষ দিকে। ইংল্যান্ডে আগস্টের ৩ থেকে ৫ এবং ২৫ থেকে ২৭ তারিখে দুটো সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদান করতে হয়।

Fosis Conference

ইংল্যান্ডের সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই ছাত্রসংসদ আছে, যার সাথে সকল ছাত্রই জড়িত। এছাড়াও মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ছাত্রদের আলাদা আলাদা সোসাইটি রয়েছে। মুসলিম ছাত্রদের সংগঠনের নাম ইসলামী সোসাইটি। ছাত্র সংসদের ফান্ড থেকে এসব সোসাইটি ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে আর্থিক বরাদ্দও পেয়ে থাকে। এসব সোসাইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত। Fosis এসব সোসাইটির ফেডারেশন (Federation of Students Islamic Societies) ৩ থেকে ৫ আগস্ট তাদের বার্ষিক সম্মেলন ম্যানচেস্টার ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় মনে পড়ছে না। আমি অতিথি বক্তা হিসেবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করি।

U.K. Islami Mission

অখণ্ড পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর সাথে সংশ্লিষ্ট লোকদের উদ্যোগেই উক্ত নামে সংগঠনটি গড়ে উঠে। তারা লিস্টারে তাদের বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেন। এ সংগঠনটি জামায়াতের সাথে ঘনিষ্ঠ বলে মূল আলোচ্য বিষয়ে বক্তব্য রাখার পরও তাদের সাংগঠনিক বৈঠকাদিতেও আমাকে অংশগ্রহণ করতে হয়। বহু সাংগঠনিক প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া ও সংগঠনকে মযবুত করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

www.bjilibrary.com

১৪০.

আমেরিকা পৌঁছলাম

১৯৭৩ সালের ৩০ আগস্ট রাতে লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দর থেকে আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা হই। পরদিন ৩১ আগস্ট সকালে শিকাগো বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এ বিমানবন্দরটি বিশ্বের বৃহত্তম ও ব্যস্ততম বিমানবন্দর বলে খ্যাত।

ইমিগ্রেশন অফিসার জানতে চাইলো যে, কতদিনের ভিসা চাই। আমি এক মাসের মেয়াদ চাইলাম। পাসপোর্টে দু'মাসের ভিসা লাগিয়ে দিলো।

আমার একটি সুটকেস ও হাতব্যাগ ছিলো। লাগেজ চেকিং পয়েন্টে সুটকেস খুলে দেখলো। হাতব্যাগে কিছু আঙ্গুর ও দুটো কমলা ছিলো। পথে খাবার পর এটুকু অতিরিক্ত বলে খেতে পারিনি। ওরা ফলগুলো নিয়ে নিলো। আমি রসিকতা করে হাসতে হাসতে বললাম, "ফলগুলো তোমাদের পছন্দ হয়ে গেলো?" হেসে জওয়াব দিলো, "আমাদের দেশে পরিকল্পনার বাইরে কোন বিদেশী ফলের চারা গজাতে দেই না।" এ ব্যাপারে তাদের সচেতনতায় মুগ্ধ হলাম।

আমার সুটকেসটি ট্রলিতে নিয়ে সংরক্ষিত এলাকার বাইরে যাওয়ার সাথে সাথেই এক সুদর্শন দীর্ঘদেহী যুবক এগিয়ে এসে হাত মিলিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বললেন, Are you Profeser Gholam Azam? Yes, please. বলার সাথে সাথে জড়িয়ে ধরে গালে গাল লাগিয়ে আলিঙ্গন করলেন এবং ট্রলিটি আমার হাত থেকে নিয়ে গাড়ির দিকে এগুলেন। একটা ভাড়া করা ট্যাক্সিতে উঠালেন। গাড়িতে বসে পরিচয় দিলেন। বাড়ি তার ইরাক। পিএইচডি করছেন। ইখওয়ানুল মুসলিমূনের কর্মী। ওস্তায মওদূদীকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। আবেগের সাথে গাড়িতেই হাত মিলালাম। ইসলামী আন্দোলনের সাথী ভাই হিসেবে বরণ করে নিলাম।

আমার বিস্তারিত পরিচয় জানতে চাইলেন। বললাম, ছাত্রজীবনে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের পদাধিকারী ছিলাম। কর্মজীবনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলাম। ওস্তায মওদূদীর ইসলামী সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর দাওয়াত আমাকে ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে টেনে নিলো। '৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তান প্রদেশে জামায়াতের আমীর ছিলাম। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। বাংলাদেশ সরকার আমার জন্মসূত্রে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব বাতিল করায় আমি বাধ্য হয়ে লন্ডনে নির্বাসন জীবনযাপন করছি।

তিনি জানতে চাইলেন, আমার পরিবার কোথায়? বললাম, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আমার পিতার বাড়িতেই আছে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছি জেনে তিনি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন।

শিকাগোতে আমার অবস্থান

ইতোমধ্যে গাড়ি একটি ছোট্ট বাড়ির সামনে এসে থামলো। তিনি গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, এ বাড়িতেই আমি থাকি। নিজেই সুটকেসটি তুলে ঘরে ঢুকলেন। একটা ছোট্ট কামরায় আমাকে উঠালেন। বাথরুম দেখিয়ে দিলেন। বললেন, আমি

www.bjilibrary.com

অত্যন্ত দুঃখিত, আপনাকে একা রেখেই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে। আসতে আসতে ৩টা বেজে যাবে। ডাইনিং টেবিল দেখিয়ে বললেন, আমার স্ত্রী দুপুর ১টায় টেবিলে খানা রেডি করে রাখবে। আপনি খেয়ে আরাম করতে থাকুন। বিকেল চারটায় আপনাকে নিয়ে MSA-এর স্থানীয় চ্যাপ্টারের ভাইদের সাথে মিলিত হবো।

বেলা তখন ১১টা। আমি একটু দম নিয়ে ১২টার সময় গোসল করতে গেলাম। পৌনে একটায় যোহরের নামায পড়ে সোয়া একটায় খাবার টেবিলে গিয়ে সবজি ও মুরগি দিয়ে তৃপ্তির সাথেই রুটি খেলাম। দুটো বাজার আগেই শুয়ে পড়লাম। সাড়ে তিনটায় উঠে টের পেলাম যে, মেজবান তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে খাচ্ছেন। চারটার আগেই আমি তৈরি হয়ে রইলাম।

আসরের সময় তখনো হয়নি। ঠিক চারটায় মেজবান আমার রুমে এলেন। জানালাম যে, আমি প্রস্তুত। তিনি সোয়া চারটায় আমাকে নিয়ে বের হলেন। গাড়িতে বসে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললেন, আমি খুব লজ্জিত যে, মেহমানকে একা ফেলে চলে যেতে হলো। খাবার সময় হাজির থাকতে পারলাম না। বললাম, আমার সামান্য অসুবিধাও হয়নি। আপনার বেগমের পাকানো মজাদার খানা তৃপ্তির সাথে খেয়েছি।

আমরা এক বাসায় পৌঁছে ৮/১০ জন লোককে সমবেত পেলাম। এক প্যালেস্টাইনি ভাই এ বাসায় সপরিবারে থাকেন। পেশায় তিনি ডাক্তার। হাসপাতালে কর্মরত। আসরের নামায জামাআতে আদায় করলাম। মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও আমাকেই ইমামতি করতে বাধ্য করা হলো। নামাযের শেষে আমার সাথে তাদের পরিচয় হলো। বেশির ভাগই ছাত্র। বিভিন্ন দেশের নাগরিক। কোন্ কোন্ দেশের তাও মনে নেই। এটুকু মনে আছে যে, কয়েকজন আরব ও একজন ভারতীয়।

পরিচয় ও কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনজন ছাড়া সবাই সম্মেলনের আয়োজনে দায়িত্ব পালনের জন্য চলে গেলেন। এ তিনজনের একজন ঐ ইরাকি ভাই, যার বাসায় উঠেছি। ঐ প্যালেস্টাইনি ভাই, যার বাসায় বসেছি এবং তৃতীয় জন বোম্বের ভাই শফি প্যাটেল। এ একজনের নামটাই মনে আছে। আমি আফসোস করি যে, বহু দেশের যেসব দীনী ভাইয়ের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে, তাদের নাম নোট করে রাখিনি। মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এ তিন ভাইয়ের সাথে আলাপ-সালাপ চলে। মাগরিববাদ চা-নাশতার আসর বসলে ঐ তিন ভাইয়ের মধ্যে আমাকে নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। আমার রাতযাপনের স্থানই বিতর্কের বিষয়। প্যালেস্টাইনি ভাই-এর দাবি হলো, আমাকে তার বাসায়ই থাকতে দিতে হবে। শফী ভাই দাবি করলেন যে, আমি তাঁরই উপমহাদেশের লোক। উর্দু ভাষায় ভাবের আদান-প্রদান করার জন্য আমাকে তাঁরই বাসায় নিয়ে যাবেন। ইরাকি ভাই তীব্র আপত্তি জানিয়ে বললেন, তিনি আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু মেহমানদারি করার সুযোগ পাননি। তাই তাঁর বাসায় না থাকলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।

তাদের বিতর্ক আমি উপভোগ করছি আর ভাবছি, দেশে নিজের বাড়িতে যেতে পারছি না, বিদেশেও নিজস্ব কোন ঠিকানা নেই। আল্লাহ তাআলা এতো ঠিকানা যোগাড় করেছেন যে, আমার থাকার জায়গা দেবার জন্য প্রতিযোগিতা চলছে। তিনজনের সবাই তাদের দাবিতে অনড়। শেষ পর্যন্ত আমার উপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব দিলেন।

www.bjilibrary.com

আমি বললাম, ইরাকি ভাইয়ের বাসায় একবেলা বেড়ালাম। শফি ভাই ও আমি প্রতিবেশী দেশের লোক এবং জামায়াতে ইসলামীর ভাই। প্যালেস্টাইনি ভাই নিজের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত। আমার অবস্থাও অনুরূপ। নির্বাসিত হিসেবে আমাদের সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হয়েছে। দীনী ভাই হিসেবে সবাই সমান হলেও এ দিক দিয়ে আমাদের দু'জনের অতিরিক্ত মিল রয়েছে। তাই প্যালেস্টাইনি ভাইয়ের হকই বেশি। প্যালেস্টাইনি ভাই আমাকে আবেগের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অপর দু'ভাই রসিকতা করে বললেন, আমরা দুর্ভাগ্যবশত নির্বাসিত নই বলে বঞ্চিত হলাম।

আমাদের গ্রামাঞ্চলে প্রবাদ আছে, "নি-নাইয়্যার সব নাও।" মানে যার কোন নৌকা নেই, সব নৌকা তার। যেটাতে উঠার সুযোগ পায় সেটাই তার। তখনকার আমার অবস্থা অনুরূপই বলা চলে।

নাশতার পর ইরাকি ভাইয়ের বাসায় আমার সামান গুছিয়ে নিতে গেলাম। বিদায়ের সময় হেজাব অবস্থায় ইরাকি ভাইয়ের স্ত্রী সালাম জানিয়ে দুঃখ প্রকাশ করলেন যে, মেহমানদারি করার সুযোগ পেলেন না। আমি তাঁদের মেহমানদারির শুকরিয়া জানিয়ে বিদায় হলাম এবং প্যালেস্টাইনি ভাইয়ের বাসায় মেহমান হলাম।

MSA সম্মেলন

পয়লা সেপ্টেম্বর (১৯৭৩ সাল) মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস MSA-এর ১১তম বার্ষিক সম্মেলন শুরু হলো। বিশাল হলে বিরাট সম্মেলনের আয়োজন। MSA তখন Umbrella Organization হিসেবে ভূমিকা পালন করায় ছাত্র ও অছাত্র মিলে প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হয়। অনেকে সপরিবারে এসেছেন। হলে মহিলাদের আসন আলাদা রাখা হয়।

সকাল ১০টায় উদ্বোধনী অধিবেশনে MSA-এর সভাপতির ভাষণ, বার্ষিক রিপোর্ট, অতিথি বক্তাদের পরিচিতি, শিকাগোর মেয়রের স্বাগত ভাষণ, বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের বাণী পাঠ করে শোনানো ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করা হয়।

সম্মেলনের Theme সম্পর্কে দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনা হওয়ার কথা। বিকেলে এ অধিবেশন শুরু হলো। সভাপতিত্ব করেন MSA-এর প্রেসিডেন্ট। মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে প্রধান অতিথির ভাষণ দেবার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয়। আলোচ্য বিষয় ঃ Education and the maintenance of social values in the changing society.

বিষয়টির উপর আমি প্রবন্ধাকারে আমার বক্তব্য তৈরি করলেও সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করে না শুনিয়ে বক্তৃতার আকারেই বিষয়টি পেশ করি। আমার অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, বক্তা ও শ্রোতার সঠিক সম্পর্ক প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে গড়ে উঠে না।

প্রবন্ধ পাঠ করা হলে প্রবন্ধের সাথে শ্রোতাদের সম্পর্ক হয়। বক্তা নেপথ্যে পড়ে থাকে। বক্তৃতা করলে সর্বক্ষণ শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়িয়ে বক্তব্যের বিভিন্ন পয়েন্টে পরিবেশিত যুক্তির পক্ষে শ্রোতাদের সমর্থন অর্জন করা অধিকতর সহজ হয়। প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখা সহজ নয়। এ বিষয়ে আমার সাথে সবার একমত হওয়া জরুরি নয়।

www.bjilibrary.com

আমি ভূমিকায় বিষয়টির গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করি। যে সমস্যার সমাধান তালাশ করার উদ্দেশ্যে বিষয়টি বাছাই করা হয়েছে, সে সমস্যার রূপ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে এক রকম এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় অন্য রকম। সমস্যার রূপ ব্যাখ্যা করার সময়, বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকায় বসবাসরত মুসলিম পরিবারকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা তুলে ধরার সময় শ্রোতাদের ভাবভঙ্গি ও সমর্থনসূচক মৃদু আওয়াজ থেকে আমি অনুভব করলাম যে, তারা আমার সাথে একমত শুধু নয়; তারাই আসল ভুক্তভোগী।

এ সমস্যার সমাধান মুসলিমপ্রধান দেশে যেভাবে করা সম্ভব তা সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। কারণ সম্মেলনের ডেলিগেটদের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ থেকেই এসেছেন এবং তাদের নিজ নিজ দেশে এ সমস্যার সমাধানের চিন্তা-ভাবনা তাদের মধ্যেও জাগ্রত রাখা প্রয়োজন। সেখানে সরকারি প্রচেষ্টায় আইনের মাধ্যমে, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার করে ও গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সমাধানের চেষ্টা করা সম্ভব। কিন্তু ইউরোপ-আমেরিকায় বসবাসরত মুসলিমদের পক্ষে ঐ তিন মাধ্যমের কোনটাই প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তাই আমার বক্তৃতার প্রধান আলোচ্য হলো, অমুসলিম দেশে বসবাসরত মুসলিমদের সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কী কী করণীয় হতে পারে।

প্রধান করণীয় : যারা অমুসলিম দেশে ভিন্ন এক পরিবেশে বসবাস করা সত্ত্বেও ইসলামী জীবনাদর্শে বিশ্বাসী এবং ইসলামী সামাজিক মূল্যবোধের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন তাদেরকে সুসংগঠিত হতে হবে। সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে অমুসলিম সমাজে বিলীন হয়ে যাবেন।

মুসলিম সংগঠনের ৬ দফা কর্মসূচি থাকতে হবে

১. সংগঠনভুক্ত নারী-পুরুষ সবাইকে ঈমান, ইল্‌ম ও আমলের দিক দিয়ে সত্যিকার মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। সংগঠনকে এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতে হবে।

২. বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে আগত ছাত্র ও অছাত্র সবার নিকট দীনের দাওয়াত ব্যাপকভাবে পৌঁছাবার মাধ্যমে তাদেরকে সংগঠনভুক্ত করতে হবে। আমার ধারণা যে, এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা MSA এমনি ধরনেরই একটি ইসলামী সংগঠন। এ সম্মেলনে যারা ডেলিগেট হিসেবে হাজির হয়েছেন তারা যদি সবাই এ সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং যারা সম্মেলনে আসেননি তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাতে থাকেন, তাহলে প্রবাসী মুসলিমদের বিরাটসংখ্যক লোক সংগঠনভুক্ত হবার প্রেরণা লাভ করবে।

৩. এ সম্মেলনে যাদের স্ত্রী ও সন্তানগণ উপস্থিত হয়েছেন তারা ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের সাথে তিন দিন এক সাথে যে পরিবেশে থাকার সুযোগ পেলেন এমন সুযোগ সারা বছর পাওয়া সম্ভব নয়। তাই MSA-এর চ্যাপ্টার যদি সর্বত্র কায়েম হয় তাহলে সাপ্তাহিক বৈঠক ও মাসিক সমাবেশে অন্তত কয়েক ঘণ্টা ইসলামী পরিবেশে কাটাবার সুযোগ পাবে। বিভিন্ন রকম সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যে নিজস্ব সামাজিক পরিবেশ গড়ে তুলতে পারলে সন্তানরা অমুসলিম সমাজের পরিবেশে যাওয়া পছন্দ করবে না এবং এর ফলে তাদের প্রভাব থেকেও আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে।

www.bjilibrary.com

৪. সংগঠনকে পরিবার গঠনের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারই সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। পিতা-মাতা যদি ঈমান, ইল্‌ম ও আমলে সত্যিকার মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাদের সন্তানদেরকে মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। শত বিরূপ পরিবেশেও নিষ্ঠা, হিকমত ও মহব্বতের সাথে প্রচেষ্টা চালালে সন্তানদেরকে সমাজের কুপ্রভাব থেকে রক্ষা করা সম্ভব। পারিবারিক পরিবেশে যদি সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে পরিবারের বাইরেও এর প্রভাবে আত্মরক্ষার সৎ সাহস পাবে।

৫. মুসলিম নামে পরিচিত এমন অনেক লোক আছে, যাদের চরিত্র অমুসলিমদের চেয়েও নিম্নমানের। তাদের কারণে ইসলামের সুনাম বিনষ্ট হচ্ছে। তাই মুসলিম নামধারী সবাইকে সত্যিকার মুসলিম বানাবার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাদেরকে বুঝাতে হবে যে, তাদের কারণে আল্লাহর মহান দীনের সুনাম যাতে ক্ষুণ্ন না হয়।

৬. প্রবাসী মুসলিমরা যদি সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় উন্নতমানের মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠতে সক্ষম হন তাহলে তাদের চারিত্রিক ও নৈতিক প্রভাব স্থানীয় লোকদের মধ্যেও পড়বে। আপনাদের সহপাঠী ও সহকর্মীরা যদি আপনাদের মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুণাবলি দেখতে পায় তাহলে তারা অবশ্যই আকৃষ্ট হবে এবং তাদের নিকটও দীনের দাওয়াত দেবার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সত্যবাদিতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা, ওয়াদা পালন, সহানুভূতি, মিষ্ট ব্যবহার, সহযোগিতা ইত্যাদি গুণে মানুষ আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এসব ইসলামেরই শিক্ষা। এসব গুণাবলিতে সমৃদ্ধ চরিত্র দীনের মৌখিক দাওয়াতের তুলনায় অনেক শক্তিশালী দাওয়াতী হাতিয়ার। বক্তৃতা চলাকালে শ্রোতাদের থেকে যে সাড়া অনুভব করেছি তা আমাকে অত্যন্ত উৎসাহিত করেছে। তারা যেন তাদের মনের কথাই আমার মুখে শুনতে পেরেছে বলে আমার ধারণা হলো।

বক্তৃতার পর লিখিত কতক প্রশ্ন থেকেও আমার তৃপ্তিবোধ হলো যে, আলোচ্য বিষয়টির গুরুত্ব প্রশ্নকারীরা অনুভব করতে সক্ষম হয়েছেন। বিষয়টি তাদের বাস্তব জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বলেই তারা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আলোচনা শুনেছেন।

সম্মেলনের ডেলিগেটদের সাথে পরিচয়

অধিবেশন মুলতবি হবার পর অন্যান্য অতিথি ও ডেলিগেটদের অনেকে এসে হাত মিলালেন। নামাযের স্থানে, খাওয়ার সময়, হাঁটাচলার সময় অনেকের সাথে পরিচয় হয়। বক্তৃতার পর আমাকে তো সবাই চেনেন। তাই দেখা হলে হাত বাড়িয়ে নিজের পরিচয় দেন। বহু দেশের লোকের সাথেই দেখা হলো। বাংলাদেশের একজন মাত্র পেলাম, যিনি কুষ্টিয়ায় জামায়াতের রুকন ছিলেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার জনাব আফসারুদ্দীন আহমদ। তার ছেলে আমেরিকায় থাকায় তিনিও সেখানে চলে যান। বেশ বয়স্ক লোক। কয়েক বছর পর দেখা হলো। তিনি কুষ্টিয়া শহরে তার বাড়িটিকে একটি মহিলা মাদরাসা স্থাপন করার জন্য দান করে যান।

আর একজন বাংলাদেশী এসে আমার সাথে পরিচয় করে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেই তার বাসায় নিয়ে গেলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

সপরিবারেই থাকতেন। তিনি অর্থনীতিবিদ ড. আবদুল মান্নান। পূর্বে দেখা না থাকলেও তার একটা বইয়ের কারণে নামটা ভালোভাবেই জানতাম। লাহোরস্থ আশরাফ পাবলিকেশন্স থেকে আমি বইটির নামে আকৃষ্ট হয়ে কিনেছিলাম। বইটির নাম হল, Interestless Banking. সুদ সম্পর্কে মাওলানা মওদূদীর বই পড়ার কারণে এ বইটির প্রতি আমার আকর্ষণ জন্মে।

তখন থেকেই তার সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ বোধ করি। জেদ্দাস্থ ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন। সৌদি আরব গেলে তার সাথে দেখা হতো।

বেশ কয়েক বছর হলো তিনি ঢাকায়ই আছেন। তিনি সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের উদ্যোক্তা। এ ব্যাংকের চেয়ারম্যান পদেও অনেক দিন ছিলেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাঝে মাঝে দেখা হয়ে যায়। দেখা হলেই বলেন, আমি আপনার কাছে এক সময় যাবো।

সম্মেলন শেষে আমেরিকা ভ্রমণ

সম্মেলনের যে অধিবেশনে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম, এর পরের অধিবেশনগুলোতে আমার উপর কোন দায়িত্ব না থাকলেও মেহমানদের সাথে আমাকে মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হতো। ফলে বক্তাদের আলোচনা শোনা এবং ফাঁকে ফাঁকে মতবিনিময় করার সুযোগ পেতাম।

MSA-এর পক্ষ থেকে আমাকে এক মাসের একটা প্রোগ্রাম পেশ করে বলা হলো, সম্মেলনে আপনার বক্তৃতায় দাওয়াত ও সংগঠনের যে গুরুত্ব পেশ করেছেন, তাতে তারা খুব উৎসাহ বোধ করেছেন। তাই তারা আমাকে আমেরিকা ও কানাডার সর্বত্র MSA-এর চ্যাপ্টারসমূহে নিয়ে যেতে চান, যাতে দাওয়াতের সম্প্রসারণ ও সাংগঠনিক অগ্রগতি ও মযবুতি লাভ করা যায়। তারা বললেন, আপনি তো দেশে দাওয়াত ও সংগঠনে জীবন কাটিয়েছেন। এখন যদি আপনি সময় দিতে পারেন, তাহলে আপনার নিকট থেকে এ খিদমত নিতে চাই।

৩ সেপ্টেম্বর (১৯৭৩ সাল) সম্মেলন শেষ হলো। তাদের প্রস্তাব আমি পছন্দই করলাম। তবে এক মাস সময় দেওয়া সম্ভব নয় বলে জানালাম। সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমাকে কুয়েত যেতে হবে এবং এর আগে লন্ডনে এক সপ্তাহ থাকতে হবে। তাই ১৫ দিনের প্রোগ্রাম তৈরি করতে বললাম। তারা ৭টি চ্যাপ্টারে নিয়ে যাবার প্রোগ্রাম বানালেন। আমেরিকার পূর্ব মাথায় নিউইয়র্ক থেকে পশ্চিম মাথায় লস এঞ্জেলেস পর্যন্ত সফর প্রোগ্রাম করা হলো। মাঝখানে ওয়াশিংটন, ডেট্রয়েট, বালটিমোর, সেক্রামিন্টু ও সানফ্রান্সিসকো।

এ সফর রীতিমতো একটা সাংগঠনিক সফর। জীবনভর এ কাজই করলাম। ঢেঁকি পেয়ে তারাও এ কাজ করিয়ে নিলেন। আমার কাছে বেশ ভালোই লাগলো। ইংরেজি ভাষায় দীনের দাওয়াত দেবার সুযোগ ইতঃপূর্বে পাইনি। এবার এ অভিজ্ঞতাও হয়ে গেলো। সফরের শেষ স্টেশন ছিলো নিউইয়র্ক। গোটা সফরে কোথাও আমাকে হোটেলে রাখা হয়নি। কারো না কারো বাসায়ই পারিবারিক পরিবেশে রয়েছি। আন্তরিক মহব্বত উপভোগ করেছি। দীনের ভিত্তিতে মহব্বতের কোন তুলনাই হয় না। যাদের সাথে কোন সম্পর্কই ছিলো না, তাদের আন্তরিক ভালোবাসা গোটা সফরেই আমাকে অভিভূত করে রেখেছে।'

www.bjilibrary.com

১৪১.

নিউইয়র্কে তিন দিন

আমেরিকায় ১৯ দিনব্যাপী সফরের পর তিন দিন সে দেশের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কে ছিলাম। পাকিস্তানি জামায়াত কর্মী জনাব আবদুল হামীদ ডুগরের বাসায় উঠলাম। ডুগর সাহেব ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় বলেই দীনী ভাই হিসেবে সকল খিদমত করেছেন। আমি শুকরিয়া আদায় করলে তিনি বলেন, এটুকু সামান্য খিদমত না করলে দীনী সম্পর্কের দাবি পূরণ হতে পারে না।

নিউইয়র্কে MSA-এর প্রোগ্রাম প্রথম দিনের সন্ধ্যায়ই সমাপ্ত হয়ে যায়। এরপর আমাকে তারা ডুগর দম্পতির দায়িত্বেই ছেড়ে দেন। ডুগর সাহেব আমাকে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে নিয়ে যান। 'ইউনাইটেড নেশনস'-এর বিভিন্ন তথ্যসংবলিত বেশ কিছু পুস্তিকা ও ফোল্ডার নিলাম। বিশাল বিল্ডিং-এর অনেক ছোট-বড় হল ও কামরা দেখলাম, যেখানে জাতিসংঘের কার্যক্রম চলে।

আমাকে Natural Science Museum দেখানো হলো, সকল রকমের পশুর আসল চামড়ায় মোড়ানো অবস্থায় কঙ্কালকে এমন নিপুণতার সাথে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় জীবন্ত পশুর মতোই হৃষ্ট-পুষ্ট, সতেজ ও সবল অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখগুলো এমন যে, মনে হয় দেখতে পাচ্ছে। আল্লাহ নিজেকে সকল স্রষ্টার সেরা (আহসানুল খালিকীন) বলেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে অনেক প্রাণীকেই সৃষ্টি করার যোগ্যতা দান করেছেন। মৌমাছি কত নিপুণভাবে মৌচাক বানায়। বাবুই পাখি কত শৈল্পিকভাবে খড়ের ঝুলন্ত বাসা বানায়। মানুষকে তিনি উৎকর্ষতার সাথে হাজারো জিনিস বানাবার যোগ্যতা দিয়েছেন। উক্ত মিউজিয়ামে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করলাম।

কালো মুসলিমদের সংগঠন

আমার নিউইয়র্ক অবস্থানকালেই ইসলামী পার্টি নামে কালো মুসলিমদের এক সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়। পার্টির হেড কোয়ার্টারের নাম রাখা হয়েছে মুসলিম উম্মাহ। সেখানকার মসজিদটির নামও উম্মাহ মসজিদ। ইসলামী পার্টির প্রেসিডেন্ট মুজাফফরুদ্দীন আবদুল হামীদ।

দাওয়াতে হাজির হলে প্রেসিডেন্ট আমাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন, "মাওলানা মওদূদীর Towards Understanding Islam বইটি পড়ে আমি সর্বপ্রথম ইসলাম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই। আগেই আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি এবং কুরআনের ইংরেজি ব্যাখ্যা থেকে শেখার চেষ্টা করে আসছি। মাওলানার বইটি পড়ে আমি তাঁর সাথে দেখা করার তীব্র বাসনা অনুভব করে লাহোর গেলাম। মাওলানার সান্নিধ্যে কিছুদিন ছিলাম। আমার জীবনের সেরা অর্জন তাঁর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক। ইংরেজিতে তাঁর লেখা কমই অনুবাদ হয়েছে। যে কয়টা পাওয়া গেলো তা নিয়ে এলাম। মাওলানার কুরআনের ব্যাখ্যার ইংরেজি পেলে ধন্য হতাম।

www.bjilibrary.com

লাহোর থেকে ফিরে এসে মাওলানার হেদায়াত অনুযায়ী ইসলামী সংগঠন গড়ে তুলবার উদ্যোগ নিলাম। 'জামায়াতে ইসলামী' নামেরই ইংরেজি হলো ইসলামী পার্টি। তাই এ নামই রাখলাম। আগে যারা মুসলিম হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে পেলাম তাদেরকে নিয়েই সংগঠন শুরু করলাম। আল্লাহর রহমতে আমাদের চেষ্টায় নওমুসলিমের সংখ্যা বাড়ছে। ঐ বইটিই আমাদের প্রধান হাতিয়ার। বইটি এমন মৌলিক জ্ঞান দান করে, যার ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হই।

আপনাকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা সংগঠন করতে গিয়ে অনুভব করছি যে, এ কাজটি হাইলি টেকনিক্যাল। আমরা হিমশিম খাচ্ছি।

আমরা অত্যন্ত প্রেরণাবোধ করছি যে, আল্লাহর সেরা নিয়ামত হিসেবে আমরা ইসলামকে পেয়েছি। আমাদের পূর্বপুরুষরা সাদা চামড়াওয়ালাদের দাস ছিলেন। বর্তমানে দাস শব্দে আমাদেরকে সম্বোধন করা না হলেও আমরা তাদের নিকট মানুষ হিসেবে কোন মর্যাদা পাই না। সাদাদের সাথে আমাদের ছেলে-মেয়েরা এক ক্লাসে বসার অনুমতি পায় না। সাদাদের রেস্টুরেন্টে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। ট্রেনে-বাসেও আমাদের পাশে সাদারা বসে না। আমরা না বসে দাঁড়িয়ে থাকলে তারা তৃপ্তিবোধ করে। পার্কেও সর্বত্র আমরা যাতায়াত করার অনুমতি পাই না।.

ইসলাম আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সবার সমান মর্যাদা দিয়েছে। আমাদের মধ্যে কোন হীনম্মন্যতা নেই। আমরা আত্মসম্মানবোধে সমৃদ্ধ। আমরা সাদাদেরকেও ইসলামের দাওয়াত দেই এবং তাদেরকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা লাভের পথ দেখাই।

কিন্তু সাংগঠনিক 'টেকনিকেলেটিজ' সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে। এ বিষয়ে জরুরি হেদায়াত পাওয়ার আশা নিয়ে আপনাকে দাওয়াত দিয়েছি। যারা সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করেন তাদের সামনে আপনি এ বিষয়ে বক্তব্য রাখলে আমরা তা শুনবো এবং টেপরেকর্ড করে রাখবো। প্রয়োজনবোধ করলে আমরা প্রশ্ন করেও জেনে নেবো।

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে তার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। মনে মনে খুশি হলাম যে, আমার সাংগঠনিক তৎপরতা বিদেশেও চালু আছে।

ইসলামিক পার্টির সাংগঠনিক বৈঠক

প্রেসিডেন্ট আমাকে উম্মাহ মসজিদের আঙিনায় সমবেত ১৫/২০ জন সাংগঠনিক দায়িত্বশীলদের বৈঠকে নিয়ে গেলেন। এর মধ্যে হেজাব পরা (চেহারা খোলা) অবস্থায় কয়েকজন মাঝ বয়সের মহিলাও ছিলেন। আমাকে যথাস্থানে নিয়ে বসালেন। আমার কথা রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা দেখলাম।

প্রথমেই তাদেরকে ইসলামী পার্টি কায়েম করার জন্য আন্তরিক মুবারকবাদ জানালাম। আল্লাহ তাআলা দীন ইসলাম বিজয়ী করার যে বিরাট দায়িত্ব রাসূল (স)-কে দিয়েছেন তা পালন করার জন্য তাঁকেও সংগঠন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই সংগঠনভুক্ত হওয়া প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। রাসূল (স) সংগঠনবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বলেছেন।

এরপর তাদেরকে বললাম, মাওলানা মওদূদী শুধু ইসলামী চিন্তাবিদই ছিলেন না। তিনি ইসলামী সংগঠক হিসেবে বিরাট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। সংগঠন সম্পর্কিত তাঁর

www.bjilibrary.com

কোন বই ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি। এ সম্পর্কে একটি বই থেকে জরুরি পয়েন্টগুলো আপনাদেরকে জানাচ্ছি। তাঁর বইটির নাম 'ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী'। এতে তিনি লিখেছেন যে, ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের প্রাথমিক পুঁজিই হলো ঃ

১. সংগঠনের কর্মীদেরকে চারটি গুণের অধিকারী হিসেবে গড়ে তোলা।

২. সংগঠনের মধ্যে চারটি গুণ পূর্ণ মাত্রায় বহাল রাখা।

কর্মীদের চারটি গুণের ব্যাখ্যা পেশ করার পর তাদেরকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন থাকলে জিজ্ঞেস করার সুযোগ দিলাম। লক্ষ্য করলাম যে, এক-একটি গুণের আলোচনা শুনে তাঁরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে পারস্পরিক তৃপ্তি প্রকাশ করছেন।

প্রেসিডেন্ট মন্তব্য করলেন, তারা যা শুনছেন তা থেকে তাদের প্রাণের খোরাক পেয়ে তৃপ্ত। আপনার বক্তব্য শেষ হলে কারো প্রশ্ন করার থাকলে করবে। আপনার অবশিষ্ট বক্তব্য শোনার জন্য এরা উৎসুক হয়ে আছে।

আমি সাংগঠনিক চারটি গুণের ব্যাখ্যা শেষ করলে প্রেসিডেন্ট প্রায় লাফিয়ে উঠে বললেন, এবার আমরা আসল মূল্যবান বিষয় জানতে পারলাম। দুটো গুণ আল্লাহর রহমতে আমাদের সংগঠনে বহাল আছে। আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা এবং সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও টিম স্পিরিট, এ দুটো গুণের অভাব নেই। কিন্তু সকল সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট বডিতে পরামর্শ করে গ্রহণ করতে হবে, এ গুণটি পুরোপুরি বহাল নেই। এর গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করলাম। দায়িত্বশীলগণকে ভুল করা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংশোধনের নিয়তে সমালোচনার সুযোগ দান করা একটি চমৎকার গুণ, যা আজ আমরা নতুন করে বুঝলাম। দায়িত্বশীলগণ যদি এ সুযোগ না দেন তাহলে যে সংগঠনে গ্রুপিং সৃষ্টি হওয়া, পারস্পরিক সন্দেহ পোষণ করা এবং গীবতের প্রচলন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তা অত্যন্ত বাস্তব সত্য।

প্রেসিডেন্টের এ মন্তব্যের পর সংগঠন সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নের জওয়াব দিলাম। সবাইকে অত্যন্ত উৎফুল্ল দেখে আমিও তৃপ্তি বোধ করলাম। আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করলাম।

আমি জানতে চাইলাম যে, কর্মীদের ব্যক্তিগত উন্নয়ন ও দাওয়াতী কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয় কি না? তাদের পারস্পরিক দৃষ্টি বিনিময় থেকে বুঝলাম যে, রিপোর্টিং সিস্টেম চালু নেই। তারা এ বিষয়ে জানতে চাইলো। আমি এ সম্পর্কে আলোচনার পর প্রেসিডেন্ট বললেন যে, কর্মীদেরকে গড়ে তুলবার জন্য এ পদ্ধতিটি চালু করতে হবে। তিনি আমাকে রিপোর্টের আইটেমগুলো কোট করে দিতে অনুরোধ করলে আমি তখন তখনই তা করে দিলাম।

কর্মীদের সাপ্তাহিক রিপোর্ট ও অধস্তন শাখা থেকে মাসিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে রিপোর্টকে উন্নত করার ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলাম। বিদায়ের সময় তাদের ভালোবাসার অভিব্যক্তি দেখে আমি রীতিমতো অভিভূত হলাম।

আমেরিকার কালো মুসলমান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এককালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। সেখানকার আদি বাসিন্দাদেরকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দিয়ে জনবসতিগুলো তারা দখল করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকলো। বিশাল দেশ। জমি চাষাবাদ করার আধুনিক যন্ত্র তখন ছিলো না। তারা কৃষি শ্রমিকের অভাব পূরণ করার উপায় তালাশ করতে লাগলো। পশু পালনের জন্য বড়

www.bjilibrary.com

বড় খামার গড়তে হলেও শ্রমিক প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, আফ্রিকায় বসবাসরত আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত মানুষগুলোকে ধরে এনে কৃতদাস হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

দু'শ বছর পর্যন্ত বিশ্বজয়ী তথাকথিত সভ্য ইংরেজ ও ইউরোপীয়রা আফ্রিকায় আক্রমণ চালিয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনকারী মানুষগুলোকে ধরে পশুর মতো জাহাজে তুলে আমেরিকায় নিয়ে যায়। আদম সন্তান হলেও আফ্রিকার অধিবাসীদের গায়ের রঙ গাঢ় কালো। সাদা রঙের লোকেরা তাদেরকে মানুষ মনে করতো না। গৃহপালিত পশু হিসেবেই তাদেরকে কাজে লাগাতো।

কালো নারী-পুরুষ যাদেরকে ধরে আনা হয়েছে, কালক্রমে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলো। জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকার ১৩টি রাষ্ট্র একটি ফেডারেশনভুক্ত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র (ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা-USA) নাম ধারণ করলো এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে ১৭৮১ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করলো।

প্রেসিডেন্ট আবরাহাম লিংকনের সময় ১৮৬৩ সালে আইন করে কৃতদাস প্রথা রহিত করা হয়। গৃহপালিত পশুর মতোই হাটে-বাজারে কালো মানুষদের বেচা-কেনা চলতো। ঐ আইন পাস হবার পর স্বাধীন মানুষ হিসেবে আইনগত স্বীকৃতি পেলেও সামাজিক অঙ্গনে আরও শতাধিক বছর তাদেরকে বর্ণগত বৈষম্যের শিকার থাকতে হয়েছে। বর্তমানে আমেরিকার কালো নাগরিকরা যেটুকু অধিকার ভোগ করছে, তা সাদাদের উদারতার কারণে নয়, কালোরা আইনি স্বীকৃতিকে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমেই নিজেদের অধিকার আদায় করে নিচ্ছে।

বর্তমানে (২০০৩) বাংলাদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ হেরি কে টমাস জুনিয়র ঐ কালো কৃতদাসদেরই বংশধর। তারা নিজেদের যোগ্যতার বলেই বহু ময়দানে অগ্রসর হচ্ছে। ক্রীড়া জগতে তারা অনেক এগিয়ে আছে। মুষ্টিযুদ্ধে তো মুহাম্মদ আলি ক্লে ইতিহাসই সৃষ্টি করেছেন।

অপরাধ জগতে কালোদের অবস্থান

আইনগতভাবে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা পাওয়া সত্ত্বেও সামাজিক স্বীকৃতির অভাবে তারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। স্কুলে তাদেরকে ভর্তি করা হতো না। ভর্তি হলেও সাদারা তাদের সাথে একসাথে ক্লাসে বসতে রাজি হতো না। তাই তারা শ্রমজীবী হয়ে থাকতে বাধ্য হতো। তারা তাদের বস্তি এলাকায় সাদাদের থেকে আলাদা বসবাস করতো। দৈহিক দিক দিয়ে তারা প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হওয়ায় অত্যন্ত সাহসী প্রকৃতি বিশিষ্টও বটে। শিক্ষার অভাবে সভ্যতাবঞ্চিত অবস্থায় বাঁচার তাগিদেই তারা নানা প্রকার অপরাধে লিপ্ত হতো।

'৭৩ সালে আমার আমেরিকার ঐ প্রথম সফরেই এ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করি। এক পাকিস্তানি ডাক্তারের গাড়িতে নিউ জার্সি থেকে নিউইয়র্ক আসার সময় নিউইয়র্ক শহরের নিকটবর্তী এক এলাকায় পৌছবার আগেই ডাক্তার সাহেব আমাকে সতর্ক থাকতে বললেন। ডাক্তার নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি আমাকে জানালা বন্ধ করতে বললেন। কারণ আমরা তখন কালোদের এলাকা পার হবো। দ্রুত গাড়ি চালাতে হবে। একটু সুযোগ পেলেই তারা গাড়ি থেকে জিনিসপত্র লুট করে নিতে পারে।

www.bjilibrary.com

ডাক্তার সাহেব থেকে আরও জানলাম যে, জেলখানায় কালোদের সংখ্যাই বেশি। আরও চমকপ্রদ খবর শুনলাম যে, জেলখানাতেই কালোরা বেশি সংখ্যায় ইসলাম গ্রহণ করছে। জেল কর্তৃপক্ষ চায় যে, কালো কয়েদিদের মধ্যে ইসলাম প্রচারকরা যেয়ে তাদেরকে মুসলিম বানাক। কারণ যারা মুসলিম হয় তারা কিছুদিনের মধ্যেই ভদ্র হয়ে যায়। যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির তারাও মুসলিম হওয়ার পর সম্পূর্ণ বদলে যায়।

জেলে আইন-শৃঙ্খলা বহাল রাখার প্রয়োজনে জেল কর্তৃপক্ষ ইসলাম প্রচারকদেরকে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এ বিষয়ে সহযোগিতা করে। মুহাম্মদ আলী ক্লেও নাকি জেলেই ইসলাম গ্রহণ করেন।

কালোদের উত্থানে ইসলামের অবদান

বর্তমানে (২০০৩ সাল) আমেরিকায় ইসলামের পতাকাতলে লাখ লাখ কালো মুসলিম বিরাট শক্তির অধিকারী। Nation of Islam নামে তারা সংঘবদ্ধ। কয়েক বছর আগে তারা রাজধানী ওয়াশিংটনে দশ লাখ কালো মুসলিমের সমাবেশ করে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে, যাতে কালোদেরকে আইনগত অধিকার থেকে কোথাও বঞ্চিত করা না হয়।

কালো মুসলিমদেরকে সাদারা Black Muslim বলে। কিন্তু তারা এ নাম মোটেই পছন্দ করেন না। এ নাম তাদের প্রতি বৈষম্যের ইঙ্গিত দেয় বলেই তাঁরা এ নামের বদলে Afro-American বলেন। অর্থাৎ তাঁরা আফ্রিকা থেকে আগত আমেরিকার নাগরিক। আমেরিকা থেকে তাদেরকে উৎখাত করার সাধ্য কারো নেই। তাদের পূর্বপুরুষ আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছে এ কথা তারা গর্বের সাথে উচ্চারিত করেন।

কালো মুসলিমদের উত্থানের ইতিহাস বড়ই চমকপ্রদ। এলিজা মুহাম্মদ নামে এক কালো মুসলিম ইসলাম গ্রহণের পর আমেরিকার মুসলিম সম্প্রদায় তাঁকে যে সম্মান, মর্যাদা ও গৌরব অনুভব করার সুযোগ দেয়, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, ইসলামের নামেই তিনি কালোদেরকে সংঘবদ্ধ করে একটি শক্তিতে পরিণত করবেন। তিনিই প্রথম Nation of Islam নামে কালোদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে বা তাঁর নেতৃত্বকে সংহত করার জন্য তিনি নবী দাবি করে বসেন। সাদাদের প্রতি দীর্ঘ বিদ্বেষ তাঁকে এতোটা অন্ধ করে ফেলে যে, তিনি এক অদ্ভুত দর্শন আবিষ্কার করেন। তিনি সাদাদেরকে শয়তানের বংশধর বলে ঘোষণা করেন। আফ্রিকা থেকে আদম সন্তানদেরকে ধরে এনে তাদের সাথে সাদারা যে আচরণ করেছে তা ইবলিসের বংশধর বলেই সম্ভব হয়েছে।

এলিজা মুহাম্মদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আকৃষ্ট হয়ে কালো সম্প্রদায়ের বহু লোক মানুষের মতো মর্যাদা নিয়ে বাঁচার তাগিদে নেশন অব ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হন। তাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাম Malcom-X (ম্যালকম-এক্স)। তিনিও জেলেই মুসলিম হন। ডাকাতির অভিযোগে তার ১০ বছরের জেল হয়।

জেল থেকে বের হবার পর তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা ও চারিত্রিক গুণাবলির কারণে এলিজা মুহাম্মদের ঘনিষ্ঠ ও নেশন অব ইসলামে জনপ্রিয় হন। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে 'নেশন অব ইসলাম' নামে আমেরিকায় কালোদের আন্দোলন সবচেয়ে শক্তিশালী হয়।

www.bjilibrary.com

Malcom-X

১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে মেলকম-এক্স এলিজা মুহাম্মদের যৌন কেলেঙ্কারি ও অর্থনৈতিক অসততার কারণে নেশন অব ইসলাম ত্যাগ করেন। ঐ বছরই তিনি হজ্জ করতে যান। হজ্জ তাঁর গোটা জীবনে বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করে। তার আত্মজীবনীতে অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত আবেগ নিয়ে তিনি লিখেন, "আসল ইসলামকে আমি মক্কায় এসে চিনলাম। মানুষে মানুষে বিভেদ একমাত্র ইসলামই দূর করতে পারে। ইসলামই বর্ণবৈষম্য দূর করতে সক্ষম। আমেরিকাকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হবে। আমি ইতঃপূর্বে কখনো দেখিনি যে, সত্যিকার ভাই ভাই হিসেবে সকল বর্ণের মানুষ এমনভাবে একসাথে মিশে যেতে পারে, যা হজ্জে দেখা গেলো। আমি মনে করি যে, আমেরিকার সাদারা যদি আল্লাহর একত্ববাদকে গ্রহণ করতে পারতো, তাহলে তারা বাস্তবে মানবজাতির ঐক্যকেও বুঝতে পারতো।"

মেলকম-এক্স হজ্জের পর নিজের নাম রাখেন 'মালিক আল-শাহবায'। হজ্জ থেকে ফিরে এসে তিনি বিশুদ্ধ ইসলামের যে আলো পেলেন তা প্রচার করতে লাগলেন। কালোদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তার কারণে ব্যাপক সাড়া জাগলো। তিনি এলিজা মুহাম্মদের কালো সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ ইসলামবিরোধী মতবাদ বলে ঘোষণা করলেন। ইসলাম সাদা-কালোর বিভেদ দূর করে সব মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম।

১৯৬৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি কালোদের এক বিরাট সমাবেশে বক্তব্য রাখার শুরুতে "আসসালামু আলাইকুম ব্রাদারস এন্ড সিসটার্স" উচ্চারণের সাথে সাথেই তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কাছে থেকেই তাঁর বুকে ১৬টি গুলি করে। হাসপাতালে নেবার পথেই তিনি শহীদ হন। কালোদের মধ্যে আসল ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে ভ্রান্ত ইসলামপন্থিরাই তাদের পথের কাঁটা মনে করে অপসারণ করে।

এলিজা মুহাম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে ওয়ালেস মুহাম্মদ নেশন অব ইসলামের প্রধান হন। রাবিতা আলমে ইসলামী তাঁকে হজ্জ করার দাওয়াত দিলে সেখানে গিয়ে তিনিও সঠিক ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। তিনি তাঁর নামের সাথে দীন শব্দ যোগ করে ওয়ালেস দীন মুহাম্মদ নাম ধারণ করেন। ইতোমধ্যেই লুই ফাররা খান নামে এক মহাবাগ্মী নেশন অব ইসলামের নেতৃত্ব দখল করেন। ওয়ালেস দীন মুহাম্মদ নেতৃত্ব হারান।

১৪২.

নেশন অব ইসলাম নেতা লুই ফাররা খান

আমেরিকায় ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী কয়েকটি মুসলিম গ্রুপ রয়েছে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নেতার নাম ইমাম সিরাজ ওহ্যাজ। নিউইয়র্কের কেন্দ্রীয় মসজিদে তিনি খতীবের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আরবী ভাষা আয়ত্ত করেন। কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন করার যোগ্যতা অর্জন করায় ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামী সম্মেলনে অতিথি বক্তা হিসেবে দাওয়াত পান। অনলবর্ষী বক্তা হিসেবে তিনি খ্যাত। তাঁর মাধ্যমেও কালো লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করছে। কিন্তু কালো সম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে তিনি পরিচিত নন। একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব হিসেবেই তিনি খ্যাত।

www.bjilibrary.com

এলিজা মুহাম্মদের প্রতিষ্ঠিত নেশন অব ইসলামই কালোদের বৃহত্তম সংগঠন। লুই ফাররা খানের নেতৃত্ব গোটা কালো সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে। কালোদের অধিকার আদায়ের দাবিতে ফাররা খানের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণেই তিনি শুধু নেশন অব ইসলামের নেতা হন। কিন্তু সঠিক ইসলামের ধারক হিসেবে ইসলামী সংগঠনসমূহের নিকট তিনি স্বীকৃত নন।

২০০০ সালে তিনি ২০/২৫ জনের এক টিম নিয়ে নেশন অব ইসলামের নিজস্ব বিমানে বহু দেশ সফর করেন। মস্কোতে গেলে সেখানে মজুমদার মুহাম্মদ আমীন নামে এক বাংলাদেশী ব্যবসায়ী তাঁকে বাংলাদেশে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। মজুমদার সাহেব 'ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক রিপ্রেজেন্টেশন অর্গেনাইজেশন' নামক সংস্থার প্রেসিডেন্ট হিসেবে লুই ফাররা খানের সাথে পরিচিত হন। মজুমদার সাহেবই তাঁকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি তাঁর টিমের সদস্যদেরকে নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসে আসেন।

তিনি আমাকে তাঁর যে ভিজিটিং কার্ডটি দেন তাতে লেখা, "Minister Louis Farra khan, National Representative of the HONOURABLE ELIJAH MUHAMMAD and the Nation of Islam.

তিনি জানালেন যে, এলিজা মুহাম্মদের স্ত্রী ওয়ালেস মুহাম্মদের মা তার ডেলিগেশনে শামিল আছেন। অবশ্য আমাদের অফিসে তাঁকে নিয়ে আসেননি।

তিনি একজন অনলবর্ষী বক্তা। ১৫/২০ মিনিট তিনি বক্তব্য রাখলেন। বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য, ইসলাম ছাড়া মানবজাতির কল্যাণের কোন উপায় নেই, আমেরিকাকে একদিন ইসলামের নিকট মাথা নত করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর স্বভাবসুলভ আবেগপূর্ণ জোরালো বক্তৃতায় আমরা অভিভূত হলাম। ইসলাম, রাসূল (স) ও কুরআন সম্পর্কে যা বললেন, তাতে আমাদের দৃষ্টিতে কোন আপত্তিকর কথা ছিলো না।

আমি তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে এবং তাঁর বিশ্ব সফরকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখলাম। আমি মন্তব্য করলাম, আমেরিকা বিশ্বের নেতৃত্ব দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং ইসলামকেই এ পথে একমাত্র প্রতিবন্ধক মনে করছে। আপনি একজন আমেরিকান হিসেবে এ নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করায় আপনাকে মুবারকবাদ জানাই। আমেরিকা থেকেই প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠা প্রয়োজন। এ দায়িত্ব পালনে আপনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা রাখি।

বিদায়ের সময় তিনি বলে গেলেন যে, আগামী বছর (২০০১) জুন মাসে আমরা এক বিরাট সম্মেলন করতে চাই। আপনাকে সে সম্মেলনে যেতে হবে। আমি সম্মতি দিলে তিনি খুব খুশি হলেন।

ফাররা খানের সফরের প্রতিক্রিয়া

জামায়াত অফিসের সম্মেলন কক্ষে লুই ফাররা খানের আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ভিডিও সেট ইংল্যান্ডে পৌঁছলে সেখানকার ইসলামী সংগঠনের পক্ষ থেকে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া জানালো। তাঁদের কাছ থেকে লুই ফাররা খান সম্পর্কে এমন কিছু রিপোর্ট পেলাম, যাতে বলা হয়েছে যে, ইসলাম সম্পর্কে তাঁর আকীদা সহীহ নয়। তিনি মুখে যা বলেন, তা মুসলমানদেরকে খুশি করা ও তাদের আস্থা অর্জন করার জন্য। তাঁর

www.bjilibrary.com

বাস্তব কার্যাবলি ও চিন্তাধারা সমর্থনযোগ্য নয় বলেই ইউরোপ ও আমেরিকার ইসলামী সংগঠনগুলো তাঁকে স্বীকৃতি দেয় না।

এ কথা জানার পর তাঁর দেওয়া কার্ডের ঠিকানায় তাঁকে চিঠি দিয়ে ইসলাম সম্পর্কে নেশন অব ইসলামের প্রকাশিত কিছু সাহিত্য আমাকে পাঠাতে অনুরোধ করলাম। এর কোন জওয়াব না পেয়ে মস্কোতে মজুমদার মুহাম্মদ আমীনকে জানালাম যে, লুই ফাররা খান আমার চিঠির কোন জওয়াবই দিলেন না। অনেকদিন পর মজুমদার সাহেব জানালেন যে, তিনি তাঁর সাথে যোগাযোগের অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন।

২০০১ সালের সেপ্টেম্বরে আমি আমেরিকায় গেলাম। ইমাম সিরাজ ওহ্যাজের সাথে দেখা হলে তাঁর কাছ থেকে জানলাম যে, ফাররা খান কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। যে সম্মেলন করার কথা ছিলো তা হয়নি।

পরবর্তী সময়ে শুনেছি যে, লুই ফাররা খান সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু এরপর তাঁর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আর কোন খবরই জানা যায়নি। তাঁকে আবার লিখবো কি না ভাবছি।

লন্ডন প্রত্যাবর্তন ও আবার সফর

আমেরিকায় ১৮ দিনব্যাপী সফর সমাপ্ত করে ১৮ সেপ্টেম্বর লন্ডন ফিরে এলাম। মাত্র আটদিন পরই ২৬ সেপ্টেম্বর শায়খ আবদুল্লাহ আলী আল মুত্তাওয়ার দাওয়াতে কুয়েত পৌছলাম। তখন রামাদান শুরু হয়ে গেছে। দু'সপ্তাহ কুয়েতে কাটিয়ে রামাদানের বাকি সময় মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েই লন্ডন থেকে বের হই। শায়খ আল মুত্তাওয়ার ভিসায় গেলেও আওকাফ মন্ত্রণালয়ের মেহমান হিসেবে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা হয় এবং একটি সরকারি গাড়ি সর্বক্ষণ আমার খিদমতে রাখা হয়।

পাঞ্জাবের শিয়ালকোটের অধিবাসী ও জামায়াতে ইসলামীর একনিষ্ঠ কর্মী জনাব ইন-আমুল হক কাদেরীর সাথে পরিচয় হলো। তিনি কুয়েতে এক ব্যাংকে কর্মরত। দিনের বেলা সরকারি মেহমান আর রাতে আমি কাদেরী সাহেবের মেহমান। থাকি হোটেলে। রামাদানে দিনে তো খাবার ঝামেলা নেই। ইফতার ও রাতের খাবারের দায়িত্ব কাদেরী সাহেবই নিলেন। শেষ রাতে হোটেলের খাবারই খেতে হতো।

ইফতার এক-একদিন এক-এক বাড়িতে করার ব্যবস্থা ছিলো। যাদের বাড়িতে ইফতার করা হতো তারা সবাই পাকিস্তানি প্রবাসী। ছোটখাটো ইফতার মাহফিলে ইফতারের আগে আমাকে কিছু বলতে হতো। মাগরিবের নামাযের পর ঐ বাড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। রামাদানের দু'সপ্তাহ এভাবে কেটে গেলো।

কাদেরী সাহেব সূকুল কাবীরে (বড় বাজার) অবস্থিত বড় একটি মসজিদে তারাবীহ নামায আদায় করার জন্য নিয়ে যেতেন। ইমাম সাহেব লেবাননের নাগরিক। দাড়ি না থাকলেও প্রাণ কেড়ে নেবার মতো কিরাআত শুনাতেন। কাদেরী সাহেবের ধারণা ছিলো যে, ঐ মসজিদে তারাবীহের নামাযে পুরো কুরআন শোনানো হয়। প্রথম যেদিন তারাবীহ পড়লাম সেদিন আধাপাড়া পরিমাণ পড়লেন। নামাযের পর কাদেরী সাহেবকে বললাম যে, আজ তো মাত্র আধপারা পড়া হলো, পুরো কুরআন কেমন করে শেষ হবে? তিনি বললেন, দেখবেন যে শেষ পর্যন্ত পুরো কুরআনই পড়া হবে। পরের দিন তারাবীহতে আগের দিনের

www.bjilibrary.com

পারার বাকি অর্ধেক না পড়ে এর পরের পারা অর্ধেক পড়লেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, কাদেরী সাহেবের ধারণা ভুল। প্রত্যেক পারার অর্ধেক পড়া হয় মাত্র।

কুয়েতের আর একটি মসজিদ সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত। মাসজিদুল ফাতেমী নামে পরিচিত। খতমে তারাবীহ্ হয় জেনে একদিন সেখানে গেলাম। এক হাফিয সাহেবই তারাবীহ্ পড়ালেন। আগের মসজিদের ইমামের পড়ার মতো চমৎকার না হলেও তিনি বেশ ভালোই পড়লেন। কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম যে, ইমাম সাহেব একটি পারার প্রথম থেকে পড়া শুরু করে কতক আয়াত বাদ দিয়ে দিয়ে পারার শেষাংশ পড়ে বিশ রাকাআত শেষ করলেন।

আমি আরও খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম যে, কোন মসজিদেই পুরো কুরআন শোনানো হয় না। আরব ভাইরা এতো দীর্ঘ সময় কষ্ট করার জন্য রাজি নন। তারা তারাবীহতে কুরআন শুনতেই চান, কিন্তু অল্প সময়েই নামায শেষ করতে চান। আর একদিন এক মসজিদে তারাবীহ্ পড়তে গেলাম। ছোট মসজিদ। কাছেই ইফতারের দাওয়াত ছিলো। আর নিকটবর্তী মসজিদ বলে সেখানেই যেতে হলো। ইমাম সাহেব পয়লা রাকাআতে "আর রাহ্মান, আল্লামাল কুরআন, খালাকাল ইনসানা আল্লামাহুল বায়ান" পড়েই রুকুতে গেলেন। রুকুতে এক তাসবীহের বেশি পড়া গেলো না, রুকু থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন। এক তাসবীহ্ পরিমাণ সময় না দাঁড়িয়েই সিজদায় চলে গেলেন। সিজদায় রুকুর মতোই এক তাসবীহ্ পড়ার সময় পেলাম। দু'সিজদার মাঝখানে ওয়াজিব পরিমাণ সময়ও বসা গেলো না। দ্বিতীয় রাকাআতে কিরাআতও প্রথম রাকাতের পরিমাণ মতোই পড়লেন। তাশাহুদ কোন রকম পড়া গেলো, দরূদ পড়ার সময় পাওয়া গেলো না। চার রাকাআত পড়ার পর আমি ও আমার সাথীরা বাড়িতে যেয়ে বাকি নামায জামাআতে পড়লাম।

জানা গেলো যে, ইখওয়ানিরা খতমে তারাবীহ পড়ে। তাদের মসজিদে গেলাম। মসজিদটি বড় নয়। মুসল্লীর সংখ্যাও কম। ইশার নামাযেও বেশ লম্বা কিরাআত শুনলাম। তারাবীহের প্রথম দু'রাকাআতে কমপক্ষে ১৫ মিনিট লাগলো। চার রাকাআতের পর বিরতি দীর্ঘ মনে হওয়ায় আমার এক সাথী ভাই জানতে পারলেন যে, কমপক্ষে ১০ মিনিট পর বাকি চার রাকাআত পড়া হবে। আর ঐ মসজিদে আট রাকাআত তারাবীহই পড়া হয়। আমরা আর বাকি চার রাকাআত ঐ মসজিদে পড়ার হিম্মত করলাম না। হাফেয সাহেব বেশ ধীরে ধীরে কুরআন শুনালেন। শুনতে ভালোই লাগলো। কিন্তু ধৈর্যে কুলালো না।

জানা গেলো যে, মিসরের বিশ্ববিখ্যাত কারী আবদুল বাসিত প্রতি রমযানেই এক সপ্তাহের জন্য কুয়েত আসেন এবং অন্যান্য আরব দেশেও যান। এক বড় মসজিদে তারাবীহের পর তিনি কয়েক রকম সুরে তিলাওয়াত করে শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করেন। তাঁকে দেখার জন্য এবং তার মুখ থেকে তিলাওয়াত শুনবার জন্য প্রচুর লোক সমাগম হয়। আমারও দেখার আগ্রহ জাগলো। কাদেরী সাহেব বললেন, এতো ভিড়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এ অনুষ্ঠান টেলিভিশনেই দেখানো হয়।

একরাতে টেলিভিশনেই দেখলাম। গোলমতো চেহারা। রঙ ফর্সা বলা চলে না। চেহারা দেখতে আকর্ষণীয় মনে হলো না। দাড়ি কামানো দেখে বিস্ময় বোধ করলাম। তাঁর

www.bjilibrary.com

কিরাআত সত্যিই বিস্ময়কর। এক মুখে তিনি তিন রকম সুরে কেমন করে পড়েন তা অবশ্যই চমকপ্রদ। একই ব্যক্তির আওয়াজ বলে বুঝার উপায় নেই। আওয়াজে এতো পার্থক্য, না শুনলে বিশ্বাস করাই সম্ভব নয় যে, এক ব্যক্তির মুখ থেকেই এতো রকম আওয়াজ বের হতে পারে।

সৌদি আরবে রামাদান

১০ আক্টোবর কুয়েত থেকে সৌদি আরব পৌঁছলাম। রামাদানের তখনও ১২/১৩ দিন আছে। শেষ সপ্তাহটা মদীনা শরীফে কাটাবার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে সেখানেই ঈদুল ফিতর উদযাপন করা যায়। মক্কা শরীফে পাঁচ-ছয় দিন রইলাম। হারাম শরীফে ইফতার করার মজাই আলাদা। মনে হলো, মক্কা শরীফে অবস্থানরত বিদেশীরা তো বটেই, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারাও বাড়িতে ইফতার না করে হারাম শরীফে চলে আসেন। মাগরিবের জামাআতে শামিল হতে হলে এছাড়া উপায়ই কি? যারা বাড়ি থেকে ইফতার নিয়ে আসেন তারা ইফতারের জন্য অপেক্ষারত চেনা-অচেনা আশপাশে যারা আছেন তাদের মধ্যে ইফতার বিলি করেন। বহু লোককে খেজুর বিতরণে তৎপর দেখা যায়।

রামাদান মাসে সৌদি আরবে রাতের সময়টা অন্য মাসের দিনের মতো হয়ে যায়। রাতে মনে হয় যেন কেউ ঘুমায় না। তারাবীহের পর সারারাত দোকানপাট খোলা থাকে। বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সরকারি অফিস, ব্যাংক ইত্যাদিও সেহরীর পূর্ব পর্যন্ত চলে। ফজরের পর যোহরের পূর্ব পর্যন্ত সবাই ঘুমায়।

আমার কাছে অদ্ভুত মনে হলো যে, রামাদানে সবাই সারারাত জেগে থাকে এবং পরদিন যোহরের পূর্ব পর্যন্ত মনে হয় যেন মক্কা শহরে কোন মানুষ নেই, সবাই কোথাও চলে গেছে। এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এ ধারণায় পৌঁছলাম যে, এটা হঠাৎ চালু হয়নি নিশ্চয়ই। ঐতিহ্যগতভাবেই এ অভ্যাস চলে এসেছে। পূর্ব-পুরুষ সারারাত হয়তো ইবাদত করে কাটিয়েছে। এখন রাত জাগার ঐতিহ্যটা শুধু বহাল আছে। কিন্তু জাগা অবস্থায় সময় কাটাবার অভ্যাসে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন সময় কাটে পার্থিব ব্যবস্থায়, টেলিভিশন দেখে ও আড্ডা মেরে। অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু সর্ব সাধারণের মধ্যে রাত জাগার ঐতিহ্যটুকুই টিকে আছে।

হারামাইন শরীফাইনে (মক্কা ও মদীনায়) দু'জন হাফিয প্রত্যেকে ১০ রাকাআত করে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়েন। এরপর জামায়াতের সাথেই বিতরের নামায আদায় করেন। বিতরে প্রথমে দু'রাকাআত নামায শেষে সালাম ফিরাবার পর আবার দাঁড়িয়ে যান এবং আরও এক রাকাআত পড়ে সালাম ফিরান। শেষ রাকাআতে রুকুতে যাবার আগেই ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার বলে দু'হাত তুলে লম্বা দোয়া আওয়াজ করে পড়তে থাকেন। দোয়া কুনুত দিয়ে শুরু করেন এবং ৮/১০ মিনিট পর্যন্ত দোয়া করতে থাকেন। মাঝে মাঝে ইমাম সাহেব নিজেও কাঁদেন এবং মুসল্লীরাও কাঁদতে থাকেন। আল্লাহর দরবারে ধরনা দিয়ে কাঁদার মধ্যে যে প্রশান্তি ও তৃপ্তি তা ভাষায় প্রকাশের বিষয় নয়, উপলব্ধির ব্যাপার। আজকাল টেলিভিশনে এ দৃশ্য সারা দুনিয়ার মানুষই দেখছে। কুয়েতে কাদেরী সাহেবের বাসায় এ দোয়ার সময় পরিবারের সবাইকে টেলিভিশনের সামনে হাত তুলে কাবা শরীফের দোয়ায় শরীক হতে দেখেছি।

www.bjilibrary.com

মক্কা ও মদীনার উভয় হারাম শরীফেই রামাদানের শেষ দিকে সেহরীর পূর্বে দু'ঘণ্টা ধরে আট থেকে বার রাকাআত তাহাজ্জুদের নামাযে রোজ তিনপারা করে কুরআন শোনানো হয়। এতেও বিরাট সংখ্যক লোক শরীক হয়।

মদীনা শরীফে

রামাদানের শেষ সপ্তাহটি মদীনা শরীফে কাটাবার উদ্দেশ্যে গেলাম। সেখানেও তারাবীহ ও বিতরের নামায মক্কা শরীফের মতোই পড়া হয়। শেষ রাতে তাহাজ্জুদে তিনপারা প্রতিদিন মদীনায়ও শোনানো হয়।

মদীনা শরীফে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী মাওলানা আবদুল আজীজ শারকী আমাকে পরামর্শ দিলেন যে, তারাবীহের সাথে বিতর না পড়ে তাহাজ্জুদের পর যেন পড়ি। তিনি রাত বারোটার পর আসহাবে সুফফার চিহ্নিত স্থানে জামাআতের সাথে তাহাজ্জুদ ও বিতর পড়ার তাগিদ দিলেন। এখানে তাঁর জামাতা হাফিয আবদুল হান্নান ইমামতি করেন। এ হাফিয সাহেব মদীনার মসজিদেই কুরআনের শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। যে কয়দিন মদীনায় ছিলাম তাঁর পেছনে তাহাজ্জুদ ও বিতর পড়লাম। খুবই চমৎকার পড়েন। তিনি একদিনে একপারা পরিমাণ পড়েন বলে দীর্ঘসময়ে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট হয়নি।

২৯ রামাদান মদীনার মসজিদে তারাবীহের নামায শেষ হতেই ঘোষণা করা হলো যে, আগামীকাল ঈদুল ফিতর। রামাদানের শেষ দিকে বিশেষ করে আরব দেশগুলো থেকে অনেক লোক মক্কা ও মদীনায় হাযির হয়। মক্কায় তো হজ্জের ভিড়ের সমান না হলেও প্রচণ্ড ভিড় হয়। মদীনায় সে তুলনায় কিছুটা কম। তবুও শেষ রাতে রাওযাতুল জান্নাতে কোন রকমে পৌঁছলাম। জানতে পারলাম যে, ফজরের পর মসজিদেই থাকতে হবে এবং ঈদের নামায পড়ে বের হতে হবে।

ফজরের জামাআতের পর সবার সাথে আমিও মসজিদে বসে রইলাম। মাইকে তাকবীর পড়া শুরু হলো। এক সাথে তিনবার "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ" উচ্চারণের পর এক দু'মিনিট পর পর মাইকে তাকবীর শুনতে থাকলাম। মুসল্লীরাও সবাই অনুচ্চ স্বরে তাকবীর পড়তে লাগলেন। বেলা ওঠার পর আধঘণ্টা পর্যন্ত তাকবীর উচ্চারিত হতে থাকলো।

এ ঈদের নামাযের আগে কিছু খেয়ে ঈদগাহতে যাওয়া সুন্নাত। চিন্তায় পড়লাম যে, খাবার কোন জিনিস তো সাথে নিয়ে আসিনি, এখন কী করা? ঠিক করলাম যে, শুধু পানিই খেয়ে নেবো। বর্তমানে যমযমের পানি সরকারিভাবেই বিশাল মসজিদের সকল এলাকায় সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। ঐ সময় ভিস্তিওয়ালাদের কাছ থেকে পানি কিনে খেতে হতো। হঠাৎ দেখা গেলো এক লোক কি যেন বিলি করছে। আমার কাছে এলে দেখলাম যে, ছোট ছোট শুকনো খেজুর, কয়েকটা আমার হাতেও দিলো। খুব খুশি হলাম যে, পানি খাবার আগে কিছু খাবার জিনিস পাওয়া গেলো। খেজুর মুখে দিচ্ছি আর ভাবছি, খেজুরের বিচি তো ফেলার জায়গা নেই, পকেটেই রেখে দিতে হবে। অবাক হয়ে টের পেলাম যে, এ খেজুরের কোন বিচি নেই। ইতঃপূর্বে এ খেজুর আমি দেখিনি। দেখতে খুব শুকনো, কিন্তু মুখে দিতেই লালা লেগে নরম হয়ে গেলো। বেশ স্বাদ লাগলো। গত এপ্রিল মাসে

www.bjilibrary.com

মদীনা শরীফের 'সূকুত তামার' (খেজুরের বাজার) থেকে কয়েক রকম খেজুর কিনলাম। এ জাতীয় খেজুরের দাম অন্য খেজুরের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ।

মসজিদে নববীতে ঈদের নামায আদায় করে খুবই তৃপ্তিবোধ করলাম। আমাদের উপমহাদেশের মতো সেখানে ঈদের কোলাকুলির রেওয়ায নেই। পরিচিতদের মধ্যে হাত মিলানোর মাধ্যমেই শুভেচ্ছা বিনিময় সমাপ্ত হয়ে থাকে।

১৪৩.

লন্ডন প্রত্যাবর্তন

ঈদুল ফিতরের পর পরই '৭৩ সালের ৪ নভেম্বর লন্ডন ফিরে গেলাম। আমার সাথে যারা যোগাযোগ করতে চান তাদের নিকট আমার যে ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেওয়া আছে তা লন্ডনের। তাই যখন আমি ইংল্যান্ডে থাকি তখন আমাকে লন্ডনেই থাকতে হয়। আমার বড় দু'ছেলে মামুন ও আমীন এবং ভাতিজা সোহায়ল থাকে ম্যানচেস্টারে। আমার সর্ব কনিষ্ঠ ভাই ড. মাহদী সেখানে আছে বলেই প্রথমে ছেলেরা তার বাসায়ই অনেকদিন ছিলো। মাহদীর এক শ্যালকও সেখানে পৌছায় থাকার জায়গার সমস্যা দেখা দেয়। তখন আমার ছোট ভাই ডা. গোলাম মুয়ায্যামের সহযোগিতায় আমি ধারকর্জ করে ওদের তিনজনের জন্য ছোট্ট একটা বাড়ি খরিদ করি। সোহায়ল ডা. মুয়ায্যামের বড় ছেলে। মুয়ায্যাম তখন লিবিয়ায় ভালো বেতনে চাকরি করে। যে তিনজনের থাকার জন্য বাড়ি খরিদ করতে হলো তাদের দু'জন আমার ছেলে। এ সত্ত্বেও বাড়ির অর্ধেক দাম আমার ভাই-ই দিয়েছে। আমি ধার করে বাকি অর্ধেক যোগাড় করলাম।

আমি মাঝে মাঝে দু-তিন দিনের জন্য ম্যানচেস্টার গেলে আমার ভাই-এর বাসায়ই বেড়াতাম। ঐ বাড়ি কেনার পর সেখানেও এক-আধদিন থেকেছি। আমার ছেলেরা '৭২ সালের মধ্যেই ম্যানচেস্টার পৌছেছে। আমি তো '৭৩ সালের এপ্রিলে লন্ডন পৌছলাম। ছেলেরা এক পাকিস্তানির গার্মেন্টেস্ ফ্যাক্টরিতে চাকরি করে নিজেদের খরচ চালাতো। আমি তাদেরকে এক পাউন্ডও দিতে পারিনি। খাওয়া-পরা ছাড়াও লেখাপড়ার জন্যও তাদেরই কঠোর পরিশ্রম করে অর্থ যোগাড় করতে হতো।

আমার স্ত্রী ও চার ছেলে তখন ঢাকায় আব্বার বরাদ্দ করা ঘরটিতেই থাকতো। আব্বা তখন আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররমের বাড়িতে থাকেন। আমার স্ত্রীকে সন্তানদের খাওয়া-দাওয়ার খরচ বাবদ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ভাতা স্বরূপ কিছু নিয়মিত দেওয়া হতো। জামায়াত তখন বেআইনি থাকা সত্ত্বেও গোপন সংগঠনের দায়িত্বশীলগণ আমার পরিবারের প্রতি লক্ষ্য রাখায় আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

'৭৮ সালে আমি দেশে চলে আসার আগেই ম্যানচেস্টারের বাড়িটি বিক্রয় করে আমার ভাই-এর টাকা ফেরত দেওয়া হয় এবং আমার ধার শোধ করা হয়।

ছেলেদের বাংলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থা

মামুন দেশ থেকে আইএ পরীক্ষা দিয়ে গেছে। আমীন আইএসসি ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় গিয়েছে। তাই এদের বাংলা ভাষায় এ পরিমাণ যোগ্যতা হয়েছে যে, বাংলা ভাষার যে-কোন বই পড়ে বুঝতে পারে। কিন্তু ইংল্যান্ডে চলে আসার পর শুধু ইংরেজি

www.bjilibrary.com

ভাষার চর্চাই চলছে। বাংলা পড়ার অভ্যাস জারি না থাকলে বাংলা ভাষা আস্তে আস্তে ভুলতে থাকবে এবং পরে বাংলা বই পড়ার প্রতি আগ্রহ থাকবে না। এ আশঙ্কা করে বাংলা ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করলাম। ঢাকা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পগুচ্ছের সব কয়টি খণ্ড আনালাম এবং তা পড়ার জন্য তাগিদ দিলাম, যাতে বাংলা ভাষায় মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

সে দেশে উচ্চশিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে যারা যায়, তাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতাম। তাদেরকে পরামর্শ দিতাম যে, বাংলা ভাষা ভালোভাবে চর্চা না করলে দেশের জনগণের সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হবে না, দেশের মানুষ তোমাদেরকে আপন বলে মনে করবে না, বিদেশী বলেই ভাববে।

ইংল্যান্ডে যা শিক্ষণীয়

আমার ছেলে-ভাতিজা ছাড়াও বাংলাদেশী যুবকদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হলে বিশেষ গুরুত্বের সাথে একটি বিষয় আলোচনা করতাম। ইংল্যান্ডে প্রথম দৃষ্টিতেই প্রকাশ্যে ও ব্যাপক আকারে যা চোখে পড়ে তা হলো অশ্লীলতা, মেয়েদের অর্ধনগ্ন পোশাক, যুবক-যুবতীদের অশালীন মেলামেশা, এমনকি প্রকাশ্যে বয়ফ্রেন্ড ও গার্ল ফ্রেন্ডদের আলিঙ্গন ও চুম্বনরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া।

আমাদের দেশে এসব দেখে আমরা অভ্যস্ত নই বলে সে দেশে এসব দেখে একদিকে বয়স্করা বিব্রতবোধ করেন এবং যুবকরা আকৃষ্ট হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে এসব অত্যন্ত মন্দ এবং জঘন্য বলেই ঘৃণার যোগ্য। এসব পশুসুলভ আচরণকে ঘৃণা করতে থাকলে এর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষা করা সহজ হবে।

কিন্তু এদের মধ্যে এতোসব শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যা আমাদের আয়ত্ত করা কর্তব্য। তোমরা যদি ঐ শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব দিয়ে লক্ষ্য করো এবং অনুকরণ করো তাহলে অনেক মানবিক গুণের অধিকারী হতে পারবে। দেশে ফিরে গিয়ে এসব গুণের অনুশীলন করলে আমাদের জনগণের মধ্যেও এসব ঐতিহ্য গড়ে উঠবে। আমি কয়েকটি গুণের উল্লেখ করছি ঃ

১. এ দেশের মানুষ খুব কম কথা বলে ঃ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলার অভ্যাস এদের নেই। ট্রেনে, বাসে, পথে-ঘাটে, এমনকি বাসস্ট্যান্ডে ও রেলস্টেশনে লাইনে দাঁড়ানো অবস্থায়ও বই বা পত্র-পত্রিকা পড়তে থাকে। অযথা বক বক করতে দেখা যায় না। আমাদের অভ্যাস এর একেবারে বিপরীত। ট্রেনে বসে বই পড়তে গেলেও আশপাশের যাত্রীদের সোচ্চার আলাপচারিতায় বিরক্ত হতে হয়। আমরা কোথাও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে অভ্যস্ত নই। পড়ার অভ্যাস খুবই কম।

আমি দেশে সাংগঠনিক প্রয়োজনে ব্যাপক সফর করেছি। বিক্রয় করার জন্য ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের প্রচুর বই সঙ্গে রাখতাম। ট্রেনে ইন্টার ক্লাসেই আমি সফর করতাম। মোটামুটি শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত লোকই এ শ্রেণীতে ভ্রমণ করে। বই-এর প্রচারের উদ্দেশ্য ছাড়াও সহযাত্রীদেরকে চুপ করে বই পড়াবার জন্য হাতে হাতে বই তুলে দিতাম, যাতে আমি নিরিবিলি পড়ে সময়টা কাজে লাগাতে পারি। দেখা যেতো যে, বই সবার হাতে পৌঁছার পর বক বক আপাতত বন্ধ হলেও অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই

www.bjilibrary.com

বই হাতে নিয়ে ঘুমাচ্ছেন। ৫/১০ মিনিটের বেশি একটানা পড়ার অভ্যাসও তাদের নেই। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিরতিহীন আলাপে সবাই অভ্যস্ত। যে কয়জন বই পাঠরত তাদেরকে বিনা মূল্যেই বইটি নিয়ে যেতে দিতাম এবং তাঁর নাম ঠিকানা নোট করে তাঁর নিকটবর্তী এলাকায় সংগঠনের দায়িত্বশীলদের নিকট ঐ লোকের সাথে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দিতাম।

ইংল্যান্ডে এর সম্পূর্ণ বিপরীত দৃশ্য আমার খুবই ভালো লাগতো। অফিসে যাবার সময় ও ছুটির পর লন্ডনের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেনে (যাকে টিউব বলা হয়) যাত্রীদের এতো ভিড় হয় যে, আসনে বসা লোকের চেয়ে দাঁড়ানো লোকের সংখ্যাই বেশি দেখা যায়। কোন ধাক্কা-ধাক্কি বা হৈ-চৈ নেই। সবাই নীরবে গাড়িতে উঠছে ও নামছে। বেশির ভাগ লোকের হাতেই পড়ার উপকরণ আছে এবং দাঁড়ানো অবস্থায়ও পড়ছে। তাদের মধ্যে এ চমৎকার শৃঙ্খলা দীর্ঘদিনের অনুশীলনের ফসল। আমাদের দেশে এ শৃঙ্খলা জনগণকে শেখাবার ব্যবস্থা কি সম্ভব নয়?

২. সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলার অভ্যাস ঃ ব্যাংক, পোস্ট অফিস বা যে-কোন অফিসেই লোকেরা লাইন দিয়ে কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কাউন্টারে কর্মরত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই মহিলা। পুরুষ হোক, মহিলা হোক সবাইকে দেখা যায় গ্রাহকদের সাথে হাসিমুখে কথা বলছে। যারা সেবা নিচ্ছে তারা দারুণ সন্তুষ্ট হচ্ছে।

দোকানে ঢুকে ক্রেতা প্রয়োজনীয় জিনিস নিজ হাতে সংগ্রহ করে মূল্য পরিশোধ করার জন্য কাউন্টারে পৌঁছলে তাকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। কাউন্টারের কর্তব্যরতদের এতে কি কোন ক্ষতি হয়? হাসিমুখে সেবা করায় তার মনও প্রফুল্ল থাকে। যে সেবা গ্রহণ করে তাকে বিনা মূল্যে সন্তুষ্ট করে তারা বিরাট লাভবান হয়। যেখান থেকে সেবা পেয়ে কেউ সন্তুষ্ট হয়, সে বার বার সেখানেই যায় বলে ঐ হাসির স্থায়ী মূল্য পাওয়া যায়। অথচ এর জন্য তাদের কিছুই খরচ করতে হয় না।

আমাদের দেশে এর দারুণ অভাব রয়েছে। কোন অফিসের গেটের সামনে দারোয়ান টুলে বসে আছে। সাহেবের সাথে দেখা করার জন্য অপরিচিত কোন লোক আসতে হাসিমুখে সালাম না দিয়ে গম্ভীর হয়ে টুলে বসেই রইলো। সাহেব আছেন কি না জিজ্ঞেস করলে গুমোট মুখেই জওয়াব দিলো। কিন্তু যদি এমন কোন ব্যক্তি আসেন, যিনি অসন্তুষ্ট হলে দারোয়ানের চাকরির ক্ষতি হতে পারে, তাহলে সে লম্বা সালাম দিয়ে তাকে সাদর অভিবাদন জানায়। এটা সৌজন্য নয়, তোষামোদ। অপরিচিতের বেলায় সৌজন্য প্রদর্শনের ধারও ধারে না।

মানুষ প্রয়োজনেই অফিসে কর্মরতদের কাছে যায়। যে সেবা পাওয়ার জন্য যায় তা প্রদান করার জন্য তাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু হাসিমুখে সেবাদানের পরিবর্তে কর্মচারী বা কর্মকর্তা সেবার জন্য আগত ব্যক্তিকে শোষণের শিকার হিসেবে হাতে পেয়ে গেলো। যে সেবা বিনামূল্যে দেবার দায়িত্ব, এর জন্য উচ্চমূল্য দাবি করে বসে। হাসিমুখে সেবা দেওয়া তো দূরের কথা, ঘুষ ছাড়া সেবা দিতেই রাজি নয়। অবশ্য দাবি অনুযায়ী ঘুষ পেলে হাসিমুখেই কাজ করে দেয়। এ হাসি গ্রাহককে খুশি করার জন্য নয়, ঘুষ পাওয়ার আনন্দের প্রকাশ। এ জাতীয় যুলুম ইংল্যান্ডে কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

www.bjilibrary.com

৩. নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস ঃ ভাড়া করা ট্যাক্সিতে দুপুর রাতে বিমানবন্দর থেকে বাসায় যাচ্ছি। ট্রাফিক পয়েন্টে লালবাতি দেখে ড্রাইভার গাড়ি থামালো। আমি লক্ষ্য করলাম যে, কোন দিক থেকে একটা গাড়িও আসছে না। ড্রাইভারকে বললাম, রাস্তা একদম ফাঁকা, না দাঁড়ালেও তো চলতো। জওয়াবে বললো, "Rule is Rule, We always obey rule." (নিয়ম নিয়মই, আমরা সবসময় নিয়ম মেনে চলি)। মনে মনে লজ্জিত হলাম। আমাদের দেশে নিয়ম জারি করার দায়িত্বশীলরাও নিয়ম ভঙ্গ করে। জনগণ নিয়ম মানার শিক্ষা কার কাছে পাবে?

লন্ডনে আমার দ্বিতীয় ছেলে আমীন তার গাড়ি ড্রাইভ করছিলো। হঠাৎ ট্রাফিক পুলিশের গাড়ি দ্রুত তার গাড়ির সামনে এসে তাকে থামতে বাধ্য করলো। পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে এসে আমীনকে অত্যন্ত ভদ্রভাবে হাসিমুখেই বললো, "Sir, Perhaps you have not marked that you have crossed the speed limit." (স্যার, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি যে, আপনি গাড়ি চালাবার গতির সীমা লঙ্ঘন করেছেন। এ বলেই গাড়ির সামনের আয়নায় একটা কাগজ সেঁটে দিয়ে বললো, Please don't mind sir" (স্যার মনে কিছু করবেন না)। আমীন বললো, আমাকে যথাস্থানে পঞ্চাশ পাউন্ড জরিমানা দিতে হলেও পুলিশের ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট। পুলিশ হাসিমুখে ভদ্র ভাষায় কথা বলায় তার কোন ক্ষতি হয়নি; বরং জরিমানা করে যাওয়া সত্ত্বেও তার প্রতি সন্তুষ্টিই প্রকাশ করা হলো।

আমাদের দেশে এ জাতীয় কেসে ড্রাইভারকে ডাকাতের মতো ধরে এবং ঘুষ নিয়ে ছেড়ে দেয়। জরিমানা করলে সরকারের তহবিলের আয় হতো। সে ডবল অন্যায় করে। সরকারি দায়িত্বে অবহেলা করে সরকারকে ঠকায় এবং ব্যক্তিগতভাবে অন্যায় উপার্জন করে।

৪. হারানো জিনিস ফেরত পাওয়া ঃ একবার আমি টিউবে (পাতালের রেল গাড়ি) ভুলে ছাতাটা না নিয়ে নেমে গেলাম। শীতকালেই সে দেশে বৃষ্টি হয়। সারাদিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তেই থাকে। ছাতা ছাড়া চলেই না। বাসায় এসে ভাতিজা রিয়াজুদ্দীনকে বললাম যে, আমাকে আজই একটা ছাতা কিনতে হবে। সে জানতে চাইলো যে, আমার ছাতা কোথায় হারালাম। শুনে সে বললো যে, অমুক জায়গায় আগামীকাল আপনাকে নিয়ে যাবো। সেখানে ছাতাটি পাওয়া না গেলে কিনবেন। আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম, এভাবে হারানো জিনিস পাওয়া যায়? পরদিন সেখানে গেলে এক ব্যক্তি জানতে চাইলো, কবে কোথায় হারিয়েছি। গতকাল হারিয়েছি শুনে আমাকে দু'দিন পর যেতে বললো। কারণ হারানো জিনিস তাদের কাছে পৌঁছতে দুই-তিন দিন লেগে যায়। দু'দিন পর গেলাম। ছাতাটি নতুন না পুরাতন, বাঁটটি দেখতে কেমন, বাঁটের রঙ কী, লম্বা কতটুকু ইত্যাদি জেনে নিয়ে দুটো ছাতা এনে দেখালো। আমি এর একটিকে আমার বলে চিনলাম। হাসিমুখে ছাতাটি আমার হাতে তুলে দিলে আমি Thank you বলে গ্রহণ করলাম। ফিরে আসতে আসতে ভাবলাম, কাফিরদের দেশে সততার যে পরিচয় পেলাম তা কি আমার মুসলমান দেশে আশা করা যায়?

৫. পুলিশ জনগণের পরম বন্ধু ঃ আমি এক রামাদানের শেষ দিন সৌদি আরব থেকে লন্ডন রওয়ানা হলাম, যাতে পরের দিন ম্যানচেস্টারে ছেলেদের সাথে ঈদ করতে পারি। আমীন গাড়ি নিয়ে লন্ডন হিথ্রো বিমানবন্দরে পৌঁছলো, যাতে রাতের মধ্যেই ম্যানচেস্টারে পৌঁছা যায়। রাত ১২টায় বিমানবন্দর থেকে আমরা রওয়ানা হলাম। ৫ ঘণ্টায়

www.bjilibrary.com

ম্যানচেস্টার পৌঁছার কথা। আমীন গাড়ি চালাচ্ছিলো। আমি তার পাশের আসনে বসা। আড়াইটা-তিনটায় হঠাৎ কি হয়ে গেলো বুঝলাম না। গাড়ির যে দিকে আমি বসেছিলাম সেদিকটা নিচু হয়ে গেলো। রাস্তার সাথে গাড়ির ঘষা লাগার বিকট আওয়াজ হচ্ছিলো। গাড়িটা রাস্তার একপাশে ঘুরে যাচ্ছিলো। আমীন সর্বশক্তি প্রয়োগ করে স্টিয়ারিং ধরে গাড়িকে রাস্তার উপর রাখার চেষ্টা করতে দেখলাম। কায়মনোবাক্যে দয়াময় আল্লাহ তাআলাকে ডাকতে লাগলাম।

গাড়ি ৬৫ মাইল বেগে চলছিলো। আল্লাহর রহমতে প্রায় দু'শ গজ রাস্তায় ঘষা খেতে খেতে গাড়িটা রাস্তার কিনারায় থামলো। গাড়িটি থামার পর আমীন বললো, মনে হয় আপনার দিকের সামনের চাকাটি খুলে পড়ে গেছে। এ অবস্থায় গাড়িটি রাস্তায়ই উল্টে যাবার আশঙ্কা ছিলো। আর স্টিয়ারিং ধরে রাখতে না পারলে গাড়ি রাস্তার বাইরে উল্টে পড়ে যেতো।

আল্লাহ তাআলা এতোবড় দুর্ঘটনায় শেষ পর্যন্ত রক্ষা করায় শুকরিয়ার জযবায় আপ্লুত হলাম। আমীন বললো যে, আমি sos এ যেয়ে পুলিশকে খবরটা জানাই। আমীন কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললো, এখনি পুলিশ আসবে। সেদিনই জানলাম যে, হাইওয়েতে দু'মাইল পরপরই sos লেখা দেখা যায়। এর মানে Save our soul (আমাদেরকে বাঁচাও) ওখানে ফোন আছে। কত নম্বর sos থেকে ফোন করা হয়েছে তা জানালে রেসকিউ পুলিশ আসে। দশ মিনিটের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি হাজির হয়ে গেলো।

পুলিশ অবস্থা শুনে ও গাড়ির অবস্থা দেখে মন্তব্য করলো যে, আপনারা অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন। এ জাতীয় দুর্ঘটনায় গাড়ি অবশ্যই উল্টে যায় বা রাস্তার বাইরে ছিটকে পড়ে। পুলিশ গাড়ির ড্রাইভারের যোগ্যতার প্রশংসা করে বললো, স্টিয়ারিং ধরে রাখতে না পারলে কিছুতেই গাড়িকে রক্ষা করা সম্ভব হতো না।

গাড়ির চাকা খুলে কোথায় গেলো তালাশ করার জন্য পুলিশও সাহায্য করলো। কিন্তু অন্ধকার দূর না হলে তালাশ করা সম্ভব নয়। ইতোমধ্যে সকাল হয়ে গেলো এবং একটু ফর্সা হলো। চাকা খুলে যাবার পর গাড়িটা যতদূর এসে থামলো এর চেয়ে আরও একটু দূরে রাস্তা থেকে সামান্য দূরে চাকাটি পাওয়া গেলো। না পেলে চাকা কিনতে হতো। ৬৫ মাইল বেগে চলা গাড়ির চাকাতো ঐ বেগ নিয়েই গাড়ি থেকে আলাদা হয়। তাই এতোটা দূর পর্যন্ত উড়ে এসে চাকাটি থামলো। এমন অসময়ে কোন গ্যারেজ খোলা থাকে না এবং কোন মেকানিক পাওয়াও সহজসাধ্য নয়। পুলিশের সাহায্যেই গাড়িটিকে একটা গ্যারেজের কাছে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো। পুলিশই মেকানিক যোগাড় করে আনলো। গাড়িতে চাকা লাগাবার ব্যবস্থা করে পুলিশ বিদায় নিলো। তাদের এ নিঃস্বার্থ সেবার জন্য আমরা আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। জওয়াবে তারা বললেন, It is our duty. তাদের মতো কর্তব্যবোধ কি আমরা অর্জন করতে পারি না?

সে দেশে আপদে-বিপদে পুলিশই প্রধান সহায়। আগুন লেগেছে? পুলিশকে জানালে ফায়ার ব্রিগেডের সেবা ত্বরান্বিত হয়। বাড়িতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে? পুলিশকে খবর দিলে যা করণীয় করবে বলে সবাই নিশ্চিত। বাড়িতে বুড়ি একা বাস করে। অসুস্থ হলে ফোনে পুলিশে খবর দিলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে। বুড়ির ছেলে থাকলেও সে তো মায়ের সাথে থাকে না। তাই নিঃসঙ্গ বুড়ির আত্মীয়তার দায়িত্বও পুলিশকেই পালন করতে হয়।

www.bjilibrary.com

আমাদের দেশে মানুষ পুলিশকে ভয় পায়। পুলিশের পাল্লায় পড়লে ঝামেলার শেষ নেই। যে কাজ করা পুলিশের পবিত্র দায়িত্ব সে কাজের জন্যও প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হতে হয়। অপরাধীরাই পুলিশের প্রয়োজন বেশি বোধ করে। টাকা দিয়ে পুলিশকে ম্যানেজ করলে অপরাধীর আর কোন বিপদ নেই।

তাই আমাদের দেশে পুলিশ অপরাধীদের বড় বন্ধু। এ অবস্থায় আইন-শৃঙ্খলা কেমন করে বহাল হতে পারে? জনগণের জান-মাল, ইজ্জত কি করে নিরাপদ থাকতে পারে? পুলিশের মধ্যে যারা অপরাধীদের বন্ধু হতে রাজি নয় তাদেরকে অযোগ্যই মনে করা হয়। এ পুলিশকে কি জনগণের বন্ধু হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়? এটা করতে না পারলে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি কেমন করে বন্ধ হবে?

১৪৪.

৬. সে দেশের বুড়িরাও মানুষের বন্ধু ঃ আমি বেশ কয়েকবার বুড়ির খিদমতে উপকৃত হয়েছি। আমি অপরিচিত এক ঠিকানায় যেতে চাই। বাড়ির নম্বর ও রাস্তার নাম জানি। নিকটবর্তী স্টেশনে নামলাম। সেখান থেকে গন্তব্যস্থলে কেমন করে যাবো? ট্রাফিক পুলিশ এ বিষয়ে তেমন সাহায্য করতে পারে না। শুনেছি যে, কোন বৃদ্ধা মহিলাকে রাস্তায় পেলে তার সাহায্য সহজেই পাওয়া যায়। এক বৃদ্ধাকে পেয়ে Excuse me (মাফ করবেন) বলে পাশে দাঁড়ালাম। তিনি হাসিমুখে বললেন, What can I do for you? (আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?) আমার গন্তব্যস্থলের নাম্বার ও রাস্তার নাম লেখা কাগজটি তার হাতে দিয়ে বললাম, Can you guide me please? (আপনি কি আমাকে পথ দেখাতে পারেন দয়া করে?) Yes, yes, why not? (অবশ্যই পারি, কেন পারবো না?) তিনি তার ব্যাগ থেকে লন্ডন শহরের রোডম্যাপ বের করে কয়েক মিনিট তালাশ করলেন। তারপর খুশি হয়ে বললেন, I have got it, come on with me. (আমি পেয়ে গেছি, আমার সাথে আসুন) বলে তিনি হেঁটে চললেন। পাঁচ-সাত মিনিট তিনি হেঁটে যে রাস্তায় আমি যাবো সে রাস্তার মাথায় পৌছলেন। রাস্তার মাথায় রাস্তার নাম লেখা থাকে। বললেন, এ রাস্তায় বাম দিকে ঐ ঠিকানা পাবেন। লন্ডনের রাস্তায় বাড়ির নাম্বার তালাশ করা সহজ। একদিকে শুধু জোড় সংখ্যা ও অপরদিকে শুধু বেজোড় সংখ্যা থাকে।

বৃদ্ধার এ খিদমতে মুগ্ধ হয়ে তাকে Thank you very much বলতেই তিনি হেসে বললেন, It's a great pleasure to help others (অপরকে সাহায্য করার মধ্যে বিরাট তৃপ্তি রয়েছে)। তার সাথে যতক্ষণ পথে হাঁটলাম, তিনি অবিরাম কথা বলেছেন। আমি কোন্ দেশের মানুষ, লন্ডনে কোথায় থাকি, কী করি, ছেলে-মেয়ে কয়টি ইত্যাদি প্রশ্ন করতে থাকলেন। জওয়াব শুনে মন্তব্যও করতে থাকলেন। সত্যি বৃদ্ধার প্রতি মায়ের মতো শ্রদ্ধাবোধ করলাম। এ রকম মা আমি বেশ কয়েকবার পেয়েছি। জানতে পারলাম যে, ছেলে-মেয়ে বড় হলে বিয়ের পর ছেলেরা বৌ নিয়ে আলাদা বাড়িতে চলে যায়। বৃদ্ধ পিতা-মাতা নিঃসঙ্গ জীবন কাটায়। স্বামী মারা গেলে বুড়ি একাই বাড়িতে থাকে। কথা বলার লোকও পায় না। কথা বলতে হলে এলাকার "Elders Home"-এ যেয়ে বুড়ো-বুড়িদের সাথে সময় কাটায়। সরকারিভাবেই এ ব্যবস্থা করা হয়। এখানেই খায় দায়, বিভিন্ন রকম খেলা করে, টেলিভিশন দেখে দিন কাটায়। শুধু ঘুমাবার জন্য নিজের

www.bjilibrary.com

বাড়িতে যায়। তাই এ ধরনের বৃদ্ধারা কোন অপরিচিত লোক পেলেও তার সাথে আলাপ করতে চায়।

আমার ঘনিষ্ঠ দীনী ভাই জনাব আবদুস সালাম থেকে শুনেছি, তিনি এরকম এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার বাড়িতে এক সময় ভাড়াটে হিসেবে থাকতেন। বৃদ্ধা উপরতলায় একা থাকতেন। দিনে কয়েকবার নিচে এসে তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন, তাঁর ছেলে মেয়েকে নাতি-নাতনীর মতো আদর করতেন। বাজারে গেলে নাতি-নাতনীর জন্য এটা ওটা নিয়ে আসতেন। অথচ তার নিজের ছেলে ও নাতি-নাতনী আছে। কিন্তু তারা অন্য শহরে থাকে। তার স্নেহ তিনি নকল নাতি-নাতনীর মধ্যেই বিলি করতে বাধ্য হন।

৭. ইংল্যান্ডে জাতীয় নির্বাচন ঃ লন্ডনে আমার ছয় বছরের নির্বাসন জীবনে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুটো নির্বাচন দেখেছি। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের জন্মভূমিই হলো ইংল্যান্ড। আমাদের দেশের নির্বাচন ও সে দেশের নির্বাচনে এতো বিরাট পার্থক্য! আমি এমন সুন্দর নির্বাচন দেখে অভিভূত। গোটা নির্বাচনী অভিযানই পত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে চলে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন হলে ভোটারদের সমাবেশে দলনেতারা বক্তব্য রাখেন এবং তা টেলিভিশনে দেশের সব ভোটাররাই দেখতে ও শুনতে পান। প্রধান দুটো রাজনৈতিক দলের মধ্যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কনজার্ভেটিভ পার্টি ও লেবার পার্টিই পালাক্রমে ক্ষমতাসীন হয়। দু'দলের প্রধানদের মধ্যে বিতর্কের অনুষ্ঠানও টেলিভিশনে দেখানো হয়। ভোটাররা সবাই শিক্ষিত। উভয় দলের বক্তব্যই তারা পত্রিকা ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পারে। ভোটারদের মতামতের জরিপ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

আমাদের দেশের মতো ময়দানে নির্বাচনী জনসভা সেখানে হয় না। ভোটারদেরকে প্রভাবিত করার জন্য রাজপথে মিছিল হতে দেখলাম না। জনগণকে আবেগতাড়িত করে কোন এক দলের পক্ষে নেবার জন্য পোস্টার, স্লোগান ইত্যাদিও নেই। আমাদের দেশে নির্বাচনী জনসভা বলতে গেলে রোজ ২৪ ঘণ্টাই চলতে থাকে। দলীয় প্রধান যারা দেশ সফর করেন এবং দিন-রাত পথসভা ও জনসভায় বক্তব্য রাখেন। নির্বাচনের দিনের আগে প্রায় মাসখানেক বা এর চেয়ে বেশি দিন এ জাতীয় নির্বাচনী অভিযান চলে। এ জাতীয় অভিযান সে দেশে হয় না।

ঐ দেশে গণতন্ত্রের এ ঐতিহ্য বহু বছরে গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে বলতে গেলে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা মাত্র ১৯৯১ সাল থেকে শুরু হয়েছে। নির্বাচনী ফলাফল দলের পক্ষে না হলে তা মেনে না নেবার যে কুসংস্কার এদেশে কায়েম আছে তা চলতে থাকলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য কেমন করে গড়ে উঠবে?

লন্ডনে যার বাড়িতে আমি থাকতাম, সম্পর্কে সে আমার ভাতিজা। সে ও তার স্ত্রী ভোটার। তাদেরকে বললাম, তোমরা যখন ভোট দিতে যাবে আমাকে সাথে নিয়ে যাবে, আমি ভোটকেন্দ্র দেখতে চাই। পোলিং বুথে কোন ভিড় দেখলাম না। আমাদের দেশের মতো ভোট কেন্দ্রের কাছে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ভোটারদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার কোন আয়োজনও দেখা গেলো না। কোন দলীয় ভলান্টিয়ারও নেই। এমনকি প্রার্থীদের কোন এজেন্টও উপস্থিত নেই। আমাদের দেশে জাল ভোট ঠেকাবার জন্য ভোটারদের পরিচয় যাচাই করার দায়িত্ব এজেন্টরা পালন করে থাকে, যাতে মিথ্যা

www.bjilibrary.com

পরিচয় দিয়ে কেউ ভোট দিতে না পারে। কোন এজেন্ট নেই দেখে আমি বিস্মিত হলাম। পার্লামেন্ট নির্বাচনেও দলের পক্ষ থেকে এজেন্টের ব্যবস্থা পাবার প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে তো স্কুল কমিটির নির্বাচনের দিনেই বিরাট হৈ চৈ হয়।

আমিও তাদের দু'জনের সাথে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করলাম। গেটে আপত্তি করার কোন লোক ছিলো না। আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারা দু'জন এগিয়ে গিয়ে ব্যালট পেপার সংগ্রহ করলো। দু'জন পর্দাঘেরা দুটো জায়গায় ঢুকলো। তখন ভোটকেন্দ্রে মাত্র দু'জন ভোটারকে আসতে দেখলাম। ওরা দু'জন বের হয়ে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, ভোটার সংখ্যা এতো কম কেন? বললো, সকাল ৮টা থেকে শুরু হয়েছে, রাত বারোটা পর্যন্ত সময় আছে। এ সময় কম হলেও সবসময় এতো কম থাকে না। তখন বেলা সাড়ে এগারোটা।

আমরা কি এমন নিরুত্তাপ নির্বাচন কল্পনা করতে পারি? এদের প্রার্থীরা নিশ্চিত যে, নির্বাচন পরিচালক কর্মচারী ও কর্মকর্তারা কোন অনিয়ম করবে না, কেউ মিথ্যা পরিচয় দিয়ে ভোট দিতে আসবে না, একজন ভোটার একাধিক ভোট দেবার চেষ্টাও করবে না।

৮. সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারি ও বিরোধী দলের সম্পর্ক ঃ ইংল্যান্ডে সংসদীয় গণতন্ত্রের বাস্তব রূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়ার আগ্রহ আমার অত্যন্ত প্রবল ছিলো। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে ইংল্যান্ডকেই আমি সংসদীয় গণতন্ত্রের মডেল মনে করতাম। লন্ডনে কয়েক বছর থাকার সুযোগ পেয়ে আমি সরকারি দল ও বিরোধী দলের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন মনে করলাম।

পার্লামেন্টের বিতর্ক দেখার জন্য কোথাও যেতে হয় না। ঘরে বসে টেলিভিশনেই দেখা যায়। বিরোধীদলীয় সদস্যদেরকেই বেশি কথা বলতে দেখলাম। কারণ তারাই সরকারের সমালোচনায় সোচ্চার। সরকারি দলের দায়িত্বশীলগণই জওয়াব দেন। সরকারদলীয় এমপিগণ কমই বক্তব্য রাখেন। কোন কোন এমপিকে কিছুটা উত্তেজিত হয়ে বক্তব্য রাখতেও দেখা যায়। লিডার অব দি হাউজ (সরকারদলীয় নেতা) শান্তভাবে জওয়াব দিলে ঐ বক্তা সন্তুষ্ট হয়ে যান।

ঐ সময় লেবার পার্টি ক্ষমতাসীন ছিলো। উড্র উইলসন তখন প্রধানমন্ত্রী। কনজার্ভেটিভ পার্টি লিডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ তখন লিডার অব দি অপজিশন। পার্লামেন্টে এ দু'জনের বিতর্ক শুনলে তাদের প্রশংসা না করে পারা যায় না। দু'জনই চমৎকার বলেন। দু'জনের কাছেই যুক্তির মযবুত হাতিয়ার আছে। তাদের বিতর্ক যেন মেধার প্রতিযোগিতা। তারা কোন অশালীন ভাষা ব্যবহার করেন না। ভাবভঙ্গিতেও কোন আক্রমণাত্মক আচরণ লক্ষ্য করা যায় না।

আমাদের দেশে সরকারি দল ও বিরোধী দলের এমপিদের বিতর্ক দেখলে লজ্জাবোধ না করে থাকা যায় না। দলের লিডারই যদি জঘন্য অশালীন ভাষায় বক্তব্য রাখেন তখন ঐ দলের অন্যরা তো আরও উগ্র ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন মনে করবেনই। সংসদে বিতর্কের মান উন্নত করতে হলে সরকারি দলকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। বিরোধী দলের অন্যায় আচরণে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তাদের অশালীন বক্তব্যের জওয়াবও শালীনভাবে দিতে হবে। এভাবে সহ্য করে করেও যদি শালীনতা কায়েম করা যায় তাহলে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে।

www.bjilibrary.com

ব্রিটেনে সরকারকে বলা হয় Her Majesty's Government এবং বিরোধী দলকে বলা হয় Her Majesty's opposition. এভাবে নামকরণের উদ্দেশ্য হলো, এ কথার স্বীকৃতি যে, সংসদীয় গাড়ি এ দু'চাকার উপর ভর দিয়েই চলে। বিরোধী দলও সরকারের সহযোগী। তাই সেখানে বিরোধী দল সরকারি দলকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে কাজ করে না, সরকারকে সংশোধনের চেষ্টা করে। সরকারি দলকে পরবর্তী নির্বাচনে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে বিরোধী দল যোগ্যতর হিসেবে প্রমাণ করার জন্য অবশ্যই চেষ্টা করে। নির্বাচনের পূর্বেই সরকারকে পদত্যাগ করার জন্য সুযোগ তালাশ করে না।

এ প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখযোগ্য। একবার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সরকারি ও বিরোধী দলে তীব্র বিতর্ক চলে। বিরোধীদলীয় নেতা এডওয়ার্ড হীথ পার্লামেন্টে ডিভিশন দাবি করেন। এ দাবির অর্থ হলো, ঐ বিষয়টি সম্পর্কে এমপিদের সমর্থন পক্ষে না বিপক্ষে তা নির্ণয় করা। যদি সরকারি মতামতের বিরুদ্ধে অধিকাংশ এমপি রায় দেন তাহলে তা নাকচ হয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী উড্র উইলসন বিরোধীদলীয় নেতাকে অবহিত করলেন যে, ডিভিশনের দাবি এখনই কার্যকর করায় সমস্যা আছে। বর্তমানে সরকারি দলের ১০/১২ জন এমপি সরকারি ডেলিগেশনে বিদেশে অবস্থান করছেন। এখন ডিভিশন হলে তারা রায় দেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। তাই এ বিষয়ে আলোচনা মুলতবি থাকুক। তারা ফিরে আসার পর ডিভিশনের দাবি পূরণ করা হবে। বিরোধীদলীয় নেতা ঐ কথা শুনে মুলতবি করতে রাজি হয়ে গেলেন। উল্লেখ্য যে, সরকারি দল মাত্র ১৫ জনের সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। বিরোধী দল জিদ ধরলে ঐ সময় ডিভিশনে সরকারি দলের হেরে যাবার আশঙ্কা ছিলো। কিন্তু বিরোধী দল সে সুযোগ গ্রহণ করার জন্য গোঁ ধরেনি।

আমাদের দেশের বিরোধী দল এমন সুযোগ পেলে কি প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে রাজি হবার কোন আশা করা যায়?

১৯৯১ সাল থেকে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় বাংলাদেশে এ পর্যন্ত তিনটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিদেশী পর্যবেক্ষকরাও সবকয়টি নির্বাচন নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। একটি দল ১৯৯৬-এর নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক আসনে বিজয়ী হওয়ায় ঐ নির্বাচনে কোন কারচুপি হয়েছে বলে অভিযোগ করেনি। কিন্তু ঐ দলটি '৯১ সালে কম আসন পাওয়ায় নির্বাচনে 'সূক্ষ্ম কারচুপি' হয়েছে বলে আপত্তি তুলেছে। এ দলটিই ২০০১ সালের নির্বাচনে হেরে গিয়ে স্থূল কারচুপির অভিযোগ করেছে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের দিন এ দলটি অবশ্য নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পরই দলটি কারচুপির ধুঁয়া তুলেছে। এমনকি তারা চিফ ইলেকশন কমিশনার, সরকারের চিফ এডভাইজার, দেশের প্রেসিডেন্ট, এমনকি সেনাবাহিনী প্রধানকেও নির্বাচনে পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে অভিযোগ করেছে। তারা এ নির্বাচন বাতিল করে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিও তুলেছেন। কাদের পরিচালনায় পুনঃনির্বাচন করতে হবে সে বিষয়ে তারা কোন মতামত প্রকাশ করেননি। সবাই যদি পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন তাহলে তারা নিরপেক্ষ নির্বাচন কার কাছে দাবি করেন?

www.bjilibrary.com

এ ব্যাপারে ইংল্যান্ড আদর্শ নমুনা পেশ করেছে। তারা নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নেন। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠনের অধিকার স্বীকার করেন। সরকারকে পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেন। কথায় কথায় সরকারের পদত্যাগ ও মধ্যবর্তী নির্বাচন দাবি করেন না। বিরোধী দল পরবর্তী নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য সকল রকম বৈধ পন্থা অবলম্বন করে। সরকারকে অচল করার জন্য কোন ষড়যন্ত্র করে না।

আমরা যদি সত্যিকার গণতন্ত্রের চর্চা করতে চাই তাহলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে ব্রিটেন থেকে গণতন্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে একেবারেই শৈশবকাল অতিক্রম করছি। আমরা যদি দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কায়েম করতে চাই তাহলে গণতান্ত্রিক নীতি মেনে চলার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যে রাজনৈতিক দল তা মানতে অস্বীকার করে তাদেরকে রাজনৈতিক ময়দান থেকে অপসারণের উদ্দেশ্যে জনগণকে ভোটের হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে।

৯. সুপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা ঃ আমি ব্রিটেনের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হবার চেষ্টা করেছি। সেখানে বিনা পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থা চলছে না। এখানে শিক্ষাব্যবস্থার সকল দিক নিয়ে আলোচনা করছি না। মাধ্যমিক স্তরের শুরু থেকেই মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। প্রাথমিক স্তরেই শিশুদের মধ্যে কার কেমন মান তা যাচাই করা হয়। এর ভিত্তিতেই মাধ্যমিক স্তরে যখন সবাই ভর্তি হয় তখন মেধা ও যোগ্যতার বিচারে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তিনটি সেকশনে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক সেকশনের জন্য উপযোগী ক্লাস টিচারের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়।

(১) মেধাবীদের সেকশন। এদের সম্পর্কে বিবেচনা করা হয় যে, এরা উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্য এবং কর্মজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরাই নেতৃত্ব দেবে বলে আশা করা যায়। এদেরকে পাঠদানের মান স্বাভাবিক কারণেই অধিকতর উন্নত।

(২) মধ্যম মানের ছাত্র-ছাত্রীদের সেকশন আলাদা। এদের মধ্যে কিছুসংখ্যক উচ্চশিক্ষার যোগ্য হতেও পারে। সাধারণত এদের সংখ্যা বেশি। এদেরকে এদের উপযোগী মানে শিক্ষাদান করা হয়।

(৩) সবচেয়ে নিম্ন মানের যারা, তাদেরকে তৃতীয় সেকশনে রাখা হয়। ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে শিক্ষালাভ করা বাধ্যতামূলক। এ বয়স পর্যন্ত এদেরকে যতটুকু শেখানো সম্ভব তা শেখাবার চেষ্টা করা হয়। এরা সাধারণত Unskilled labour (অদক্ষ শ্রমিক) হয়ে থাকে।

এ তিন সেকশনের মধ্যে প্রথম সেকশনের ছেলে-মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও দার্শনিক হিসেবে গড়ে উঠে।

যারা মধ্যম মানের তারাই সব রকম টেকনিক্যাল পেশার যোগ্য হয়ে গড়ে উঠে। এরাই সকল শিল্পকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি পেশার দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দায়িত্ব পালনের যোগ্য হয়।

মেধার দিক দিয়ে সর্বনিম্নমানের সেকশনের এক শিক্ষক থেকে স্কুলের অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হলাম। উক্ত শিক্ষক একজন পাকিস্তানি এবং জামায়াতে ইসলামীর ওখানকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বলেন, এদের শিক্ষক হিসেবে ব্রিটিশ

www.bjilibrary.com

আদিবাসী কেউ দায়িত্ব নিতে রাজি হয় না। তাই এদেরকে শিক্ষাদান করার জন্য বিদেশীদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং তাদেরকে ভালো বেতন দেওয়া হয়, যাতে টাকার মায়ায় এ দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

উক্ত শিক্ষক বলেন, স্কুলে নির্দিষ্ট এলাকায় এরা ইনডোর ও আউটডোর খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে। লেখাপড়ার ধার ধারে না। পরীক্ষা দিতে চায় না, দিলেও আজে বাজে কথা লিখে। পাঠ্য বই না পড়লে পরীক্ষায় কী লিখবে?

স্কুলে সহশিক্ষা চালু রয়েছে। ক্লাস সেভেন থেকেই ছেলে-মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করতে থাকে। ক্লাস নাইন-টেনের ছেলে-মেয়েদের ক্লাস নেওয়া সবচেয়ে কঠিন।

আইন এদেরকে বাধ্য করে স্কুলে আসতে। না এলে অভিভাবকদের জরিমানা দিতে হয় বলে সবাই ছেলে-মেয়েদেরকে স্কুলে আসতে বাধ্য করে। স্কুল কর্তৃপক্ষের চাপে এরা ক্লাসে আসে। নাইন ও টেনের ক্লাসে যেয়ে শিক্ষক যদি সসম্মানে ফিরে আসতে পারে তাহলে যোগ্য শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হয়। এদেরকে গুড হিউমারে রেখে কিছু শেখাতে পারা বিরাট কৃতিত্বের কথা। শিক্ষক সাধ্যমতো চিৎকার করে অধিকাংশকে শোনাতে পারলেও কতক ছেলে হৈ-চৈ করতে থাকে। এমনকি ক্লাসের শেষ প্রান্তে ছেলে-মেয়ে আলিঙ্গন করে চুমো চুমি করে। শাসন করার প্রশ্নই উঠে না। সে চেষ্টা করলে সম্মান নিয়ে ক্লাস নিয়ে বিদায় হওয়া অসম্ভব।

১৪৫.

লেখার ধারাবাহিকতা

এ পর্যন্ত যা লেখা হয়েছে তাতে ১৯৭৩ সালের বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে। এরপর ১৯৭৪ সালের শুরু থেকে লেখার কথা। ইতোমধ্যে পাকিস্তানে ২০ দিনের সফর হয়ে গেলো। এ সফরের কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রথমত, মাওলানা মওদূদীর জন্ম-শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করা।

দ্বিতীয়ত, ছয়টি ইসলামী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে ২০০২ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ায় পাকিস্তানের রাজনীতিতে কেমন প্রভাব পড়েছে সে বিষয়ে অবহিত হওয়া।

তৃতীয়ত, সীমান্ত প্রদেশে ইসলামী ঐক্যশক্তির নিজস্ব প্রাদেশিক সরকার কায়েম করে তারা কতটুকু অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে তা জানা।

চতুর্থত, পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী বিভিন্ন ময়দানে কতটুকু অগ্রগতি লাভ করতে পারলো তা সরেজমিনে দেখা।

পঞ্চমত, মাওলানা মওদূদীর কবর যিয়ারত করা। ১৯৭৯ সালে যখন তিনি ইন্তিকাল করেন তখন আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে জানাযায় যাওয়া সম্ভব হয়নি। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত আমীর জনাব আব্বাস আলী খান জানাযায় শরীক হন। আমীরে জামায়াতের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভের পর পাকিস্তানে যাবার এটাই প্রথম সুযোগ হয়। মাওলানার মাযার যিয়ারত আমার জন্য বিরাট আবেগের বিষয়।

www.bjilibrary.com

এসব কারণেই ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করে এ বিষয়েই কয়েক কিস্তি লেখা সমীচীন মনে করছি। আমার এ লেখার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যও এসব আলোচনা অত্যন্ত উপাদেয় বিবেচিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার পাকিস্তান সফর

গত ৬ ও ৭ ডিসেম্বর লাহোরে এক বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান এ মহাসম্মেলনের আয়োজন করে। পাকিস্তানের আমীরে জামায়াত মুহতারাম কাযী হুসাইন আহমদ এ সম্মেলনে যোগদান করার জন্য দাওয়াতনামা পাঠান। সম্মেলনে আমার যোগদান করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীকে অনুরোধ করি। তিনি জামায়াতের বিদেশ বিভাগীয় কমিটি ডেকে সম্মেলনে আমার যোগদান করার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেন। আমীরে জামায়াত তদানীন্তন বিদেশ বিভাগীয় সেক্রেটারি হিসেবে অধ্যাপক আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহেরকেও সম্মেলনে যোগদান করার নির্দেশ দেন।

ইসলামী ব্যাংকের বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করা জরুরি বলে জনাব আবু নাসেরকে সম্মেলনের পরপরই ঢাকায় ফিরে আসতে হয়। পাকিস্তানে আমার কমপক্ষে দু'সপ্তাহ সফর করার কথা। তাই মুহতারাম আমীরে জামায়াত আমার সফরসঙ্গী হিসেবে সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী রিসার্চ একাডেমীর ডাইরেক্টর মাওলানা আবদুশ শহীদ নাসীমকে মনোনীত করেন।

করাচি রওয়ানা

আমরা তিনজন ৪ ডিসেম্বর একসাথেই করাচি রওয়ানা হলাম। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এবং ঢাকা মহানগর নেতৃবৃন্দ বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে আমাদেরকে বিদায় জানান।

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এক ঘণ্টা। আমার ঘড়িতে রাত যখন ১২টা তখন করাচিতে ১১টা। করাচি সময় সাড়ে ১১টায় বিমান করাচি কায়েদে আযম বিমানবন্দরে অবতরণ করলো। আমরা বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমানে সফর করলাম। ঢাকা-করাচি-ঢাকা রুটে একমাত্র বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সই যাতায়াত করে। অন্যান্য এয়ারলাইন্স অন্যত্র থেকে করাচি আসে এবং ঢাকার পরেও অন্য দেশে যাতায়াত করে থাকে।

করাচি বিমানবন্দরে কর্মরত বেশ কয়েকজন অফিসার আমাদেরকে ইমিগ্রেশনে পৌঁছার আগেই অভ্যর্থনা জানালেন। বুঝা গেলো যে, করাচি জামায়াত আগেই এ ব্যবস্থা করেছে, যাতে অল্প সময়ে আমাদের বের করে নিয়ে যেতে পারে।

ইমিগ্রেশনের সীমানা পার হওয়ার পর লাগেজ সংগ্রহ করে বিমানবন্দরে সাধারণ প্রবেশাধিকারের নিষিদ্ধ এলাকা পার হয়ে গেলে যাত্রীদের অভ্যর্থনাকারীদের দেখা পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, ইমিগ্রেশনের সীমানা পার হতেই জামায়াতের নেতৃস্থানীয় অনেকে আমাদেরকে নিষিদ্ধ এলাকায়ই অভ্যর্থনা জানালেন। হয়তো বিশেষ অনুমতি নিয়েই তারা নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করেছেন।

www.bjilibrary.com

এ অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে ছিলেন কেন্দ্রীয় জামায়াতের নায়েবে আমীর সিনেটর প্রফেসর আবদুল গফুর আহমদ, জামায়াতের করাচি মহানগর আমীর ডা. মেরাজুল হুদা সিদ্দিকী, করাচি থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ ও প্রাদেশিক সংসদের সদস্যগণ এবং মহানগর জামায়াতের নেতৃবৃন্দ।

দায়িত্বশীলগণ লাগেজ সংগ্রহের দায়িত্ব নিলেন। নিষিদ্ধ এলাকার ভেতরেই জামায়াত ও জমিয়তের (ছাত্র সংগঠন) হাজার দেড়েক রুকন ও কর্মী ঢুকে পড়লেন এবং ফুলের মালা দিয়ে আমাকে প্রায় ঢেকে ফেললেন। দুপুর রাতে এতো লোক এভাবে সমবেত হবে বলে আমার ধারণা ছিলো না।

তারা নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ও ইনকিলাব ইনকিলাব ইসলামী ইনকিলাব (বিপ্লব) ধ্বনিতে গোটা বিমানবন্দর কাঁপিয়ে তুললেন। তাদের আন্তরিকতা, মহব্বত ও জোশ দেখে আমি অভিভূত হলাম। অনুভব করলাম যে, বিশ্বের সর্বত্র যারাই ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় তারা দীনী রেশতায় গভীরভাবে আবদ্ধ।

সিনেটর গফুর আহমেদের গাড়িতে আমাকে আরোহণ করতে হলো। আমাদের গাড়ির বহর রাত একটায় জনাব জাভেদ ইকবাল নামে জামায়াতের মধ্যবয়সী এক রুকনের বাড়িতে পৌঁছলো। সেখানে রাতের খাবারের আয়োজন করা ছিলো। নেতৃবৃন্দের সাথে আমাদের খাবার কথা। বিমানে রাতের খাবার পরিবেশন করায় আমি খেতে না পারলেও সবার সাথে খাদ্যসভায় বসতে হলো। কিছু ফল খেয়ে তাদের সাথে শরীক হলাম।

যখন বিছানায় শুতে গেলাম তখন প্রায় রাত দুটো বাজে। সকাল সাড়ে আটটার ফ্লাইটেই লাহোর রওয়ানা হতে হবে। তাই ফজরের পর ঘুমাবার যথেষ্ট সময় পাওয়া গেলো না। এভাবে সফরের পয়লা দিন থেকেই অনিয়ম শুরু হয়ে গেলো।

১৪৬.

করাচি থেকে লাহোর পৌঁছলাম

করাচি থেকে বিমান সকাল আটটায় রওয়ানা হবার কথা। আমরা ৭টায়ই বিমাবন্দরে পৌঁছলাম। আমরা তিনজন যাত্রী। আমি, অধ্যাপক আবু নাসের ও মাওলানা আবদুশ শহীদ নাসিম। আমাদের মালামালের ওজন সমস্যা হবার কথা ছিলো না। কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইংরেজিতে লেখা আমার একটা বই বিলি করার জন্য ৮০০ কপি সাথে নিয়ে যাওয়ায় সমস্যা দেখা দিলো। বইটির নাম Political thoughts of Abul A'la Mawdudi. ৪৮ পৃষ্ঠার বই। মাওলানা নাসিমের তত্ত্বাবধানে শতাব্দী প্রকাশনী ভালো কাগজে বইটি প্রকাশ করেছে বলে যথেষ্ট ওজন হয়েছে। মাওলানা মওদূদী (র)-এর জন্ম-শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মাওলানার রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে রচিত বইটি বিলি হলে দেশ-বিদেশের অনেক লোকের হাতে বইটি পৌঁছে যাবে মনে করেই সাথে নিয়ে গেলাম।

আগের দিন ঢাকা থেকে করাচি বিমানবন্দরে পৌঁছলে সেখানে কর্মরত কর্মকর্তাদের যে আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিলো সে কথা স্মরণ করে আবু নাসের সাহেব একজন শ্মশ্রুধারী কর্মকর্তার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। নাসের সাহেবের উদ্দেশ্য

www.bjilibrary.com

সফল হলো। ঐ ভদ্রলোক আরও দু'জন কর্মকর্তাকে নিয়ে বোর্ডিং কার্ড সংগ্রহ করা পর্যন্ত সবকিছুই অল্প সময়ে সমাধা করলেন। নাসের সাহেব মন্তব্য করলেন, "আপনার নাম বিক্রয় করলাম।" আমার নাম বিক্রয়যোগ্য পণ্য হতে দেখে মনে মনে খুশিই হলাম।

পিআইএ'র বিমান সকাল সাড়ে আটটায় ছেড়ে ১০টায় লাহোর পৌঁছলো। সম্মেলনে বিদেশী মেহমানগণকে বিভিন্ন সময় অভ্যর্থনা জানাবার জন্য জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে বারবার বিমানবন্দরে হাজির হতে হচ্ছে। তা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল বেশ কয়েকজন আমাদেরকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানালেন। সম্মেলনের আয়োজনে দায়িত্বশীলগণের ব্যস্ত থাকাই স্বাভাবিক। তবুও যারা এলেন তারা হলেন, জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল সাইয়্যেদ মুনাওয়ার হাসান, নায়েবে আমীর জনাব আসলাম সলিমী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আশরাফ মালিক, বিদেশ-বিভাগীয় সেক্রেটারি জনাব আবদুল গাফফার আযীয, পাঞ্জাবের সাবেক প্রাদেশিক আমীর হাফিয মুহাম্মদ ইদরিসী ও লাহোর মহানগর আমীর মিয়া মাকসূদ আহমদ।

সেক্রেটারি জেনারেলের গাড়িতে আমাকে বসানো হলো। আমীরে জামায়াত কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, সামান্য জ্বর থাকায় তাঁকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখা হয়েছে, যাতে পরদিন সম্মেলনে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। মুনাওয়ার সাহেব জানালেন যে, 'আইওয়ানে ইকবাল' নামে লাহোরের সবচেয়ে বড় হলে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আর হলের অতি নিকটে অবস্থিত 'হলিডে ইন্' নামক হোটেলে মেহমানদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে যানবাহন সমস্যার সমাধান সহজ হয়। আমাদের তিনজনকেও ঐ হোটেলেই থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

আমি শীতের দেশেও রোজ দুপুরে গোসল না করলে খেয়ে তৃপ্তি পাই না। তাছাড়া সফর করে কোথাও পৌঁছলে গোসল করে সফরটা ধুয়ে ফেলে দেই। গোসল না করা পর্যন্ত সফর যেন গায়ে লেগেই থাকে। সেদিনটা ছিলো শুক্রবার। গোসল করে এক মসজিদে জুমুআর নামায আদায় করে হোটেলে ফিরে খেয়ে ঘুমালাম। গত রাতের ঘুমের বকেয়া কিছুটা আদায় হলো। সফরের ক্লান্তি একটু লাঘব হলো।

মাওলানা মওদূদীর কবর যিয়ারত

পরের দিন শনিবার ৬ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হবার কথা। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ৫ তারিখ সন্ধ্যায়ই যিয়ারতে যাবো। জামায়াতের কেন্দ্রীয় দপ্তরে যোগাযোগ করে সময়সূচি ঠিক করা হলো, যাতে গাড়ির ব্যবস্থা করা হয় এবং মাওলানা মরহুমের ছেলেরা ঐ সময় উপস্থিত থাকেন।

হোটেল থেকে আমাদের তিনজনকে নিয়ে মাগরিবের আগেই গাড়ি রওয়ানা হলো। ধারণা ছিলো যে, আমরা ইছরায় গিয়ে নামাযের আগেই পৌঁছবো। ৫/এ যাইলদার পার্ক যে মহল্লায় অবস্থিত, এর নাম ইছরাহ। কিন্তু রাস্তায় ভিড়ের দরুন পথেই এক মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করে নিতে হলো।

৫/এ যাইলদার পার্কের বাড়িটি জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের ইতিহাসের পূর্ণ স্মৃতি বহন করে। ১৯৪৮ সাল থেকে এ বাড়িটির একাংশেই আমীরে জামায়াত মাওলানা মওদূদী সপরিবারে বসবাস করতেন এবং বাকি অংশে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস

www.bjilibrary.com

অবস্থিত ছিলো। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে এ বাড়িতেই সর্বপ্রথম মাওলানার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। ১৯৭২ সালের নভেম্বরে এ বাড়ি থেকেই মাওলানার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হজ্জ উপলক্ষে পাকিস্তান থেকে বের হই।

গাড়িতে বসে বসে হিসাব করে দেখলাম, ৩১ বছর পর ঐ বাড়িতে যাচ্ছি, যেখানে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর কমপক্ষে তিন-চারবার গিয়েছি। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও মজলিসে আমেলার বৈঠকে বছরে ২+২=৪ বার যোগ দিতে হতো। এছাড়াও আয়ুবের স্বৈরশাসনামলে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রয়োজনেও ১৯৬২ থেকে '৭০ পর্যন্ত বেশ কয়েকবারই লাহোরস্থ এ বাড়িতে গিয়েছি। এসব স্মৃতিচারণ করতে করতে সেখানে পৌঁছলাম।

ঐ বাড়িটি প্রথমে ভাড়ায় নেওয়া হয়। বাড়ির মালিক বাড়িটি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত জানালে জামায়াত সংগঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে বাড়িটি কিনে নেয়। কিন্তু বাড়ির যে অংশে মাওলানা সপরিবারে অবস্থান করছিলেন সে অংশের টাকা তিনি নিজে আদায় করেন। জামায়াতের আন্তরিক ও আবেগময় অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি বিনামূল্যে বসত-বাড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে কিছুতেই রাজি হননি।

মাওলানা মওদূদী (র)-এর ছয় ছেলের মধ্যে দু'জন আমেরিকায়। বড় ছেলে ওমর ফারুক ২৬ বছর সৌদি আরবে ছিলেন। বর্তমানে লাহোরে নিজস্ব বাড়িতে থাকেন। মাওলানার ঐ বাড়িটিতেই চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ছেলে থাকেন। আমরা বাড়িতে পৌঁছে চতুর্থ ছেলে মুহাম্মদ ফারুক ও কনিষ্ঠ ছেলে খালেদ ফারুককে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ পাই। তারা দু'ভাই আমাদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

৫/এ যাইলদার পার্ক বাড়িটি একটি কারণে বিশেষভাবে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত সবার নিকট নামেই পরিচিত। বহু বছর বাড়ির আঙ্গিনায় প্রতিদিন আসরের নামাযের জামাআতের পর মাওলানার 'বিকালের আসর' বসতো। যে কেউ পূর্ব যোগাযোগ ছাড়াই ঐ বৈঠকে হাজির হবার এবং মাওলানাকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেতো। তিনি যে জওয়াব দিতেন তা প্রশ্নসহ নোট করে রাখায় পরবর্তীতে 'বিকালের আসর' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। বাংলায় এ সবের তরজমাও বাজারে চালু আছে। তাই ৫/এ যাইলদার পার্ক নামক বাড়িটি সুপরিচিত।

মরহুম আব্বাস আলী খান মাওলানার জানাযা ও দাফনে শরীক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই জেনেছিলাম যে, ঐ আঙ্গিনার পূর্ব-দক্ষিণ কোণায় মাওলানাকে কবরস্থ করা হয়েছে। আমরা তিনজন মাওলানার দু'ছেলেসহ কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলাম। মদীনা শরীফে জান্নাতুল বাকী নামক কবরস্থানে গেট পার হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই দেখা যায়, কবর যিয়ারতের বেশ কয়েকটি দোয়া বড় বড় হরফে লেখা আছে। ঐ সবকয়টি দোয়াই আওয়াজ করে পড়লাম। মাওলানার প্রতি গভীর মহব্বতের কারণে দোয়ার সময় স্বাভাবিক আবেগ সৃষ্টি হলো। দোয়া শেষ করে মাওলানার দু'ছেলেকে এবং আমার দু'জন সাথীকে বললাম, "জীবনে এ বাড়িতে বহুবার এসেছি। কোন সময়ই এসে মাওলানাকে অনুপস্থিত পাইনি। আজই প্রথম এ বেদনা বোধ করছি যে, আমি এলাম, আর মাওলানা অনুপস্থিত।" এ কথাগুলো বলার সময় আমি আবেগ সংবরণ করতে পারিনি।

www.bjilibrary.com

মাওলানার কবরের পাশেই তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রীর কবর রয়েছে। মাওলানার ইন্তিকালের ২৪ বছর পর ৯০ বছর বয়সে গত বছর তিনি ইন্তিকাল করেন। কবর দুটোকে লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। অত্যন্ত সাদাসিধে অবস্থায়ই আছে। কবর মাটি দিয়ে উঁচু করে রাখা দেখলাম, বাঁধাই করা হয়নি। এটাই শরীআতের বিধান। কবর দুটো লন থেকে প্রায় চারফুট উঁচু স্থানে রয়েছে। লন থেকে তিনটি সিঁড়ি বেয়ে লোহার গেট দিয়ে কবরের কাছে যেতে হয়। এ বাড়িতে এলে যে মানুষটিকে দেখে চোখ ও প্রাণ জুড়াতো, আজ শুধু তাঁর কবর দেখে অতৃপ্ত হৃদয় নিয়েই ফিরে এলাম।

মানসূরাহ গমন

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় অফিস কমপ্লেক্সের নাম 'মানসূরাহ'। ১৯৭২ সালে মাওলানা মওদূদী (র)-এর মানসূরাহ মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে আমি তাঁর পাশেই উপস্থিত ছিলাম। লাহোর থেকে মুলতান যাবার পথে মুলতান রোডেই কয়েক একর জমি নিয়ে কেন্দ্রটি শুরু হয়। জামায়াতের কেন্দ্রীয় যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অফিসাদি, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বাসভবন, সম্মেলনের উপযোগী হল, বিশাল মসজিদ ইত্যাদি মিলে এ কমপ্লেক্স তৈরির পরিকল্পনা সামনে রেখেই মাওলানা সর্বপ্রথম মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। আরও সিদ্ধান্ত ছিলো যে, জামায়াতের রুকনদের মধ্যে যাদের সাধ্য আছে তারা যেন এর আশেপাশে বসতবাড়ি তৈরি করেন, যাতে ঐ এলাকায় এমন একটি মহল্লা গড়ে উঠে, যেখানে জামায়াতের একটি জনশক্তি সৃষ্টি হয়।

মসজিদের ভিত্তি স্থাপনের সাত বছর পর মাওলানার ইন্তিকাল হয়। এ সময়ের মধ্যেই মসজিদ ও অফিসের নির্মাণকাজ সমাধা হয়ে যায় এবং ৫/এ যাইলদার পার্ক থেকে অফিস মানসূরাহ স্থানান্তরিত হয়। আমি ঐ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ৩১ বছর পর লাহোর গেলাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয়দের যারা মানসূরাহ বিভিন্ন সময় গিয়েছেন তাদের কাছ থেকে কিছু ধারণা পেলেও স্বচক্ষে দেখার সুযোগ ইতঃপূর্বে হয়নি।

মাওলানার মাযার যিয়ারতের পরই আমরা মানসূরাহ গেলাম। গাড়ি যখন জামায়াতের সাবেক আমীর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদের বাসার সামনে পৌঁছলো তখন তিনি মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যে গেট থেকে বের হচ্ছিলেন। আমার আসার খবর পেয়ে তিনি থামলেন এবং আমাকে নিয়ে আবার বাসায় প্রবেশ করলেন। বৈঠকখানায় আমাদেরকে নিয়ে বসার আগে পূর্বের মতোই মযবুতভাবে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন। আমার সাথী দু'জনের সাথেও কোলাকুলি করলেন। মিয়া সাহেব বেশ জোরে চেপে ধরেই আলিঙ্গন করে থাকেন। বর্তমান ৯০ বছর বয়সেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

১৯৫৫ সালে যখন আমি প্রথম লাহোর গেলাম তখন থেকে ৭২ সালের শেষ দিক পর্যন্ত মিয়া সাহেব জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। তিনি বহুবার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তান সফর করেন। তাঁর সাথে একটানা ১৮ বছরের ঘনিষ্ঠতা। ১৯৭২ সালে মাওলানা মওদূদী আমীরের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন এবং মিয়া সাহেব আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমি দেশে আসার পূর্বে সৌদি আরব, দুবাই, লন্ডন প্রভৃতি স্থানে জামায়াতের আমীর হিসেবে বেশ কয়েকবার মিয়া সাহেবের সাথে দেখা হয়।

www.bjilibrary.com

মাওলানা মওদূদী আমীর থাকাকালে তাঁকে 'আমীরে জামায়াত' বলে সম্বোধন করা হতো না। শুধু মাওলানা বলেই সবাই সম্বোধন করতো। 'মাওলানা সাহেব'ও বলা হতো না। তেমনিভাবে মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ আমীর নির্বাচিত হবার পরও সবাই তাকে আগের মতোই মিয়া সাহেব বলে সম্বোধন করতো। জামায়াতের বর্তমান আমীর কাযী হুসাইন আহমদকে সবাই কাযী সাহেব বলেই সম্বোধন করে থাকেন। আমীরে জামায়াত বলে সম্বোধনের রেওয়ায আগেও যেমন ছিলো না, এখনও নেই।

১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর নির্বাচিত হবার পর থেকে আমাকে সবাই আমীরে জামায়াত বলেই সম্বোধন করা শুরু করলো। জামায়াতের কর্মপরিষদে এ বিষয়ে আমি আপত্তি উত্থাপন করে বলেছি যে, আমি যখন আমীর থাকবো না তখন আমাকে কিভাবে সম্বোধন করা হবে? আমাকে আযম সাহেব বা অধ্যাপক সাহেব বলে সম্বোধন করা যেতে পারে। কিন্তু আমার সাথীগণ আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় এখনও আমীরে জামায়াত বলার সাথে সাবেক শব্দটি যোগ করে ডাকা হয়। মাওলানা দেলাওয়ার হুসাইন সাঈদী তো এখনো আমীরে জামায়াত বলে ফেলেন। আপত্তি করলে বলেন যে, পুরাতন অভ্যাস সহজে ছাড়ানো যায় না। এমনকি বর্তমান আমীরে জামায়াত ২০০১ সালে নির্বাচিত হবার পর বেশ কয়েকবার আমাকে পূর্বের অভ্যাসমতো আমীরে জামায়াত বলে সম্বোধন করে সাথে সাথেই ভুল বুঝতে পেরে মুচকি হেসেছেন।

অপ্রাসঙ্গিক কথা এসে গেলো প্রসঙ্গক্রমেই। যা হোক, মিয়া সাহেবের বৈঠকখানায় কিছু সময় বসার পর এশার নামাযের উদ্দেশ্যে সবাই মসজিদে গেলাম। মসজিদের প্রধান বিল্ডিং-এ-ই এক সাথে হাজারখানেক লোক নামায পড়তে পারে। এরপর বারান্দা, বারান্দার পর বিশাল চত্বর। মসজিদের ইমাম একজন হাফিয ও ক্বারী। চমৎকার কিরাআত পড়েন।

নামাযের শেষে মিয়া সাহেবের বৈঠকখানায় আবার বসতে হলো। চা-নাশতা ছাড়া বিদায় দিতে রাজি হলেন না। মানসূরার আরও যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সাথে পরিচয় করানো হলো। মানসূরাহ ঘুরে দেখার জন্য রাতের বেলা সুবিধা হবে না বলে মিয়া সাহেবের বাসা থেকেই হোটেলে ফিরে গেলাম। ৬ ও ৭ তারিখে সম্মেলন সমাপ্ত হবার পরদিন সকাল ১০টায় সকল বিদেশী মেহমানকেই মানসূরাহ দেখানো হবে জেনে আশ্বস্ত হলাম।

আমীরে জামায়াতের সাথে সাক্ষাৎ

মানসূরাহ থাকাকালেই জানা গেলো যে, আমীরে জামায়াত মুহতারাম কাযী হুসাইন আহমদ হোটেলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যাতে বিদেশী মেহমানদের সাথে দেখা হয় এবং পরদিন সম্মেলনে যথাসময়ে উপস্থিত হওয়া সহজ হয়। আমরা হোটেলে পৌঁছার পরপরই তিনি হোটেলে পৌঁছে গেছেন বলে জানতে পারলাম। সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আশরাফ মালিককে আমাকে দেখা-শোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। তাকে বললাম যে, আমি আমীরে জামায়াতের কামরায় দেখা করতে যেতে চাই। অল্পসময় পরই আমীরে জামায়াত আমার কামরায় হাজির হয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। এর পরপরই নায়েবে আমীর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ এলেন। বিদেশ বিভাগীয় দায়িত্বশীল যাকে ডাইরেক্টর বলা হয় জনাব আবদুল গাফফার আযীযও উপস্থিত ছিলেন।

www.bjilibrary.com

গত ২০০২-এর অক্টোবরের নির্বাচনে কাযী সাহেব সোয়াত ও সীমান্তের নওশেরা জেলা থেকে দাঁড়িয়ে দু'আসনেই বিজয়ী হন এবং তাঁর জন্মস্থান নওশেরা আসনটি বহাল রেখে অপরটি ছেড়ে দেন। মুত্তাহিদা মজলিসে আমল নামে ইসলামী ছয় দলীয় জোটের জাতীয় সংসদের সংসদীয় দলের তিনি নেতা নির্বাচিত হন। আর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে মাওলানা মওদূদী তারজুমানুল কুরআন নামক যে মাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করেন, প্রফেসর খুরশিদ আহমদ বর্তমানে ঐ মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। এর আগে মরহুম জনাব খুররাম মুরাদ সম্পাদক ছিলেন। এ পত্রিকাটি এখনও ইসলামী আন্দোলনের নকীবের ভূমিকা পালন করছে। এ পত্রিকাটি নিয়মিত আমার নিকট আসে। এতে আমি যথেষ্ট খোরাক পাই এবং প্রফেসর সাহেবের সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাই।

উপহার সামগ্রী

চকবাজারের আলিফ ক্যাপ গার্মেন্টিস-এর হাজী মুহাম্মদ সুবহান শাহ ঈদুল ফিতরের আগের রাতে বিভিন্ন ধরনের এক ডজন টুপি দিয়ে পাঠালেন। যিনি নিয়ে এলেন তিনি চকবাজারে এসব টুপি বিক্রয় করেন। ঘটনাক্রমে তিনি ছাত্রজীবন থেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত। তিনি জানালেন যে, টুপির মালিক হাজী সাহেব নাকি আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট। কারণ এক বছর আগে মন্ত্রী, মেয়র, এমপিসহ মোট ২০ জনকে তিনি টুপি উপহার পাঠিয়েছিলেন। একমাত্র আমিই নাকি ফোনে শুকরিয়া জানিয়েছিলাম। এবার পাঠানো কয়েক পদের টুপির মধ্যে এক পদের টুপি আমার খুবই পছন্দ হলো।

পাকিস্তান রওয়ানা হবার আগে আমার সফরসঙ্গী মাওলানা আবদুশ শহীদ নাসিম সাহেবের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিলাম যে, ওখানকার নেতৃবৃন্দের জন্য উপহার হিসেবে কয়েক ডজন টুপিই নিয়ে যাবো। সমস্যা দেখা দিলো যে, ঈদের কারণে কয়েকদিন কারখানা ও দোকান বন্ধ থাকবে। হাজী সাহেবকে মোবাইলে ফোন করে তার শ্বশুর বাড়িতে ভোলায় পাওয়া গেলো। তাকে জানালাম যে, আমি তার টুপি খুবই পছন্দ করেছি। কয়েক ডজন কিনতে চাই, বিদেশে নিয়ে উপহার দেবার জন্য। তিনি খুশি হয়ে বললেন যে, দোকান বন্ধ থাকলেও তিনি ফোনে জানিয়ে দিচ্ছেন, যেন আমার জন্য দোকান খুলে নির্দিষ্ট একটা সময়ে। সে হিসেবে দোকানে গিয়ে দু'রকম সাইজের তিন ডজন টুপির অর্ডার দিয়ে এলাম। যেদিন যেয়ে টুপি আনার কথা সেদিন বিকেল পর্যন্তও আমি লোক পাঠাতে পারিনি। দোকান থেকে ফোন করে জানালো যে, তিন ডজন টুপি নিয়ে এক লোককে পাঠাচ্ছেন। টুপি দিয়ে গেলো। কিন্তু কোন বিল দিলো না। জিজ্ঞেস করলে বললো যে, টাকা নাকি দেওয়া লাগবে না। এসব টুপির খুচরা মূল্য ৬০ থেকে ৭৫ টাকা। কিন্তু টাকা দেবার সুযোগ পেলাম না।

লাহোর হোটেলে যখন আমীরে জামায়াত ও নায়েবে আমীর আমার কামরায় এলেন, তখন আমি দু'ডজন টুপি মানসূরায় বিলি করার জন্য দিলাম। আমীরে জামায়াত একটি টুপি মাথায় দিলেন। মাপ ঠিক মতোই হলো। টুপির কোয়ালিটির প্রশংসা করলেন। আমি একটি টুপি প্রফেসর খুরশিদের মাথায় পরিয়ে দিলাম। টুপির তুলনায় মাথা একটু

www.bjilibrary.com

বড়। তিনি বললেন, আপনার হাতে পরিয়ে দেওয়া টুপি আমি অবশ্যই নেবো। কাযী সাহেবের মেয়ের ঘরের ১৫ বছর বয়সের এক নাতি সাথে এসেছিলো। এর মাথায়ও একটা টুপি পরিয়ে দিলেন। কাযী সাহেব বললেন, তোমার খোশ কিসমত।

আমার স্ত্রী আমীরে জামায়াতের স্ত্রীর জন্য বাহরাইন থেকে পাওয়া খুবই চমৎকার রঙের বোরকার কাপড় দিয়েছিলেন। এটা কাযী সাহেবের হাতে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার নাতির হাতে দিয়ে বললেন, আজই তোমার নানীর হাতে পৌঁছে দিয়ে জানাও যে, বাংলাদেশ থেকে উপহার হিসেবে এসেছে।

পকেটে রেখে ব্যবহার করা যায় এমন ছোট্ট একটি আতরের শিশিতে গোলাপের আতর ভরে কাযী সাহেবের জন্য নিয়েছিলাম। তিনি এ মহব্বতের উপহার পেয়ে খুব খুশি হলেন। আমি বললাম, গোলাপের আতর সহজে পাই না। এবার পেয়ে আপনাকে দিলাম, যাতে ব্যবহার করার সময় আপনার ভাইকে মনে পড়ে।

১৪৭.

সম্মেলনে আগত মেহমান

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীর জন্ম-শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বহু দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদগণকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিলো। কতক দেশের ক্ষুদ্রমনা ও ইসলাম বিদ্বেষী সরকার যাদেরকে আসতে দেয়নি এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন আরব বিশ্বের প্রখ্যাত ইসলামী আন্দোলন 'ইখওয়ানুল মুসলিমূনের' 'মুরশিদুল আম' মামূন আল হুদাইবি। মিসর সরকার কায়রো বিমানবন্দর থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেয়। সত্তরের দশকে ড. হাসানুল হুদাইবি ইখওয়ানুল মুসলিমূনের মুরশিদুল আম ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি হজ্জ উপলক্ষে সৌদি আরব এসেছিলেন। আমিও সে বছরই প্রথমে হজ্জে যাই। তাঁর সাথে জেদ্দাহ ও মিনায় সাক্ষাৎ হয়। মামূন আল হুদাইবি তাঁরই যোগ্য সন্তান। তিনি গত ৯ জানুয়ারি (২০০৪ সালে) হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কায়রোতে ইন্তিকাল করেন। মাত্র ১৪ মাস আগে পঞ্চম মুরশিদুল আমের ইন্তিকালের পর এ পদে তিনি অধিষ্ঠিত হন।

মুরশিদ মানে পথপ্রদর্শক বা নেতা। 'ইখওয়ানুল মুসলিমূন' সংগঠনের প্রধানের জন্য এ পদবি নির্ধারণ করে। আম মানে সর্বজনীন। মুরশিদুল আম মানে সর্বজনীন নেতা। মামূন আল হুদাইবি শুধু মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমূনের নেতা ছিলেন না; আরব বিশ্ব ও পৃথিবীর যেসব দেশে ইখওয়ানদের যত সংগঠন আছে তিনি তাদের সবারই নেতা ছিলেন। এ আন্তর্জাতিক সংগঠনের যত শাখা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রয়েছে এর শাখা প্রধানদের পদবি হলো মুরাকিবে আম। 'মুরাকিব' শব্দের অর্থ হলো তত্ত্বাবধায়ক। জর্ডান ও সুদানের মুরাকিবে আম সম্মেলনে উপস্থিত হন। তাদের নাম যথাক্রমে শায়খ আবদুল মজীদ আয-যানীবাত ও শায়খ সাদেক আবদুল্লাহ আবদুল মাজেদ। জর্ডান থেকে ইসলামী ফ্রন্ট প্রধান শাখা আবদুল হামীদ আল কুযাত ও ইসলামী এ্যাকশন ফ্রন্টের

www.bjilibrary.com

সেক্রেটারি জেনারেল শায়খ হামযা মানসূর সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তারা সবাই বক্তৃতা করেন।

সুদান সরকারের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক ডাইরেক্টর ড. কামাল ওবায়দ, মালয়েশিয়ার ইসলামী পার্টি (পাস) বিদেশ বিষয়ক ব্যুরোর চেয়ারম্যান ও পার্লামেন্ট সদস্য ড. হাত্তা রামলি ও পাস-নেতা আহমদ আওয়াং, কুয়েতের ইখওয়ান নেতা মুস্তফা মুহাম্মদ তাহহান, মরক্কো ইসলামী আন্দোলনের নির্বাচিত নেতা আবূ যায়েদ ইদরিসী, লেবাননের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ফাতহী ইকন, তিউনিসিয়ার 'আন-নাহদা' আন্দোলনের নির্বাচিত নেতা শায়খ রাশেদ আল গানুশী, ইরানের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের দায়িত্বশীল মাওলানা ইসহাক মাদানী, ফিলিস্তিনের মাসজিদুল আকসার সাবেক ইমাম শায়খ সিয়াম, ইসলামী সার্কেল অব নর্থ আমেরিকার নেতা ড. যাহেদ হুসাইন বোখারী ও নেপাল ইসলামী সংঘের সেক্রেটারি জেনারেল জনাব নজরুল হাসান আমন্ত্রিত মেহমান হিসেবে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বিদেশী মেহমানদের মধ্যে দু'জনই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একজন হলেন মিসরের অধিবাসী ও কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খ ড. ইউসুফ আল কারদাভী। তিনি ইখওয়ানুল মুসলিমূনের চিন্তানায়ক হিসেবে গণ্য। তার লেখা বিরাট দুটো গ্রন্থ 'ইসলামে হালাল ও হারাম' এবং 'ইসলামে যাকাতের বিধান' বাংলা ভাষায় অনূবাদ করেন মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম। ১৯৭৯ সালে তিনিই মাওলানা মওদূদীর জানাযায় ইমামতি করেন। কাবা শরীফের ইমামেরই এ জানাযায় ইমামতী করার কথা ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি উপস্থিত হতে পারেননি।

দ্বিতীয় প্রধান মেহমান ছিলেন ইরানের আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ আলী তাসখীরী। তিনি ইরানভিত্তিক আন্তর্জাতিক আন্তঃমাযহাব সম্পর্কোন্নয়ন সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন

৬ ডিসেম্বর সকাল এগারোটায় উদ্বোধনী অধিবেশন শুরু হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর এবং বর্তমানে এদারায়ে মাআরিফে ইসলামীর সভাপতি মিয়া তোফায়ল মুহাম্মদ, যার বয়স ৯০ বছর। এ অধিবেশনের প্রধান আকর্ষণ ছিলো জামায়াতের আমীর কাযী হুসাইন আহমদের দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধনী ভাষণ।

প্রোগ্রাম অনুযায়ী উদ্বোধনী ভাষণের পর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেবার জন্য তিনটি নাম ছিলো এবং প্রধান বক্তা ছিলেন জর্ডানের ইখওয়ান নেতা শায়খ আবদুল মজীদ আযযানিবাত। সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্য যে তিনজনের নাম ছিলো এর মধ্যে প্রথম নাম আমার। দ্বিতীয় নাম আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ আলী তাসখীরী ও তৃতীয় নাম লেবাননের ড. ফাতহী ইকন।

সম্মেলন পরিচালনা করছিলেন জামায়াতের বিদেশ বিভাগের ডাইরেক্টর জনাব আবদুল গাফফার আযীয। তিনি আরবী ও উর্দু ভাষায় সমান পারদর্শী। ঘোষণা দু'ভাষায় তিনি দিতেন। আরবী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতার সারকথা উর্দুতে শুনিয়ে দিতেন। তিলাওয়াতে কুরআন ও নাতে রাসূলের পর কাযী হুসাইন আহমদের উদ্বোধনী ভাষণের ঘোষণার অপেক্ষা করছি। কিন্তু ঘোষক সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্য আমার নাম ঘোষণা করায় অত্যন্ত বিস্মিত হলাম ও বিব্রতবোধ করলাম। ঘোষক ভুল করলেন কি না বুঝার জন্য তাঁর দিকে

www.bjilibrary.com

তাকালাম। তিনি আমাকে মাইকের সামনে হাজির হতে ইশারা করলেন। অগত্যা হাজির হলাম। মাত্র মিনিট দশেক বক্তব্য রাখলাম।

ইংরেজিতে বক্তৃতা শুরু করলে আবু নাসের সাহেব এসে কানে কানে বললেন যে, কাযী সাহেব উর্দুতে বলতে অনুরোধ করছেন। কিন্তু আমি সে অনুরোধের মর্যাদা রক্ষা করা সমীচীন মনে না করে ইংরেজিতেই বলতে থাকলাম। এর কারণ কাযী সাহেবকে পরে অবহিত করেছি। আমার এ বক্তব্যের সারকথা নিম্নরূপ ঃ

"এ সম্মেলনে বহু দেশ থেকে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ মেহমান হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই ইসলামের পুনরুজ্জীবনে মাওলানা মওদূদী (র)-এর অবদানের মূল্যায়ন করে বক্তব্য রাখবেন। আমি এ বিষয়ে এমন চারজন ব্যক্তির মূল্যায়নমূলক বক্তব্য পেশ করতে চাই, যারা এখানে উপস্থিত নেই। তাদের মধ্যে দু'জন দুনিয়া থেকেই বিদায় হয়ে গেছেন। আমি তাদের মুখ থেকে সরাসরি যা শুনেছি তা আপনাদেরকে শুনাচ্ছি।

যে দু'জন দুনিয়ায় নেই তাদের একজন করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর ইতিহাসবিদ ড. ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী এবং অপরজন হলেন পাকিস্তানের এককালীন আইনমন্ত্রী এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী আল্লাবখস খোদাবখস ব্রোহী (এ.কে. ব্রোহী)। যে দু'জন এখনও বেঁচে আছেন তারা হলেন ইখওয়ানুল মুসলিমূনের মহান নেতা ফী যিলালিল কুরআন নামক বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরের লেখক শহীদ সাইয়েদ কুতুবের ছোট ভাই মক্কা উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ কুতুব এবং সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদী। একে একে তাদের বক্তব্য পেশ করছি ঃ

১. ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরের ঘটনা। মাওলানা মওদূদী পূর্ব-পাকিস্তান সফরে এলেন। ঐ সময় এ্যাডভোকেট এ. কে. ব্রোহীও শেখ মুজিবের এক মামলায় উকিল হিসেবে ঢাকায় এলেন। তখন ইঞ্জিনিয়ার খুররাম শাহ মুরাদ জামায়াতের ঢাকা শহরের আমীর ছিলেন। তিনি জামায়াতের পক্ষ থেকে এ দু'জনকে একই সাথে সংবর্ধনা দেবার আয়োজন করলেন।

   এ. কে. ব্রোহী সাহেব ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টে জামায়াতকে বেআইনী ঘোষণার বিরুদ্ধে মামলায় জামায়াতের পক্ষে উকালতি করে বিজয়ী হওয়ার কারণেই এ সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। গভর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মুহাম্মদের সময় তিনি পাকিস্তান সরকারের আইন মন্ত্রী থাকাকালে মন্তব্য করেছিলেন, "ইসলামী শাসনতন্ত্র আবার কী চিজ?" তখন জামায়াতের করাচি শহরের আমীর চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ তাঁর সাথে দেখা করে মাওলানা মওদূদীর লেখা Islamic Law and Constitution বইটিসহ আরও কতক ইসলামী সাহিত্য উপহার দিয়ে আসেন। এসব বই পড়ে তিনি সম্পূর্ণ বদলে গেলেন এবং মাওলানার লেখা তাফসীর তাফহীমুল কুরআন অধ্যয়ন করলেন।

   অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানটি তদানীন্তন হোটেল শাহবাগের হল রুমে (বর্তমানে সেখানে পিজি হাসপাতাল) অনুষ্ঠিত হয়। ব্রোহী সাহেবকে দেওয়া সংবর্ধনার জওয়াবে তিনি

www.bjilibrary.com

যে বক্তব্য রাখেন তাতে তিনি বলেন, "আমি জানি না মাওলানা কোনদিন রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে সফল হবেন কি না। তবে আমি মনে করি, তিনি ইসলামকে সঠিকরূপে আধুনিক শিক্ষিতদের নিকট পরিবেশন করতে পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন। তিনি আমাদের মতো শিক্ষিত বিভ্রান্তদেরকে পর্যন্ত ইসলামের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল করতে সক্ষম হয়েছেন। পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় প্রভাবিত অগণিত শিক্ষিত যেসব লোক ইসলামের ব্যাপারে হীনম্মন্যতাবোধ করতো তাদেরকে মুসলিম হিসেবে গৌরববোধ করার যোগ্য বানাতে পেরেছেন। এরচেয়ে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে?

২. এরপর ১৯৭২ সালের জুন মাসের কথা। মাওলানা মওদূদীর তাফসীর তাফহীমুল কুরআন লেখার সমাপ্তি উপলক্ষে লাহোরে এক বিরাট সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন ডক্টর ইশতিয়াক হোসাইন কুরাইশী এবং বিশেষ বক্তা ছিলেন ঐ এডভোকেট এ. কে. ব্রোহী। ড. কুরাইশী তাফহীমুল কুরআন সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "এ তাফসীর আমার মতো লক্ষ লক্ষ আধুনিক শিক্ষিত লোককে কুরআন অধ্যয়ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমরা শুধু সওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করতাম। এ তাফসীর আমাদেরকে কুরআন বুঝবার স্বাদ আস্বাদন করতে শিখিয়েছে। মানবজাতির হেদায়াত হিসেবে কুরআনকে বুঝবার যে প্রেরণা এ তাফসীর থেকে পেয়েছি এর আগে তা উপলব্ধি করার সুযোগই পাইনি।

৩. ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাস। মাওলানা মওদূদী তার দ্বিতীয় ছেলে ডাক্তার আহমদ ফারুক মওদূদীর তত্ত্বাবধানে আমেরিকায় চিকিৎসা শেষে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথে তিনদিন লন্ডনে ছিলেন। আমি তখন সেখানে বাধ্যতামূলক নির্বাসন জীবনযাপন করছি। মাওলানার সাথে তখনই আমার সর্বশেষ সাক্ষাৎ।

ইসলামী মিশন ইউকে-এর পক্ষ থেকে লন্ডনের এক হোটেলে মাওলানাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। আমিও মঞ্চে উপস্থিত ছিলাম। অতিথি বক্তা হিসেবে প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ কুতুব বলেন, "বিশ্বে সর্বকালে এবং সকল দেশেই আল্লাহ তাআলা ইসলামী চিন্তাবিদ পয়দা করেন। দুনিয়া কখনও ইসলামী চিন্তাবিদ থেকে খালি ছিলো না। বর্তমানেও আল্লাহর রহমতে বিশ্বের সব দেশেই চিন্তাবিদ রয়েছেন।

একটু মুচকি হেসে বললেন, আমাকেও কেউ কেউ তাদের মধ্যে গণ্য করেন। আজ আমি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছি, এ শতাব্দীতে গোটা বিশ্বে যারা ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে স্বীকৃত তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে আল উসতায আবুল আ'লা মওদূদী সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তির সাহায্যে আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী ভাষায় পরিবেশন করেছেন, যা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তাঁকে আমি দীনের উসতায হিসেবে অন্তর দিয়ে শ্রদ্ধা করি।

৪. সর্বশেষ ঘটনা ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের। ইংল্যান্ডে FOSIS (Federation of Students Islamic Societies) নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি সংগঠন আছে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েই Students Islamic Society আছে, এদের সম্মিলিত সংগঠনের নামই FOSIS। এদের পক্ষ থেকে প্রতিবছরই বার্ষিক

www.bjilibrary.com

সম্মেলন হয়ে থাকে। ১৯৭৫ সালে ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সম্মেলন হয় আগস্ট মাসে। ঐ সম্মেলনের Theme (প্রধান আলোচ্য বিষয়)। "Modern Concept of Islamic State And Government (ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে আধুনিক যুগের ধারণা)।

সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন সুদানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী সাদেকুল মাহদী। তিনি তখন ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন। জেনারেল নুমেরী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সুদানে সামরিক শাসন কায়েম করেন। নুমেরীর পতনের পর সাদেকুল মাহদী আবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

উক্ত সম্মেলনে আমি আমন্ত্রিত অতিথি ছিলাম। তাই প্রধান অতিথির বক্তৃতা সরাসরি শুনবার সুযোগ পেলাম। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলাম বলে তাঁর বক্তৃতা বিশেষ মনোযোগসহকারে শুনি।

মি. সাদেকুল মাহদী বক্তৃতার ভূমিকায়ই মাওলানা মওদূদীর মূল্যায়ন এমনভাবে করলেন যে, আমার অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো এবং পরম গৌরববোধ করলাম। তিনি বললেন, "আরবী ভাষায় এ সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এবং ইংরেজি ভাষায় এ বিষয়ে যত বইপুস্তক সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা অধ্যয়ন করেছি। আমার জন্য বিষয়টি অত্যন্ত জটিলই মনে হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার কোথাও এ যুগে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রাচীন রূপ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার সমন্বয় সাধন কেমন করে সম্ভব সে বিষয়ে সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করা বিরাট জটিল ব্যাপার। বিশ্বে বর্তমান এমন কোন মডেল কোথাও নেই বলে বিষয়টি আমার জন্য মোটেই সহজ মনে হলো না।

এ বিষয়ে আমার ব্যাপক অধ্যয়ন ও দুরূহ গবেষণা চলাকালে হঠাৎ এমন একটি গ্রন্থ পেয়ে গেলাম, যা আমার আলোচ্য বিষয়ের জন্য যথেষ্ট মনে হলো। বইটির নাম হলো Islamic Law And Constitution by Abul Ala Mawdudi, আমার গোটা বক্তব্য এ বইটি থেকে সংগ্রহ করেছি।"

আমি মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে উপরিউক্ত চারজনের মূল্যায়ন শুনিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

ঐ চারজনের মধ্যে ড. ইশতিয়াক হুসাইন কুরাইশী ছাড়া অন্য তিনজনই তাদের বক্তব্য ইংরেজি ভাষায় পেশ করেছেন। তাই তাঁদের মন্তব্য তাদের বলিষ্ঠ ভাষায় ইংরেজিতে প্রকাশ করাই আমি সঙ্গত মনে করলাম। কারণ উর্দু ভাষায় তাদের মূল্যায়ন সমান ওজনের ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব মনে হয়নি।

আমাকে দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান বক্তা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। কাযী সাহেব উদ্বোধনী অধিবেশনে এবং পরের দিন প্রথম অধিবেশনে শ্রোতাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আমার পরবর্তী বক্তৃতা উর্দুতেই হবে। উদ্বোধনী অধিবেশনে ইংরেজিতে বক্তৃতা করার কারণেই তিনি দু'দিনই এ ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন মনে করে থাকবেন।

www.bjilibrary.com

১৪৮.

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ

আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর ঘোষণা করা হলো যে, জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের মুহতারাম আমীর কাযী হুসাইন আহমদ এখন উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করছেন। ঘোষক জনাব আবদুল গাফফার আযীয আমার পাশের চেয়ারে এসে বসলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, উদ্বোধনী ভাষণের আগে নিয়ম ভঙ্গ করে আমাকে আগে বক্তব্য রাখতে দেওয়ার কারণ কী?

বললেন, কাযী সাহেব ইসলামী আন্দোলনে আপনাকে সিনিয়র হিসেবে সম্মান দিতে চান বলে তাঁরই নির্দেশে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সম্মেলনে প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে কাযী সাহেব অত্যন্ত বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে প্রধান আলোচ্য বিষয় ব্যানারে যা লেখা ছিলো তা হলো, 'ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও মুসলিম উম্মাহ'। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে মানবজাতির খিদমত ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। এ মহান দায়িত্বের অনুভূতি ও চেতনা যখন হারিয়ে যাচ্ছিলো, তখন প্রায় একই সময়ে আল্লাহ তাআলা আরব বিশ্বে ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ও দক্ষিণ এশিয়ায় সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদীকে এ দায়িত্ববোধ দান করেন। তারা মুসলিম উম্মাহকে জাগ্রত করার জন্য একই ধরনের আন্দোলন গড়ে তুলেন, যার ফলে গোটা বিশ্বে ইকামাতে দীনের আন্দোলন এগিয়ে চলছে। এ দুজনের আওয়াজ দুনিয়ায় ব্যাপকভাবে পৌঁছেছে। এ ছাড়াও তুরস্ক, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে একই ধরনের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। তাই ইসলামী আন্দোলন বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক শক্তিতে পরিণত হতে চলেছে।

বর্তমানে যারা দুনিয়ার ত্রাণকর্তা সেজেছে তারা ইসলামী শক্তির উত্থানের আশঙ্কায়ই পেরেশান। ইসলামী আন্দোলন সর্বত্র নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে ইসলামকে বিজয়ী করতে চায়। ইসলামের দুশমনরা মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাস বলে অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিনয় করছে। আমরা এমন এক সময়ে মাওলানা মওদূদী (র)-কে স্মরণ করছি, যখন পাশ্চাত্যের মোড়লরা মুসলিম দেশের শাসকদের মধ্যে ইসলামের দুশমনী করার যোগ্য লোকদেরকে বাছাই করে তাদেরকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখছে। কোন মুসলিম দেশে যাতে ইসলামী শক্তি ক্ষমতায় আসতে না পারে সে হীন উদ্দেশ্যে তারা জঘন্যতম ষড়যন্ত্র করছে।

এ কঠিন পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বিশ্বের সকল দেশের ইসলামী আন্দোলনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির গুরুত্ব অনুভব করেই এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। ইসলামবিরোধী সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এ সম্মেলনের মাধ্যমে চিন্তা ও কর্মের পূর্ণ ঐক্যের ভিত্তিতে একটি বলিষ্ঠ ঘোষণাপত্র রচনা করতে হবে, যাতে সর্বত্র একই মহান লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনকে পরিচালিত করা হয়।

www.bjilibrary.com

মুসলিম উম্মাহ তো একই উম্মত। আমরা নিজেদেরকে যতই বিভক্ত করে রাখি না কেন, ইসলামের দুশমনরা আমাদের সবাইকে মুসিলম হিসেবেই গণ্য করে এবং তাদের জন্য বিপজ্জনক মনে করে আমাদের সবাইকেই দাবিয়ে রাখতে চায়। আমরা নিজেদেরকে শিয়া, সুন্নী, দেওবন্দী, বেরেলভী, হানাফী, আহলে হাদীস ইত্যাদি নামে বিভক্ত করে নিজেদেরকে দুর্বল করে রেখেছি। মুসলিম শাসকরাও দীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ নয়। তাই দুশমনরা আমাদেরকে আক্রমণ করার সুযোগ নিচ্ছে। এ মুসীবত থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়ই হলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দীনের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। সত্যের পতাকাবাহীরা যদি ঝাণ্ডা উঁচিয়ে সমবেতভাবে এগিয়ে চলে তাহলে বাতিলের ধ্বংস অনিবার্য।

পাকিস্তানে সকল ফেরকাবন্দি খতম করে আমরা এক হওয়ার সাথে সাথে মুসলিম মিল্লাত জেগে উঠে শক্তির সৃষ্টি করেছে। উম্মতের ঐক্যই আল্লাহ তাআলার সাহায্য টেনে আনবে।

কাযী হোসাইন আহমদের কৃতিত্ব

জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর কাযী হোসাইন আহমদ ১৯৭৮ সালে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে ১০ বছর দায়িত্ব পালনের পর ১৯৮৭ সালে আমীর নির্বাচিত হন। এরপর আরও তিনবার নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। তিনি পাকিস্তানে ইসলামী শক্তির ঐক্যের প্রচেষ্টার সাথে সাথে বিশ্বের সকল ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের একটি ফোরাম গঠনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতার ধারক ও বাহকরা ইসলামের পুনর্জাগরণের আতঙ্কে বেসামাল হয়ে নানা বাহানায় ইসলামকে সন্ত্রাসী মতবাদ হিসেবে চিত্রিত করার জঘন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এবং সন্ত্রাস দমনের নামে আফগানিস্তান ও ইরাককে দখল করে নিয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কারণ তদন্ত না করেই এর জন্য মুসলমানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে পাশব প্রক্রিয়ায় প্রতিশোধ নিচ্ছে।

মুসলমানদের উপর এতো বড় অন্যায় করা সত্ত্বেও ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্রের একটি সংস্থা হিসেবে ওআইসি কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। তাদের মধ্যে এ বিষয়ে কোন রকম ঐকমত্যই সৃষ্টি হয়নি। বরং তাদেরই কয়েকটি আরব রাষ্ট্র তাদের দেশকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য আমেরিকাকে সুযোগ দিয়েছে। ৫৭টি রাষ্ট্রের একটি সংস্থা ঐক্যবদ্ধ থাকলে জাতিসংঘকে উপেক্ষা করে জর্জ বুশ এতো বড় সিদ্ধান্ত নিতে সাহস করতেন না।

সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় ওআইসি-এর শীর্ষ সম্মেলনে ড. মুহাম্মদ মাহাথির গোটা মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে ওআইসিভুক্ত দেশগুলোর করণীয় সম্পর্কে যে বলিষ্ঠ বক্তব্য রেখেছেন, সে আলোকে যে ধরনের সিদ্ধান্তমূলক ঘোষণা প্রয়োজন ছিলো, মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ঐক্যের অভাবে তেমন বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

এ পরিস্থিতিতে বেসরকারিভাবে বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সমন্বিত প্রচেষ্টায় যাতে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে জনগণকে ইসলামের পক্ষে ব্যাপকভাবে সক্রিয় করা সম্ভব হয় এ উদ্দেশ্যে কাযী হুসাইন আহমদই সবচেয়ে অগ্রসর ভূমিকা পালন করছেন। তিনি ঐ মহান উদ্দেশ্যে বেসরকারি পর্যায়ে পাকিস্তানে যে

www.bjilibrary.com

আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, আর কোন দেশেই ইসলামী আন্দোলনের পক্ষে এ পর্যন্ত এতোটুকু অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।

পাকিস্তানি ইসলামী শক্তির ঐক্য

পাকিস্তানের দেওবন্দী, বেরেলভী, আহলে হাদীস, হানাফী এমনকি শিয়া ফেরকাসহ 'মুত্তাহিদা মজলিসে আমল' (MMA) নামে একটি রাজনৈতিক প্লাটফরম তৈরি করার প্রধান কৃতিত্ব কাযী হুসাইন আহমদেরই। ২০০২ সালের অক্টোবরের জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের নির্বাচনে এমএমএ যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা ঐক্য ব্যতীত কিছুতেই সম্ভব ছিলো না।

পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মুশাররফের আদর্শ ব্যক্তিত্ব হলেন তুরস্কের কামাল পাশা। তিনি মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলটিকে অনুগত করে দেশটিকে তুরস্কের মতো ধর্মনিরপেক্ষ বানাবার যে পরিকল্পনা করেছেন, এমএমএ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তা প্রতিরোধ করছে। এমএমএ-ই এখন পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল। নাওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগ, ভুট্টোর পিপলস পার্টি ও আরও কয়েকটি ছোট দল মিলে ARD (Alliance for Restoration of Democracy) নামে যারা সরকারবিরোধী দল হিসেবে পার্লামেন্টে ভূমিকা পালন করছে তারা এমএমএ থেকে ছোট দল। তাই পার্লামেন্টে লিডার অব দি অপজিশন নিয়োগ করতে হলে এমএমএ থেকেই গ্রহণ করতে হয়। এমএমএ পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার কাযী হুসাইন আহমদ। পারভেজ মোশাররফ তাঁকে লিডার অব দি অপজিশন নিয়োগ দিতে অনিচ্ছুক বলে নির্বাচনের ১৫ মাস অতিক্রম হওয়ার পরও কোন বিরোধীদলীয় লিডার নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের রাজনৈতিক খবর খুব কমই প্রকাশিত হয়। আমি সেখানে যেয়ে জানতে পারলাম যে, LFW (Legal Frame Work) নামে একটি বিরাট চ্যাপ্টার পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে শামিল করা হয়েছে, যাতে প্রেসিডেন্টের হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়। এমএমএ এ দাবি তুলেছে যে, শাসনতন্ত্র সংশোধনের যে পদ্ধতি স্বয়ং শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে, একমাত্র সে পদ্ধতিতেই LFW-কে পার্লামেন্টে পেশ করতে হবে। প্রেসিডেন্ট এ দাবি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে, কারণ এমএমএ ছাড়া পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন সম্ভব নয়।

এমএমএ নামে যে ইসলামী ঐক্যজোট হয়েছে তা জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে। বিগত নির্বাচনের ফলে সীমান্ত প্রদেশে এমএমএ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে প্রাদেশিক সরকার গঠন করেছে। বেলুচিস্তানে সরকারি মুসলিম লীগ এমএমএ-কে নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়েছে। আগামী নির্বাচনে এমএমএ জাতীয় সংসদেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাযী হোসাইন আহমদের ব্যক্তিগত পরিচয়

কাযী হোসাইন আহমদ ১৯৩৮ সালে সীমান্ত প্রদেশের প্রখ্যাত দেওবন্দী আলেম মাওলানা কাযী মুহাম্মদ আবদুর রবের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতার ধর্মীয় জ্ঞান ও রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে তিনি অবিভক্ত ভারতের জাতীয় ওলামা সংগঠন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সীমান্ত প্রদেশের সভাপতি নির্বাচিত হন।

www.bjilibrary.com

কাযী সাহেব পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওগ্রাফিতে এমএসসি ডিগ্রি নিয়ে সেখানেই তিন বছর অধ্যাপনা করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় হন। রাজনৈতিক ময়দানের প্রয়োজনেই তিনি অধ্যাপনার পেশা ছেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ দেন এবং যোগ্যতার বলে প্রাদেশিক চেম্বার অব কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রির ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৭০ সালে তিনি জামায়াতে ইসলামীর রুকন হন এবং পেশোয়ার শহরের আমীর নির্বাচিত হন। কয়েক বছর পরই তিনি প্রাদেশিক সেক্রেটারি ও প্রাদেশিক আমীরের দায়িত্ব পালন করে ১৯৭৮ সালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন। তখন মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ আমীর ছিলেন। ১৯৮৭ সালে তিনি কেন্দ্রীয় আমীর নির্বাচিত হন।

তিনি ১৯৮৬ সালে ছয় বছরের জন্য পাকিস্তানের সিনেট মেম্বার নির্বাচিত হন। ১৯৯২ সালে পুনর্নির্বাচিত হন। তিনি গত জাতীয় নির্বাচনে দু'আসন থেকে নির্বাচিত হন। বর্তমানে পার্লামেন্টে ৬৮ সদস্যবিশিষ্ট M.M.A পার্লামেন্টারি পার্টির তিনি লিডার।

গত মাসে (ডিসেম্বর ২০০৩) আমি পাকিস্তান থাকাকালেই M.M.A-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা শাহ আহমদ নূরানীর ইন্তিকালের পর বর্তমানে কাযী সাহেব ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।

আল্লাহর রহমতে কাযী সাহেবের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে যেসব ইসলামী দল এক সময়ে মাওলানা মওদূদী ও জামায়াতে ইসলামীর কঠোর বিরোধী ছিলো তারাও ইসলামী ঐক্যের স্বার্থে জামায়াতের সাথে এক মঞ্চে সমবেত হতে সক্ষম হয়েছেন। আর কোন দেশে ইসলামী আন্দোলনের কোন নেতা এভাবে ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। বাংলাদেশে আমি ১৯৭৮ সাল থেকে ২০ বছর চেষ্টা করেও এ মহান উদ্দেশ্যে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম হইনি।

কাযী সাহেবের মাতৃভাষা পশতু। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম উর্দু হওয়ায় উর্দুও মাতৃভাষার মতোই বলেন। ঢাকায় ১৯৯৭ সালে তার ইংরেজি ভাষার বক্তৃতা শুনেছি। লাহোর সম্মেলন উপলক্ষে আগত আরব নেতাদের সাথে তিনি স্বচ্ছন্দে আরবী ভাষায় বক্তব্য রাখলেন। আরবদের সঙ্গে আরবীতে ভাব বিনিময় করতে না পারলে ঘনিষ্ঠ হওয়া যায় না। আমার এ অক্ষমতার কারণে আরবদের মধ্যে যারা ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন না তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে না পারার দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করি। প্রায় সব দেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আরবী ভাষায় বক্তব্য রাখতে দেখেছি। এদিক দিয়ে পাক-ভারত-বাংলার জামায়াত নেতাগণ পেছনে পড়ে আছেন। কাযী হোসাইন আহমদ-ই ব্যতিক্রম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ এ যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে আরব বিশ্বে যথেষ্ট মর্যাদা পাবেন।

আরবীতে বক্তৃতা করার ব্যাপারটা অভ্যাসের সাথে জড়িত। উপমহাদেশের বহু আলেম এমন আছেন, যারা আরবী ভাষায় বড় বড় তাফসীর পড়েন। কিন্তু আরবী ভাষায় বলার সুযোগ না পাওয়ায় এবং অভ্যাস না করায় আরবীতে মনের ভাব স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারেন না। তেমনিভাবে অনেকে ইংরেজি বুঝেন ও পড়েন, কিন্তু বলতে অভ্যস্ত নন।

www.bjilibrary.com

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে মূল্যায়ন

আমি ও পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছাড়া বিভিন্ন দেশের ইসলামী আন্দোলনের ১৫ জন নেতা দু'দিনব্যাপী সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। মালয়েশিয়ার একজন ইংরেজিতে, নেপাল ও ইরানের মাওলানা ইসহাক মাদানী উর্দুতে এবং বাকি ১২ জনই আরবীতে বক্তৃতা করেন। তারা বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা ও মুসলিমদের করণীয় সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছেন। আমি এখানে শুধু মাওলানা মওদূদীর অবদান সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে যা বলেছেন তা-ই উল্লেখ করছি।

শায়খ ড. ইউসুফ আল কারদাভী

"১৯৫৮ সালে আল ইমাম মওদূদীর সাথে কায়রোতে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তিনি আরদুল কুরআন সফরে মিসর গিয়েছিলেন। (তাফহীমুল কুরআন লেখার প্রয়োজনে তিনি ঐসব স্থান সফর করেন, যেসবের নাম কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। তাঁর তাফসীরে ঐসব এলাকার নকশা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সফর সাথী মাওলানা আসেম আল হাদ্দাদের উর্দুতে লেখা 'আরদুল কুরআন কা সফর' নামক বইতে ঐ সফরের বিবরণ আমি পড়েছি, –লেখক) শায়খুল আযহারের বাড়িতে তার সম্মানে এক সমাবেশ হয়। শায়খুল আযহারের অনুরোধে তিনি সেখানে সূরা আল ফাতিহার চমৎকার তাফসীর পেশ করেন। আমি ১৯৪০ সাল থেকেই তাঁর লেখা পড়ছিলাম।

"ষাটের দশকের প্রথম দিকে তিনি কাতার এলেন। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিরাট জনতা রাস্তায় নেমে এলো। কাতারের চিফ জাস্টিস শায়খ আল হামূদ স্বয়ং তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির হলেন। অথচ তিনি কখনো কারো অভ্যর্থনা করতে যেতেন না।

১৯৬৯ সালে আমি তিন সপ্তাহ লাহোর ছিলাম। তখন অতি নিকট থেকে মাওলানাকে দেখা ও বুঝার সুযোগ পাই। চতুর্থ বার ১৯৭৪ সালে আমেরিকার বাফেলোতে তাঁর ডাক্তার ছেলের বাড়িতে দেখা হয়। তিনি চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। সর্বশেষ সাক্ষাৎ তখন হয়, যখন আমি তাঁর আখেরী সফরে শরীক হই। তাঁর জানাযায় লাখ লাখ লোক শামিল হয়। তার জানাযায় ইমামতী করার সৌভাগ্য আমারই হয়।

মাওলানা আমাদের, আমরাও মাওলানার। ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ ও ইমাম মওদূদীর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ এক। জামায়াতে ইসলামী যেমন ইখওয়ানুল মুসলিমুন, ইখওয়ানও তেমনি জামায়াতে ইসলামী। মাওলানা সৃষ্টিজগতের জন্য আল্লাহর এক অমূল্য উপহার।

তিনি বিশাল সাহিত্য রচনা করেন এবং নিজেই ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি অনেক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। কোন কিছুই তাঁর দৃঢ়তাকে দমন করতে পারেনি। তিনি মুজাহিদের জীবনযাপন করেন এবং মুজাহিদের মৃত্যুই বরণ করেন। তিনি এমন এক জামায়াত রেখে যান, যা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তিনি তার যুগে একই সাথে 'মুফাক্কিরে আকবর' (শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ), 'মুজাদ্দিদে মুতলাক' (উন্মুক্ত মুজাদ্দিদ) ও 'আযীম মুসলিহ' (মহান সংস্কারক)। আল্লাহ আমাদেরকে এ দাওয়াতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার তাওফীক দান করুন।

www.bjilibrary.com

আমি যখন ইমাম তাইমিয়্যা ও ইমাম ইবনে কাইয়্যেমের সাথে মাওলানা মওদূদীর তুলনা করি তখন মাওলানার ইসলামী আন্দোলনকে তাদের আন্দোলনেরই অনিবার্য অংশ মনে করি।

মাওলানা মওদূদীর আন্দোলনের প্রভাব আমি সর্বত্র লক্ষ্য করছি। বিশেষ করে মিসরে 'ইখওয়ানুল মুসলিমুন' নাম সরকার ব্যবহার করতে বাধা দেয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ছাত্রদের সংগঠনের নাম রাখা হয়েছে 'জামায়াতে ইসলামী' এবং সর্বস্তরের সভাপতিদের জন্য জামায়াতে ইসলামীর মতো আমীর পরিভাষা ব্যবহার করে।"

১৪৯.

রাশেদ আল গানুশী

তিউনিসে নাহদাত আন্দোলনের প্রধান শায়েখ রাশেদ আল গানুশী এক যুগ ধরে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন। ১৯৯৫, ১৯৯৯ ও ২০০১ সালে আমি সফরে গেলে প্রতিবারই তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ইসলামী চিন্তাবিদ। মাওলানা মওদূদীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার একজন একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি সম্মেলনে মাওলানার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন ঃ

"মাওলানা মওদূদী আমাদের মতো আধুনিক শিক্ষিতদের উপযোগী যুক্তি ও ভাষায় ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে যেভাবে পেশ করেছেন এবং তা বাস্তবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে যে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন এর জীবন্ত রূপ এখানে স্বচক্ষে দেখলাম। বিশ্বে যে বিরাটসংখ্যক লোক মাওলানার ভক্ত রয়েছে, তারা যদি পাকিস্তানে আসে তাহলে এ বিশাল দেশের মাটিতে তাদের স্থান সংকুলান হবে না।

আমি সাইয়েদ মওদূদীর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তাঁর সাহিত্য আমাকে জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দিয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী, হাসানুল বান্না শহীদ ও ইমাম খোমেনী এ শতাব্দীর চিত্র পরিবর্তনে মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম উম্মাহর উপর চাপিয়ে দেওয়া ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বিরুদ্ধে তারা সফল যুদ্ধ করেন। চিন্তার জগতে মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যাজ্য বলে সচেতন সকল মুসলমানের নিকট এটা সুস্পষ্ট।

তিউনিসে কিভাবে ইসলামকে ভিত্তিমূল থেকে উৎখাত করার অপচেষ্টা চলছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা হাসিল করার জন্য পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ সম্প্রতি তিউনিস সফর করেছেন। আমি পাকিস্তানের জনগণকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তারা যেন এমন জাহেলিয়াতের দিকে না যান, যা নবীর যুগের পূর্বে চালু ছিলো। এ জাহেলিয়াত-এর চেয়েও মারাত্মক। এটা তথাকথিত মডার্ন (আধুনিক) ইসলামের জাহেলিয়াত।"

এ কথা বলার পর তিনি তিউনিস সরকার আধুনিকতার নামে ইসলামের সকল ভিত্তিকে ধ্বংসের জন্য যা যা করেছে তা বললেন, শুনে সবাই স্তম্ভিত। একটি মুসলিমপ্রধান দেশে এসব করা কেমন করে সম্ভব হচ্ছে তা সত্যিই বিস্ময়কর। মোট আশি লাখ জনগণের এক-তৃতীয়াংশই জেলখানায় আবদ্ধ। এর মধ্যে হাজার হাজার আলেম রয়েছেন।

www.bjilibrary.com

তিউনিস ফরাসি সাম্রাজ্যের অধীনে থাকাকালে মুসলমান নামধারী বিরাটসংখ্যায় হাবীবুর রকীবার মতো লোক তৈরি হয়েছে, যারা ক্ষমতাসীন হয়ে যা যা করেছে এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

১. কুরআনকে আরবীর বদলে ফরাসি অক্ষরে পড়তে বাধ্য করা।

২. প্রথম হিজরীতে প্রতিষ্ঠিত যাইতুশ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া। যেখানে ইবনে খালদূনের মতো মনীষী শিক্ষা লাভ করেছেন।

৩. তিউনিসের পুরাতন সব আইন বাতিল করে ফরাসি আইন চালু করা।

৪. মহিলাদেরকে স্বাধীন হবার জন্য তাদেরকে ইসলাম থেকে স্বাধীন হতে বাধ্য করা।

৫. বেহেশত ও দোযখ বিশ্বাস করাকে কুসংস্কার ঘোষণা করা।

৬. মঞ্চে পর্দানসীন মহিলাদেরকে এনে প্রকাশ্যে পর্দা ছিঁড়ে ফেলা। এছাড়া প্রগতি সম্ভব নয় বলে ঘোষণা করা।

৭. রমযানে প্রকাশ্যে মদ পান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এটা জরুরি ঘোষণা করা এবং রোযা রাখাকে অর্থনৈতিক উন্নতির বিরোধী বলা।

এসব অবিশ্বাস্য রকমের বিবরণ দেবার পর তিনি মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে যাবতীয় অস্পষ্টতা দূর করে দিতে সক্ষম হয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সব রকমের বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তানে ও বহুদেশে সুখবরের দিন এগিয়ে আসছে। বিশেষ করে পাকিস্তানের সকল ইসলামী শক্তির ঐক্য এ কথাই প্রমাণ করে।

"মাওলানা মওদূদী, ইমাম খোমেইনি ও সাইয়েদ কুতুব ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছেন। পাকিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদ নেতা কাযী হুসাইন আহমদ এবং তার সাথীগণ জামায়াতে ইসলামীকে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করেছেন। বর্তমানে ফেরকাবন্দি ও পারস্পরিক বিরোধিতার মেঘ কেটে যাচ্ছে। এটা গোটা মুসলিম উম্মতের জন্য বিরাট এক সুখবর। পাকিস্তানে ঐক্যের এ প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।"

মুস্তাফা মুহাম্মদ তাহ্যান

কুয়েতের ইখওয়ান নেতা মুস্তাফা মুহাম্মদ তাহ্যান বলেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফ্রান্সের যৌথ শক্তি উসমানী খিলাফতকে খতম করার পর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে, যাতে আবার ইসলামী খিলাফত কায়েম হতে না পারে। তারা মুসলিম বিশ্বে তাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এ বিশ্বাসই গড়ে তুলেছে যে, ইসলামকে মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন এবং ইসলামও অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্ম মাত্র।

ইমাম হাসানুল বান্না শহীদ এবং শায়খ আবুল আলা মওদূদী এর মারাত্মক পরিণতি আঁচ করতে পেরেছেন। তাই তারা চিন্তার ময়দানে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পেশ করে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং কর্মের ক্ষেত্রে এক কার্যকর ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন গড়ে তুলেন। এর ফলেই সারাবিশ্বে আজ ইসলামের বিরাট জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে।"

www.bjilibrary.com

আয়াতুল্লাহ তাসখীরী

ইরানের উচ্চমানের নেতা আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ আলী তাসখীরী আরবীতে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আমি গৌরব বোধ করছি যে, আমি এমন এক মজলিসে শরীক হয়েছি, যেখানে একদিকে আল্লামা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ও অপরদিকে বিংশ শতাব্দীর এক মহান ব্যক্তিত্ব আল্লামা ইকবালের ঝলক দেখতে পাচ্ছি।"

ইকবালের বাণী ছিলো, "মুসলমান কুরআন ছাড়া বিজয়ী হতে পারবে না।" সাইয়েদ মওদূদী একথা বাস্তবে রূপদান করেছেন। মাওলানা মওদূদী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও অন্যান্য আধুনিক মতবাদের প্রভাবমুক্ত করে আধুনিক শিক্ষিতদেরকে ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত করেছেন। তার সাহিত্য ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম ও ইসলামী আইন রচনায় সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দেয়।

আল্লাহ তাআলা যাদেরকে আল্লামা মওদূদীর রূহ থেকে ফয়েয হাসিলের তাওফীক দিয়েছেন, তাদেরকে আমি আন্তরিক সালাম জানাই।"

সাইয়েদ মওদূদী তার যুগের চেয়েও অগ্রগামী আলেম ও মুজাহিদ ছিলেন। তিনি গোটা বিশ্বে ইসলামী আন্দোলনের ভিত রচনা করেন। ইমাম খোমেইনি এই দাওয়াতের উপরই বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মাওলানা মওদূদী মুসলিম উম্মাহর নেতা ছিলেন। তিনি সারা দুনিয়াকে যে বিপ্লব ও আন্দোলনের পথ দেখালেন, সে পথেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া আমাদের উপর ফরয। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই আমরা সফল হতে পারবো।

ইসলামী হুকুমত কায়েমের উদ্দেশ্যে তাঁর জ্ঞান ও চিন্তা থেকে এমন এক দর্শন স্পষ্ট হয়ে সামনে এসেছে, যা সর্বদিক ও বিভাগে ব্যাপ্ত। তিনি এদিকে মানুষকে আহ্বান জানালেন। গোটা পাশ্চাত্য এ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেলো। সাইয়েদ মওদূদী বললেন, দীন ইসলাম শুধু ব্যক্তিকে নয়, গোটা মানবতাকে উন্নতি দান করে।

"পাশ্চাত্য মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করতে চায়। তারা ইরান, মিসর, ইরাক ও অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার দেশগুলোকে তাদের ইসলামপূর্ব গৌরবময় ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। সাইয়েদ মওদূদী ইসলামের সঠিক ধারণা পেশ করেছেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনকে বাতিল বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি মধ্যবর্তী উম্মতকে মানব জাতির উপর সত্যের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবার দাওয়াত দিয়েছেন। তাঁর দাওয়াতের সৌন্দর্য ও যুক্তির তুলনা নেই। তিনি পুঁজিবাদের গোমর ফাঁক করে দেন এবং মানবতার শোষক হিসেবে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনিই সবার আগে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাষায় পেশ করেন। ইরানে আয়াতুল্লাহ বাকের এ চিন্তাধারার ভিত্তিতেই অগ্রসর হন। আমাদেরকে এ ভাবধারায়ই এগিয়ে যেতে হবে।"

"সকল ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তাবিদকে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে, যাতে ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে যেখানেই ইসলামী হুকুমত কায়েম হয় সেখানেই তা চালু করা সম্ভব হয়। আফগানিস্তানে এটাই সমস্যা ছিলো। এখন ইরাকে সে সমস্যাই দেখা দিয়েছে। সাইয়েদ মওদূদী একথাই বুঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, বিভিন্ন দল ও মতের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক নৈকট্য গড়ে তুলতে হবে। তাদের মধ্যে শতকরা ৯৫ ক্ষেত্রে

www.bjilibrary.com

কোন মতভেদ নেই। শতকরা মাত্র ৫ ভাগ মতপার্থক্যের প্রাধান্য দিয়ে উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। ৯৫ ভাগ ঐক্যকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। পাশ্চাত্যের এ প্রচারণা অর্থহীন যে, মুসলমানদের দীন এক নয়, তারা একমত হয়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে অক্ষম। কিছুসংখ্যক ক্ষমতালিপ্সু ও নেতৃত্ব পিপাসু আলেমকে ব্যবহার করে উম্মতকে বিভক্ত করে রাখার এ ষড়যন্ত্রের মুকাবিলা করতে হবে।"

ডাক্তার তোয়াহা রামলী

মালয়েশিয়ার ইসলামী পার্টির নেতা ও পার্লামেন্ট সদস্য ডাক্তার তোয়াহা রামলীই শুধু ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, "মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের মুজাহিদ বললে ভুল হবে না। পাকিস্তানের জনগণের এটা বিরাট গৌরব যে, তারা এ যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব থেকে ফয়েয হাসিল করেছেন। তার দেওয়া শিক্ষার একজন ছাত্র হিসেবে আমিও গৌরব বোধ করছি যে, আমি তার চিন্তাধারা থেকে পথনির্দেশ হাসিল করেছি। তিনি যুব সমাজকে মসজিদমুখী করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পবিরার-পরিকল্পনার বিরোধিতা করেছেন। আমি একজন ডাক্তার হিসেবে চীন ও সিঙ্গাপুরে পরিবার-পরিকল্পনার কুফল দেখে মনে করছি যে, আল্লাহ তাআলা মাওলানাকে সালেহ হিসেবে গণ্য করবেন।"

"এখন মাওলানা মওদূদী আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। হাসানুল বান্না ও সাইয়েদ কুতুব শহীদ হয়ে গেছেন। তারা ইসলামকে যতটুকু এগিয়ে দিয়ে গেলেন, এখন তাদের আন্দোলনকে চূড়ান্তভাবে সফল করার দায়িত্ব আমাদের।"

"১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার অহংকার ও গৌরব ধ্বংস হবার পর এর জন্য ইসলাম ও মুসলিমদেরকে অন্যায়ভাবে দায়ী করে তারা আমাদের বিরুদ্ধে হিংস্রভাবে প্রতিশোধ নিতে চাচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে এবারই প্রথম বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে সমবেত হয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী এ পরিস্থিতিতে কেমন করে এতো বড় আয়োজন করতে সক্ষম হলো তা ভেবে বিস্মিত হয়েছি। বুঝতে পারলাম যে, মাওলানা মওদূদীর বিশাল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে এতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণকে সমবেত করা সম্ভব হয়েছে।"

মাওলানা মুহাম্মদ ইসহাক মাদানী

মাওলানা ইসহাক মাদানী ইরানের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দায়িত্বশীল। তিনি হিন্দুস্তানে লেখাপড়া করায় উর্দুতেই বক্তব্য রাখলেন। তিনি মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বলেন, "মাওলানা বর্তমান যুগের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে ইসলামকে এমন চমৎকারভাবে পেশ করেছেন, যার ফলে শিক্ষিত অনেক মুসলিম ইসলামের বিজয়ের জন্য জীবন দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি ইসলাম সম্পর্কে উত্থাপিত সকল বিভ্রান্তি ও সন্দেহ দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। ইরানে মাওলানা মওদূদীর মিশনকেই বিপ্লবের আকারে চালু করা হয়েছে।"

সম্মেলনের সকল অতিথি বক্তাই মাওলানা মওদূদীকে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান চিন্তানায়ক ও বাস্তব সংগ্রামী হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। যে কয়েকজনের বক্তব্য আমি উদ্ধৃত করেছি তাদের মূল্যায়নের সাথে শব্দের পার্থক্য থাকলেও ভাবের মধ্যে সুস্পষ্ট মিল থাকায় সকলের বক্তব্য উদ্ধৃত করার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।

www.bjilibrary.com

আমার মনে বিরাট প্রশ্নের সৃষ্টি হলো

বহু দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের মুখে মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে এতো উচ্চ মানের মূল্যায়ন শুনে আমার মনে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হলো যে, আমাদের দেশের আলিমগণের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন তারাই কি শুধু ইসলামের সঠিক জ্ঞানের অধিকারী? বিশ্বের সেরা ইসলামী চিন্তাবিদগণ মাওলানা মওদূদীকে এ যুগের শ্রেষ্ঠতম বা অন্ততপক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ বলে প্রশংসা করেন। তারা কি সবাই বিভ্রান্ত? আরব বিশ্বের আলিমগণ মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারাকে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃতি দেন কেমন করে? তাহলে কি আমাদের দেশের আলিমগণের মধ্যে যারা মাওলানা মওদূদী গোমরাহ বলে প্রচার করেন তারাই দুনিয়ার সেরা আলিম? তারাই শুধু সহী ইসলামকে চেনেন? দুনিয়ার আলিম সমাজ কি তাহলে সবাই গোমরাহ? বিশ্বে যারা মাওলানা মওদূদীকে দীনের বড় আলিম হিসেবে ভালোবাসেন তাদের সম্বন্ধে আমাদের দেশের ঐ আলিমদের মন্তব্য কী? সারা দুনিয়ার ইসলামপ্রিয় লোকেরা মাওলানা মওদূদীকে সঠিকভাবে চিনলেন। আমাদের দেশের সকল আলিম কেন চিনতে পারলেন না?

আল্লাহর রহমতে বাংলাদেশের বিরাটসংখ্যক আলিম জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয়ভাবে শরীক রয়েছেন। তাদের মধ্যে কি বড় আলিম কেউ নেই? তারা কি সবাই গোমরাহ? দেশের ইসলামপ্রিয় জনগণ কি তাদেরকে গোমরাহ বলে মনে করে?

আরও একটা প্রশ্ন

আমি পাকিস্তানে ইসলামী সকল শক্তির ঐক্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেছি। দেওবন্দী, বেরেলবী, আহলে হাদীস ও শিয়াদের মোট ছয়টি দল মুত্তাহিদা মজলিসে আমল (MMA) শরীক আছেন। এতে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উভয় গ্রুপই রয়েছে, যারা সবাই দেওবন্দী হিসেবে পরিচিত।

আমাদের দেশে দুটো রাজনৈতিক দলের সাথে দুটো ইসলামী দল মিলে চারদলীয় ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। একটি ইসলামী দলের একাংশের নেতা মাওলানা মওদূদীর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা জামায়াতে ইসলামীর সাথে রাজনৈতিক ঐক্যে শামিল হয়েছি। তাদের সাথে আদর্শিক বা ইসলামী ঐক্য করিনি।"

কিন্তু পাকিস্তানে যে ইসলামী ঐক্য হয়েছে তা শুধু রাজনৈতিক ঐক্য নয়। ইসলামী আইন ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের উদ্দেশ্যেই এ ঐক্য হয়েছে। সীমান্ত প্রদেশে তাদের ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে। সেখানে যেয়ে দেখলাম ১২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ছয়জন জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের এবং বাকি ছয়জন জামায়াতে ইসলামীর। চিফ মিনিস্টার জমিয়তের নেতা ও সিনিয়র মিনিস্টার প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর আমীর।

আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, পাকিস্তানে যারা পূর্বে 'মওদূদী ফিতনা' বলে প্রচার করতেন তারাও ঐ ঐক্য কায়েমের পর থেমে গেছেন এবং ইসলামী ঐক্যের সাথে সহযোগিতা করছেন। জনগণের নিকট ঐ জাতীয় প্রচারণা মোটেই পছন্দনীয় নয়। তারা ঐক্যের জন্য পাগল। তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, পাকিস্তানের আলিম সমাজও কি জামায়াতের সাথে ঐক্য করে গোমরাহ হয়ে গেলেন?

www.bjilibrary.com

১৫০.

আবার হায়রে মৃত্যু

জীবনে যা দেখলাম দ্বিতীয় খণ্ডের ৫২ নং কিস্তি শুরু হয়েছে 'হায়রে মৃত্যু' শিরোনামে। ১৫০ নং কিস্তি 'আবার হায়রে মৃত্যু' শিরোনামে শুরু করতে হচ্ছে। ঐ মৃত্যু ছিলো আমার তৃতীয় ভাই ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ গোলাম মুকাররামের স্ত্রী সাকীনা খাতুন সাকুর। আর এ মৃত্যু হলো আমার দ্বিতীয় ভাই প্রফেসর ডাক্তার গোলাম মুয়াযযামের স্ত্রী হাসিনা খাতুনের। হাসিনা সাকুর আপন বড় বোন। সাকুর মৃত্যু হলো ২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারি। আর হাসিনার মৃত্যু হলো ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে দু'বোন চলে গেলো।

ঘনিষ্ঠজনের মৃত্যু মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা প্রকাশ না করে পারা যায় না বলে আলোচনার ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করেই লিখছি। এ জাতীয় ঘটনা আত্মজীবনীর অপরিহার্য অংশ।

৪ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) বুধবার সকাল সোয়া এগারোটায় আমার ছোট ছেলে ড. সালমান সোবহানবাগ থেকে আমাকে ফোনে এমন হৃদয়স্পর্শী খবর দিলো যে, তৎক্ষণাৎ সোবহানবাগ রওয়ানা হলাম। সালমান ওর বড় চাচা ও চাচার সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করতে গেলো। সাথে ওর আম্মাও গেলেন।

সালমান ৭ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডে যাচ্ছে। সে গত ২০০৩ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি পেলেও ইউরোপ ও আমেরিকার ডিগ্রি অপরিহার্য মনে করছে। একাডেমিক ক্যারিয়ারের জন্য নাকি তা অত্যন্ত জরুরি। তাই সে ল্যানকেস্টার ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট ডক্টরেট কোর্সের জন্য যাচ্ছে। আত্মীয়স্বজনের সাথে বিদায়ী সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সে সর্বপ্রথম বড় মুরব্বী হিসেবে ওর বড় চাচার সাথে দেখা করতে সকালে সোবহানবাগে অবস্থিত বাড়িতে পৌঁছলো। সাথে ওর আম্মাও গেলেন। ড. মুয়াযযাম তখন মাত্র ঘুম থেকে উঠে এলো। আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন "হাসিনা, এখনও জাগেনি?" ড. মুয়াযযাম রুমে ঢুকে তাকে ডাকতে লাগলো। ফিরে এসে বললো, "ভাবী, এসে দেখুন তো হাসিনা কোন জওয়াব দিচ্ছে না"।

আমার স্ত্রী দেখেই বুঝতে পারলেন যে, হাসিনা নেই। সালমানকে ডেকে নিলো। সালমান দৌড়ে নিচের ফ্ল্যাটে যেয়ে ডা. মুয়াযযামের দ্বিতীয় ছেলে ড. ফায়সালকে নিয়ে এলো। ফায়সাল ওর মায়ের কবজিতে হাত দিয়ে চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো, আম্মাতো নেই। বিস্ময়ের বিষয় যে, একই বিছানায় থাকা সত্ত্বেও ডা. মুয়াযযাম কিছুই টের পায়নি। মুয়াযযাম বললো, "রাতে হাসিনাকে একবার টয়লেটে যেতে দেখলাম। আমি ফজরের নামায পড়ে শুয়ে পড়লাম। হাসিনা অসুস্থ বলে তাকে নামাযের জন্য ডাকলাম না। মনে করলাম ঘুমাক, যখন জাগবে তখনই নামায পড়ে নেবে।"

তিন বোনেরই হঠাৎ মৃত্যু

হুসনা, হাসিনা ও সাকিনা (সাকু) আপন তিন বোন, ছোট বোন সাকু ২০০২ সালের ২৬ জানুয়ারি তার বড় মেয়ে ফৌজিয়ার গায়ে হেলান দিয়ে বসা। বোন হাসিনা ও আরও

www.bjilibrary.com

কয়েকজন আত্মীয়ের সাথে বসে আলাপরত অবস্থায় মেয়ের গায়ের উপর কাত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

মধ্যম বোন হাসিনা ৪ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) স্বামীর পাশে বিছানায়ই ঘুমন্ত অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করলো। বড় বোন হুসনা ১৯৯৬ সালে কুরবানীর ঈদের বিকেলে কুরবানীর গোশত বিলি-বণ্টন শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। বলে দিলেন, আমাকে ডাকাডাকি করো না, বিশ্রাম করতে দাও। সন্ধ্যার পর ছোট ছেলে ফুয়াদের স্ত্রী কাছে এসে চেহারা দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলে সবাইকে ডেকে আনলো। বুঝা গেলো, নীরবেই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁর বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার ফারুক থেকে এ তথ্য পেলাম।

তিনজনেই এভাবে হঠাৎ করে চলে গেলো। ব্যথা-বেদনায় ছটফট করা, মুখে কাতরাবার আওয়াজ করা, কোন রকম অস্থিরভাব প্রকাশ করা ইত্যাদির কোনটাই দেখা গেলো না। কী সুন্দর মৃত্যু!

আমার সাথীহারা ভাই

হাসিনার স্বামী আমার ছোট ভাই ডাক্তার মু. গোলাম মুয়াযযাম। বয়সে আমার চেয়ে মাত্র পৌনে দু'বছরের ছোট। আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। ছোট সময় ওর খুব অসুখ হতো বলে মনে পড়ে। কিন্তু গত ৫০ বছরের মধ্যে অসুস্থ হয়ে কোন সময় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে মনে পড়ে না। অথচ আমি গত ১০ বছরে তিন-চার বার হাসপাতালে যেতে বাধ্য হয়েছি।

এখন এ ভাইটি সাথীহারা হয়ে গেলো। আমাকে সে এতো ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে বলেই তার জন্য আমার বড়ই মায়া লাগে। তাকেও আমি প্রাণ থেকে মহব্বত করি। তাই তার স্ত্রীর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত গভীর বেদনাবোধ করছি।

তার তিন সন্তানের মধ্যে বড়টি মেয়ে। আর দু'জন ছেলে। আমাদের বংশে এ জেনারেশনে সে-ই সবার বড় মেয়ে। সে আমার বড় ছেলের চেয়ে মাত্র দেড় মাসের ছোট। ওর ডাক নাম মুনীরা। আমার আর পাঁচ ছেলের সে খুবই প্রিয় আপা। আমার মেয়ে নেই বলে ছোট সময় থেকেই ওর জন্য মেয়ের মতোই আদর লাগে। সে বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের মাইক্রোবাইওলজির প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান। যোগ্য পিতার যোগ্য কন্যা। সে ডাক্তার নাইমা নামে পরিচিত। ওর দু'ছেলেই আমেরিকায় থাকে। নাখালপাড়ায় ওর স্বামীর বিরাট বাড়িতে না থেকে পিতা-মাতার সান্নিধ্যে থাকার উদ্দেশ্যে সোবহানবাগে মায়ের ফ্ল্যাটের নিচের ফ্ল্যাটেই থাকে।

ডাক্তার মুয়াযযামও প্যাথলজি ও মাইক্রোবাইওলজির প্রফেসর ছিলো। সিলেট ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের দায়িত্বও পালন করেছে। বিদেশেও অনেকদিন চাকরি করেছে। সর্বশেষে বেশ কয় বছর ইবনে সীনা ল্যাবরেটরিতে ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলো। মাত্র বছর দু'এক আগে অবসর নিয়েছে। বর্তমানে যারা দেশের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজে প্রফেসর তাদের অনেকেই তার ছাত্র।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনাকালে ষাটের দশকেই সে রামাদানের রোযা রাখায় স্বাস্থ্যগত কোন ক্ষতি হয় কি না সে বিষয়ে গবেষণা করে প্রমাণ করেছে যে, রোযা রাখায়

www.bjilibrary.com

কোন ক্ষতি তো হয়ই না; বরং উপকারই হয়। তার এ গবেষণাকর্মটি আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ গবেষণা বিদেশীরা করতে পারে না। কারণ তারা রোযা রাখে না। তাই তারা এ গবেষণাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন "Scientific Indications in the Holy Quran." শিরোনামে যে বিখ্যাত গবেষণাকর্মটি প্রকাশ করেছে, এতে পাঁচজন বিজ্ঞানীর মধ্যে ড. মুয়াযযাম একজন। ঐ বইতে মেডিক্যাল সাইন্সের উপর লেখাটি তারই।

গতকাল (৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যার পর সোবহানবাগে তাকে দেখতে গেলাম। তাকে তার পড়ার ঘরে লিখতে বসা দেখে বিস্মিত হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কী লিখছো? বললো, মেডিক্যাল সংক্রান্তই। দেখে আরও মায়া লাগলো। মেডিক্যাল গবেষক এ মানুষটি এ দেশে কোন মর্যাদা পেলো না। আগের দিন স্ত্রীকে দাফন করেছে। আর পরের দিনই গবেষণায় রত হয়ে গেলো।

ডা. মুয়াযযাম আমার আগেই উর্দু শেখার সুযোগ পেয়েছে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ম্যাট্রিকে আরবীর যে পাঠ্যবই ছিলো, তাতে কুরআনের অংশটুকুর অনুবাদ উর্দুতে লেখা ছিলো। সে চান্দিনায় আব্বার সাথে থাকায় আব্বা তাকে আরবীর সাথে সাথে উর্দুও শিখিয়ে দিলেন। সে আব্বার সোহবত আমার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে। আমি ছাত্রজীবনে বন্ধের সময় ছাড়া আব্বার সাথে থাকার কোন সুযোগই পাইনি।

ডা. মুয়াযযাম রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনারত থাকাকালে নিয়মিত সাপ্তাহিক দারসে কুরআন পেশ করতো। তাফহীমুল কুরআন উর্দুতেই পড়তো। বহু বছর থেকে সে মগবাজারস্থ কাযী অফিস লেন জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্তও জুমুআর আযানের পর আধঘণ্টা কুরআনের ধারাবাহিক অনুবাদ শোনাতো।

১৯৯২-'৯৩ সালে ১৬ মাস আমি জেলে ছিলাম। প্রথমদিকে এ ভাইটি দেখা করতে জেলে গেলো। বিনা দোষে জেলে আটক থাকায় সে মনের ব্যথা করুণ ভাষায় প্রকাশ করলো। বললাম, ইসলামী আন্দোলনে এমন পর্যায় আসবেই। এর আগেও কয়েকবার জেলে থাকতে হয়েছে, তুমি তা জানো। সে বললো, এ বয়সে যে কষ্ট ভোগ করছেন তাতে আমরা বেদনাবোধ করি। আমি বললাম, তোমার এ ভালোবাসা আমার বিরাট সান্ত্বনা। যে আন্দোলনের অপরাধে আমি কারাবন্দি, তুমিও এর একজন কর্মী। তুমি যদি রুকন হয়ে যাও তাহলে আমার জেলে থাকার কষ্ট দূর হয়ে যাবে। আমার এ কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সে রুকন হবার জন্য সিরিয়াস হলো এবং আমার জেলে থাকাকালেই রুকন হিসেবে জেলে দেখা করতে গেলো। আনন্দের আতিশয্যে আমি নিবিড় আলিঙ্গন করে মন্তব্য করলাম, "আমার কারাগারে আসা সার্থক হলো।"

এমন প্রিয় ভাইটির যখন জীবন সাথীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তখন তার সাথীহারা হওয়ার বেদনা আমি গভীরভাবে অনুভব করছি বলেই তার সম্বন্ধে এতো কথা লিখলাম। আগামী জুলাই মাসে (২০০৪) তার বয়স ৭৯ পূর্ণ হবার কথা।

আমার ভাইটি অসহায় নয়

আল্লাহর রহমতে আমার ভাইটি অসহায় নয়। তার স্ত্রী যেভাবে ২৪ ঘণ্টা সঙ্গ দিতো, যখন যে খিদমত দরকার এর সুব্যবস্থা করতো, একান্ত পরিবেশে যেসব বিষয়ে আলাপ-

www.bjilibrary.com

আলোচনা করতো, ৫২ বছরের জীবন-সাথী হিসেবে যেসব স্মৃতিচারণ করতো এর কোন বিকল্প নেই বলেই অসহায় বলছি। তা না হলে সে আমার চেয়েও ভালো অবস্থায় আছে। তাঁর মেয়ে ও দ্বিতীয় ছেলে ডাক্তার। তারা একই বিল্ডিং-এ নিকটবর্তী ফ্লাটেই থাকে। বড় ছেলে সোহায়ল পাশের ফ্লাটেই ছিলো। দু'বছর হয় সপরিবারে ম্যানচেস্টারে থাকে। সেদিন সে চোখের পানি ফেলে বললো, "চাচ্চা! দেশে সততার সাথে ব্যবসা করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। এখানে সৎভাবে ব্যবসা করার কোন উপায় নেই বলেই আপনাদেরকে এ বয়সে রেখে বিদেশে যেতে বাধ্য হয়েছি।"

আমার ভাইয়ের তিন ছেলে-মেয়ের মধ্যে একজন মাত্র বিদেশে। আর দু'জনই তার পিতার কাছেই আছে। এদ্দিন পিতা-মাতা পাশের ফ্ল্যাটে আলাদা থাকতো। এখন তো পিতাকে এক সাথেই রাখতে হবে। তাই আমার ভাইটি দুই ডাক্তার সন্তানের সাথেই আছে।

আমার ছয় ছেলের মধ্যে চার জন অনেক বছর থেকেই বিদেশে আছে। চতুর্থ ছেলে দেশে থাকলেও সেনাবাহিনীতে কর্মরত বলে আমার সাথে থাকতে পারছে না। ছোট ছেলে সালমান সাথে ছিলো। সেও বিদেশে চলে গেলো। যাবার দিন আমাকে ও তার আম্মাকে কাঁদতে কাঁদতে বলে গেলো, "আপনাদেরকে এ বয়সে একা ফেলে কিছুতেই চলে যেতাম না। ঢাকায় সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আগ্রহ করে আমাকে নিতে চাইলো। কিন্তু পরিচালকদের মধ্যে কয়েকজন আব্বার ছেলে হবার অপরাধে নিতে দিলো না। দেশে প্রতিভার কোন মূল্যায়ন হয় না এবং সিনসিয়ার সার্ভিসেরও এপ্রেসিয়েশন পাওয়া যায় না। যেখানে কাজ করছিলাম সেখানেও আত্মমর্যাদাবোধ করিনি। উন্নতির আশাও তেমন মনে হয় না। বিদেশী ডিগ্রি নিয়ে ফিরে এলে হয়তো সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। আমি বললাম, তোমার একাডেমিক ক্যারিয়ারের উন্নতির জন্য যেতে হচ্ছে বলে আমার কোন আপত্তি নেই। সন্তানের উন্নতিই তো পিতা-মাতার বড় কাম্য। আমাদের জন্য চিন্তা করো না, দোয়া করতে থাকবে। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহর রহমতে আমরা এমন একটি দীনী সংগঠনে আছি, যাদের মধ্যে আল্লাহর ওয়াস্তে মহব্বতের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। গত ২৭ ডিসেম্বর হঠাৎ প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হলাম। তোমার কোন ব্যবস্থা করতে হয়নি। খবর পেয়েই আবু নাসের এ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে ইবনে সীনা হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করে ফেললো। আমি মোটেই অসহায় বোধ করি না।

আরও বললাম, "আল্লাহ সাহায্য করার ফায়সালা করলে শত্রু দ্বারাও সাহায্য করতে পারে। তোমার বড় চাচীর মেয়ে ও ছেলে ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও এবং পাশে থেকেও মায়ের জন্য কিছুই করার সুযোগ পেলো না। দুনিয়ায় কেউ কারো কাজে আসে না আল্লাহর ফায়সালা ছাড়া। তাই আমাদের জন্য তোমার পেরেশান হওয়ার প্রয়োজন নেই।"

হাসিনার জানাযা ও দাফন

হঠাৎ মৃত্যু হলে মৃতব্যক্তি মানসিকভাবে প্রস্তুত হবার সুযোগ পায় না, দেনা-পাওনা, লেন-দেন ও পারিবারিক বিষয়ে কিছুই বলে যাবার সুযোগ পায় না। কিন্তু হাসিনা এদিক দিয়ে বিরল দৃষ্টান্ত। সে বছরখানেক আগে থেকেই সবকিছু বলে গিয়েছে। ডায়াবেটিকসই তার প্রধান রোগ ছিলো। হৃদরোগ ছিলো না। অথচ হৃদরোগেই তার

www.bjilibrary.com

মৃত্যু হলো। তার ছেলে রাত বারোটা পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে আলাপ-সালাপ করলো। হাসিনা বুকে একটু ব্যথা বোধ করায় হট ওয়াটার ব্যাগ বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লো এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। তার ছেলে ফায়সাল আফসোস করে বললো, বুকে ব্যথার কথা জেনেও আমি কেন হাসপাতালে নিয়ে গেলাম না। আমি নিজে একটা হাসপাতাল পরিচালনা করি। অথচ আমার আম্মাকে চিকিৎসা সেবা দিতে পারলাম না। বুঝতেই পারলাম না যে, অবস্থা এতোটা খারাপ।

জানাযার ব্যাপারে জানা গেলো যে, সে আগেই বলে গেছে যে ভাই সাহেবের আগে যদি আমি মারা যাই তাহলে ভাই সাহেব যেন আমার জানাযা পড়ান। আমাকে সে ভাই সাহেব বলেই ডাকতো। আমিও আপন বোনের মতোই মনে করতাম। আরও বলে গেছে যে, যদি ভাই সাহেব না থাকেন তাহলে বড় ছেলে সোহায়ল জানাযায় ইমামতি করবেন।

যে রাতে মারা গেলো তার পরের দিন দুপুরে হাসিনার চাচাতো ভাইয়েরাও এলেন। কোথায় দাফন করা হবে পরামর্শ চললো। চাচাতো ভাই আলমগীর আদেল সাহেব বললেন, সুবহানবাগ কবরস্থানে দাফন করা যাবে। আপনারা সিদ্ধান্ত নেন। মগবাজারে আব্বা পারিবারিক গোরস্থানের জন্য জায়গা রেখে গেছেন। পরে জানা গেলো যে, হাসিনা এ বিষয়েও স্পষ্ট করে বলে গিয়েছে, আমি মগবাজারের বৌ, আমার কবর সেখানেই যেন হয়। বোন সাকুর কবর যেখানে আছে। তার এ অসিয়ত অনুযায়ী কাযী অফিস লেন, মগবাজারেই আমার ইমামতিতে বাদ আসর জানাযার নামায হয় এবং সাকুর কবরের পাশেই তাকে দাফন করা হয়। দিনটি ছিলো শুক্রবার। সোবহানবাগ জামে মসজিদে জুমুআর নামাযের পর প্রথম জানাযা হয়। ৬ ফেব্রুয়ারি (২০০৪) বিকেলে হাসিনাকে দাফন করার পর কবরের পাশেই সবাইকে নিয়ে দোয়া করলাম, যাতে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দেবার তাওফীক দান করেন, কিয়ামত পর্যন্ত কবর আযাব থেকে হেফাযত করেন এবং কবরের সাথে জান্নাতের সুড়ঙ্গ বানিয়ে দেন।

আব্বার বংশধরদের বৈঠক

দোয়ার পরপরই ভাই-ভাতিজাদেরকে বলে দিলাম, পরের দিন সন্ধ্যার পর ৮টায় সোবহানবাগ তোমাদের সবার সাথে বসতে চাই। যথাসময়ে সবাই সমবেত হলো। একই সোফায় আমার সাথীহারা দু'ভাইকে দু'পাশে নিয়ে বসলাম। দু'বছর পর এভাবে তিন ভাই একত্র হলাম। ডা. মুয়াযযামের তিন ছেলে-মেয়ে, মুনীরার স্বামী ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন (সাইহাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ-এর অন্যতম মালিক) এবং ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মুকাররামের একমাত্র ছেলে সালেহ, দু'মেয়ে ফারহানা ও ফাহীমা, ফারহানার স্বামী মারুফ (ব্যবসায়ী), আমার তিন ভাতিজার স্ত্রীগণ, মুনীরাদের মামা মুহসিন ও আমার দু'ভাইয়ের নাতি-নাতনীরা উপস্থিত ছিলো।

আব্বার বংশধর হওয়া সত্ত্বেও আমার পরিবারের কেউ উপস্থিত হতে পারেনি। আমার চার ছেলে তো সপরিবারে বিদেশেই আছে। সেনাবাহিনীর অফিসার ছেলেটি জানাযা ও দাফনের জন্য ছুটি নিয়ে এসেছিলো। ছুটি ফুরিয়ে যাওয়ায় চলে গেলো। ছোট ছেলে সালমান সন্ধ্যায়ই ইংল্যান্ডে রওয়ানা হয়ে গেলো। ওর আম্মা ও স্ত্রী তাকে বিদায় করার জন্য বিমানবন্দরে গেলো। সেই তো হাসিনার ইন্তিকালের খবর পয়লা জেনে দেশে-

www.bjilibrary.com

বিদেশে সবাইকে জানাল। সে-ই পত্রিকা ও টেলিভিশনে দেবার জন্য মৃত্যু সংবাদ রচনা করে নিজেই সব জায়গায় বিলি করলো। কিন্তু বৈঠকে হাজির হবার সুযোগ পেলো না।

হাসিনার মৃত্যুতে আমার দু'ভাইয়ের পরিবারের সবাই অত্যন্ত বেদনাহত ছিলো। তাদেরকে সান্ত্বনা দান করা এবং এ মানসিক অবস্থায় দীনী দিক দিয়ে উপদেশ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিলো। প্রথমে বললাম, আমাদের দাদা, আব্বা ও চাচাদের কারো স্ত্রী তাদের আগে মারা যাননি বলে সাথীহারা হননি। আমার দু'ভাই সাথীহারা হয়ে গেলো। তোমাদের কাছে দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমাকে সাথীহারা না করেন।

সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দীর্ঘদিন বিছানায় পড়ে কষ্ট পেয়ে যায়নি। আল্লাহ মনে হয় মৃত্যুযন্ত্রণাও ভোগ করতে দেননি। আরামের সাথে রূহ নিয়ে গেলেন। পরামর্শ দিলাম, প্রতি নামাযের পর পিতা-মাতার জন্য গোনাহ মাফের দোয়া করবে। আল্লাহ তাআলা নিজেই আবেগময় দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা।" (হে আল্লাহ তারা আমাদেরকে যেমন স্নেহের সাথে লালন-পালন করেছেন, তেমনিভাবে তাদের দু'জনের উপর তুমি রহম করো)। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, "জীবিত লোকের পক্ষ থেকে মৃতের জন্য হাদিয়া (উপহার) হলো তার জন্য গোনাহ মাফ চাওয়া। তাই সব সময় বিশেষ করে নামাযের পর এ দোয়াই করতে থাকবে।"

আরও বললাম, "আত্মীয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম হলো পিতা-মাতা, ভাই, স্ত্রী ও সন্তান। যারা দুনিয়ায় নেক আমল করেনি, তারা হাশরের ময়দানে ঐ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের থেকে পালিয়ে বেড়াবে বলে সূরা আবাসায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুনিয়ায় ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মারা গেলে যতই কাঁদুক বা বেদনা বোধ করুক, দুনিয়ায় নেক হয়ে না মরলে হাশরে কোন সম্পর্ক থাকবে না। সূরা আত তূর-এর ২১ নং আয়াতে সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, ঐ ঘনিষ্ঠ লোকেরা বেহেশতে গেলেও তাদেরকে একসাথে রাখা হবে। যে উচ্চমানের বেহেশতে যাবে অন্যদেরকে নিম্নমানের বেহেশতে থেকে প্রমোশন দিয়ে তার সাথে মিলিত করবে। তাই সবারই চেষ্টা করা উচিত, যাতে উন্নতমানের বেহেশতে যেতে পারি। তাহলে একজনের কারণে অন্যরাও প্রমোশন পাবে। নাফসের তাড়নায়, শয়তানের ধোঁকায় ও পরিবেশের প্রভাবে যেন এমন কিছু না করি, যা আল্লাহর হুকুম ও রাসূলের তরীকার বিরোধী। হাশরের ময়দানে যেন আমাদের আপনজনদের কাছ থেকে পালাতে না হয়। এ জযবা নিয়ে যেন চলতে পারি যে, বেহেশতে মিলিত হবো।

মগবাজার ও সোবহানবাগ

ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা মরহুম মাওলানা আবদুস সুবহানের নামেই আরমানিটোলার তারা মসজিদের নিকটবর্তী বাড়িটির নাম সুবহান মঞ্জিল। মাওলানা সাহেবের সন্তানরা সোবহানবাগ এলাকায় অনেক জমি খরিদ করেন। তখন এ এলাকা খালি ময়দান ছিলো। মরহুম মাওলানার নাম থেকে সোবহানবাগ নাম দেওয়া হয়। ডা. মুয়াযযামের স্ত্রী হাসিনা মাওলানা সাহেবের দ্বিতীয় ছেলে মরহুম এ.কে. মুহাম্মদ হুসাইনের কন্যা। হাসিনা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে সোবহানবাগে যে জমি পেয়েছে সেখানেই বেশ কয়েকটি ফ্ল্যাট তৈরি হয় এবং হাসিনা ও তার দু'ছেলে-মেয়ে এক-একটি করে ফ্ল্যাটের মালিক হয়।

www.bjilibrary.com

আব্বা মগবাজারে ১৯৪৮ সালে তিন বিঘা জমি খরিদ করেন। আমাদের ভাই-বোনদের ভাগে যে জমি পড়ে তাতেই বাড়িঘর করা হয়। মাত্র দু'বছর আগে আমার ভাই ডা. মুয়াযযাম মগবাজারের নিজের বাড়ি থেকে সোবহানবাগের বাড়িতে চলে যায় এবং ছেলেদের সাথে বসবাস করতে থাকে।

১৫১.

লাহোর সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে আমার বক্তৃতা

২০০৩ সালের ৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীর ও মাসিক তারজুমানুল কুরআনের সম্পাদক অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ সভাপতিত্ব করেন। এ অধিবেশনে আমাকে প্রধান বক্তার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী উর্দুতে বক্তৃতা করতে হয়। সভাপতি থেকে জানতে চাইলাম, কতটা সময় বরাদ্দ করা হয়েছে? তিনি বললেন, আপনার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়নি, যতক্ষণ ইচ্ছা বলুন। আমি ৫০ মিনিট দীর্ঘ বক্তৃতা করলাম।

আমি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলাম, স্থানীয় শ্রোতাদের অধিকাংশই দাঁড়িয়ে গেলেন। তাদের এ আবেগে অভিভূত হলাম। ধারণা করলাম, এরা সবাই জামায়াতের লোকই হবেন।

সর্বপ্রথম আমার প্রতি শ্রোতাদের ভালোবাসা প্রকাশ করায় তাদের নিকট আন্তরিক শুকরিয়া জানালাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে সালাম জানালাম। বললাম, "বাংলাদেশ মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট একটি দেশ। কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে বিরাট দেশ। প্রায় ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটিরও বেশি মুসলমান। তাদের পক্ষ থেকেও আপনাদেরকে সালাম জানাই। বিশ্বের কোথাও এমন অল্প জায়গায় এতো বিরাটসংখ্যক মুসলিম নেই। দেশটি ভৌগোলিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। দেশটি এক বিশাল রাষ্ট্র দ্বারা প্রায় চারদিকে ঘেরাও অবস্থায় আছে। আর ঐ রাষ্ট্রের কোন সরকারই ভালো প্রতিবেশী হিসেবে আচরণ করেনি। ইসলামী আন্দোলন সেখানে একমাত্র আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করেই ইকামাতে দীনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরপর এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হবার যৌক্তিকতা তুলে ধরে বললাম, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় রাজধানী ইসলামাবাদ এবং বৃহত্তম শহর করাচি। এ সম্মেলন ঐ দু'জায়গায় না হয়ে লাহোরে কেন হচ্ছে? আমি মনে করি পাকিস্তানের ইসলামী রাজধানীই লাহোর। আল্লামা ইকবালই মাওলানা মওদূদীকে দাক্ষিণাত্য হায়দারাবাদ থেকে লাহোর আসার পরামর্শ দেন। তা না হলে হয়তো জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্র লাহোরে স্থাপিত হতো না। আল্লামার মাযার ও মাওলানার মাযার লাহোরেই রয়েছে। তাই এ সম্মেলন লাহোরে অনুষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ভূমিকাস্বরূপ এ দুটো কথা বলার পর মূল বক্তব্য শুরু করলাম ঃ

রাসূল (স) মাত্র লাখ দুয়েক মুসলমান তৈরি করে রেখে যান। তারা অর্ধশতাব্দীর মধ্যে মানবজাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। সে কালের দুটো প্রধান সাম্রাজ্য

www.bjilibrary.com

রোম ও পারস্য ইসলামী শক্তির নিকট পরাজিত হয়। আর আজ প্রায় দেড়শ কোটি মুসলমান সর্বত্র লাঞ্ছিত। কুরআন ঘোষণা করেছে যে, ইহুদী জাতি আল্লাহর অভিশপ্ত। অথচ তাদের দাপটে গোটা আরব বিশ্ব সন্ত্রস্ত। এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর কী হতে পারে? এর কারণ আল্লামা ইকবালের ভাষায় "আগের যুগে মুসলমান বলেই ছিলো সম্মানিত আর তোমরা কুরআনকে ত্যাগ করায় লাঞ্ছিত।" এমনকি আল্লাহর অভিশপ্ত জাতির হাতে অসহায়ের মতো জীবন দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এ দুর্দশার আসল কারণ আমাদের চরম অজ্ঞতা। অনেকের ধারণা মুসলমানের ঘরে পয়দা হলেই মুসলমান হিসেবে গণ্য। অথচ নবীর সন্তানও কাফির হতে পারে এবং কাফিরের সন্তানও নবী হয়েছেন। ঈমান, ইলম ও আমলের কতক গুণ মুসলিম হওয়ার জন্য জরুরি। ডাক্তারের সন্তান হলেই গদিনশীন ডাক্তার বলে গণ্য হয় না। আল্লাহ মুসলিম হিসেবে গণ্য হবার জন্য কতক গুণ অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। তা অর্জন না করলে নবীর সন্তানকেও তিনি মুসলিম বলে স্বীকার করেন না।

সম্মেলনের হলে বড় বড় হরফে মাওলানা মওদূদীর কতক বাণী লেখা ছিলো। এর একটির দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। তাতে লেখা, "সম্পদ বিনষ্ট হবার ক্ষতি তোমার জানা আছে, কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতার ক্ষতি তোমার জানা নেই।" ইসলামকে সঠিকভাবে জানার জন্য মাওলানা মওদূদীর লেখা সাহিত্য আল্লাহর বিরাট নিয়ামত। জানার ওপরই মানার যোগ্যতা নির্ভর করে।

মুসলিম জাতি ক্ষমতাহীন কেন?

কুরআন ঘোষণা করছে যে, আল্লাহ সকল রাজত্বের মালিক। তিনি যাকে খুশি রাজত্ব দেন, যার কাছ থেকে খুশি রাজত্ব কেড়ে নেন। মুসলিম জাতি আল্লাহর মরযি মতো রাজত্ব পরিচালনায় অযোগ্য হওয়ার কারণেই তিনি তাদের নিকট থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিয়েছেন।

মাওলানা মওদূদী লিখেছেন, "মুসলিম জাতিই সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান। কারণ তাদের নিকটই আল্লাহর কিতাব রয়েছে। আর তারাই সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগা। কারণ তারা আল্লাহর কিতাবকে মেনে চলছে না।"

কুরআনই সর্বশেষ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবই মানবজাতির হেদায়াতের একমাত্র মাধ্যম। আর কোন নবী আসবেন না বলে শেষ নবীর উম্মতের উপরই মানবজাতিকে হেদায়াত করার দায়িত্ব রয়েছে। আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার যে দায়িত্ব রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম পালন করেছেন, প্রত্যেক মুসলিমের উপরই সে দায়িত্ব বর্তায়। রাসূলের যুগে যারা ঈমানের দাবিদার হওয়া এবং রাসূলের ইমামতিতে নামায আদায় করা সত্ত্বেও দীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ওহুদের যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করেছে, তাদেরকে কুরআনে মুমিন বলে স্বীকার করা হয়নি। মাওলানা মওদূদীর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী আন্দোলন উম্মতের মধ্যে এ দায়িত্ববোধই জাগ্রত করেছে। ইসলামের শুধু ধর্মীয় দিকের দায়িত্ব পালন করলেই রাসূলের পূর্ণ আনুগত্য হয় না; বরং ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর আমল ও উদ্দেশ্যও ইকামাতে দীনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা।

www.bjilibrary.com

কুরআন ইসলামী আন্দোলনের গাইড বুক

কুরআনের তিনটি সূরায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহর হক দীনকে বিজয়ী করার জন্যই রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়েছে। আর এ বিরাট দায়িত্ব পালনের গাইড বুক হিসেবেই যে কুরআন নাযিল হয়েছে, সে কথাই মাওলানা মওদূদী তার তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে প্রমাণ করেছেন। মানব সমাজে অন্য কোন জীবন বিধানের অধীনে থেকে শুধু ইসলামের ধর্মীয় বিধান পালন করা শিক্ষা দেবার জন্য রাসূল (স)-কে পাঠানো হয়নি। বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে টিকে থাকতে পারে না।

কোন ঈমানদার ব্যক্তি মাওলানা মওদূদীর তাফসীর অধ্যয়ন করলে এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে যে, ইসলামী আন্দোলন সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে হককে কায়েম করার সংগ্রাম। হক ও বাতিলের সংঘর্ষ অনিবার্য। তাফহীমুল কুরআনের অধ্যয়নকারীকে হকের পক্ষে সক্রিয় হতে উদ্বুদ্ধ করে। নিরাপদ দূরত্বে থেকে হক ও বাতিলের সংঘর্ষকে তামাশা হিসেবে দেখতে দেয় না। এ তাফসীর বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রেরণা যোগায়। পাঠককে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না। হয় তাকে সক্রিয় হতে হয়, আর না হয় অধ্যয়ন ক্ষান্ত করতে হয়।

ইসলামের সঠিক পরিচয়

আমার পিতৃকুল ও মাতৃকুল আলেম ও পীর বংশ। কড়া ধর্মীয় পরিবেশেই গড়ে উঠেছি। দাদা ও পিতা থেকে জেনেছি যে, ইসলামই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ছাত্রজীবনে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র)-এর ওয়ায ও বইয়ের বাংলা অনুবাদ পড়ে বুঝতে পেরেছি যে, ইসলাম অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ধর্ম। এমএ পরীক্ষা দিয়ে তাবলীগ জামায়াতে তিন চিল্লা সময় দিয়ে উপলব্ধি করেছি যে, ইসলাম ধর্মের দাওয়াত সম্প্রসারণ করা মুসলিম জীবনের নিশান। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের পর অনুধাবন করতে পারলাম যে, ইসলাম শুধু ধর্ম ও মিশন নয়, ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ও এ বিধানকে বিজয়ী করার আন্দোলন।

কুরআন বুঝার তাগিদ

জামায়াতে যোগদানের পূর্বে কুরআন বুঝার তাগিদ কোন আলেমের মুখে শুনিনি। তাবলীগ জামায়াতে পাক-ভারত-বাংলার বহু বড় বড় আলিমের বক্তৃতা শুনবার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু কুরআন বুঝতে চেষ্টা করতে হবে এমন উপদেশ কেউ দেননি। সওয়াবের উদ্দেশ্যেই ছোট বয়স থেকে কুরআন তিলাওয়াত করে এসেছি। জামায়াতের কর্মী হতে হলে প্রতিদিন কুরআন অধ্যয়ন করতে হয়। এ বাধ্যবাধকতা না থাকলে আমার কুরআন অধ্যয়নের সৌভাগ্য হতো কি না জানি না।

সংগঠক মাওলানা মওদূদী

মাওলানা মওদূদী শুধু ইসলামী চিন্তাবিদই ছিলেন না; তিনি সফল ইসলামী সংগঠকও ছিলেন। ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্ব খুবই বিরল। একই ব্যক্তি চিন্তাবিদ ও সংগঠক হওয়ার উদাহরণ আমার জানা নেই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) যে চিন্তাধারা রেখে গেলেন, এরই ভিত্তিতে শহীদাইনে বালাকোট মুজাহিদ আন্দোলন গড়ে তুলেন এবং সীমান্তে ইসলামী হুকুমতও কায়েম করেন। কার্লমার্কস কমিউনিজম ও সোশালিজমের

www.bjilibrary.com

যে চিন্তাধারা দিলেন, এরই ভিত্তিতে লেনিন ও এঙ্গেলস আন্দোলন ও সংগঠন চালু করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন। তিনিও ইসলামী আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু সংগঠন গড়েননি। মাওলানা মওদূদীর সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে সংগঠনকে নেতৃত্বের কোন্দল, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, গ্রুপিং সৃষ্টি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করার কার্যকর বিধি-বিধান প্রয়োগ করেছেন। সংগঠনের সকল পর্যায়ে পারস্পরিক জওয়াবদিহিতার নীতি, সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনার ব্যবস্থা ও সংগঠনের সংশ্লিষ্ট ফোরামে পরামর্শক্রমে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতির প্রচলন করে সংগঠনকে সমস্যামুক্ত রাখার ঐতিহ্য চালু করে গেছেন। এসব সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয় কুরআন ও হাদীসে কোথাও এভাবে সাজানো নেই। তাই আমার দৃষ্টিতে চিন্তাবিদ মওদূদীর চেয়ে সংগঠক মওদূদী অধিক কৃতিত্বের অধিকারী।

'ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলি' বইটিতে কর্মীদের ব্যক্তিগত চারটি গুণ ও সাংগঠনিক চারটি গুণকে ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক পুঁজি বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। সংগঠন পরিচালনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমি জোর দিয়ে বলছি যে, উপরিউক্ত ৪+৪=৮টি গুণের কোনটার অভাব হলেই কোন না কোন সাংগঠনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

তাই মাওলানা মওদূদীকে আমি সাংগঠনিক বিরাট প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করি।

ইকামতে দীনের উদ্দেশ্যে সংগঠনভুক্ত হওয়া যে ফরয, একথা তিনি দলিলসহ প্রমাণ করেছেন। অনেক দীনদার মুসলমানও সংগঠনের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকাই নিরাপদ ও সুবিধাজনক মনে করেন। সাংগঠনিক শক্তি ব্যতীত ইসলাম বিজয়ী হতে পারে না। তাই নবী রাসূলগণও সংগঠন কায়েম করার মাধ্যমেই দীনকে বিজয়ী করতে সক্ষম হয়েছেন।

ইসলামী নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ছাত্র সংগঠন

১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তানের জন্ম হয়। ঐ বছরই ডিসেম্বর মাসে মাওলানা মওদূদী ইসলামী জমিয়তে তালাবা নামে ছাত্র সংগঠন কায়েম করেন। ইসলামী আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি ছাত্রদেরকে পৃথকভাবে সংগঠিত হবার পরামর্শ দেন। এটা মাওলানা মওদূদীর দূরদৃষ্টির প্রমাণ। ছাত্র জীবনের বয়সটাই মন-মগজ ও চরিত্র গড়ার সময়। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আজ তাদের হাতেই জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্ব, যারা ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে তৈরি হয়েছেন।

ইসলামের বিজয়ের জন্য দুটো শর্ত পূরণ হওয়া জরুরি। প্রথম শর্তই হলো এমন একদল লোক তৈরি করা, যাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দিলে তারা আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআলা সূরা আন নূরের ৫৫নং আয়াতে ওয়াদা করেছেন যে, এমন একদল সৎ ও যোগ্য লোক তৈরি হলে তিনি তাদের হাতে খিলাফতের দায়িত্ব তুলে দেবেন।

রাসূল (স)-এর যুগে ১৩ বছরে এমন এক দল লোক যোগাড় হওয়ার পরই রাসূল (স)-এর নেতৃত্বে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়। তিনি মক্কায় অবস্থানকালেই লোক তৈরি হওয়া সত্ত্বেও মক্কায় ইসলামী হুকুমত কেন কায়েম হলো না? এর কারণ, ইসলামের বিজয়ের জন্য দ্বিতীয় শর্তটি মক্কায় পূরণ হয়নি। সে শর্তটি হলো, জনগণের সক্রিয়

www.bjilibrary.com

ইসলামবিরোধী না হওয়া। আল্লাহ তাআলা তার দীনের মহানিয়ামত কোন অনিচ্ছুক জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেন না। এ শর্তটি মদীনায় পূরণ হওয়ায়ই সেখানে দীন বিজয়ী হয়।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনগণ ইসলামের বিরোধিতায় সক্রিয় নয়। তাই এ দু'দেশের ছাড়াও সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই এ দ্বিতীয় শর্তটি বিদ্যমান রয়েছে। শুধু প্রথম শর্তটি পূরণের অপেক্ষায় ইসলামী হুকুমত কায়েম হতে পারছে না। সুদান ও ইরানে যে ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়েছে তাদের জন্য সবারই দোয়া করা দরকার, যাতে তারা ইসলামের বিধান যথাযথরূপে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন।

আল্লাহ তাআলা জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের বর্তমান আমীর কাযী হোসাইন আহমদের মধ্যে গতিশীল নেতৃত্বের গুণাবলি দান করেছেন। তারই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পাকিস্তানে সকল ইসলামী শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। এ মহান ঐক্য সকল মুসলিম দেশের অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এটা এতো বড় কাজ হয়েছে, যার সুফল পাকিস্তানের জন্য পরম কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। আমি বিশ বছর চেষ্টা করেও বাংলাদেশে এমন ঐক্য গড়তে সফল হতে পারিনি।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ইসলামী যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলবার শর্তটি পূরণ হলেই ইসলামের বিজয় সম্ভব। ১৯৪৭ সাল থেকে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে যে বিরাটসংখ্যক লোক তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে যারা ছাত্রজীবন শেষে জামায়াতে ইসলামীতে সক্রিয় হননি তাদের নিকট আমি আকুল আবেদন জানাই যে, তারা যেন অবিলম্বে সক্রিয় হয়ে আমীরে জামায়াতের হাতকে শক্তিশালী করেন। জামায়াতের সকল স্তরের নেতৃবৃন্দ যদি তাদেরকে সক্রিয় করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান তাহলে বিজয়ের প্রথম শর্তটি পূরণ হয়ে যাবে বলে আমার আশা। কাযী সাহেবের মতো নেতা পেয়েও যদি নিষ্ক্রিয় সাবেক ছাত্রগণ এগিয়ে না আসেন তাহলে পাকিস্তানে ইসলামের বিজয় না হওয়ার জন্য তারা আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হতে পারেন।

এখন প্রয়োজন ইসলামী হুকুমত

মাওলানা মওদূদী ও ইমাম হাসানুল বান্না শহীদের আন্দোলনের ফলে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে এতো বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে এবং আরবী, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষায় ঐ সাহিত্য বিশ্বে এতোটা ছড়িয়েছে যে, ইসলামকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে অস্বীকার করার আর কোন উপায় নেই। জ্ঞানের জগতে ইসলাম এ যুগে অচল দাবি করার সাধ্য কারো নেই।

এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ। মদীনায় ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব রূপ দেখে আট বছর পরই দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করেছে। ইসলামী হুকুমত কায়েমের পূর্বে ১৩ বছরে সামান্যসংখ্যক লোকই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ নিজের কল্যাণ অবশ্যই চায়। ইসলামপূর্ব সমাজের চিত্র যারা দেখেছে তারা ইসলামী সমাজের রূপ দেখে তা তাদের জন্য কল্যাণকর বলে বুঝতে তাদের বেগ পেতে হয়নি।

আমরা ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করে বহুবছর চেষ্টা-সাধনা করে ইসলামকে চিনেছি। বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর পক্ষে এভাবে সাধনা করা স্বাভাবিক নয়। ইসলামী হুকুমত

www.bjilibrary.com

কায়েম হলে সর্বশ্রেণীর জনগণ ইসলামের বাস্তব রূপ দেখে আকৃষ্ট না হয়ে পারবে না। তাই ইসলামী হুকুমত এখন সময়ের দাবি। পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত কায়েম হলে বিশ্বের সর্বত্র ইসলামী আন্দোলন ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হবে।

বাংলাদেশে ইসলামের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের ১২ কোটি মুসলমান মুসলিম উম্মাহর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, রাসূল (স)-এর জন্য মহব্বত ও কুরআনের উপর ভক্তি মুসলমানদের মধ্যে মযবুত রয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম হবার পর যারা ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, তারা রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ভারত থেকে সেকুলারিজম ও রাশিয়া থেকে সোশালিজমকে আমদানি করে শাসনতন্ত্রে শামিল করেন। বাংলাদেশের জমিন ইসলামের চরম বিরোধী এ দুটো মতবাদ কবুল করতে রাজি হয়নি। ১৯৭৭ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন অবস্থায় ইসলামবিরোধী এ দুটো মতবাদকে শাসনতন্ত্র থেকে উচ্ছেদ করে এর পক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করেন। জনগণ বিপুল সংখ্যায় অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে শাসনতন্ত্রের এ সংশোধনী সমর্থন করে। এ সংশোধনীর আগে শাসনতন্ত্রের কোথাও আল্লাহর নাম ছিল না। এ সংশোধনীতে শাসনতন্ত্রের শুরুতেই বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের বদলে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শাসনতন্ত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন নিষিদ্ধ ছিলো। এ সংশোধনীতে এ দফাটিও উচ্ছেদ করা হলে জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামী দল প্রকাশ্যে কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগ এখনো ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে তাদের আদর্শ বলে দাবি করে। তাদের গঠনতন্ত্রে সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসেবে উল্লেখ ছিলো। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের আত্মহত্যার বেশ কয়েক বছর পর তারা এ মতবাদকে ত্যাগ করেছে বলে ঘোষণা করে। কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহের অস্তিত্ব পত্র-পত্রিকায় পাওয়া গেলেও সমাজতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন ময়দানে অনুপস্থিত।

পাকিস্তানে ইসলামী দলগুলোর ঐক্য ও নির্বাচনী সাফল্যে বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলোর মধ্যে অনুরূপ ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ঐক্য প্রচেষ্টা চালু রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যদি এ প্রচেষ্টাকে সফল করেন তাহলে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবার আশা করা যায়।

মুসলিমদের আত্মসমালোচনা জরুরি

মুসলিম উম্মাহ দুশমনদের বিরুদ্ধে যতটা সোচ্চার, মুসলিম হিসেবে ইসলামের প্রতি দায়িত্ববোধ সম্পর্কে ততোটা সচেতন নয়। দুশমনরা তো দুশমনি করবেই। যদি মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা নিজ নিজ দেশে রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ মেনে চলেন তাহলে দুশমনরা কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সবচেয়ে লজ্জার বিষয় হলো যে, তাদের অনেকেই নিজেদেরকে সংশোধন না করে ইসলামকেই সংশোধন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। এর চেয়ে বড় ক্ষোভের বিষয় হলো, মুসলিম নামধারী ইসলামের

www.bjilibrary.com

দুশমনদেরকে অবাধে ইসলামবিরোধী তৎপরতা চালাতে দিচ্ছেন। এদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে সামান্য আইনগত ব্যবস্থাও নিচ্ছেন না। স্বাধীন বাংলার নওয়াব সিরাজুদ্দৌলার সেনাপতি মীর জাফর আলী খান যদি ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের সাথে হাত না মিলাতো তাহলে এ উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন শুরুই হতো না। ক্লাইভ তার দেশের জন্য হিরোর গৌরব অর্জন করেছে। আমি ক্লাইভকে গালি দিতে চাই না। আমার জাতির মীর জাফরকে আমি আসল দোষী মনে করি। মুসলিম দেশের বড় মুসীবতই হলো, এ মীর জাফর মার্কা নামধারী মুসলিম।

মুসলিম উম্মাহর আসল সমস্যা

মুসলিম উম্মাহর আসল সংকট হলো ঈমান, ইলম ও আমলের অভাব। জনবল তো বিরাটই রয়েছে। ধনবলের দিক দিয়েও নিঃস্ব নয়। বস্তুগত উন্নতির অভাবও আসল সমস্যা নয়।

সম্মেলনে মাওলানা মওদূদীর একটা উদ্ধৃতি কাপড়ের ব্যানারে বড় বড় হরফে লেখা ছিলো, "এমন দৃঢ় মন চাই, যা ভাঙা নৌকা নিয়েও উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেবার হিম্মত রাখে, এমন সাহস চাই, যা কোন বড় শক্তির পরওয়া করে না এবং আল্লাহর উপর এমন ভরসা চাই, যা বস্তুগত অভাবের তোয়াক্কা করে না।" এসব গুণ থাকলেই আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হওয়া যায়। জনশক্তি, ধনশক্তি ও অস্ত্রশক্তির অভাব সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধে আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন। অথচ এসব শক্তি থাকা সত্ত্বেও হুনাইনের যুদ্ধে প্রথমে পরাজয় হয়। কুরআনে এর কারণও উল্লেখ করা হয়েছে। ঐসব শক্তি আসল জিনিস নয়। সহী ইলম, মযবুত ঈমান, আমলে সালিহ, শাহাদাতের জযবা, ইখলাস ইত্যাদি হলো আসল শক্তি, যা থাকলে আল্লাহ তাআলার সাহায্য পাওয়া যায়। আর এ সাহায্য পেলে অন্য কোন কারণেই পরাজয় হতে পারে না। মাওলানা মওদূদী, শহীদ হাসানুল বান্না ও ইমাম খোমেনী মুসলিম উম্মাহকে এ আসল শিক্ষাই দিয়ে গেছেন।

১৫২.

লাহোর সম্মেলনের ঘোষণাপত্রের পটভূমি

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে আশির দশক পর্যন্ত ৭০ বছর ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy) ও তথাকথিত সাম্যবাদ (So-called Communism and socialism)-এর মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) চলেছে। বিশ্বে পরাশক্তি (Super power) হিসেবে গণ্য হওয়ার প্রতিযোগিতাই ঐ ঠাণ্ডা লড়াই নামে পরিচিত।

১৯৮৮ সালে গর্ভাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়েই উপলব্ধি করেন যে, বিপর্যস্ত অর্থনীতি কাটিয়ে উঠতে হলে পার্টির আমলাতান্ত্রিকতা লাঘব করে স্বচ্ছতা ও খোলামেলা নীতি (পেরেসত্রয়কা ও গ্লাসনস্ট) প্রবর্তন করে শ্রমিকদেরকে প্রেরণা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ পরিবর্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে এমন রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে যার ফলে ১৯৯১ সালে ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিকস (USSR)-এর ১৫টি রিপাবলিকের ১১টি ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম হয়ে যায় এবং কমনওয়েলথ অব ইনডিপেনডেন্ট স্টেটস (CIS) গঠন করে।

www.bjilibrary.com

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পরিণতিতে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে সোশ্যালিজম আত্মহত্যা করে এবং বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকল্প আদর্শ হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। পরিণামে সোভিয়েত রাশিয়া পরাশক্তির মর্যাদা হারায়।

এরপর থেকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (USA) সেক্যুলার ডেমোক্রেসির একচ্ছত্র ধ্বজাধারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে এবং একমাত্র পরাশক্তির দাবিদার হিসেবে গোটা বিশ্বের মোড়ল সেজে বসে। এমনকি জাতিসংঘকেও নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। জাতিসংঘকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ইরাক দখল করে নেয়। যুক্তরাষ্ট্রের এ দাপট যদি অব্যাহত থাকে তাহলে জাতিসংঘ লীগ অব নেশনস-এর মতোই বিলুপ্ত হয়ে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করবে।

গণতান্ত্রিক বিশ্ব ইসলামকেই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মনে করে

পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আমেরিকা ও তার দোসররা ইসলামের পুনর্জাগরণ আন্দোলনকে তাদের একচেটিয়া মোড়লগিরির জন্য হুমকি মনে করছে। তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে একমাত্র ইসলামই চ্যালেঞ্জ করে আসছে। পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ৪৫টি রাষ্ট্র যদি ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয় তাহলে এসব রাষ্ট্রে আমেরিকার মোড়লগিরি যে চলবে না একথা তাদের নিকট সুস্পষ্ট।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে জনগণের মধ্যে ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপক সমর্থন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরাশক্তি ও এর দোসররা নিম্নরূপ কৌশল অবলম্বন করছে ঃ

১. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার যাতে কায়েম হতে না পারে সে উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র করছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়েও আলজেরিয়া ও তুরস্কে সামরিক একনায়কত্বকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। তুরস্কে নির্বাচিত সরকারকে নাকে খত দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে সমর্থন দিতে বাধ্য করা হয়েছে। মিসরে অবাধ নির্বাচন হতে দেওয়া হচ্ছে না। পাকিস্তানে সামরিক একনায়কের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। তিউনিসিয়ায় ইসলামের দুশমন সরকারকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে।

২. যেসব মুসলিম প্রধান দেশে রাজতন্ত্র কায়েম আছে সেখানে তারা নির্বাচিত সরকার কায়েমের জন্য চাপ দিচ্ছে না। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী হয়েও তারা রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

৩. সুদান, ইরান ও আফগানিস্তানের গণসমর্থিত সরকারকেও "ইসলামী রাষ্ট্র" ঘোষণা করায় তাদের দুশমন হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মুজাহিদ উসামা বিন লাদেনকে অজুহাত বানিয়ে আফগানিস্তানে গণহত্যা চালিয়ে তাদের পুতুল সরকার কায়েম করেছে। ইরান ও সুদানকে দাবিয়ে রাখার সর্বাত্মক অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪. মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে তাদের পোষ্য রেযাশাহ পাহলভীর রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে ইসলামী আন্দোলন বিজয়ী হলে আমেরিকাকে চরম অপমানিত হতে হয়। এর প্রতিশোধ নেবার হীন উদ্দেশ্যে ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে ইরান আক্রমণ করালো। ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরানকে পরাজিত করার জন্য ইরাককে

www.bjilibrary.com

বিরাট সামরিক শক্তিতে উন্নীত করলো। ইরানকে পরাজিত করতে না পারলেও সাদ্দাম হোসেন ঐ শক্তি প্রয়োগ করে কুয়েত দখল করে আমেরিকাকে কুয়েত উদ্ধারের বাহানায় উপসাগরে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ করে দিলেন। ইরাকের ভয়ে সৌদি আরবও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটির সুযোগ দিতে বাধ্য হলো।

আমেরিকার সাহায্যে গড়ে উঠা ইরাকের সামরিক শক্তি যাতে ইসরাইলের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়াতে পারে সে উদ্দেশ্যেই সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করা অপরিহার্য মনে করা হলো।

এভাবেই সাদ্দামকে ব্যবহার করে আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যকে পঙ্গু করে ইসরাইলকে শঙ্কামুক্ত করলো।

৫. ইসলামকে আক্রমণ করে সরাসরি কিছু বলা দৃষ্টিকটু বলে তারা ইসলামকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করে নিয়েছে।

ক. মৌলবাদী ইসলাম, যা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। যখন ইসলাম কায়েম করার আন্দোলন করা হয় তখন এটাকে তারা মিলিটেন্ট ইসলাম বলে।

খ. লিবারেল (উদার) ইসলাম, যা শুধু ধর্ম হিসেবে পালন করা হয়।

গ. মডার্ন (আধুনিক) ইসলাম, যা পাশ্চাত্য মূল্যবোধের ভিত্তিতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত।

তারা প্রথম প্রকারের ইসলামকেই ভয় পায়। কারণ তা তাদের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা লিবারেল ইসলামকে অপছন্দ করে না। তবে মডার্ন ইসলামকে খুব পছন্দ করে।

ইসলাম দুশমনীর প্রতিক্রিয়া

যারা ইসলামকে জীবন বিধান হিসেবে বিজয়ী করার চেষ্টা করেন তারা নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইসলামী আন্দোলন পরিচালনা করেন। তারা সন্ত্রাসী পদ্ধতিতে শক্তি প্রয়োগ করেন না। কারণ, নবী রাসূলগণও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। কিন্তু ইসলামের দুশমনরা যখন ইসলামী আন্দোলনকে দমন করার জন্য পশুশক্তি প্রয়োগ করে চরম নির্যাতন চালায় তখন এর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় কোথাও কোথাও কিছু বিক্ষুব্ধ যুবক গেরিলা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু মূল আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কখনো তা সমর্থন করেন না। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের প্রতিক্রিয়ায় যদি কিছু লোক গেরিলা পদ্ধতির আশ্রয় নেয় এর জন্য কি সরকারই আসল অপরাধী নয়? দায়িত্বহীন কতক লোক এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া দেখায় বলে ইসলামী আন্দোলনকে ঢালাওভাবে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করা আরও বড় অপরাধ। কতক গেরিলাকে বাহানা বানিয়ে নিয়মতান্ত্রিক ইসলামী আন্দোলনকে মিসর ও আলজেরিয়ায় প্রকাশ্যে কাজই করতে দিচ্ছে না।

মুসলমানদের আযাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী আখ্যাদান

সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মু ও কাশ্মীরের হিন্দু রাজা হরি সিং জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতে শামিল করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে

www.bjilibrary.com

বিদ্রোহ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী জনগণের ব্যাপক সমর্থন পেয়ে জম্মু ও কাশ্মীর দখলের প্রচেষ্টা চালায়। ভারতের সেনাবাহিনী জনসমর্থনের অভাবে তা প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করার জন্য জাতিসংঘে আবেদন জানায়। জাতিসংঘ জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে তাদের মধ্যে গণভোটের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত এতে সম্মত হওয়ায় পাকিস্তানও যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়।

কিন্তু নেহরু বেঈমানি করে অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরে গণভোট করতে দেয়নি। নপুংসক জাতিসংঘও এর ওয়াদা পালন করতে সক্ষম হয়নি। আমেরিকা কখনো এ বিষয়ে ভারতের উপর চাপ দেয়নি। জম্মু ও কাশ্মীরের মুসলমরা ৪০ বছর দাবি জানিয়েও যখন গণভোটের ন্যায্য অধিকার আদায় করতে সক্ষম হলো না, তখন তারা নিরুপায় হয়ে নব্বইয়ের দশকে গেরিলা পদ্ধতিতে আযাদী আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হলো।

ভারত এ আযাদী আন্দোলনকে সন্ত্রাসী কার্যাবলি বলে সেনাবাহিনী লেলিয়ে গণহত্যা চালাচ্ছে। জাতিসংঘ ও এর মোড়ল আমেরিকা ভারতের বেঈমানি, ওয়াদা খেলাফী ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি না করে আযাদী আন্দোলনকেই সন্ত্রাস আখ্যা দিয়ে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ভারতকে সমর্থন দিচ্ছে।

ফিলিস্তীনের ঘটনা আরও করুণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানের নেতা হিটলারের নাৎসীবাদ ও ইতালির নেতা মুসোলিনির ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা, ব্রিটেন ও রাশিয়ার মিত্রশক্তিকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী জাতি ইহুদীরা বিপুল অর্থ সাহায্য করে। যুদ্ধে মিত্রশক্তি বিজয়ী হলে ইহুদীরা ফিলিস্তিনে তাদের নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করে। ইহুদী জাতি ১২০০ বছর পূর্বে ফিলিস্তিন থেকে বিতাড়িত হয়। মিত্রশক্তি তাদেরকে আমেরিকা, কানাডা, রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার বিরাট পতিত এলাকায় রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা করে দিতে পারত। ইয়াহুদী জাতির এ দাবি মেনে নিয়ে মিত্র শক্তি ১২০০ বছর থেকে বসবাসরত আরব মুসলমানদেরকে ফিলিস্তিনের অর্ধেক এলাকা থেকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বলে উচ্ছেদ করে ইসরাইল রাষ্ট্র কায়েম করে দেয়। উচ্ছেদকৃত ফিলিস্তিনী মুসলমানরা বাধ্য হয়ে লেবানন, জর্দান, সিরিয়া ও অন্যান্য আরব দেশে আশ্রয় নেয়।

ইহুদীরা তাদের রাষ্ট্রকে শক্তিবলে সম্প্রসারিত করতে থাকে। বাস্তুহারা ফিলিস্তিনী মুসলমানরা গেরিলা পদ্ধতিতে আযাদী সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়। এ সংগ্রাম স্তব্ধ করার জন্য ইসরাইল সরকার গণহত্যা চালাতে থাকে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বহুবার ইসরাইলকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। নিরাপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্য রাষ্ট্রের ১৪ জনের মতের বিরুদ্ধেও আমেরিকা ভেটো প্রয়োগ করে সে প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেয়। আমেরিকার সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও ভেটো প্রয়োগের কারণে ইসরাইল জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবেরই পরওয়া করে না।

প্রকৃত সত্যি কথা এটাই যে, আমেরিকার মোড়লিপনাই বিশ্বকে গেরিলা যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছে। ভিয়েতনামকে আমেরিকাই গেরিলা যুদ্ধের জন্য বাধ্য করে। ফিলিস্তিনে দীর্ঘতম সময় থেকে এ যুদ্ধ চলছে। সম্প্রতি আফগানিস্তান ও ইরাকে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জনগণের আন্দোলনের অধিকার হরণ করার এটাই স্বাভাবিক পরিণতি।

www.bjilibrary.com

পরীক্ষামূলক গেরিলা যুদ্ধ

ষাটের দশকে সিরিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমূনের নির্বাচিত অত্যন্ত জনপ্রিয় সরকার ছিলো। রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় হাফিয আল আসাদ সেনাবাহিনী নিয়ে ঐ সরকারকে উৎখাত করে সামরিক স্বৈরশাসন চালু করে। ইখওয়ানের পক্ষে প্রবল জনসমর্থন থাকায় সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ইখওয়ানের একটি গ্রুপ গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। গেরিলা যুদ্ধে অনেক নাশকতামূলক কাজ করতে হয়, যার ফলে নিরপরাধ মানুষও নিহত হয়। ইখওয়ানের কর্মীরা আখিরাতের ভয়ে এভাবে হত্যা করতে পারেনি। আধুনিক যুগে উন্নত সামরিক অস্ত্রে সজ্জিত সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে এ জাতীয় গেরিলা পদ্ধতি সফল হতে পারে না। সিরিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে চেষ্টা করে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো তাতে বিশ্বে কোথাও এ পদ্ধতিকে ইখওয়ান সমর্থন দিচ্ছে না। সিরিয়াতেও মূল নেতৃত্ব এ জাতীয় প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেনি।

১৯৭২ সালে পাকিস্তানে মি. ভুট্টোর চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর থাকাকালে '৭০-এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচিত সংসদ সদস্য ডাক্তার নাযির আহমদকে সন্ত্রাসীরা তার চেম্বারে গুলি করে হত্যা করে। এর প্রতিক্রিয়া প্রদর্শনের জন্য Democratic Youth Force নামক জামায়াতের সমর্থক যুব সংগঠনের নেতারা মাওলানা মওদূদীর নিকট হাজির হয়। ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। তারা বললো, "মাওলানা! আর সহ্য করা যায় না, আমরাও তাদেরকে মারতে চাই। আপনি আর আপত্তি করবেন না। এভাবে সহ্য করলে আমরা আর এগুতে পারবো না।" জওয়াবে মাওলানা বললেন, "রাসূল (স)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদেরকে চলতে হবে। এতে যদি শত বছরও লাগে লাগুক। তারা নিরাশ হয়ে জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া তোয়ায়েল মুহাম্মদের নিকট যেয়ে ঐ একই কথা বললো। তিনি বললেন, "তোমরা ইসলামী ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে যেভাবে গড়ে উঠেছো তাতে এ জাতীয় কাজ করার যোগ্যতা তোমাদের থাকার কথা নয়। যাদের এ যোগ্যতা আছে তারা কারো অনুমতি চাইতে যায় না। তোমরা অনুমতি চাইতে এসে প্রমাণ করেছো যে, এটা তোমাদের করণীয় কাজ নয়। সিরিয়ার মতো পরীক্ষামূলকভাবেও পাকিস্তানে তা করতে দেওয়া হয়নি।

আত্মঘাতী হামলা

১৯৬৫ সালে ভারত লাহোর শহর দখল করার উদ্দেশ্যে বিরাট ট্যাঙ্ক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসে। তাদেরকে প্রতিহত করার দায়িত্বে ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান। তিনি তার বাহিনীকে বললেন, "এ বাহিনীর মুকাবিলা করার সাধ্য আমাদের নেই। উপায় একটাই আছে– কোমরে ডিনামাইট বেঁধে ট্যাঙ্কের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। রাস্তার দু'পাশে জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে যথাসময়ে একসাথে দেশ রক্ষার জন্য জীবন দিতে হবে।" সৈনিকরা একটু দ্বিধা করছে মনে করে সেনাপতি নিজেও তাদের সাথে জীবন দেবার ঘোষণা দিলেন। তখন সবাই প্রস্তুত হয়ে গেলো এবং টিক্কা খানকে যেতে দিলো না।

কয়েকশ ট্যাঙ্ক এবং প্রতি ট্যাঙ্কে অবস্থানরত অফিসার ও সৈনিকগণ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে গেলে লাহোর দখলের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয়ে গেলো। যুদ্ধের পর আমি ঐসব বিধ্বস্ত ট্যাঙ্ক দেখে এসেছি।

www.bjilibrary.com

ফিলিস্তিনে হামাস আত্মঘাতী বোমা মেরে দুশমন ইসরাইলীদেরকে হত্যা করছে ঐ একই জযবা নিয়ে। ইসরাইলের মতো সশস্ত্র বাহিনীকে প্রতিহত করার সাধ্য না থাকায় গেরিলা পদ্ধতি অবলম্বন করতে তারা বাধ্য হয়েছে। ইরাকেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করে আমেরিকার অন্যায় দখলদারিত্বকে প্রতিহত করার চেষ্টা চলছে।

আত্মঘাতী হামলাকারীদেরকে সন্ত্রাসী বলে গালি দিলেই কি তাদের জীবনদান মূল্যহীন হয়ে যাবে! সন্ত্রাসীরা ব্যক্তিস্বার্থে যুলুম করে। তারা জীবন দেয় না, জীবন হরণ করে। হামাসের লোকেরা শাহাদাতের পবিত্র জযবা নিয়ে ইহুদী দখলদারদেরকে হত্যা করতে গিয়ে শহীদ হচ্ছে।

নিজের ইচ্ছায় দেশ, জাতি ও দীনের স্বার্থে জীবন বিসর্জন দেওয়া কোন খেলা? যারা ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে বৃহত্তম কল্যাণের জন্য জীবন দিচ্ছে তারা সন্ত্রাসী? যারা তাদের বাড়ি-ঘর শক্তিবলে দখল করে আছে তারাই তো আসল সন্ত্রাসী।

ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান ও ইরাকে আযাদী হাসিলের জন্য যারা জীবন দিচ্ছে তাদেরকে সন্ত্রাসী নাম দিয়ে যত নিন্দাই করা হোক, নিরপেক্ষ প্রত্যেকটি মানুষ আমেরিকাকেই সন্ত্রাসের জন্মদাতা বলছে। আযাদী আন্দোলন যদি সন্ত্রাস হয়, আযাদী হরণ করা বহুগুণ বড় সন্ত্রাস।

লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যে ঘোষণাপত্র (Declaration) প্রকাশ করা হয়েছে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও যৌক্তিকতা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে উপরে লিখিত পটভূমি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে এতো দীর্ঘ আলোচনা করতে হলো।

আমি ঘোষণাপত্রের সারসংক্ষেপ পেশ করা মোটেই যথেষ্ট মনে করছি না। তাই ২২ দফা ঘোষণাপত্র উর্দু থেকে অনুবাদ করে পরিবেশন করা কর্তব্য মনে করছি।

১৫৩.

ঐতিহাসিক ২২ দফা ঘোষণা

১. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এবং উম্মতের করণীয় প্রথম কাজই হলো সর্বস্তরে মুসলমানদের কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা যথাযথভাবে অর্জন করা। তাদেরকে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, তারা ব্যক্তিগত, সামষ্টিক ও জাতীয় জীবন ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী যাপন করবে। ইসলামী শিক্ষাকে ব্যাপক করা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অন্যদেরকেও আমল করানো তাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হতে হবে।

২. তাগূতী শক্তি তাদের পূর্ণ বাহিনী নিয়ে মুসলমান, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, তথা গোটা মানবতার উপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে তাকে সম্পূর্ণ খতম করাই তাদের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তারা দীনী মাদরাসা ও আলিমদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণার বাজার উত্তপ্ত করে রেখেছে, যাতে দীনী মাদরাসা ও আলিমদের উপর আক্রমণ করাকে বৈধ সাব্যস্ত করা যায়। তেমনিভাবে আল্লাহর আইন কায়েমে যারা তৎপর তারাও আক্রোশের শিকার হয়ে আছে।

www.bjilibrary.com

অপরদিকে এসব তাগূতী শক্তি নৈতিক অবক্ষয়, নগ্নতা, নির্লজ্জতা ও চারিত্রিক বিপর্যয় ব্যাপক করায় সচেষ্ট রয়েছে। তারা যা কিছু মন্দ ও অনিষ্টকর তার বিকাশ এবং যা কিছু মঙ্গলকর তা ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর।

মুসলিম উম্মতের উপর এটা ফরয যে, নিজেদেরকে ও মানবতাকে তাগূতের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাসূল (স)-এর সুন্দরতম আদর্শের আলোকে নিয়মতান্ত্রিক ও কার্যকর সংগ্রামের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে, যাতে বিশ্বকে ধ্বংস থেকে বাঁচানো যায়। তদুপরি যুলুমের অবসান, ইনসাফ কায়েম এবং আযাদী হাসিলের উদ্দেশ্যে সকল সংগ্রামী প্রচেষ্টা ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক চালাতে হবে। কঠোরতা অবলম্বন ও গোপন তৎপরতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে এবং প্রতিশোধস্পৃহা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ত্যাগ করতে হবে।

৩. ইসলামবিরোধী সকল শক্তি একজোট হয়ে মুসলিম উম্মতের উপর হামলারত আছে। এ অবস্থায় মুসলিমদের পারস্পরিক ঐক্য সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। সকল প্রকার মতপার্থক্য খতম করে বিশ্বের সকল মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুশমনদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে হবে।

৪. বর্তমান চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করার জন্য এটা অত্যন্ত জরুরি যে, মুসলিম বিশ্বে শিক্ষার মানকে উন্নত করতে হবে। শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। নিজেদের কৃষ্টি ও সভ্যতার মূল্যমানের হেফাযত করতে হবে এবং জাহেলী যাবতীয় প্রথা বিসর্জন দিতে হবে। হকপন্থী ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সহযোগিতায় আদর্শ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কায়েম করতে হবে এবং বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো উন্নত করতে হবে।

৫. স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে ইসলামী শরীআতকে বাস্তবে কায়েম করতে হবে, যাতে আদল, ইনসাফ, সাম্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যেন গোটা বিশ্বের জন্য অনুকরণযোগ্য নমুনা হতে পারে।

৬. ইসলামী বিধি-বিধান ও রীতিনীতি অনুযায়ী ইজতিহাদ (গবেষণা) ও জিহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এবং ইসলামী আদব মুতাবেক পালন করতে হবে। ইজতিহাদ চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য যেমন জরুরি, তেমনি মানব জীবনে আদল ও ইনসাফ কায়েম করার মাধ্যমই হলো জিহাদ। তাগূতী শক্তি জঘন্য অপপ্রচারের মাধ্যমে জিহাদকে যে সন্ত্রাস নাম দিয়েছে এ সম্মেলন তা নাকচ করে দিয়ে ঘোষণা করছে যে, জিহাদ যুলুম ও ঔপনিবেশিক দখলদারিত্ব খতম করা এবং ইনসাফ কায়েম করার মাধ্যম। কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদ জারি থাকবে। এর উপর কোন বিধি-নিষেধ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৭. মুসলিম উম্মতের মধ্যে যত মত ও পথ রয়েছে তাদের মধ্যে ঐক্য, ঐকমত্য, ঘনিষ্ঠতা, সহনশীলতা, ধৈর্য ও উদার দৃষ্টির নীতি চালু করতে হবে। মতপার্থক্যকে জ্ঞানের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। দুশমনদের ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করে তাদেরকে এমন কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না, যাতে তারা মুসলমানদেরকে মতভেদের নামে লড়াইয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

www.bjilibrary.com

৮. বিশ্বের কুফরী নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে যেসব ফিতনা ও শঙ্কা সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম উম্মাহকে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করাকে টার্গেট হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করতে হবে।

৯. মুসলিম মিল্লাতের সামষ্টিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনে নির্বাচনের ন্যায়ভিত্তিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। ইসলাম পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমর্থক এবং একনায়কত্ব ও স্বৈরতন্ত্রের ঘোর বিরোধী, তাই সকল বিষয়ে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

একনায়কত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর নেতৃত্বের কর্মপদ্ধতি থেকে মিল্লাতকে নাজাত দিতে হবে, যাতে সামষ্টিক জীবনের ব্যবস্থাপনা স্বাধীন, গণতান্ত্রিক ও পরামর্শের নীতি অনুযায়ী পরিচালিত হতে পারে।

১০. জাতীয় খনিজ, কৃষি ও কাঁচামালের উপর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশবাদী শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান একচেটিয়া দখলদারিত্ব থেকে মুসলিম মিল্লাতকে নাজাত দেবার এবং শাসকবর্গকে দুশমনদের দালাল হওয়া থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে পারস্পরিক মতবিনিময় ও সমঝোতার চেষ্টা করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে গণমাধ্যমের সকল প্রকার প্রভাব খাটাতে হবে।

১১. জাতীয় সম্পদের যুলুমভিত্তিক বণ্টনের প্রচলিত ব্যবস্থা খতম করে এবং কতক সুবিধাভোগী শ্রেণীকে একচেটিয়া দখলদারিত্ব থেকে উৎখাত করে, সততা ও আমানতদারির সাথে উম্মতের উন্নতি ও বৃহত্তর কল্যাণে তা ব্যয় করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, যাতে দারিদ্র্য দূর হতে পারে এবং মুসলিম উম্মাহ সত্যিকার ও দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হাসিল করতে পারে এবং মযলুম মানুষ তাদের অধিকার ভোগ করতে পারে।

১২. ইসলাম কোন সভ্যতার দ্বন্দ্বের ধারক নয়; বরং ইসলাম সকল সভ্যতার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পতাকাবাহী—এ মহাসত্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

ইসলাম এমন এক দীন, যা মানুষের সাম্য অধিকারের হেফাযত, মানবতার সম্মান ও ধর্মীয় স্বাধীনতার প্রবর্তক। সভ্যতার দ্বন্দ্বের চিৎকার পাশ্চাত্যের পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে, যা এক মারাত্মক প্রবণতা। এটার ভিত্তি হলো ঘৃণা ও বিদ্বেষ, যা আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। আমরা এ কথার পৃষ্ঠপোষক যে, বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতার মধ্যে সকল বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে মীমাংসা করতে হবে, যাতে দুনিয়া শান্তির দোলনায় পরিণত হতে পারে।

১৩. বিশ্বায়নের আকর্ষণীয় নামে উপনিবেশবাদীরা গোটা দুনিয়াকে তাদের অর্থনৈতিক ও তামদ্দুনিক শেকলে আবদ্ধ করার জন্য পূর্ণ শক্তিতে কর্মতৎপর রয়েছে। মিল্লাতকে এ বিষয়ে অবহিত করতে হবে, যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে এ বিপদের মুকাবিলা করা যায়।

www.bjilibrary.com

১৪. মুসলিম উম্মতকে নিজেদের বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত নিম্নমানের ব্যাপারে উপনিবেশবাদী শক্তির ভূমিকা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু এর জন্য শুধু তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত না করে সত্যানুরাগী হয়ে নিজেদের কর্ম-তৎপরতার হিসাব নিয়ে নিজেদের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করতে হবে। অভ্যন্তরীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর না করে বাইরের দুশমনের মুকাবিলা করা যায় না।

১৫. কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, ইরাক, চেচনিয়া, পূর্ব-ইউরোপ, আরাকান ও মোরোল্যান্ডের মযলুম মুসলমান এবং অন্যান্য নির্যাতিত জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃতি আদায় করা ও যালিমদেরকে যুলুম থেকে বিরত রাখার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

১৬. উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং এ বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা ও গবেষণার সাথে ইসলামী স্পিরিট ও জিহাদী জযবা শামিল থাকে।

১৭. মিশনারী সংস্থাসমূহ ও বিদেশী এনজিওদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচালনায় যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে, সেসবের প্রতি কড়া নজর রাখতে হবে, যাতে আমাদের নবপ্রজন্মকে তাদের রং-এ রাঙিয়ে মুসলিম উম্মতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে। পাশ্চাত্য শক্তিসমূহ তাদের জঘন্য লক্ষ্য হাসিল করার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সেবামূলক ও খয়রাতি প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমালোচনার টার্গেট বানাচ্ছে। তাদের প্রভাবে পড়ে বহু কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিকার করতে হবে।

১৮. বিদেশী সাহায্যে কর্মতৎপর তথাকথিত এনজিওসমূহের হিসাব নেওয়াও সময়ের দাবি। কারণ তাদের আসল লক্ষ্য আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া, সভ্যতার মূল্যমান থেকে সরিয়ে নেওয়া ও ঈমানের ভিত্তিসমূহের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এসব প্রতিষ্ঠান উপনিবেশবাদের উদ্দেশ্যে মুসলিম দুনিয়ায় কর্মতৎপর রয়েছে। তাদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য বুদ্ধিজীবীগণকে সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে নিজেদের ধর্মীয় ও জাতীয় কর্তব্য পালন করতে হবে।

১৯. মুসলিম উম্মতের আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের জন্য মযবুত আওয়াজ তুলবার উদ্দেশ্যে ওআইসিকে শুধু সক্রিয় করলেই চলবে না; বরং মিডিয়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্পকারখানা ও প্রতিরক্ষায় সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গি ও পলিসি অবলম্বন করতে হবে, যাতে মুসলিম উম্মাহ আন্তর্জাতিক ময়দানে নিজস্ব ভূমিকা পালন করতে পারে এবং কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, আরাকান, মোরোল্যান্ড ইত্যাদি এলাকার মযলুম মুসলমানদেরকে উপনিবেশবাদীদের খপ্পর থেকে নাজাত দেবার জন্য মুসলিম উম্মাহ গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে পারে।

২০. সকল প্রকার গণমাধ্যম– রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি বিরাট এক শক্তি। এসব গণমাধ্যমকে জনগণের সংশোধন, জননিরাপত্তা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা এবং ইসলামের বাণী প্রচার ও মিল্লাতের কল্যাণে ব্যবহার

www.bjilibrary.com

করার পরিকল্পনা নিতে হবে। এসব গণমাধ্যম বর্তমানে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ছড়ানো, নির্লজ্জতা ও নগ্নতা ব্যাপক করা ও সন্ত্রাস প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রতিকার অত্যন্ত জরুরি।

২১. ইসলাম নারীকে যে অধিকার, সম্মানের স্থান ও নিরাপত্তার বিধান দিয়েছে তা সামষ্টিক জীবনে পূর্ণ সততার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। মহিলাদের অধিকার হরণের কুপ্রথা ও জাহেলী রসম-রেওয়ায খতম করতে হবে, যার অনুমতি ইসলাম কখনো দেয় না। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা নারী-অধিকার সম্পর্কে ইসলামী বিধানসমূহকে অপপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়। তাদের এ সুযোগ দেওয়া যাবে না।

২২. মুসলমানদের মধ্যে যারা না জানার কারণে বা কোন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন পথে চলছেন, যার দরুন মিল্লাতের ক্ষতি হচ্ছে ও উপনিবেশবাদী শক্তির কল্যাণ হচ্ছে, তারা যেন খোলা মন-মগজ নিয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনঃ বিবেচনা করেন এবং দুশমনদের শক্তি বৃদ্ধির সহায়ক না হয়ে উম্মতের সাথে সহযোগিতা করেন ও উম্মতকে শক্তিশালী করার পথ অবলম্বন করেন।

এ সম্মেলন দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করছে যে, তাগূতী শক্তিসমূহ তাদের উপায়-উপকরণ, সামরিক শক্তি ও বিরোধী প্রোপাগাণ্ডা সত্ত্বেও ব্যর্থ ও বিফলকাম হবে এবং ইনশাআল্লাহ বাতিল শক্তি পরাজিত হবে এবং হক বিজয়ী হবে। ইসলামের বিশ্বজনীন ও ইনসাফপূর্ণ সমাজব্যবস্থা মযলুমদেরকে যুলুম থেকে উদ্ধার করবে এবং ইনশাআল্লাহ আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হবে।

এ সম্মেলন জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান-এর আমীর কাযী হোসাইন আহমদ ও সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণের প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছে যে, এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন পর ইসলামী বিশ্বের বাছাই করা ও বিশিষ্ট ওলামা-ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও চিন্তাবিদগণকে সমবেত হওয়ার ও তাদের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার সুযোগ করে দিয়েছেন। এ সম্মেলন আশা করে যে, সর্বসম্মতভাবে এখান থেকে যে ঘোষণাপত্র জারি করা হলো তা ইসলামী দুনিয়ার জন্য এক সময়োপযোগী বার্তা বহন করবে। ইনশাআল্লাহ এর ইতিবাচক সুফল ফলবে এবং পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, মতবিনিময় ও সহযোগিতার এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

১৫৪.

পাকিস্তানে অভ্যন্তরীণ সফর

লাহোর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের দাওয়াত কবুল করার পর পাকিস্তানের আমীরে জামায়াত আমাকে ১৫ দিনের সময় নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি সম্মতি দিলাম।

পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন উপলক্ষে COP (Combined Opposition Parties) ও PDM (Pakistan Democratic Movement) নামে ৫ দলীয় ঐক্যজোটের নেতৃবৃন্দের দেশব্যাপী সফরে জামায়াতের

www.bjilibrary.com

প্রতিনিধি হিসেবে আমি সকল প্রাদেশিক রাজধানী, বিভাগীয় শহর ও গুরুত্বপূর্ণ জেলাশহরে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছি। ঐ সব স্থানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায়ও পূর্ব-পাকিস্তানের দায়িত্বশীল হিসেবে বক্তব্য রেখেছি। ১৯৭২ সালে ১১ মাস বাধ্য হয়ে পাকিস্তানে আটকা পড়লাম। তখনও জামায়াতের সুধী সমাবেশে ও ছাত্রদের প্রোগ্রামে বহু জায়গায় গিয়েছি। ৩১ বছর পর এবার সফরে যেয়ে ৫০ থেকে ৭০ বছর বয়সে পূর্বপরিচিত বেশ কিছু লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। হাজার হাজার লোক আমাকে দীনী রেশতার কারণে ভালোবাসে বলে জানলাম। জামায়াতের দায়িত্বশীলদের মধ্যে যারা সিনিয়র তাদের সাথে তো যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিলোই। আমার সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিলো পেশোয়ার যাওয়ার। এমএমএ সেখানে প্রাদেশিক সরকার দখল করে আছে। তারা কেমন করছে তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করলাম।

আমি ৫ ডিসেম্বর (২০০৩) লাহোর পৌঁছলাম। ২০ ডিসেম্বর করাচি থেকে ঢাকা ফিরে আসবো বলে ধারণা ছিলো। কিন্তু করাচি মহানগরীতে রুকন সম্মেলনে যোগদানের জন্য আবদার করায় রাজি হতে হলো। ২১ ও ২২ তারিখে করাচি থেকে ঢাকা আসার কোন বিমান না পাওয়ায় সফর ১৫ দিনের চেয়ে বেড়ে ২০ দিন হয়ে গেলো।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজধানী সফর

সিন্ধু প্রদেশের রাজধানী করাচি হলো পাকিস্তানের দরজা বা প্রবেশ পথ। সেখানে লাখ লাখ বাংলাদেশী বসবাস করেন। সেখানে কমপক্ষে তিন দিন থাকার ওয়াদা করেছি। পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে তো সম্মেলন উপলক্ষেই যেতে হলো। সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে ইসলামী সরকার সম্পর্কে জানার জন্য প্রবল আগ্রহ ছিলো। বেলুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটায় যাবার আগ্রহ না থাকলেও তাদের দাবি মেনে যেতে হলো। আযাদ কাশ্মীরের রাজধানী মুযাফফারাবাদে যাবার দাবিও ছিলো কিন্তু আমি তা থেকে অব্যাহতি নিয়েছি।

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ১৯৭২ সালে অনেক দিন ছিলাম বলে সেখানে যাবার ইচ্ছে ছিলো। ঐ সময় বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযান চালানো হয়। সেখানে কয়েকবার ঢাকার মতো প্রবল বৃষ্টি হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা নাকি এতো বৃষ্টি ইতঃপূর্বে দেখেনি। আবহাওয়াবিদরা বলেন যে, বনাঞ্চলে বৃষ্টি বেশি হয়ে থাকে। আমি মন্তব্য করলাম যে, আল্লাহ তাআলা গাছের দাবি পূরণের জন্যই এমন করে বৃষ্টি দিলেন। ইসলামাবাদ শহর বাংলাদেশের মতোই সবুজ এবং ঢাকা শহর থেকেও বৃক্ষের সংখ্যা বেশি মনে হলো।

আমার সফর উপলক্ষে লাহোর, পাঞ্জাবের বিভাগীয় শহর গোজরানওয়ালা, ইসলামাবাদ, রাউলপিন্ডি, সোয়াত, দীর, পেশোয়ার, কোয়েটা, করাচি ও হায়দারাবাদে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বিরাট বিরাট সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এসব সমাবেশে রুকন, কর্মী ও সুধীদেরকে সম্বোধন করে বক্তব্য রেখেছি এবং কিছু প্রশ্নের জওয়াবও দিয়েছি। লাহোর সম্মেলনে যেসব পয়েন্ট আলোচনা করেছি প্রধানত ঐ সবই এসব সমাবেশে পেশ করেছি। অবশ্য করাচিতে রুকন সম্মেলনে "ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সহী জযবা" নামক আমার লেখা বই থেকে বক্তব্য রেখেছি। করাচির আমীর ও

www.bjilibrary.com

সেক্রেটারির দাবি ছিলো যে, আমি যেন রুকনদের প্রতি হেদায়াতমূলক বক্তব্য রাখি।

রুকন সম্মেলনে জামায়াতের করাচি আমীর ড. মেরাজুল হুদা সিদ্দিকী জানতে চাইলেন যে, আমার এ বক্তব্য পুস্তিকাকারে পাওয়া যায় কি না। বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় বলে জানালে তিনি অনুরোধ করলেন যেন আমি হেদায়াতমূলক আমার লেখা সকল পুস্তিকা তাকে পাঠাই। তিনি সেখানে উর্দুতে অনুবাদ করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিগত বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে পাকিস্তান থেকে ইসলামী জমিয়তে তালাবার নেতৃবৃন্দ এসেছিলেন। তাদের মাধ্যমে আমার লেখা ৫০/৬০টি পুস্তিকা থেকে বাছাই করে ৩২টি পুস্তিকা পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে উর্দুতে অনুবাদ করার যোগ্য বাংলাভাষী কয়েকজন রুকন আছেন। আমার জানামতে মাওলানা মুস্তফা যামান আব্বাসী ও প্রফেসর মুহাম্মদ মুহীউদ্দীন চৌধুরী দ্বারা অনুবাদের দায়িত্ব পালন সম্ভব। মাওলানা আব্বাসী একটি মাদরাসা ও মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা, মাদরাসার মুহতামীম ও মসজিদের খতীব। আর প্রফেসর চৌধুরী ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বৃহত্তম নোয়াখালীর জেলা আমীর এবং বহু বছর করাচি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের হেড হিসেবে দায়িত্ব পালন করে অবসর গ্রহণ করেছেন। লাহোরে সম্মেলনের কারণে জামায়াতের রুকন ও কর্মীদের নিজস্ব সমাবেশ করা সম্ভব ছিলো না বলে পেশোয়ার থেকে আবার লাহোর আসতে হলো। জামায়াতের হেড কোয়ার্টার মানসূরায় বিশাল হলে লাহোর শাখার রুকন, কর্মী ও সুধী সমাবেশে বক্তব্য রাখতে হলো।

এর পূর্ব দিন পেশোয়ার থেকে বিমানযোগে লাহোর পৌঁছি এবং সন্ধ্যার পর জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস সংলগ্ন একটি প্রশস্ত কামরায় কেন্দ্রীয় জামায়াতের নেতৃবৃন্দ এবং সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সাথে বৈঠকে মিলিত হই। আমীরে জামায়াত কাযী হোসাইন আহমদ পেশোয়ারে থাকায় এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। সাবেক আমীর মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ ও অন্যতম নায়েবে আমীর চৌধুরী রহমত ইলাহী, সেক্রেটারি জেনারেল সাইয়েদ মুনাওয়ার হাসান ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেলগণ উপস্থিত ছিলেন। জনপ্রিয় মাসিক উর্দু ডাইজেস্টের প্রধান সম্পাদক জনাব আলতাফ হাসান কুরাইশী ও প্রখ্যাত সাপ্তাহিক জিন্দেগীর সম্পাদক জনাব মুজিবুর রহমান শামীও উপস্থিত ছিলেন। পাকিস্তান আমলে আমার সাথে তারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তারা মাওলানা মওদূদীর (র) পরম স্নেহভাজন হিসেবেই পরিচিত।

১৯৫৬ সাল থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত মিয়া তোফায়েল মুহাম্মদ জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক সাংগঠনিক সফর করেছেন। বাংলাদেশে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা জানার আগ্রহ নিয়ে ৯০ বছর বয়সেও বৈঠকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে জামায়াতের অগ্রগতি ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সবাই বেশ উৎসুক ছিলেন বলে অনেক প্রশ্ন করলেন।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাংগঠনিক অবস্থা

পাকিস্তানে আমি যতো সমাবেশে বক্তব্য রেখেছি সর্বত্রই বাংলাদেশে জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। জামায়াতের

www.bjilibrary.com

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে একটু বিস্তারিত জানাতে হয়েছে। বিভিন্ন সমাবেশে যতোটুকু জানিয়েছি তা নিম্নরূপ–

১৯৭১ সালে যখন পূর্ব-পাকিস্তান আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখন পূর্ব ও পশ্চিমে সর্বমোট রুকনসংখ্যা ছিলো সাড়ে তিন হাজার। এর মধ্যে পূর্বে ছিলো মাত্র ৪৫০ জন। ১৯৭২ সালে সরকার ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল করা নিষিদ্ধ বলে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করায় জামায়াত প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে পারেনি। কিন্তু জামায়াতবদ্ধ হওয়া যেহেতু ফরয, সেহেতু '৭২ সালেই "জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ" নামে সাংগঠনিক পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়ে যায়। ১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্র সংশোধন করা হয় এবং ঐ নিষিদ্ধ ধারা উৎখাত হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এরপর প্রকাশ্যে দাওয়াত সম্প্রসারণ ও সাংগঠনিক তৎপরতা চালায়।

মাত্র সাড়ে চারশ রুকনের সংগঠন হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ যাত্রা শুরু করলেও ২০০৩ সালে আল্লাহর রহমতে রুকনসংখ্যা ১৫ হাজারে পৌঁছেছে এবং এর মধ্যে মহিলা রুকন প্রায় ৩ হাজার। জানতে পারলাম যে, বর্তমানে পাকিস্তানে মোট রুকনসংখ্যা ১৮ হাজার। বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র হবার সময় পাকিস্তানের রুকনসংখ্যা আমাদের চেয়ে তিন হাজার বেশি ছিলো। দেখা গেলো যে, বর্তমানেও ১৮-১৫=৩ হাজারের ব্যবধানই বহাল রয়েছে।

এ তথ্য জেনে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে জামায়াতের পাঞ্জাব প্রদেশের সাবেক আমীর হাফেয মুহাম্মদ ইদরিস জানতে চাইলেন, রুকনসংখ্যা এত দ্রুত বৃদ্ধি পেলো কেমন করে? প্রশ্নের কারণ হলো, পাকিস্তানে তিন হাজার থেকে ১৮ হাজার হওয়া মানে ৬ গুণ বৃদ্ধি। বাংলাদেশে ৪৫০ থেকে ১৫ হাজার হওয়া মানে ৩০ গুণ বৃদ্ধি।

জওয়াবে বললাম, ব্যাপকভাবে কর্মীদেরকে মটিভেট করা হয়েছে যে, রুকন না হওয়া পর্যন্ত জামায়াতে যোগদান করা সত্ত্বেও জামায়াতের আসল শক্তি হিসেবে গণ্য হওয়া যায় না। একমাত্র রুকনদের ভোটেই সর্বস্তরে জামায়াতের নেতৃত্ব নির্ধারিত হয়। কর্মীদেরকে রুকনিয়াত কবুল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে হয়তো আমার লেখা "বাইয়াতের হাকীকত" পুস্তিকাটিরও কিছু অবদান আছে। পুস্তিকাটিতে সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে যুক্তি সহকারে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নিকট জান-মাল বিক্রয়ের দাবি পূরণ করতে হলে ইকামাতে দীনের উদ্দেশ্যে গঠিত কোন জামায়াতের নিবেদিত সদস্য হতে হবে। জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করলে রুকন না হওয়া পর্যন্ত বাইয়াতের হক আদায় হয় না।

হাফেয সাহেব জানতে চাইলেন এ পুস্তিকাটি উর্দুতে অনুবাদ করা হয়েছে কি না। আমি জানালাম যে, পাকিস্তান ও ভারতের জন্য পুস্তিকাটির উর্দু অনুবাদ প্রকাশ করে উভয় দেশের আমীরে জামায়াতকে পাঠিয়েছি। ১৯৮৮ সালে বইটি উর্দুতে প্রকাশিত হয়। সম্ভবত ৮৯ সালেই ৫০০ কপি আমীরে জামায়াত পাকিস্তানের নিকট ইসলামী ছাত্রশিবিরের তদানীন্তন সভাপতির হাতে পাঠিয়ে চিঠিতে লিখেছি যে, মাজলিশে সূরার সদস্যগণের নিকট থেকে জানতে চাই যে, ইসলামের দৃষ্টিতে বইটিতে কোন ভুল আছে কি না। এ চিঠির জওয়াবে আমাকে জানানো হলো যে, বইটিতে কোন ভুল পাওয়া

www.bjilibrary.com

যায়নি। বইটি পাকিস্তানে ছাপাবার অনুমতি চাওয়া হলো এবং ভাষা আরও একটু সহজ করার জন্য আমার সম্মতি দাবি করা হলো। আমি জানালাম, বিনা অনুমতিতেই ছাপুন এবং প্রয়োজন মতো ভাষা সহজ করে নিতে পারেন।

চট্টগ্রামের পটিয়া মাদরাসার সাবেক উস্তায ও জামায়াতের চট্টগ্রাম মহানগর শাখাস্থ অফিস সংলগ্ন মসজিদের ইমাম ও খতীব প্রখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস বইটি উর্দুতে অনুবাদ করেছেন। তাঁর ভাষা বেশ কঠিন বলেই সহজ করা প্রয়োজন বোধ করা হয়।

হাফিয ইদ্রিস বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন যে, তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আবার বইটি পাঠাতে অনুরোধ করলেন। আমার মনে হয় ভাষা সহজ করার ঝামেলা পোহাতে গিয়ে ছাপানো সম্ভব হয়ে উঠেনি। যাহোক, বইটি তাঁকে পাঠালাম। তিনি বইটি পড়ে অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং জামায়াতের সাপ্তাহিক মুখপত্র এশিয়া ম্যাগাজিনে ছাপিয়ে দিচ্ছেন বলে জানালেন।

জামায়াতের রাজনৈতিক অবস্থান

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হত্যার পর আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৭৭ সালে শেখ মুজিবের একদলীয় স্বৈরশাসন ব্যবস্থা শাসনতন্ত্র থেকে উৎখাত করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনর্বহাল করেন। ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে সামরিক অফিসাররা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার কিছুদিন পর সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ সামরিক শাসন কায়েম করেন। জামায়াতে ইসলামী ১৯৮০ সালে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে নির্দলীয় অরাজনৈতিক কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার দাবি জানায়। ১৯৯০ সালে প্রধান দুটো রাজনৈতিক দল জিয়াউর রহমানের বিএনপি ও শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ এ দাবি সমর্থন করলে ঐ দাবিতে রাজধানীতে ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থান ঘটায়। প্রেসিডেন্ট এরশাদ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৯১ সালে জামায়াতের প্রস্তাবিত কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় এ দেশে সর্বপ্রথম নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ১৪০টি আসন, আওয়ামী লীগ ৮৪টি এবং জামায়াত ১৮টি আসনে জয়লাভ করে। জামায়াত ক্ষমতায় শরীক না হয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখার স্বার্থে বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থন দান করে। কিন্তু জামায়াত পার্লামেন্টে বিরোধী দল হিসেবেই ভূমিকা পালন করে।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদের দলের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কায়েমের উদ্দেশ্যে ইসলাম ও ইসলামী দলগুলোর উপর এমন নির্যাতন চালায় যার ফলে ১৯৯৯ সালে বিএনপি ইসলামী দলগুলোর সাথে ঐক্যজোট করা প্রয়োজন মনে করে। চারদলীয় জোটের ঘোষণাপত্রে জনগণের নিকট ওয়াদা করা হয় যে, জোট একসাথে নির্বাচন করবে এবং কোয়ালিশন সরকার কায়েম করবে।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি এতো আসন লাভ করে যে, কোয়ালিশন না করে দলীয় সরকারই গঠন করতে সক্ষম হয়। এ সত্ত্বেও নির্বাচনী যৌথ ঘোষণা অনুযায়ী জোট সরকার গঠন করা হয়। কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা না থাকলে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের কোন সুযোগই থাকতো না।

www.bjilibrary.com

২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীরা মাত্র ৩০টি আসনে ঐক্যজোটের নমিনেশন পায়। এর মধ্যে ১৭টি আসনে জামায়াত বিজয়ী হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী ও সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ দুটো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। আল্লাহর রহমতে তাদের সততা ও যোগ্যতার ফলে সর্বমহলে জামায়াতের নৈতিক প্রভাব পড়ছে।

আমাদের দেশে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রয়েছে যে, দলীয় লোকেরা মন্ত্রিদের নিকট মন্ত্রণালয়ে তদবিরের উদ্দেশ্যে ভিড় করে। যার ফলে মন্ত্রীকে সরকারি দায়িত্ব পালন করার চেয়ে দলীয় কর্মীদেরকে সন্তুষ্ট করতে বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। জামায়াতের মন্ত্রীদ্বয় দলীয় লোকদেরকে মন্ত্রণালয়ে যেতে নিষেধ করায় পত্র-পত্রিকায় ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। দেশে এ নিয়ম চালু রয়েছে যে, মন্ত্রী জেলায় সফরে গেলে ডিসি মন্ত্রীর আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেন। কারণ এ কাজের জন্য সরকারি তহবিল নেই। মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে মন্ত্রীর সাথে গণ্যমান্যদের জন্য লাঞ্চ ও ডিনারের বিলাসপূর্ণ ব্যবস্থা করা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নাচ-গানের আয়োজন করা আপ্যায়নের অপরিহার্য আইটেম।

জামায়াতের মন্ত্রীদ্বয় ডিসিদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের জন্য সার্কিট হাউসে থাকার ব্যবস্থা করা ছাড়া অন্য কোন রকম আপ্যায়নের প্রয়োজন নেই। খাবার ব্যবস্থা জামায়াতের স্থানীয় দায়িত্বশীলগণ করবেন, যেমন তাদের সাংগঠনিক সফরে করে থাকেন। ফলে মন্ত্রীর সফরের সময় সার্কিট হাউসে ডিসি ও এসপি প্রমুখ জামায়াতের মেহমান হিসেবে খাবার সময় মন্ত্রীদের সাথে শরীক হন।

এমপিদের এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজে সরকারি তহবিল থেকে লাখ লাখ টাকা ব্যয় করা হয়। এমপি স্বয়ং তদারকির দায়িত্ব পালন করেন। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী কোন কোন এমপি এবং সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঐ টাকার বিশেষ একটা অংক তাদের খেদমতের বখশিশ হিসেবে গ্রহণ করেন। জামায়াতের এমপিগণ নিজেরা যেহেতু এভাবে নেন না, সেহেতু সরকারি লোকেরাও এর সুযোগ পান না। এতে তারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও জামায়াতের লোকদের সততার প্রশংসা করেন এবং তাদেরকে শ্রদ্ধা করেন।

মন্ত্রীদ্বয় সচিব থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে 'বস' হিসেবে ব্যবহার করেন না। তাদের আচরণে সবাই মুগ্ধ। এভাবেই সরকারি কর্মচারী মহলে জামায়াতের নৈতিক প্রভাব ছড়াচ্ছে। সৎ লোকের শাসন ছাড়া যে দেশের উন্নতি হতে পারে না এ ধারণা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে।

১৫৫.

পেশোয়ার সফর

লাহোর শহরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত সম্মেলনে দাওয়াত পেয়ে আমীরে জামায়াতকে জানালাম, "আপনার নিজের প্রদেশে (সীমান্ত প্রদেশ) এমএমএ (৬ দলীয় ইসলামী জোট) ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের জন্য

www.bjilibrary.com

এটা এক বিরাট প্রেরণার বিষয়। তাই আমি পেশোয়ার যেতে চাই, যাতে সরকারের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করতে পারি।"

তিনি জানালেন, আপনি কমপক্ষে ১৫ দিন সময় নিয়ে আসুন। আপনাকে সব প্রাদেশিক রাজধানীতেই নিয়ে যেতে চাই। ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর (২০০৩) পেশোয়ারের জন্য বরাদ্দ হয়। আমীরে জামায়াত কাযী হোসাইন আহমদের দ্বিতীয় ও কনিষ্ঠ ছেলে সদ্য পাস করা ডাক্তার আনাসের ওলীমাতে ১৪ তারিখে যোগদান করলাম। বরের জন্য নির্দিষ্ট আসনের এক পাশের চেয়ারে আমাকে বসালেন এবং অপর পাশে বরের শ্বশুরকে বসালেন। বরকে যারা মুবারকবাদ জানিয়ে হাত মিলাতে এলেন তাদের সাথে আমাকেও হাত মিলাতে হলো।

প্রাদেশিক সরকারের চিফ মিনিস্টার, আকরাম খান দুররানীর সাথে ওলীমার মাহফিলেই কাযী সাহেব আমাকে পরিচিত করালেন। ইসলামী সরকার কায়েম করতে সক্ষম হওয়ায় আমি তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানালাম। কাযী সাহেবের বড় ভাইসহ বেশ কয়েকজন আত্মীয় ও পেশোয়ারের গণ্যমান্য লোকদের সাথে পরিচয় হলো। আমার পরিচয় পেয়ে ফটো সাংবাদিকরা ছবি তুলতে তৎপর হলেন। কাযী সাহেব ব্যবসায়ী হিসেবে ওলীমাতে বড় অংক ব্যয় করতে পারতেন। যে অংক বরাদ্দ করেছিলেন, তা থেকে অর্ধেকের বেশি জামায়াতের সমাজসেবা বিভাগে দান করে ওলীমা সংক্ষিপ্ত আকারে সমাধা করলেন।

প্রাদেশিক সরকারের পরিচয়

সীমান্ত প্রদেশের আইনসভার মোট আসন সংখ্যা ১২৪। এর মধ্যে ২০% আসন মহিলাদের জন্য বরাদ্দ। আর তিনটি আসন অমুসলিমদের জন্য রিজার্ভ। এমএমএ জোটের আসনসংখ্যা ৬৮। এর মধ্যে জামায়াতের আসনসংখ্যা ২৬ (পুরুষ ২০ এবং মহিলা ৬)।

৬ দলীয় ইসলামী জোটের মধ্যে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের দু'গ্রুপের আসনসংখ্যাই বেশি। মাওলানা ফযলুর রহমান গ্রুপই প্রধান। মাওলানা সামীউল হক গ্রুপের আসনসংখ্যা কম বলেই এ গ্রুপের কোন মন্ত্রী নেই। তবে ডেপুটি স্পীকারের পদটি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। জোটের অন্যান্য দল দু-একটি করে আসন পেয়েছে।

বিরোধী দলের মধ্যে পিপলস পার্টির শেরপাও (ভুট্টোর আমলের চিফ মিনিস্টার) গ্রুপ ১২টি ও ওয়ালী খানের ন্যাপ ১০টি আসন পেয়েছে। এরাই প্রধান বিরোধী দল।

এমএমএ সরকারের মন্ত্রিসভায় চিফ মিনিস্টারসহ মোট ১২ জন মন্ত্রী। খরচ কমাবার উদ্দেশ্যেই নাকি সংখ্যা এতো কম রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ছয় জন জমিয়তের এবং ছয় জন জামায়াতের। চিফ মিনিস্টার জমিয়তের এবং স্পীকার জামায়াতের। জামায়াতের প্রাদেশিক আমীর সিরাজুল হক (ডেপুটি চিফ মিনিস্টারের মর্যাদায়) সিনিয়র মিনিস্টার। সীমান্ত প্রদেশে ৬ দলীয় জোটের মধ্যে জামায়াত ও জমিয়তই প্রধান। মাওলানা ফযলুর রহমানের দল সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান ছাড়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে কোন আসন পায়নি।

জামায়াতের ৬ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ

মন্ত্রীদের সবার সাথে একসঙ্গে বৈঠক হওয়ায় প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হয়েছে। আমার সফরসাথী মাওলানা আবদুশ শহীদ নাসীম যাবতীয় তথ্য সযত্নে নোট করে আমাকে দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

মন্ত্রীদের মধ্যে একজনের বয়স ৫০ বছর। আর বাকি পাঁচ জনের বয়স সর্বোচ্চ ৪২ ও সর্বনিম্ন ৩২ বছর মাত্র। তারা সবাই প্রাক্তন ছাত্রনেতা। সিনিয়র মিনিস্টার ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে ঢাকা এসেছিলেন।

তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। (১) অর্থ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, (২) খাদ্য, রাজস্ব, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (৩) তথ্যপ্রযুক্তি, সংস্কৃতি, পর্যটন, ক্রীড়া, মিউজিয়াম (৪) যাকাত ও উশর। পূর্বে যাকাত ও উশরের কোন মন্ত্রণালয় ছিলো না। দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যাকাত ও উশর বাবদ সন্তোষজনক তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খাতে তহবিলের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জামায়াতের মন্ত্রীগণের উদ্যোগে মন্ত্রিসভা সর্বসম্মতভাবে প্রদেশে সর্বক্ষেত্রে ভিআইপি কালচার উঠিয়ে দিয়েছে। ভিআইপি হিসেবে কিছু লোককে বিশেষ সুবিধা ভোগ করার অধিকার দেওয়া ইনসাফের খেলাফ বিবেচনা করা হয়েছে। প্রটোকল ব্যবস্থা উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব পাস হয়নি। জনগণকে সরাসরি মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগদানই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল। মন্ত্রীদের বেতন আগের তুলনায় কমাবার সিদ্ধান্তে সবাই একমত হন। কিন্তু নতুন গাড়ির বদলে পুরানো গাড়ি দিয়ে কাজ চালাবার পক্ষে সবাই একমত হননি।

ইসলামী সরকারের এ যাবৎ অর্জন

এ পর্যন্ত সীমান্ত প্রদেশের এমএমএ সরকার যা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। চুরি, ডাকাতি কমেছে।

২. গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধী দলকে যাবতীয় অধিকার ভোগের সুযোগ দিয়ে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে।

৩. আইন পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে শরীআ বিল পাস করা সম্ভব হয়েছে। বিরোধী দল কোনরূপ বিরোধিতা করেনি।

৪. সরকারকে শরীআ বিষয়ক পরামর্শ প্রদানের উদ্দেশ্যে ২১ জন সেরা আলেমের সমন্বয়ে একটি শরীআ কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে।

৫. সকল সরকারি সুদ মওকুফ করা হয়েছে। সরকারি ব্যাংক 'আল-খায়বার'-কে ক্রমান্বয়ে ইসলামীকরণের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই এর সুদ সিস্টেম বন্ধ রাখা হয়েছে। সকল ব্যাংককে ইসলামীকরণের উদ্দেশ্যে শরীআ বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

৬. যাকাত ও উশর মন্ত্রণালয় চালু করা হয়েছে।

৭. শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের উদ্দেশ্যে একটি শিক্ষাকমিশন গঠন করা হয়েছে। দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করা হয়েছে। ছাত্রীদের জন্য পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া চলছে।

৮. মদ, জুয়া, বাদ্য, অশ্লীল নারী ছবি ও সকল ইসলামবিরোধী রসম রেওয়াজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৯. খরচ কমাবার উদ্দেশ্যে হোটেলে সরকারি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

১০. প্রতি জনবসতিতে সরকারি হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। হার্ট ও কিডনির মতো বড় বড় রোগের চিকিৎসার ব্যয় সরকার বহন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

১১. সরকার কম দামে রেশনে গম সরবরাহ করছে। খোলাবাজারে গমের দাম কমালে বেশি দাম পাওয়ার আশায় গম আফগানিস্তানে পাচার হয়ে যায় বলে দাম কমানো হয়নি।

১২. রাজস্ব আদায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩. মেয়েদের খেলা ছেলেদের থেকে পৃথকভাবে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ যাতে ইসলামবিরোধী না হয় সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে।

১৫. পর্যটন বিভাগে পর্যটকদের খিদমতের জন্য মহিলাদেরকে ব্যবহার করা বন্ধ করা হয়েছে।

জামায়াতের মন্ত্রীদের নিজস্ব কর্মসূচি

১. জামায়াতের প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি করে পরামর্শ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২. বাজেট প্রণয়নের জন্য সাবেক প্রাদেশিক অর্থ মন্ত্রীগণকে নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটির চেয়ারম্যান হলেন জামাতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ সিনেটর প্রফেসর খুরশিদ আহমদ।

৩. জামায়াতের মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ইসলামী ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪. জামায়াতের মন্ত্রীগণ শুক্রবারে যেখানেই থাকেন সেখানে জুমুআর খুতবা দেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে জামায়াতে নামায আদায় করেন।

৫. জামায়াতের মন্ত্রীগণ নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই দেশ ও জনগণের সেবাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন বলে জানালেন। খাদ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি খিদমত করা সম্ভব। আর যাকাত ও উশর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন।

প্রাদেশিক সরকারের সমস্যা

এমএমএ সরকারের প্রধান সমস্যা হলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ। প্রেসিডেন্ট জেনারেল পারভেজ মোশাররফ ২০০২ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পরও সকল ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

১. প্রাদেশিক সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর একান্ত অনুগত সামরিক ব্যক্তিকে গভর্নর নিয়োগ করে রেখেছেন। কামাল পাশা হলো প্রেসিডেন্টের আদর্শ। তাই সীমান্ত প্রদেশের আইনসভা সর্বসম্মতিক্রমে শরীআ বিল পাস করা সত্ত্বেও গভর্নর তাতে দস্তখত না করে প্রেসিডেন্টের নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। গভর্নরের দস্তখত না

www.bjilibrary.com

হওয়া পর্যন্ত পরিষদে পাস হওয়া বিলও আইনগত মর্যাদা পেতে পারে না। এভাবে শরীআ বিলকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে।

২. সিনেমা সেন্সর করে অনুমতি দেবার ইখতিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকায় অশ্লীল সিনেমাও সীমান্তের সিনেমা হলে চালু আছে। এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া থেকে প্রদেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য এমএমএ সরকার সিনেমার নায়িকাদের ছবিসংবলিত পোস্টার প্রকাশ্যে প্রদর্শনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে। নায়িকাদের ছবির পোস্টার মানেই অশ্লীলতা। যৌন আকর্ষণই সিনেমার পোস্টারের আসল লক্ষ্য।

   পেশোয়ার শহরে সিনেমার কোন পোস্টার না দেখে বিস্মিত হয়ে জামায়াতের এক দায়িত্বশীলকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সিনেমা হল বন্ধ করে দিয়েছেন? জওয়াবে বললেন, সব রকম সিনেমাই হলগুলোতে চালু আছে। নায়িকার অশ্লীল ছবি ছাড়া পোস্টার করা অর্থহীন মনে করেই তারা পোস্টার লাগায় না।

৩. এমএমএ সরকার যা করতে চায়, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা না পেলে পদে পদে সমস্যার সম্মুখীন হতে বাধ্য। শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলামীকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বাধা আসার আশঙ্কা রয়েছে।

পাকিস্তানের রাজনীতিতে এমএমএ জোটের অবস্থান

সীমান্ত প্রদেশে সরকারে এমএমএ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে বেলুচিস্তানে এমএমএ ও পিপলস পার্টির কোয়ালিশন সরকার রয়েছে। সিন্ধু প্রদেশে এমএমএ বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে বটে, কিন্তু প্রধান বিরোধী দল নয়। পাঞ্জাব প্রদেশেও একই অবস্থা।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভার নাম ন্যাশনাল এসেম্বলী (জাতীয় সংসদ)। পারভেজ মুশাররফের অনুগত কায়েদে আযম মুসলিম লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করতে পারেনি। অন্যান্য কয়েকটি দল থেকে প্রয়োজনীয়সংখ্যক এমপি বাগিয়ে কোন রকমে সরকার গঠন করেছে।

সংসদের অধিবেশন শাসনতন্ত্রের দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে দায়সারাভাবে ডাকা হয় এবং অল্পদিন পরই সমাপ্ত করে দেওয়া হয়। সংখ্যার দিক দিয়ে এমএমএ অবশ্যই প্রধান বিরোধী দল। এমএমএ পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার হলেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর কাযী হোসাইন আহমদ। পাকিস্তানের তিনিই ইসলামী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। তারই উদ্যোগ, আন্তরিকতা ও অবিরাম প্রচেষ্টায় এমএমএ নামক ঐক্যজোট এতোবড় শক্তিতে পরিণত হয়েছে। তাই তাঁকে সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। নির্বাচনের দেড় বছর পরও সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা হিসেবে কাউকে ঘোষণা করা হচ্ছে না।

বেনজির ভুট্টোর পিপলস পার্টি সংসদে দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল এবং নওয়াজ শরীফের মুসলিম লীগ তৃতীয় অবস্থানে আছে। আরও কতক ছোট ছোট গ্রুপ এবং স্বতন্ত্রদেরকে একজোট করে প্রধান বিরোধী দল খাড়া করার চেষ্টা চলছে, যাতে কাযী সাহেবকে লিডার অব দি অপজিশনের মর্যাদা না দিয়ে বাঁচা যায়।

www.bjilibrary.com

প্রেসিডেন্টের গোঁয়ার্তুমি

পাকিস্তানের বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৭৩ সালে নির্বাচিত গণপরিষদে সর্বসম্মতভাবে পাস হয়। সংবিধান সংশোধনের বিধানে বলা হয়েছে যে, সংসদের দু-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়া কোন সংশোধন বৈধ হবে না। অথচ প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পূর্বে স্বৈরশাসকের মতো একক সিদ্ধান্তে LFO (Legal Frame Work) নামে শাসনতন্ত্রে বিরাট সংশোধনী আনয়ন করে তাতে শামিল করে নেন। এ দ্বারা সরকার ও সংসদকে যে কোন সময় বাতিল করার ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেন। এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলে সুপ্রিম কোর্ট তা খারিজ করে দেন। এটা চরম বিস্ময়ের বিষয় যে, সুপ্রিম কোর্ট কেমন করে শাসনতন্ত্র বিরোধী রায় দিতে পারলো।

এমএমএ প্রথম থেকেই তথাকথিত LFO-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে এসেছে। নির্বাচনের পর এমএমএ দাবি করেছে যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশনে এলএফও-কে অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে এবং দু-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন এর পক্ষে না পেলে এটা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রেসিডেন্ট এ দাবি সুপ্রিম কোর্টের দোহাই দিয়ে অগ্রাহ্য করে এসেছেন। আমার বিগত পাকিস্তান সফরকালে ২০০৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর ঐ দাবিতে এমএমএ গণবিক্ষোভের পূর্বঘোষিত কর্মসূচি পালন করে। এক সপ্তাহ পূর্বেই এমএমএ হুমকি দেয় যে, ১৮ তারিখের মধ্যে এ দাবি মেনে না নিলে সারাদেশে ব্যাপক গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে।

প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর অনড় মনোভাব দেখে আমার আশঙ্কা ছিলো যে, ১৮ তারিখের কর্মসূচিকে প্রতিহত করার জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬ দলীয় ইসলামী জোটের দলীয় প্রধানদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশ ও র‍্যালিতে জনগণের অভূতপূর্ব সাড়া দেখে সরকার এর বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকে এবং পার্লামেন্টে বিষয়টি মীমাংসার জন্য পেশ করার আশ্বাস দেয়।

সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সারাদেশে প্রদর্শিত এ বিক্ষোভে সরকারের টনক নড়ে। এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে এমএমএ যে ভূমিকা পালন করছে তা সর্বস্তরের জনগণ সক্রিয়ভাবে সমর্থন করে। এ দাবিকে শক্তিবলে দাবিয়ে রাখার সাহস সরকারের নেই।

আপাতত সরকার ও এমএমএ-এর মধ্যে সংঘর্ষ থেমে গেলেও এ দাবি পূরণে গড়িমসি এখনও চলছে। ঐ দাবির সাথে আরও একটি দাবি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জেনারেল পারভেজ মোশাররফ যুগপৎ নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান ও উর্দিপরা সশস্ত্র বাহিনী প্রধানের পদ দখল করে আছেন। এমএমএ দাবি করেছে যে, দ্বিতীয় পদটি ত্যাগ করতে হবে। এ দাবি এক বছর পর মেনে নিতে তিনি সম্মত হয়েছেন। এমএমএ মনে করে যে, আমেরিকার পৃষ্ঠাপোষকতা পাওয়ায় এ দাবি সহজে মেনে নেবেন না। গণআন্দোলনের মাধ্যমেই এসব দাবি আদায় করার জন্য এমএমএ প্রস্তুত।

পাকিস্তান থেকে ফিরে এলাম অসুস্থ হয়ে

আল্লাহর রহমতে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর নিয়েই গত ৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান সফরে গেলাম। ২০ দিনের সফর শেষে ২৪ ডিসেম্বর ভোরে ঢাকায় ফিরে এলাম অসুস্থ অবস্থায়। ২৭

www.bjilibrary.com

তারিখ থেকে ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়। ৩০ তারিখ হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসলেও আরো ৫ দিন পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বাধ্য হই।

অসুস্থতার পটভূমি

দীন ও ঈমানের পর দুনিয়ায় আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত হলো সুস্থতা। সুস্থ না থাকলে কিছুই করা যায় না। সর্দিজ্বর ও পেটের পীড়াকে মারাত্মক অসুখ গণ্য করা হয় না। হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিককেই কঠিন রোগ মনে করা হয়, যার ফলে অনেক কিছু খাওয়া চলে না এবং বহুবিধ নিয়ম মেনে চলতে হয়। এ তিনটি রোগের কোনটিই নেই এমন লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে বেশি নয়।

গত নভেম্বরে আমার বয়স ৮১ পূর্ণ হলো। ঐ পর্যন্ত ঐ তিনটি প্রধান রোগের কোনটাই আমার ছিলো না। আল্লাহর এ বিরাট করুণার শুকরিয়া জানিয়ে কূলকিনারা পাওয়া যাবে না।

২০০১ সালের ১ জানুয়ারি থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রধান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তিন বছর উল্লেখযোগ্য কোন সফর করিনি। ২০০২ সালে মাত্র দু'বার দু-তিন দিন করে সিলেট ও নীলফামারীতে জামায়াতেরই সাংগঠনিক সফরে গিয়েছি। ২০০৩ সালের প্রথম সাড়ে তিন মাস সৌদি আরবে ছিলাম। হজ্জের সফরে দু'সপ্তাহ ছাড়া বাকি সময় সহজ বাংলায় কুরআন মাজীদের অনুবাদের উদ্দেশ্যে বড় ছেলের বাসায় জেদ্দায় ছিলাম। তাই মদীনা শরীফ যিয়ারত করা ছাড়া আর কোথাও সফর করতে হয়নি।

অর্থাৎ পূর্ণ তিন বছর এমন কোন সফর করতে হয়নি, যাতে খাওয়া, ঘুম, গোসল, বিশ্রাম ইত্যাদিতে অনিয়ম হয়। সারা জীবনে বহু অনিয়ম সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু গত তিন বছর পূর্ণরূপে নিয়ম পালন করে চলার সুযোগ পেয়েছি।

পাকিস্তানের ২০ দিনের সফরে সম্মেলনের দু'দিন ছাড়া নিয়মিতই অনিয়ম চলেছে। আমার বহু বছরের অভ্যাস প্রায় প্রতিদিনই ভঙ্গ করতে হয়েছে। দুপুরে খাওয়ার আগে গোসল করার সুযোগ পাইনি বললেই চলে। দুপুরে খাবার পর দেড়-দু'ঘণ্টাই বিশ্রামের অভ্যাস ত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিলো না। ৬ ও ৭ ডিসেম্বর সম্মেলন শেষ হলো। ৮ তারিখ দুপুরে খাওয়ার পর সামান্য সময় বিশ্রাম করে সড়কপথে বিভাগীয় শহর গুজরানওয়ালায় যেয়ে সন্ধ্যার পর কর্মী ও সুধী সম্মেলনে বক্তৃতা করি। রাতের খাওয়ার পর লাহোর ফিরে আসতে হলো। অথচ আমার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস হলো রাতের খাওয়ার পরই শুয়ে পড়া।

পরদিন বিমানে ইসলামাবাদে যেতে হয়। বিকেল পৌনে দুটোয় ফ্লাইট। ১২টায় বিমানবন্দরে রওয়ানা। তাই খাওয়ার সময়ের আগেই যেতে হলো। সাড়ে তিনটায় ইসলামাবাদ পৌঁছে গোসল ছাড়াই অসময়ে খেতে হলো। ইসলামাবাদ থেকে সকাল ১০টায় সড়কপথে রওয়ানা দিয়ে বিকেল তিনটায় সোয়াত পৌঁছলাম। রাস্তা খারাপ থাকায় আছাড় খেতে খেতেই গেলাম। প্রচণ্ড শীত, তদুপরি বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগেই সমাবেশ শেষ করতে হবে। নামায আদায় করে কয়েকটা কলা খেয়ে সভায় গেলাম। মাগরিবের পর গোসল করে দুপুরের খাবার ও রাতের খাবার এক সাথেই খেলাম।

www.bjilibrary.com

এভাবেই গোটা সফরে অনিয়মই নিয়মে পরিণত হলো। লাহোর, ইসলামাবাদ, পেশোয়ার ও করাচিতে দু'দিন করে থাকায় দ্বিতীয় দিনটায় তেমন অনিয়ম হয়নি। ২১ ডিসেম্বর করাচিতে রুকন সম্মেলনে যোগদানের পর সেদিনই ঢাকা ফিরে আসার ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু ২১ ও ২২ তারিখে কোন ফ্লাইট না থাকায় ২৩ তারিখ দিবাগত মধ্যরাতে ঢাকা রওয়ানা হওয়া গেলো।

২২ তারিখ অবসর থাকায় করাচি থেকে সড়ক পথে বিভাগীয় শহর হায়দ্রাবাদে সফরে যেতে হলো। রাত ৯টায় কর্মসূচি শেষ করে করাচি ফিরে এসে খাবার ইচ্ছা ছিলো, যাতে খাবার পরপরই শুয়ে পড়তে পারি। কিন্তু গণ্যমান্য লোকদের সাথে ডিনার খাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় তাদের সম্মান রক্ষার্থে খেতে হলো। খাওয়ার পর সড়কপথে আড়াই ঘন্টা সফর করে করাচিতে রাত একটায় বিছানায় গেলাম। সারারাত ঘুম হলো না। শেষ রাত থেকে আমাশয় শুরু হলো। ওষুধ খাওয়া সত্ত্বেও ২৩ তারিখ রাত ৯টা পর্যন্ত আমাশয়ের যাতনা সইতে হলো। রাত ১০টায় বিমানবন্দরে রওয়ানা হলাম। বিমানে রাত একটায় উঠলাম। এ রাতটাও নিদ্রাহীন কাটলো। ২৪ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছলাম। পরদিন বিকেলে পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী চট্টগ্রাম যেতে হলো। দুপুরে খাবার পর বিশ্রামের সময় পেলাম না। পরদিন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় বিকেলের বিমানে আসতে হলো বলে সেদিনও দুপুরে খাবার পর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেওয়া সম্ভব হলো না।

এ দীর্ঘ অনিয়মের ধকল শরীরে সহ্য হলো না। ২৭ তারিখ দুপুরে প্রচণ্ড কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলো। লেপ ও ডবল কম্বল জড়িয়ে গায়ের উপর চেপে ধরেও কম্পন বন্ধ করা গেলো না। আবু নাসের সাহেব খবর পেয়ে এম্বুলেন্স পাঠিয়ে ইবনে সিনা হাসপাতালে বিকেল ৪টায় ভর্তির ব্যবস্থা করলেন। চারদিন হাসপাতালে থেকে ৩০ তারিখে বাড়িতে ফিরে এলাম।

আমার কোন সময় উচ্চ রক্তচাপ ছিলো না। আমার নাতনী নাবিহা নিয়মিত আমার স্ত্রীর রক্তচাপ মাপে। ৪ জানুয়ারি সন্ধ্যায় সে আমার রক্তচাপ মেপে পেরেশান হয়ে বললো যে, ২০০/১০০ চাপ সত্ত্বেও আপনাকে নরমাল অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, এটা কেমন ব্যাপার। আমার শালীর জামাতা ডা. মেজর আমীন এসে মেপে বললো যে, নাবিহা ভুল বলেনি। ইবনে সিনার রেসিডেন্সিয়াল মেডিকেল অফিসার ডা. আকমানকে ফোনে জানালাম। তিনি একটা ওষুধ পাঁচ দিন খেতে বললেন এবং প্রতিদিন তিনবেলা রক্তচাপ মেপে রেকর্ড রাখতে পরামর্শ দিলেন।

৫ তারিখ সন্ধ্যায় নাবিহা মেপে বললো, ২১০/১০০ রক্তচাপ নিয়ে আপনি চেম্বারে বসে কেমন করে কাজ করছেন? আমার চাচাতো বোন হাসিনার ছেলের ওয়ালীমায় যেতে সবাই মানা করলো। আমি তবু গেলাম। উচ্চ রক্তচাপ হলে শারীরিক যেসব অসুবিধা হওয়ার কথা এর কিছুই টের পাচ্ছি না বলে আমি চেম্বারে বসে এখন রাত ১০টা পর্যন্তও লিখছি।

আমি মনে মনে ঠিক করেছি যে, আমি আর এমন ধরনের সফরে যাবো না, যেখানে অবিরাম অনিয়ম চলে। আল্লাহপাক যেটুকু হায়াত রেখেছেন তা যেন কাজে লাগাতে পারি, সে চেষ্টাই করবো। অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা থেকে যেন আল্লাহপাক রেহাই দান করেন, সবার কাছে এ দোয়াই চাই।

www.bjilibrary.com

আমি জানি না, আরবী 'সফর' শব্দটি থেকেই ইংরেজি Suffer শব্দ তৈরি হয়েছে কি না। Suffer মানে দুঃখ-কষ্ট পাওয়া। হয়তো এ শব্দটি আরবী থেকেও চয়ন করা হতে পারে। কারণ আরবী অনেক প্রাচীন ভাষা। সফর কষ্টকর বলে আল্লাহ তাআলা নামায সংক্ষেপ করে দিয়েছেন। এমনকি দু'ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়ার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে।

১৫৬.

হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন

১৯৭৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর হজ্জের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব রওয়ানা হয়ে ১৮ তারিখে জেদ্দা পৌছলাম। বাংলাদেশ থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি হজ্জ উপলক্ষে মক্কা শরীফ পৌছার কথা। এর আগের বছর নবগঠিত ঢাকা শহর শাখার আমীর মাওলানা নূরুল ইসলাম (ছদ্মনাম কুতুব) এসেছিলেন।

দু'একদিন জেদ্দায় থেকে সেখান থেকে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ যেয়ে ওমরাহ করলাম। তখনও ঢাকা থেকে জামায়াতের পক্ষ থেকে কেউ পৌছেননি। বাংলাদেশ থেকে যারা হজ্জ করতে গেলেন তাদের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলেই দেশের অবস্থা জানতে চেয়েছি। সবার কাছ থেকেই হতাশাজনক কথা শুনেছি। আইন-শৃঙ্খলার অভাব, নিরাপত্তাহীনতা, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্য, যুবক-কিশোরীদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা ইত্যাদির কারণে সবার মুখেই হতাশার সুর লক্ষ্য করলাম।

ঐ বছর হজ্জের তারিখ ছিলো ১৯৭৪ সালের ৪ জানুয়ারি। ৩ জানুয়ারি মক্কা থেকে মিনায় যাবার কথা। যিলহজ্জ মাসের ৫ তারিখের পূর্বেই সব হাজী মক্কায় পৌছে যান। জামায়াতের কোন প্রতিনিধি ৫ তারিখেও মক্কায় না পৌছায় আমি নিরাশ হয়ে গেলাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর দায়িত্বশীলের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই আমি হজ্জে এলাম। তাদের কারো পক্ষে লন্ডন যাওয়া সম্ভব ছিলো না। নেতৃস্থানীয়দেরকে তখনো আত্মগোপন করে থাকতে হয়। কয়েকজনকে বাংলাদেশের নাগরিকত্বের অযোগ্য ঘোষণা করায় প্রকাশ্যে চলাফেরা করতেও অক্ষম ছিলেন। তবে হজ্জে যাওয়া সম্ভব ছিলো। এর জন্য পাসপোর্টের দরকার হয় না। পিলগ্রিম পাস নিয়েই হজ্জে যাওয়া যায়। তাই হজ্জ উপলক্ষে সাক্ষাতের সুযোগ নেওয়া হলো।

আমি, মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ এবং মাওলানা আবদুস্ সুব্হান ছাড়া আরও দু'জন ১৯৭৪ সালে হজ্জ উপলক্ষে সৌদি আরবে ছিলেন। তাঁরা হলেন, অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ও মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম।

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ১৯৬৫ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি ছিলেন, ১৯৬৯ সালে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা শহর শাখার সেক্রেটারি ছিলেন এবং ১৯৭১ সালের শেষ দিকে শহর আমীর খুররাম মুরাদ সাহেবের অব্যাহতি নেবার পর আমীরের দায়িত্ব পালন করেন।

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমীর জনাব শামসুর রহমানের জামাতা। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে লাহোরে গুজব

www.bjilibrary.com

শুনলাম যে, জনাব আবদুল খালেক ও অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ঢাকায় শহীদ হয়ে গেছেন। মাসখানিক পরই তা গুজব বলেই জানতে পেরে সান্ত্বনা পেলাম।

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার সপরিবারে ১৯৭২ সালের এপ্রিলে কোলকাতা-কাটিহার হয়ে নেপালের রাজধানী কাঠমুণ্ডু পৌঁছে লাহোরে খবর পাঠান। মাওলানা মওদূদীর নির্দেশে আমি তাকে লাহোরে পৌঁছার পরামর্শ দিই। তিনি ১৯৭২-এর আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে লাহোর পৌঁছলেন।

মাওলানা মওদূদীর সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকার সাথে যোগাযোগের সুবিধা ও বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে আমার লন্ডন যাবার সিদ্ধান্ত '৭২ সালের জুন মাসেই গ্রহণ করা হয়। যাবার সুযোগ করে দেবার উদ্দেশ্যে ইউ.কে. ইসলামী মিশনের বার্ষিক সম্মেলনে আমাকে অতিথি হিসেবে লন্ডন যাবার দাওয়াত দেওয়া হয়। পাকিস্তানের প্রধান সামরিক শাসনকর্তা ও প্রেসিডেন্ট মি. ভুট্টো আমাকে লন্ডন যেতে দিলেন না।

অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার লাহোর পৌঁছার পর মাওলানা মওদূদী পরামর্শ দিলেন যে, আমার আগে সারওয়ার সাহেবকে লন্ডন চলে যাওয়া উচিত। মি. ভুট্টো তো আমাকে যেতে দিলেন না। সারওয়ার সাহেব আগে পৌঁছে গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করতে থাকুন। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৭৩ সালের জানুয়ারিতে তিনি লন্ডন পৌঁছেন। আমি এপ্রিলে পৌঁছাতে সক্ষম হই।

লন্ডনে পৌঁছার পর পরই সৌভাগ্যবশত অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার একটা ইসলামী প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়ে গেলেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম MET (Muslim Educational Trust) জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কয়েকজনের উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে MET নামে প্রতিষ্ঠানটি কায়েম হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি এক মহৎ উদ্দেশ্যে কাজ করছে। ইংল্যান্ডে অল্প কিছু বেসরকারি স্কুল ছাড়া সব স্কুলই সরকারি এবং অবৈতনিক। যেসব স্কুলে উল্লেখযোগ্য মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী পড়ে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জরুরি শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে MET স্কুল কর্তৃপক্ষকে সম্মত করার চেষ্টা করে। যে স্কুল সম্মত হয় সে স্কুলে MET এ উদ্দেশ্যে শিক্ষক সরবরাহ করে। শিক্ষকদের বেতন MET-ই দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষককে ক্লাসে পড়াবার ব্যবস্থা করে দেয় মাত্র। MET-এ উদ্দেশ্যে তহবিল সংগ্রহ করে। ইংল্যান্ডের মতো দেশে এটা ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট খিদমতের কাজ। অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার ১৯৭৩ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দীনের ঐ মহান খিদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন।

সারওয়ার সাহেব এ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধন করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে তিনি দীন ইসলাম সম্পর্কে যে স্বচ্ছ ধারণা রাখেন তা এ ময়দানে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদান করার জন্য তিনি ইংরেজিতে মূল্যবান আটটি বই লিখেছেন। এসব বইকে ভিত্তি করেই MET-এর শিক্ষকগণ স্কুলে পাঠদান করেন। সারওয়ার সাহেব এ ময়দানে বিরাট অবদান রেখেছেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি তার মেধা প্রয়োগ করে ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ২০০১ সালে আমি আমেরিকায় গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকটি ইসলামী সংগঠন তার লেখা বইকে প্রাধান্য

www.bjilibrary.com

দিতে দেখে খুশি হয়েছি। আল্লাহ তাআলা তার এ খিদমতকে কবুল করুন। তাঁকে এ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ Fellow of Royal Society of Arts (FRSA) উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম পাকিস্তান কায়েম হওয়ার এক বছর আগেই (১৯৪৬ সালে) জামায়াতে ইসলামী হিন্দ-এর এলাহাবাদ সম্মেলনে যোগদান করে মাওলানা মওদূদীর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ এলাকায় তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি জামায়াতে যোগদান করেন। তখন তিনি কোলকাতায় ছিলেন।

পাকিস্তান কায়েম হবার পর জামায়াতে ইসলামী হিন্দের উর্দুভাষী যারা হিজরত করে পূর্ব-পাকিস্তানে এসেছিলেন তাদের প্রচেষ্টায় পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে ১৯৫২ সালে জামায়াতের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ছয়জন সদস্য এ এলাকায় সফর করেন। ১৯৫৩ সালে প্রথম প্রাদেশিক পর্যায়ে জামায়াতের সংগঠন কায়েম হয়। মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম বরিশালে এক মাদরাসায় শিক্ষকতা করছিলেন। তাঁকে ঢাকায় এনে মাওলানা মওদূদীর বই বাংলা অনুবাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

১৯৫৬ সাল থেকে '৬৯ সালের আগস্ট পর্যন্ত তিনি জামায়াতে ইসলামী পূর্ব-পাকিস্তানের আমীর ছিলেন এবং ১৯৬৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে '৭১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের নায়েবে আমীর ছিলেন।

১৯৭১-এর নভেম্বরের শেষ দিকে মাওলানা ও আমি জামায়াতের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদে যোগদানের জন্য একসাথেই লাহোর গিয়ে আটকা পড়ে গেলাম। ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হওয়ায় ফিরে আসতে পারলাম না। ১৬ ডিসেম্বরের পর মওলানা আবদুর রহীম অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লেন। আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান '৭২ সালের শেষ দিকে হজ্জে চলে গেলাম। মওলানা আবদুর রহীম করাচি রয়ে গেলেন। '৭৩ সালের মাঝামাঝি নেপাল থেকে লেখা মাওলানা আবদুর রহীমের চিঠি লন্ডনে পেয়ে বুঝতে পারলাম যে, তিনি পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে নেপাল পৌঁছেছেন এবং গোপন পথেই দেশে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। আমি অনুভব করলাম যে, দেশে যাবার আগে আমার সাথে তার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া তার মতো ব্যক্তিত্বের গোপনে চোরাপথে নেপাল থেকে ভারতের সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে বে-আইনীভাবে প্রবেশ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে বিরাট কেলেঙ্কারি হয়ে যেতে পারে। তাই আমি তাকে হজ্জে আসার ব্যবস্থা করলাম এবং তার জন্য বিমানের টিকেট পাঠালাম।

আমরা পাঁচজন একসাথে হজ্জ করলাম এবং হজ্জের আগে ও পরে দীর্ঘ বৈঠক করে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের সমস্যা ও সমাধান সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করলাম। আমি ও অধ্যাপক গোলাম সারওয়ার একই সাথে লন্ডন থেকে পৌঁছলাম। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের দ্বিতীয় নির্বাচিত আমীর মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহ ঢাকা এলেন। মাওলানা আবদুস্ সুব্হানকে পাকিস্তান থেকে আনলাম। আর মওলানা আবদুর রহীমকে নেপাল থেকে আনার ব্যবস্থা করলাম। আমাদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাওলানা সাহেবদ্বয় পাকিস্তানে ফিরে গেলেন। মক্কা শরীফে মওলানা আবদুর

www.bjilibrary.com

রহীম একান্ত সাক্ষাতে আমাকে বললেন, "তাফহীমুল কুরআনের অনুবাদ সম্পন্ন করাই আমার এখন প্রধান ধান্দা। তাই নেপালে প্রবাসকালেও আমি এ কাজ করেছি। আমি দেশে গিয়ে এ কাজটি সমাধা না করে আর কোন দিকে মনোযোগ দেবো না।" আমি এ বিষয়ে তাকে উৎসাহ দিলাম ও তার এ সিদ্ধান্তের জন্য মুবারকবাদ জানালাম।

তিনি আরও বললেন, "আমি রুকনিয়াতের দায়িত্ব আবার নিতে চাই না। লেখার মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের খিদমতেই বাকি জীবন নিয়োজিত করতে চাই। ১৯৭২ সালের জুন মাসে মাওলানা জামায়াতের রুকনিয়াত থেকে ইস্তফা দেন। এরপর কয়েকবার আমি করাচিতে তার সাথে দেখা করে অন্তরঙ্গভাবে আলোচনা করেছি। তিনি আমাকে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি ইসলামী আন্দোলনে আছেন ও থাকবেন।

মাওলানা সাহেব ১৯৭৪ সালের মে মাসে করাচি থেকে ছদ্মনামে ঢাকায় ফিরে আসেন। বাংলাদেশের অধিবাসী যারা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন তারা অনেকেই ঐ সময় দেশে ফিরে আসার সুযোগ পান। ১৯৭৫-এর মে মাসে তিনি রুকন হন এবং উপনির্বাচনে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হন।

মিনা ও আরাফায়

১৯৭৪ সালের ৩ জানুয়ারি মক্কা শরীফ থেকে মিনা যাবার পূর্ব পর্যন্তও ঢাকা থেকে জামায়াতের কোন প্রতিনিধি না পৌঁছায় ধারণা করলাম যে, হজ্জকে উপলক্ষ করে লন্ডন থেকে ইসলামী আন্দোলনের যে লক্ষ্য নিয়ে এলাম তা সফল হলো না। তাই বিষণ্ন মন নিয়েই মিনায় যেতে হলো। হজ্জ উপলক্ষে একসাথে মিলিত হবার জন্য আমি মাওলানা আবদুস্ সুব্হানকে পাকিস্তান থেকে আনার ব্যবস্থা করলাম। ঢাকা থেকে দায়িত্বশীল না এলে আমাদের দু'জনের আসা অর্থহীন মনে করার কারণেই আমরা দু'জন বিমর্ষ ছিলাম। মিনা থেকে পরদিন আরাফার ময়দানে পৌঁছে আমি ও মাওলানা আবদুস্ সুব্হান গোসল করে যোহরের নামাযের জন্য প্রস্তুত হবার উদ্যোগ নিলাম।

গত বছর (২০০৩) আরাফার ময়দানে পেশাব, পায়খানা ও ওযূ-গোসলের যে চমৎকার ব্যবস্থা দেখলাম তা ১৯৭৪ সালে কল্পনা করাও সম্ভব ছিলো না। বালতি দিয়ে একটু দূর থেকে পানি সংগ্রহ করে গোসল করলাম। মাওলানা আবদুস্ সুব্হান গোসল করতে গেলেন একা, কিন্তু ফিরে এলেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর মাস্টার শফীকুল্লাহ সাহেবকে নিয়ে।

একেবারেই অপ্রত্যাশিতভাবে মাস্টার সাহেবকে দেখে আনন্দের আতিশয্যে অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রইলাম। বিষণ্নতার বদলে খুশির বন্যা বয়ে গেলো। হজ্জে আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল হওয়ায় হজ্জের তৃপ্তি আরও গভীর হলো।

আরাফার ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে এমনভাবে মাস্টার সাহেবকে পেয়ে যাওয়াকে আমরা আল্লাহ তাআলার খাস মেহেরবানী বলে অনুভব করলাম। তাঁকে না পেলে বিষণ্ন মনেই হজ্জ করতে হতো। আল্লাহর দয়া অসীম ও অলৌকিক।

মাস্টার সাহেবের বিলম্বে পৌঁছার কারণ

মাস্টার মুহাম্মদ শফীকুল্লাহর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, তিনি ঢাকা থেকে অন্য হজ্জ

www.bjilibrary.com

যাত্রীদের সাথে এক বিমানে জেদ্দা পৌঁছেন। সৌদি কর্তৃপক্ষ ঐ বিমানের সকল আরোহীকে মক্কা শরীফ যেতে না দিয়ে 'কোয়ার‍্যান্টিন'-এর উদ্দেশ্যে আটক রাখে। হজ্জ যাত্রীদেরকে নিজ নিজ দেশের সরকার কতক রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ইঞ্জেকশন দিয়ে দেয়। সৌদি সরকার ঐ ব্যবস্থা করার জন্য সব সরকারের নিকটই দাবি জানায়। বাংলাদেশ সরকারও সে ব্যবস্থা করে থাকে। কিন্তু ঐ বছর বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থার উপর সৌদি সরকার আস্থা হারিয়ে ফেলে। কারণ ঐ বছরই স্টিমারে প্রেরিত বাংলাদেশী হজ্জ যাত্রীদের মধ্যে একজন কলেরায় পথেই মারা যান। এ খবর জানতে পেরে বিমানে আগত হজ্জ যাত্রীদেরকে রোগ প্রতিষেধক ইঞ্জেকশন দেবার উদ্দেশ্যে জেদ্দাতেই আটক রাখা হয়, যাতে হজ্জ থেকে তারা বঞ্চিত না হন সে জন্যই সরাসরি আরাফার ময়দানে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে শেখ মুজিবের সরকার ছিলো। তখন দেশে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়। বিভিন্ন দিক দিয়ে সরকারের ব্যর্থতার খবর বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ে। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিঞ্জার বাংলাদেশকে 'তলাহীন ঝুড়ি' আখ্যা দেয়। শিক্ষার মান এতোটা নিম্নগামী হয় যে, এ দেশের ডিগ্রি নিয়ে বিদেশে গেলে তা স্বীকৃত হতো না। সেখানে পরীক্ষা দিয়ে স্বীকৃতি যোগাড় করতে হতো। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রি পাকিস্তান আমলে বিদেশে স্বীকৃত ছিলো। কিন্তু বাংলাদেশ আমলে সে মর্যাদা হারাতে হলো। অবশ্য ১৯৮২ সাল থেকে আবার স্বীকৃত হচ্ছে, বরিশাল ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজ এখনও স্বীকৃত নয় বলে জানা গেলো।

আরাফার ময়দানে বাংলাদেশী খাদ্য

মাস্টার শফীকুল্লাহর হাতে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়েছিলো, যার মধ্যে রান্না করা জিনিসও ছিলো। এক সপ্তাহ জেদ্দায় আটক থাকার পর সে খাদ্য অখাদ্যে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। রান্না করা খাদ্যের মধ্যে টাকি মাছের ভর্তা ও ভাজা করা কৈ মাছ ছিলো। দুর্গন্ধের কারণে আমি খেতে পারলাম না। কিন্তু সৌদি আরবে কর্মরত ও অন্য দেশ থেকে হজ্জের উদ্দেশ্যে আগত কয়েকজন বাংলাদেশী মাছ ফেলতে দিলেন না। তারা বললেন, "বাংলাদেশী মাছ পচা হলেও খাবো। কতদিন থেকে দেশী মাছ খেতে পাইনি। আরাফার ময়দানে কোন কালেও হয়তো এ মাছ আসেনি। এখানে আমাদের দেশী মাছের মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। এ মাছ খেয়ে এখানে ইতিহাস সৃষ্টি করবো।" আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, তাঁরা ঐ সব কথা শুধু রসিকতা করে বলেননি; বরং তাঁরা আবেগসহকারে ঐ পচা মাছ সত্যি সত্যিই মজা করে খেলেন। বাংলাদেশী মাছ জিন্দাবাদ।

শীতকালীন আমার অতিপ্রিয় একরকম পিঠাও খাদ্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। পলিথিন দিয়ে মোড়ানো পিঠাগুলো থেকেও দুর্গন্ধ বের হলো। এতে ছত্রাক পড়ে গেছে এবং ভেজা ভেজা মনে হয়েছে। পিঠার মায়া ত্যাগ করতে না পেরে যত্নের সাথে তা ধুয়ে রোদে দিলাম। রোদ লেগে পিঠাগুলো ফেটে চৌচির হয়ে গেলো। দুর্গন্ধ এ পরিমাণ কমলো যে, আমি খেতে পারলাম। আর যারা পচা মাছ খেতে সক্ষম ছিলেন তারা তো এতে দুর্গন্ধ বোধই করলেন না।

www.bjilibrary.com

আমার প্রিয় মেরা পিঠা

আমাদের গ্রামাঞ্চলে এ পিঠার নাম মেরা পিঠা। সব জেলায় এ পিঠার প্রচলন নেই। নতুন আতপ চাউলের গুঁড়ি (চূর্ণ) তাওয়াতে ভুনে নিলে যে সুগন্ধ সৃষ্টি হয় তা এ পিঠার প্রধান আকর্ষণ। এরপর গরম পানিতে মেখে লেই (কাই বা মণ্ড) বানিয়ে নিতে হয়।

এ মণ্ড থেকেই পিঠা তৈরি করা হয়। হাতে নিয়ে বিভিন্ন আকৃতির পিঠা বানানো হয়। পিঠার জনপ্রিয় আকার হলো মাঝখানটা মোটা ও দু'কিনারায় ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে একদম পেন্সিলের মাথার মতো হয়ে যায়। লম্বায় আড়াই থেকে চার ইঞ্চি মাত্র। হাতের তালুতে রেখে বানাতে হয়। গোলাকৃতি ও চেপ্টা আকারেও বানায়। গোল পিঠার ভেতরে শুঁটকিভর্তা দেবার প্রথাও আছে। ছোট সময় দাদীর সাথে বসে আমরা ভাই-বোনেরা হরেক আকারে পিঠা তৈরি করেছি। এটা শখের খেলাই ছিলো।

পিঠা তৈরি হয়ে গেলে সারা গায়ে ছিদ্র করা মাটির পাতিলে রেখে অপর একটি পানিভর্তি পাত্রে বসিয়ে আগুনে জ্বাল দিতে হয়। পানির উত্তাপে পিঠা সিদ্ধ হয়। পিঠাতে পানি লাগানো হয় না। এ পদ্ধতিতেই ভাঁপা পিঠা তৈরি হয়।

সিদ্ধ হবার পর তাজা তাজা গরম অবস্থায় খেতে একরকম মজা। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তাওয়ায় গরম করে খেতে হয় এবং তাতে ভিন্ন স্বাদ ভোগ করা যায়। ঘি-চিনির সাথে খেলে আরও মজা। গোশতের সালুন দিয়েও খাওয়া যায়। আমি শুঁটকির ভর্তা পেলে খুশি হই।

লম্বা আকারের পিঠার ভেতরে কিছু দেওয়া হয় না। নাযিল নামে আমার এক বিলাতি নাতী ঢাকায় এসে প্রথম এ পিঠায় কামড় দিয়ে মন্তব্য করলো, "এটা আবার কেমন পিঠা! ভেতরেও পিঠা, অন্য কিছুই নেই।" এ কথা শুনে সবাই হাসলাম। উপরে ও ভেতরে একই রকম পিঠা ইতঃপূর্বে সে খায়নি।

এ পিঠার এতো দীর্ঘ বিবরণ পাঠ করে পাঠক-পাঠিকাদের লোভ হবারই কথা। কিন্তু যথানিয়মে তৈরি করতে না পারলে হতাশ হতে হবে।

নবম শ্রেণী থেকে এমএ পর্যন্ত আমি ঢাকায় লেখাপড়া করেছি। ছুটি হলে গ্রামের বাড়ি বীরগাঁও না যেয়ে আব্বা-আম্মার কাছে কুমিল্লা জেলার চান্দিনায় চলে যেতাম। আমার দাদী তার আদরের বড় নাতীর প্রিয় 'মেরা পিঠা' ঢাকায় পাঠিয়ে দিতেন। আমার ছেলেরাও সবাই উত্তরাধিকারসূত্রে এ পিঠার ভক্ত। আমার ছোট ছেলে সালমানের ঘরের আমার দু'নাতনী নাবা ও সাফা এ পিঠা পেলে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়।

মিনায় বাংলাদেশী নারিকেল

মাস্টার শফিকুল্লাহ আমার হাতে লাগানো নারিকেল গাছের প্রথম ছড়ার একটা নারিকেল আরাফার ময়দানে দিলেন। ঐ বারই গাছটিতে পয়লা নারিকেল হয়। ইত্তেহাদুল উলামার সেক্রেটারি মাওলানা মুফিজুল হক ফেনী থেকে এ গাছের চারাটি এনে দিয়েছিলেন। মাছ আর পিঠা আরাফার ময়দানেই খাওয়া হয়েছে। নারিকেলটি মিনায় নিয়ে গেলাম। মাশাআল্লাহ নারিকেলটি আকারে বেশ বড় এবং অত্যন্ত সুস্বাদু ছিলো। ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে বের করা হলো।

www.bjilibrary.com

মীনায় আমাদের তাঁবুর আশেপাশের তাঁবু থেকেও বিভিন্ন দেশের লোক আমার সাথে দেখা করতে আসতেন। এভাবে ১০/১২টি দেশের লোক ঐ নারিকেল খেয়েছেন। এমন লোকও কয়েকজন ছিলেন, যারা জীবনে পয়লা নারিকেল দেখলেন ও খেলেন। এভাবেই বাংলাদেশী নারিকেলটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা পেয়ে গেলো।

১৯৯৯ সালে বাড়িতে বিল্ডিং নির্মাণ করার কারণে ঐ গাছটি কেটে ফেলতে হলো। ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমাদের নারিকেল কিনতে হয়নি। সারা বছরই নারিকেল হতো। ভাই-বোনদেরকেও দেওয়া সম্ভব হতো। এর একটি চারা পারিবারিক গোরস্তানে বড় হচ্ছে। যখন ফল হবে তখন হয়তো আমি দুনিয়ায় থাকবো না।

আমার বাগান করার হবি

সবারই কোন না কোন হবি (শখ) থাকে। ছোট বয়স থেকে দাদীর সাথে তরিতরকারির বাগানে যোগালি হিসেবে কাজ করে বাগান করার শখ জন্মে। কারো কারো বাগানের শখ ফুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছাত্র জীবনে চান্দিনায় আব্বার পরামর্শে ফলের বাগানের উপর গুরুত্ব দেই। ঢাকায় মগবাজারে বসবাস শুরু হলে তরিতরকারি ও ফলের চাষ সমান গুরুত্ব পায়। বিল্ডিং হবার পর বাগানের শখ ছাদেই মেটাতে বাধ্য হই। এখানে ফুল ও ফলের চাষই প্রধান। টবে কাঁচা মরিচ, পুঁইশাক ও বেগুনের মধ্যেই তরকারির চাষ সীমাবদ্ধ। বেগুনে খুব কমই সফল হই। কাঁচা মরিচ প্রচুর হয়। আত্মীয়-স্বজনকে বিলাই। সুগন্ধি এলাচিলেবু ও কাগজি লেবু বেশ হয়, যা ফলের মধ্যে গণ্য নয়।

ফলের মধ্যে কাযী পেয়ারার ফলনই বেশি সন্তোষজনক। দু'বছর আগে ড্রামে বরই গাছ লাগালাম। পূর্বের এক কিস্তিতে গত বছর লিখেছিলাম যে, এতে রাজবরই-এর কলম লাগাতে চাই। টঙ্গীর ডিআইটি (দারুল ইসলাম ট্রাস্ট) আবাসিক এলাকার বাসিন্দা জনাব ফারুকুজ্জামান গত বছর এপ্রিল মাসে কলম লাগাবার ব্যবস্থা করলেন। চাষী কল্যাণ সমিতির কর্মকর্তা জনাব শাহজাহান আনওয়ারীর টঙ্গীস্থ বাড়ি থেকে রাজবরই-এর বীজ এনে তারই ছোট ভাই জনাব আমিনুল ইসলাম কলম লাগিয়ে দিয়ে গেলেন। আল্লাহর রহমতে প্রায় ৫/৬ কেজি বরই হয়েছে। বরই-এর সাইজ ও স্বাদ অত্যন্ত সন্তোষজনক। ছাদে বরই ফলানোর সফল প্রচেষ্টার সাক্ষ্য বহন করার উদ্দেশ্যে চাষী কল্যাণ সমিতির সেক্রেটারি জেনারেল জনাব ইরশাদুল্লাহ সদলবলে এসে ফটো ও ভিডিও করে আমাকে উৎসাহিত করলেন।

দু'বছর আগে আমার একান্ত সহকর্মী সেলিম হিমসাগর ও নীলাম্বরী নামের আমের দুটো কলম লাগিয়েছিলো। এবার দুটোতেই প্রচুর মুকুল এলো। চাষী কল্যাণ সমিতি থেকে এরও ফটো তোলা হয়। ফলন সন্তোষজনক হলে এ প্রচেষ্টাকেও সফল বলা যাবে।

শাহজাহান আনওয়ারী সাহেব কয়েক মাস আগে আম-রুপালি ও ত্রিফলা নামের আমের দুটো কলম দিলেন। আম-রুপালি লোকমুখে আম্রপলি বলে উচ্চারিত হয়। ত্রিফলা নামের ভিত্তি হলো, এ গাছে নাকি বছরে তিনবার ফলন হয়। আগামী বছর এতে ফল ধরার আশা করা যায়।

ফুলের মধ্যে গোলাপ ৫/৬ রকমের আছে। সুগন্ধীর চেয়ে গন্ধহীনই বেশি। সবচেয়ে বেশি গাছ বেলি ফুলের। প্রচুর ফুল হয়। হাসনাহেনা গাছটি বেশ বড়। ফুল ঝরে গেলে

www.bjilibrary.com

ডালা কেটে দেই। মাস দু'য়েকের মধ্যে আবার ফুল ফোটে। তখন সন্ধার পর গোটা ছাদ গন্ধে ভরে যায়। আরও কয়েক রকমের ফুল গাছ আছে।

আগে আমি নিজেই বাগানের পরিচর্যা করতাম। কিন্তু এখন আর পারি না। সেলিমই সবকিছু করে। পরিকল্পনা আমার, যা সেলিম বাস্তবায়ন করে। মালীর দায়িত্ব সে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যোগ্যতার সাথে পালন করে। মাঝে মাঝে আমি তার সাথে যোগালি হিসেবে কাজ করি।

বাগানের পরিচর্যার ব্যাপারে গাছের রোগের চিকিৎসা, কোন সময় কোন সার দেওয়া প্রয়োজন ইত্যাদি বিষয়ে শাহজাহান আনওয়ারী সাহেব সেলিমকে পরামর্শ দেন।

এ বাগান আমার মনে যেমন আনন্দ দেয়, চোখও জুড়ায়। ফজরের নামাযের পর বাগানে হাঁটি এবং গাছের সান্নিধ্য উপভোগ করি। রাতে খাবার পর শোবার আগে কিছুক্ষণ বাগানে হাঁটি। আমার স্ত্রী এবং এসএসসি পরীক্ষার্থী নাতনী নাবীহা প্রায়ই আমার সাথে ছাদে হাঁটতে যায়। শহরে ছাদ সত্যি আল্লাহ তাআলার এক বিরাট নিয়ামত। আটতলা দালানের ছাদে বিশুদ্ধ হাওয়া ও উন্মুক্ত আকাশ দেহ-মনকে যে তৃপ্তি দান করে তা শহরে ক'জনের ভাগ্যে জুটে? আলহামদু লিল্লাহ।

স্বাধীন বাংলাদেশে জামায়াতের পুনর্গঠন

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়। ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক দল নিষ্ক্রিয় হতে বাধ্য হয়।

জামায়াতে ইসলামী ইকামাতে দীনের সংগঠন। কোন অবস্থায়ই এ কাজ বন্ধ থাকতে পারে না। কারণ এ কাজ করা ফরয। যাদের এ চেতনা আছে, তারা সব অবস্থায় পরিবেশ অনুযায়ী যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু করতে বাধ্য। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। জুন মাসে রুকনদের ভোট সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। মাওলানা আবদুল জাব্বার আমীর নির্বাচিত হন। '৭৩ সালের এপ্রিল মাসে মাস্টার শফীকুল্লাহ আমীর নির্বাচিত হন এবং এ বছর তিনিই জামায়াতের প্রতিনিধি হিসেবে হজ্জে যান। '৭৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে হজ্জ থেকে দেশে ফিরে মাস্টার সাহেব জানতে পারলেন যে, ফেব্রুয়ারি মাসেই জনাব আবদুল খালেক আমীর নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি পদত্যাগ করলে মজলিসে শূরা মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ আলীকে অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত আমীর নির্বাচিত করে।

১৯৭৫ সালের মে মাসে উপনির্বাচনে মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৬ সালের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মওলানা আবদুর রহীম তিন বছরের জন্য আমীর নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে আমার দেশে ফিরে আসার পর মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে আমীর পদে উপনির্বাচন হয় এবং আমার উপর আমীরের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৭৯ সালের মে মাসের পূর্ব পর্যন্ত আইনগত বাধা থাকায় জামায়াতে ইসলামীর নামে প্রকাশ্যে কোন তৎপরতা সম্ভব হয়নি। আইনগত বাধা অপসারিত হলে মে মাসে জনাব আব্বাস আলী খানের নেতৃত্বে ইডেন

www.bjilibrary.com

হোটেলের রুকন সম্মেলনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করে। আমার নাগরিকত্ব সমস্যার কারণে জনাব আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমীর হিসেবে জামায়াতের রাজনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা করেন। আর নির্বাচিত আমীর হিসেবে আমি অভ্যন্তরীণ ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে থাকি।

১৯৮০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত একুশ বছরে জামায়াতের আমীর পদে সাত বার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবারই আমাকে নির্বাচিত করা হয়। আমি এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর ২০০১ সালে মাওলানা মতিউর নিজামী আমীর নির্বাচিত হন। ২০০৪ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত মেয়াদের জন্য নিজামী সাহেব পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৭৯ সালের মে মাস থেকে ১৯৯৪ সালের জুন পর্যন্ত জনাব আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীরের বোঝা বহন করতে হয়। একটানা ১৫ বছর জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক নেতৃত্বে বিরাট দায়িত্ব খান সাহেব অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পালন করেন।

১৯৯৪-এর জুন মাসে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের মাননীয় বিচারপতিগণ সর্বসম্মতভাবে আমাকে বাংলাদেশের জন্মগত নাগরিক হিসেবে ঘোষণা দেবার পর জনাব আব্বাস আলী খান ভারমুক্ত হন এবং রাজনৈতিক ময়দানে আমার দায়িত্ব পালনের সুযোগ হয়। ঐ সময় থেকে ১৯৯৯ সালে খান সাহেবের ইনতিকাল পর্যন্ত তিনি সিনিয়র নায়েবে আমীর হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

বর্তমানে আমীরে জামায়াতকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ের কঠিন দায়িত্বও পালন করতে হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বক্ষেত্রে সাফল্য দান করুন।

হজ্জের আনুষ্ঠানিকতার পর

আরাফার ময়দানে ও মিনায় আমরা সমবেতভাবে বাংলাদেশ ও ইসলামী আন্দোলনের জন্য কাতরভাবে দোয়া করে তৃপ্তিবোধ করেছি। হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবার পর আমি মাস্টার শফীকুল্লাহ ও মাওলানা আবদুস্ সুব্‌হান মক্কা শরীফে বেশ কয়েকদিন একাধারে বৈঠক করেছি। মাস্টার সাহেব থেকে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছি। আন্দোলন ও সংগঠনের বিস্তারিত খবর জানতে পেরে উৎসাহবোধ করেছি। যে কঠিন পরিবেশে সংগঠনকে চালু করতে হচ্ছে তা উপলব্ধি করতে পেরেছি।

বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের জন্য বিদেশে থেকে যা কিছু করতে চেষ্টা করছি তা সংগঠনের জন্য খুবই সহায়ক বলে জেনে আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জানালাম। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ভবঘুরের মতো বিদেশে পড়ে থাকার দুঃখবোধ দূর হয়ে গেলো। দেশের বাইরে না থাকলে এটুকু খিদমত করার সুযোগ পেতাম না। আল্লাহ যা করেন তাতেই যে কল্যাণ তা উপলব্ধি করলাম।

মাস্টার সাহেব দেশে ফিরে যাবেন, আমিও লন্ডন ফিরে যাবো বলে আমাদের কথা যেন ফুরাচ্ছে না। রাতদিন আলোচনা হচ্ছে। এ সত্ত্বেও মাস্টার সাহেবের যাবার আগের রাতটা শুয়ে শুয়ে আলাপ করেই কেটে গেলো। উভয়ের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক হাল-অবস্থার বিনিময় হলো। বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার আমীর হিসেবে দীর্ঘদিন তিনি দায়িত্ব পালন

www.bjilibrary.com

করেন। তখন আমার ব্যাপক সফরে ঐ জেলায় মাস্টার সাহেবের সাথে বহুদিন কেটেছে। ঐ সব স্মৃতিচারণও বাদ যায়নি। আন্দোলনে একসাথে চলার মাধ্যমে যে ব্যক্তিগত গভীর ভালোবাসা জন্মে তাতে পরস্পরের মধ্যে আবেগময় সম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং একের জন্য অপরের অন্তর থেকে আন্তরিক মঙ্গল কামনা করা হয়।

১৫৭.

১৯৭৪ সালের কথা

১৯৭৪ সালে দু'বার হজ্জ অনুষ্ঠিত হয়। ৪ জানুয়ারি ও ২৩ ডিসেম্বর-এ দু'তারিখে হজ্জ হয়। হিজরী সন ঈসায়ী সনের চেয়ে দশ দিন বা এগারো দিন কম হওয়ায় ৭৪ সালের শুরুতে একবার এবং শেষদিকে আর একবার হজ্জের তারিখ পড়ে গেছে।

১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে হজ্জের পর মাস্টার শফীকুল্লাহ ঢাকা ফিরে গেলেন। আমি ৭ ফেব্রুয়ারি ৪ দিনের জন্য দুবাই ও দু'দিনের জন্য বাহরাইন, আবার ৫ দিনের জন্য সৌদি আরবে কাটিয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি লন্ডন ফিরে গেলাম।

বিদেশে থাকাকালে যদিও ১৯৭৩ সাল থেকে আমার মূল অবস্থান লন্ডনেই ছিলো, তবুও বছরে কমপক্ষে দু'বার আরব দেশে যেতে হয়েছে। একবার হজ্জের মৌসুমে আর একবার রামাদান মাসে। রামাদানের প্রথম দিকে কুয়েত ও শেষ দিকে মক্কা ও মদীনায় কাটিয়েছি। ঈদুল ফিতর কোন বছর মক্কায় এবং কোন বছর মদীনায় উদযাপন করেছি।

১৯৭৪ সালের দ্বিতীয় হজ্জ

১৯৭৪ সালের দ্বিতীয় হজ্জ ২৩ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। আমি ৭ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে সৌদি আরব রওয়ানা হই। মক্কা শরীফ পৌছে বাংলাদেশী হাজীগণের সাথে দেখা হলে তাদের কাছ থেকে দেশের অবস্থা জানার চেষ্টা করি। আগের বছরের তুলনায় এ বছরের অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ বলে জানা গেলো। লন্ডনের পত্রিকায়ও এ খবর পেয়েছি যে, খাদ্যাভাবে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। হাজীদের কাজ থেকে আরও বিস্তারিত যা শুনলাম তাতে মনে অত্যন্ত বেদনাবোধ করলাম।

এ হজ্জে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি হিসেবে জনাব শামসুর রহমান ও মাওলানা আবদুল জব্বার এবং ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহের মক্কা শরীফ পৌছার পর তাদের কাছ থেকে দেশের সার্বিক অবস্থা জেনে অত্যন্ত পেরেশানীবোধ করলাম। দেশে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। পথেঘাটে মরা মানুষের লাশ দেখা যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা দৃষ্টে দেশে কোন সরকার আছে বলে মনে হয় না। এ ধরনের বিবরণ শুনে দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চরম শঙ্কাবোধ করলাম।

দেশের একটি চিত্র

আমার সামনে এখন ঐ সময়কার অবস্থা সম্পর্কে ৭০০ পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থ রয়েছে। এটা দেশের অবস্থা সম্পর্কে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের একটা বিশ্বস্ত সংকলন। সংকলন করেছেন হাফিয মাওলানা মুনীরুদ্দীন আহমদ। গ্রন্থটি পরিবেশন করেছে খোশরোজ কিতাব মহল। এ বিরাট গ্রন্থটির নাম 'বাংলাদেশ–বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর'। এতে

www.bjilibrary.com

সংকলকের একটি দু'পৃষ্ঠার ভূমিকা ছাড়া আর কোন মন্তব্য নেই। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সাড়ে তিন বছরের খণ্ড খণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু ছবি এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।...

উপাদান সংগ্রহ হয়েছে সংবাদপত্র থেকে।....

নমুনা হিসেবে মাত্র দুটি জাতীয় দৈনিক (দৈনিক ইত্তেফাক ও গণকণ্ঠ) এবং একটি সাপ্তাহিক (সোনার বাংলা) পত্রিকার তথ্য বিশেষভাবে ও অন্যান্য পত্রিকার তথ্য সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে।"

সংকলক প্রতিটি তথ্য পরিবেশনের সাথে সাথে পত্রিকার নাম ও প্রকাশের সন-তারিখ উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থের ৪৪০ পৃষ্ঠা থেকে ৭০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেশ ও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয়ের সংকলন রয়েছে।

গ্রন্থটিতে দুর্ভিক্ষ শিরোনামে যেসব খবর সংকলিত হয়েছে তা নিম্নরূপ পাঁচটি সাব-হেডিং-এ প্রকাশিত হয়েছে।

১. গ্রামাঞ্চলে অন্ন-বস্ত্রের হাহাকার,

২. পেটের দায়ে কন্যা বিক্রি,

৩. চোরাবাজারে কাফনের কাপড় বিক্রি হচ্ছে,

৪. এখানে-ওখানে, ডোবায়-পুকুরে লাশ,

৫. অন্নাভাবে অসহায় মানুষ স্ত্রী তালাক দিচ্ছে।

উক্ত গ্রন্থটি থেকে ১৯৭৪ সালের পত্রিকার কতক শিরোনাম উল্লেখ করছি ঃ

অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েই চলছে, পরিবার পরিজনসহ আত্মহত্যার হিড়িক।

ঢোল পিটিয়ে মানুষ বিক্রি ঃ মানব শিশু আজ নিত্য দিনের কেনা-বেচার পণ্য।

রেকর্ড সৃষ্টিকারী খবর ঃ জঠর জ্বালায় বমি ভক্ষণ। রাজধানীর পথে পথে জীবিত কঙ্কাল।

ক্ষুধার তাড়নায় পানিতে সন্তান নিক্ষেপ।

রাজধানীতে জঙ্গি ভুখা মিছিলের দাবি, "ভাত দাও, কাপড় দাও, নইলে গদি ছেড়ে দাও।"

রংপুর জেলায় অনাহার ও কলেরায় প্রতিদিন সহস্রাধিক লোক মরিতেছে।

দুর্ভিক্ষ ঃ পাঁচ লাখ মরেছে ঃ দশ লাখ মরবে।

উপরিউক্ত গ্রন্থে যে ভয়ঙ্কর ও করুণ চিত্র পাওয়া গেলো তা ১৯৭৪ সালে মক্কা শরীফে অবস্থানকালে এমন বিস্তারিত জানা না থাকলেও লন্ডনের পত্রিকায় যেটুকু খবর ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ পেতো তাতেই ভয়াবহ অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছিলাম। হজ্জ যাত্রীদের মুখে শুনে আরও অবহিত হলাম। মনে মনে স্থির করলাম যে, হজ্জের পর বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশকে দুর্ভিক্ষ থেকে উদ্ধার করার জন্য সম্মত করতে চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তা-না হলে এ অসহায়ত্বের সুযোগে ভারত বাংলাদেশকে গ্রাস করার চেষ্টা করতে পারে।

www.bjilibrary.com

১৫৮.

১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের হজ্জ

জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবদুল জাব্বার, ছাত্রনেতা আবু নাসের ও আমি একই সাথে আরাফাহ ও মিনায় হজ্জের করণীয় সমাধা করলাম। পৃথক পৃথকভাবে ও সমবেতভাবে মহান মাবূদের দরবারে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ, দেশের জনগণ, দেশের ইসলামী আন্দোলন, মুসলিম উম্মাহ ও নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রয়োজন পুরনের জন্য দোয়া করে ঐ কয়টি দিন তৃপ্তির সাথে কাটালাম।

মিনায় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের দীনী ভাইদের তাঁবুতে আমাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেলেন। বাংলাদেশে বর্তমান পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য অত্যন্ত আবেগের সাথে তারা আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উর্দু ভাষায় বক্তব্য রাখতে হবে বলে মাওলানা আবদুল জাব্বারকে বলার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে অত্যন্ত জোশের সাথে বাংলাদেশে ইসলামের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। বর্তমান মুজিব সরকারের উপর আল্লাহর গযব হিসেবেই দুর্ভিক্ষ এসেছে বলে মত প্রকাশ করলেন। ইসলাম ছাড়া আর কোন শক্তিই বাংলাদেশকে বাঁচাতে পারবে না বলে তিনি জোড়ালো ঘোষণা দিলেন। তার আবেগময় বক্তৃতায় পাকিস্তানি ভাইয়েরা খুবই উৎসাহিত হলেন।

হজ্জের আগে আমাদের চারজনের যত বৈঠক হয়েছে, তাতে দেশ থেকে আগত তিনজনের নিকট থেকে দেশের অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানার সুযোগ হয়েছে। প্রকাশ্যে জামায়াতের সাংগঠনিক তৎপরতা সম্ভব না হওয়া সত্ত্বেও এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা উজ্জ্বল কিনা জানা না গেলেও তারা তিনজনই সংগঠনে সক্রিয় সবার ইখলাস, জযবা ও ত্যাগের মনোভাব সম্পর্কে যা বললেন, তাতে উৎসাহে আমার অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠলো। দেশের সংগঠনের জন্য বিদেশে দ্বিগুণ উৎসাহের সাথে কাজ করার প্রেরণা বোধ করলাম।

হজ্জের পর আমাদের বৈঠকে ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে মতবিনিময় ও বহু রকমের পরামর্শ হয় এবং করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিদেশে আমার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করলে তারা আমাকে মূল্যবান পরামর্শ দেন।

ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধি ঐবারই প্রথম হজ্জ উপলক্ষে এলো। তার কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের পরিবেশ সম্পর্কে যা জানা গেলো, বিশেষ করে সহশিক্ষার কুফল যা দেখা দিলো, তাতে দীনের দাওয়াতের সুযোগ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতেও ছাত্রকর্মীরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে বলে জানলাম। প্রকাশ্যে সাংগঠনিক তৎপরতার কোন সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও রিক্রুটমেন্টের হার বেশ সন্তোষজনকই মনে হলো।

ছাত্র প্রতিনিধিকে আমি দুটো বিশেষ পরামর্শ দিলাম ঃ

১. ইসলামী ছাত্র সংগঠনের বর্তমান নাম ইসলামী ছাত্রসংঘ। এখনও প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ আসেনি। যখন সুযোগ আসবে তখন সংঘ শব্দটির পরিবর্তে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করার জন্য এখনই চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। সংঘ শব্দটি খাঁটি সংস্কৃত।

www.bjilibrary.com

২. ছাত্র সংগঠনের দাওয়াত ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। স্কুল পর্যায়ে থাকাকালে জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা তেমন জাগ্রত হয় না। কলেজে ভর্তি হবার সময় থেকেই ঐ চেতনা সৃষ্টি হয়। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের জন্য এমন লোকই প্রয়োজন, যারা আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, দীন কায়েম করাকেই জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়। তাই মেধাবী ছাত্রদেরকে স্কুল পর্যায়েই ধরতে হবে। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী থেকে ছাত্রদেরকে সংগঠনভুক্ত করতে পারলে কলেজে ভর্তি হবার পূর্বেই সাথী পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই সদস্য হয়ে যেতে পারে।

বাদশাহ্ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ

১৯৭৩ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি হজ্জ সমাধা করে ঐ মাসের শেষ দিকে জেদ্দায় রাজপ্রাসাদে সর্বপ্রথম সৌদি বাদশাহ্ ফায়সালের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পাই।

১৯৭৩ সালে সাবেক মন্ত্রী শায়খ আহমদ সালাহ জামজুম নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে আমাকে নিয়ে সরাসরি বাদশাহর নিকট পরিচয় করিয়ে দিলেন। এবার তিনি নিজে না গেলেও চিফ প্রটোকল অফিসার জনাব আবদুল ওহ্যাবের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন।

আমি, জনাব শামসুর রহমান, মাওলানা আবদুল জাব্বার ও ছাত্রনেতা আবু নাসের একসাথে বাদশাহর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। দু'বছর আগে বাংলাদেশ সম্পর্কে আমি যে সাক্ষাৎ করেছিলাম তা উল্লেখ করলে তিনি মনে আছে বলে জানালেন। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্র উৎখাত না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন না বলে যে আমাকে জানিয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি এ ব্যাপারে মযবুত আছেন বলে জানালেন।

আমি বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষাবস্থার করুণ অবস্থা তুলে ধরে বললাম যে, রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি না দিলেও সে দেশের কোটি কোটি মুসলিমকে এ কঠিন সময়ে আর্থিক সাহায্য দেবার জন্য আবেদন জানাই। আমরা আশঙ্কা করছি যে, বর্তমান অসহায় অবস্থার সুযোগে ভারত ঐ দেশটিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জনাব শামসুর রহমান এবং আবু নাসেরও কিছু কথা বললেন। তিনি জওয়াবে "হাযা ওয়াজিবী" (এটা আমার কর্তব্য) বলে জানালে আমরা শুকরিয়া জানালাম।

আবু নাসের আমার সম্পর্কে বললেন, "বাংলাদেশ সরকার তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল করে দিয়েছে। অথচ আমরা তাঁকে দেশে পেতে চাই।" তিনি শুধু বললেন, "হুয়া আখী" (তিনি আমার ভাই)। তিনি আর কী বলবেন? বাংলাদেশকে রাষ্ট্র হিসেবে যিনি স্বীকৃতিই দেননি তিনি এ বিষয়ে কী করতে পারেন?

বিদায়ের পালা

দেশে আমরা '৭১-এর নভেম্বর পর্যন্ত কাছাকাছি ছিলাম। তিন বছর পর হারিয়ে যাওয়া দীনী ভাইদের সাথে মিলিত হতে পেরে আমরা সবাই যে কতো খুশি হয়েছিলাম তা বিদায়ের সময় তীব্রভাবে অনুভব করলাম। আমাদের এ ভালোবাসা পার্থিব কোন স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে উঠেনি। আমরা আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য জান ও মাল দিয়ে জিহাদ

www.bjilibrary.com

করাকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করায় আমাদের মধ্যে যে ভালোবাসা তা আল্লাহর মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। আমরা আল্লাহর জন্যই একত্র হয়েছিলাম, আবার আল্লাহর জন্যই একে অপর থেকে পৃথক হচ্ছি। এ জাতীয় ভালোবাসাকেই রাসূল (স) ঈমানের পূর্ণতার লক্ষণ বলে সুসংবাদ দিয়েছেন।

ঢাকায় ছাত্র সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রাই আমার সাথে যোগাযোগ রাখতো। আমি তাদেরকে 'তুমি' সম্বোধন করতাম না, 'আপনি' বলতাম। সে হিসেবে মক্কায় আবু নাসের পৌঁছলে আমি সে নিয়মেই সম্বোধন করলাম। কিন্তু আবু নাসের আমাকে 'তুমি' বলতে বাধ্য করলো। তখন থেকে ছাত্র নেতাদেরকে তুমিই বলে এসেছি। আগে যাদেরকে তুমি বলিনি তাঁরা 'আপনিই' রয়ে গেছেন।

১৯৭৪ সালের কয়েকটি সম্মেলনের কথা

১৯৭৪ সালের তিনটি ইসলামী সম্মেলনে আমাকে মেহমান হিসেবে যোগদান করতে হয়েছে। ইউকে ইসলামী মিশন ১৯৭৪-এর ২৪ আগস্ট তিন দিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করে। লন্ডন থেকে ১০০ মাইল দূরে লেইসেস স্টার শহরে (লোকমুখে লেস্টার) ইসলামী ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একদিনের অধিবেশনে আমাকে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে হয়। ইউকে ইসলামী মিশন দাওয়াতে দীনের একটি সংগঠন। তাই দায়ী ইলাল্লাহর দায়িত্ব যারা পালন করতে চান তাদের মধ্যে যেসব গুণাবলি থাকা জরুরি সে বিষয়েই আমি আলোকপাত করলাম।

দ্বিতীয় যে সম্মেলনে আমাকে অতিথি বক্তা হিসেবে যোগদান করতে হয় তা UMO (United Muslim Organization) নামে একটি সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। ড. আবদুল আযীয পাশা ছিলেন এ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি ভারত থেকে আগত। ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করে লন্ডনে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন। ইংল্যান্ডের মুসলিম সংগঠনগুলোকে একটি বৃহত্তর ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই তিনি প্রচেষ্টা চালান। অবশ্য তিনি এ ব্যাপারে সফল হতে পারেননি। কিন্তু ছোট ছোট কয়েকটি সংগঠন নিয়েই তিনি UMO নামে সম্মেলনের আয়োজন করেন। উল্লেখযোগ্য কোন সংগঠন এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

আমার বক্তব্যে ইসলামী সংগঠনসমূহের ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করে এ উদ্যোগের সাফল্যের জন্য পরামর্শ দিলাম যে, এ জাতীয় প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন চালিয়ে সকল সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সম্মত করে ঐক্য সংগঠনের নামকরণ ও নেতৃত্ব নির্ধারণ করতে হয়। আগেই সংগঠনের নাম ঘোষণা করে এবং কেউ এর সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হলে ঐক্যপ্রচেষ্টা সফল হতে পারে না।

ইংল্যান্ডের ২৫০টিরও বেশি ইসলামী সংগঠনের একটি ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম ১৯৯৭ সালে গঠন করা সম্ভব হয়। এর নাম Muslim Council of Britain. এ ঐক্যের বদৌলতেই MCB ব্রিটিশ সরকারের নিকট সে দেশে বসবাসরত সকল মুসলমানের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে স্বীকৃত। কয়েক বছর আগে MCB-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সম্মেলনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার অতিথি হিসেবে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ বক্তব্য রাখেন।

www.bjilibrary.com

গত ২০০১ সালে আমার ইংল্যান্ড সফরের সময় MCB-এর কর্মকর্তা ও সদস্যদের এক সমাবেশে আমাকে মেহমান হিসেবে দাওয়াত দেয়। জনাব ইকবাল সাকরানীর সভাপতিত্বে সেখানে আমাকে 'ইসলামী আন্দোলন : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' বিষয়ে বক্তব্য রাখার ও বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেবার সুযোগ দান করা হয়। জনাব সাকরানীর পূর্বপুরুষ ভারত থেকে ব্যবসায় উপলক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় যেয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনি সেখানেই জন্ম গ্রহণ করেন। বহু বছর থেকে তিনি ব্রিটিশ নাগরিক। তিনি একজন ব্যবসায়ী।

ড. সাকরানী বেশ কয়েক বছর আগে ঢাকায় এসেছিলেন এবং মেহেরবানী করে আমার বাড়িতে এসে সাক্ষাৎ করে গেলেন। ২০০১ সালে তিনি MCB-এর সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। এরপর অন্য একজন নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে তিনি পুনর্বার সেক্রেটারি জেনারেল নির্বাচিত হন। কয়েকদিন আগে বিবিসি'র টেলিভিশনে MCB-এর একটা খবরে জনাব ইকবাল সাকরানীকে দেখলাম। এ প্রতিষ্ঠানটি ইংল্যান্ডে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসেবে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে এবং লক্ষ লক্ষ ব্রিটেনবাসী মুসলমানদের ও ইসলামের স্বার্থে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। MCB-এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল হলেন ইসলামী ফোরাম ইউরোপের সাবেক প্রেসিডেন্ট ড. আবদুল বারী।

রাবেতা সম্মেলন

রাবিতা আলমে ইসলামীর উদ্যোগে মক্কা শরীফে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫৩টি দেশ থেকে ইসলামী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমবেত হন। বাংলাদেশকে একটি রাষ্ট্র হিসেবে সৌদি সরকার তখনো স্বীকৃতি না দেবার কারণে সেখান থেকে কাউকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। রাবেতা আলমে ইসলামীর তদানীন্তন সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে আমার পরিচয় থাকার কারণে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবেই আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়।

১৯৭৪ সালের ৬ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী এ সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আমি লন্ডন থেকে ৫ এপ্রিল মক্কা শরীফ পৌছলাম। সম্মেলনের ডেলিগেটদের সাথে হোটেলে ঐ কয়দিন কাটালাম। বহু দেশের ইসলামী নেতৃবৃন্দের সাথে পরিচয় হলো। এদের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ড. মুহাম্মদ নাসের-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। মাসজুমি পার্টি ক্ষমতাসীন থাকাকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাবেতার সম্মেলনে তিনি 'দেওয়ানে দাওয়াহ' নামক ইসলামী সংগঠনের নেতা হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন।

সম্মেলনের প্রস্তাবনা কমিটিতে তিনি ও আমি সদস্য থাকায় সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলির খসড়া রচনায় আমরা দু'জন একমত হয়ে মতামত দিয়েছি। এভাবে তার সাথে মতবিনিময়ের সুযোগ হয়েছে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত কাছাকাছি বলে উপলব্ধি করেছি। ১৯৮০ সালে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর হিসেবে তাকে আমি চিঠি লিখি। জামায়াতের পক্ষ থেকে গৃহীত একটা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই লিখেছিলাম।

পরিকল্পনা ছিলো যে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশে দু'জন করে ছাত্রকে সংগঠনের দায়িত্বে পাঠানো হবে, যাতে তারা ঐ দেশের ডিগ্রি হাসিল করে। এভাবে তারা সে দেশের ভাষা

www.bjilibrary.com

শিখবে, দেশ ও জনগণ সম্পর্কে অবহিত হবে। তারা ঐ দেশের ভাষায় জামায়াতের সাহিত্য অনুবাদ করার যোগ্য হবে। সে দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে কাজ করার সুযোগ পাবে এবং এক সময় রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করতে পারবে। ড. নাসেরকে জানিয়েছিলাম যে, তাদের যাবতীয় ব্যয়ভার আমরা বহন করবো। তিনি তাদের লোকাল গার্ডিয়ানের দায়িত্ব নিলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকবো।

চিঠির জওয়াবে তিনি জানালেন যে, বর্তমান সরকার এভাবে দু'জন বিদেশীকে আসার অনুমতি দেবে না। আরও জানালেন যে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি মোটেই তার অনুকূল নয়। তখন জেনারেল সুহার্তুর সামরিক স্বৈরশাসন চলছিলো। তিনি রাবেতা আলমে ইসলামীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও তাকে রাবেতার বার্ষিক অধিবেশনে যেতে দেওয়া হতো না।

রাবেতা সম্মেলনের কার্যক্রম

রাবেতা আলম ইসলামীর ঐ সম্মেলনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিলো। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সহযোগিতা করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো। বিভিন্ন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ও হুকুমত কায়েমে সহযোগিতার কোন উদ্দেশ্যে ছিলো না। বিভিন্ন দেশের আমন্ত্রিত নেতৃবৃন্দকে সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তারা জানতে চেয়েছেন যে, ইসলামের সহী আকীদা শিক্ষা ও বাস্তব জীবনে মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় দীনী শিক্ষা জনগণের মধ্যে চালু আছে কিনা এবং শিরক ও বিদআত থেকে জনগণকে রক্ষা করার চেষ্টা হচ্ছে কিনা।

৫ দিনব্যাপী সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের অবস্থা সব দেশের প্রতিনিধিদের জানার সুযোগ হলো। কোন্ দেশে ইসলামী দাওয়াতের কার্যক্রম কী রকম চলছে তা থেকে সবাই কমবেশি উপকৃত হন।

রাবেতা কর্তৃপক্ষ ৫৩টি দেশের ডেলিগেটদের আসা-যাওয়ার খরচ ও সম্মেলনে অবস্থানকালীন থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেছেন। সকল ডেলিগেট এ সুযোগ দান করার জন্য রাবেতার প্রতি শুকরিয়া জানিয়েছে। ডেলিগেটগণ পরস্পর পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে সবাই রাবেতার প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের প্রচেষ্টা ছাড়া এমন মহাসুযোগ পাওয়া মোটেই সম্ভব হতো না। রাবেতায় দাওয়াত পাওয়ায় মহান কাবাঘর যিয়ারত ও উমরা করার সৌভাগ্য হওয়ায় সবাই পরম তৃপ্তিবোধ করেছেন। ডেলিগেটদের মধ্যে অল্প কিছু লোক ছাড়া সবাই জীবনে এই প্রথম পবিত্র মক্কানগরীতে হাজির হওয়ার সুযোগ পেলেন।

সম্মেলনের প্রস্তাবাবলি

প্রস্তাবনা কমিটিতে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত প্রস্তাবাবলি সম্মেলনে পেশ করা হলে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে ডেলিগেটগণ তা মঞ্জুর করেন। প্রস্তাবসমূহের সারকথা নিম্নরূপ ঃ

১. ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস কুরআন ও হাদীস। সকল ইসলামী সংগঠন জনগণের মধ্যে এ দুটোর জ্ঞান পৌঁছাবার উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে।

২. যেসব ইসলমী সাহিত্য ঐ দুটো উৎসের ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাষায় নির্ভরযোগ্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ রচনা করেছেন, তা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে জনগণের মধ্যে প্রচার করতে হবে।

www.bjilibrary.com

৩. শিরক বিদআত মুসলিম উম্মাহর মধ্যে যে মারাত্মক রোগ ছড়াচ্ছে তা থেকে মুসলিম জনগণকে হেফাযত করার উদ্দেশ্যে তাওহীদের যথার্থ শিক্ষা ও সুন্নাহর ব্যাপক প্রচার অত্যন্ত জরুরি। ইসলামী সংগঠনকেই এ মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মদীনা যিয়ারত

সম্মেলনের পর একটি বিশেষ বিমানে সকল ডেলিগেটকে মদীনা শরীফ যিয়ারতের জন্য নেওয়া হলো। সরকারি ব্যবস্থায় যিয়ারত করার এমন এক সুবিধা পাওয়া যায়, যা অন্যভাবে পাওয়ার উপায় নেই। রাসূল (স)-এর মাযার যিয়ারতের সময় প্রতি নামাযের জামাআতের পরই প্রচণ্ড ভিড় হয়।

পুলিশ সেখানে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। সরকারি ব্যবস্থায় পুলিশ পাহারায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পাওয়া যায়। রাসূল (স), হযরত আবূ বকর (রা) ও হযরত ওমর (রা)-এর প্রতি সালাম উচ্চারণ করতে যতক্ষণ সময় লাগে তা পাওয়া যায়। কারণ সরকারি মুআল্লিম নিজেই সালামের কথাগুলো উচ্চারণ করে সবাইকে তার সাথে সাথে উচ্চারণ করান।

মক্কা শরীফে হাজরে আসওয়াদে চুম্বনের সময় এর চেয়ে অনেক বেশি ভিড় হয় এবং ভীষণ ধাক্কাধাক্কি পোহাতে হয়। পুলিশ ধাক্কাধাক্কির মাত্রা কমাবার চেষ্টা করলেও বন্ধ করতে পারে না। সরকারি মেহমানদেরকে পুলিশ প্রহরায় ধীরে সুস্থে হাজরে আসওয়াদে চুম্বনের ব্যবস্থা করা হয়। ধাক্কাধাক্কি করা নিষেধ। তবু অদ্ভুত আবেগে অনেকেই তা করে। ভিড় থাকলে চুমুর বদলে হাতের ইশারাই যথেষ্ট। কিন্তু অনেকে শক্তি প্রয়োগ করে হলেও চুমু দেবেই। তাই ধাক্কাধাক্কি বন্ধ হয় না।

সরকারি মেহমান হিসেবে কায়েকবারই চুমু দেবার সুযোগ পেয়েছি। হজ্জ মওসুম ছাড়া অন্য সময়ে চুমু দিতে পেরেছি। কিন্তু ধাক্কাধাক্কি করে চুমু দেবার চেষ্টা করিনি।

বিশেষ বিমানে মদীনা যিয়ারতের পর দিন ঐ বিমানেই ডেলিগেটদেরকে রিয়াদ নিয়ে যাওয়া হয়। বাদশাহ ফায়সালের সাথে ডেলিগেটদেরকে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যেই রাজধানী রিয়াদে নেবার ব্যবস্থা করা হলো।

বাদশাহ ফায়সালের সাথে সাক্ষাৎ

দেড়'শ ডেলিগেটকে রাজপ্রাসাদের হলরুমে বসানো হলো। ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে বাদশাহর সাথে কথা বলার জন্য জর্দানের প্রতিনিধি মিঃ কামিল আল শরীফকে মনোনীত করা হয়।

তিনি রাজধানী আম্মানের একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এবং প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গেনাইজেশন (PLO)-এর সমর্থক আল কুদ্স কমিটির সেক্রেটারি।

কামিল আল শরীফ পাকিস্তানে জর্দানের রাষ্ট্রদূত থাকাকালে ওআইসি-এর সেক্রেটারি জেনারেল মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রাহমানের সাথে '৭১ সালে ঢাকা এসেছিলেন। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে (বর্তমানে হোটেল শেরাটন) কামিল আল-শরীফের সাথে পরিচয় হয়। '৭২ সালে আমি যখন পাকিস্তানে আটকা পড়লাম তখন তিনি ইসলামাবাদে তার বাসায় দাওয়াত করে খাওয়ান।

www.bjilibrary.com

রাবেতা সম্মেলনের ডেলিগেটদের প্রতিনিধি হিসেবে বাদশাহ ফায়সালের সাথে কথা বলার দায়িত্ব পেয়ে বাদশাহর সামনে তার সাথে কাছাকাছি বসার জন্য কয়েকজন বাছাই করে নিলেন। আমাকেও তাদের সাথে রাখলেন। আমাকে তাঁর ডান পাশে বসালেন। বাদশাহর আসনের খুব কাছে সামনা-সামনি আমরা বসলাম। আমাদের পেছনে বাদশাহর দিকে মুখ করে সকল ডেলিগেট বসলেন।

কামিল আল শরীফ সালাম দিয়ে কথা শুরু করলেন। বাদশাহকে "জালালাতুল মালিক" বলে সম্বোধন করার সাথে সাথে বাদশাহ আপত্তি করে বললেন, "আল্লাহ তাআলাই একমাত্র 'জাল্লা জালালাহু'। আর কারো জন্য 'জালালাতুন' উপাধি সাজে না।" কামিল আল শরীফ সংশোধন করে অন্য শব্দে সম্বোধন করলেন।

কামিল আল শরীফ ডেলিগেটদের পক্ষ থেকে ইসলামী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য বাদশাহকে শুকরিয়া জানালেন এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের এ সুযোগ দেবার জন্য মুবারকবাদ জানালেন। বাদশাহ মুসলিম উম্মাহর মুরুব্বির যে মহান ভূমিকা পালন করছেন এর জন্য ডেলিগেটগণ অত্যন্ত প্রেরণাবোধ করছেন বলে উল্লেখ করলেন। এ কথার জওয়াবে বাদশাহ আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করে উম্মাহর যথার্থ খেদমতের জন্য আল্লাহ যেন তাঁকে তাওফীক দেন সেজন্য দোয়া করতে বললেন।

১৫/২০ মিনিট বাদশাহর সাথে আলাপ-আলোচনার শেষ পর্যায়ে বাদশাহ ডেলিগেটদেরকে সম্বোধন করে বললেন, আপনারা আল্লাহর দীনের খেদমতে আরো তৎপর হোন। আল্লাহ স্পষ্ট করে বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহর সাহায্য কর তাহলে তিনিও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন।" আল্লাহর দীনের খেদমত করাকেই আল্লাহ তাঁর সাহায্য বলে গণ্য করেন। এর চাইতে বড় মর্যাদা আর কিছুতেই নেই।

দরবার থেকে বিদায় হবার সময় বাদশাহর পক্ষ থেকে প্রত্যেক ডেলিগেটকেই একটা চমৎকার ব্রিফকেস গিফ্ট হিসেবে দেওয়া হলো। ব্রিফকেস খুলে দেখা গেলো যে, তাতে কয়েকটি জিনিস রয়েছে। ১. কাবা শরীফের গেলাফের ২/৩ বর্গফুট পরিমাণ এক টুকরা। ২. মাথায় পরার সাদা রুমাল যার নাম 'গোতরা' ও গোতরাকে চেপে রাখার জন্য কাল গোল চাকতি যাকে 'ইগাল' বলা হয়। ৩. গায়ের জামার উপর বিশাল একটা গাউন যাকে 'আবা' বলা হয়।

যোহরের নামাযের পর বাদশাহর মেহমান হিসেবে খাবার পরিবেশন করা হয়। রিয়াদ শহরে পানির সর্বোচ্চ টাংকির উপর এক বিশাল রেস্তোরাঁ রয়েছে, যা ধীরে ধীরে ঘুরতে থাকে। এর এক জায়গায় বসে কাচের বাইরে তাকিয়ে থাকলে এক জায়গায় বসেই গোটা রিয়াদ শহরের দৃশ্য উপভোগ করা যায়। গোটা রেস্তোরাঁ ঘুরতে থাকে বলেই এভাবে দেখা যায়।

আমরা শ'দেড়েক লোক মাত্র। খাদ্যের যে বিরাট আয়োজন দেখলাম তার তিন ভাগের এক ভাগ খাওয়াও সম্ভব মনে হলো না। বিরাট বিরাট খাঞ্চায় আস্ত ভেড়া ও দুম্বা ভুনে রাখা হয়েছে। এর পেট কেটে পোলাও বের করা হলো। মেহমানরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে প্লেটে নিচ্ছেন। যার যে অঙ্গের গোশত পছন্দ তা নেবার সুযোগ রয়েছে। সবাই কেটে নিতে সক্ষম নয় বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে কেটে দেবার জন্য লোক নিয়োজিত আছে। সবাই প্লেটে খাবার নিয়ে চারদিকে সাজিয়ে রাখা চেয়ারে বসে সামনে

www.bjilibrary.com

ছোট টেবিলে প্লেট রেখে খেতে খেতে একজায়গায় বসেই ১০০ ফুট উচ্চতা থেকে রিয়াদ শহরের দৃশ্য উপভোগ করতে থাকলেন।

বিকেলে বিমানে ডেলিগেটদেরকে জিদ্দায় নিয়ে বাসযোগে মক্কা শরীফে পৌঁছানো হলো। সেখান থেকে সবাই নিজ নিজ দেশে ফিরে গেলেন। হজ্জের পর আমি আরও মাসখানিক সৌদি আরবে কাটিয়ে ২৭ জানুয়ারি (১৯৭৫) ইংল্যান্ড ফিরে গেলাম।

১৫৯.

ঘটনাবহুল '৭৫ সাল

১৯৭৫ সালে দু'জন রাষ্ট্রনায়কের হত্যার ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মার্চ মাসে সৌদি বাদশাহ্ ফায়সাল তার চাচাতো ভাইয়ের গুলিতে নিহত হন। আর আগস্ট মাসে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার নেতৃত্বে সপরিবারে নিহত হন।

এ দু'জন রাষ্ট্রনায়কের হত্যার পরিণাম কিন্তু এক রকম নয়। বাদশাহ্ ফায়সালের তিরোধানে সৌদি আরব এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক থেকে বঞ্চিত হলো, যিনি গোটা মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। '৭৩ সালে ইসরাইলের বিরুদ্ধে তৈলের অস্ত্র ব্যবহার করে তিনি ইসরাইলের দখল থেকে মিসরের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার করে বিশ্বের মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতার গৌরব অর্জন করেন। বাদশাহ্ ফায়সাল আমেরিকাকে তেল সরবরাহ বন্ধ করার হুমকি দিয়ে কাবু করে ফেলেন। ইহুদী রাষ্ট্রের অন্ধ পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করার জন্যই তিনি তেলের অস্ত্র প্রয়োগ করেন। আমেরিকা এতো বড় অপমানের প্রতিশোধ নেবার এমনি উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো, যা রোধ করার সাধ্য বাদশাহর ছিলো না। বাদশাহর এক ভ্রাতুষ্পুত্র আমেরিকায়ই কিশোর বয়স থেকে বড় হয়েছিলো। সে রাজবংশের সদস্য হিসেবে দেশে এসে অবাধে বাদশাহকে অতি নিকট থেকে গুলি করে হত্যা করার মহাসুযোগ পেয়ে গেলো। বাদশাহর নিরাপত্তা রক্ষীরা অসহায় হয়ে ঘটনার পর প্রিন্সকে গ্রেপ্তার করলো এবং যথাসময়ে তার উপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলো। এ হত্যাকারীর মতো লক্ষ জনকে ফাঁসি দিলেও কি সামান্য ক্ষতিপূরণ হতে পারে? বাদশাহ ফায়সালের হত্যা গোটা মুসলিম উম্মাহকে নেতৃত্বহীন করে পঙ্গুতে পরিণত করে ছেড়েছে।

খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন

সৌদি বাদশাহর উপাধি হলো, 'খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন'। হারামে মক্কা ও হারামে মদীনার খাদিম। কাবা শরীফের গেলাফে বড় বড় অক্ষরে উপাধিটি লেখা আছে। মিসরের স্বৈরশাসক জামাল আবদুন নাসের মিসরের রাজতন্ত্র উৎখাত হবার পর আরব জাতীয়তাবাদের মহানেতা সেজে সকল আরব দেশে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেনা বিদ্রোহের অপচেষ্টা চালায়। লিবিয়া, সিরিয়া, ইরাকে তখনই বিদ্রোহী সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে। আরব বিশ্বে মিসরই তখন সশস্ত্র বাহিনীর দিক দিয়ে সবচেয়ে অগ্রসর ছিলো। বহু আরব দেশে সামরিক বাহিনী গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে মিসরীয় সামরিক অফিসার প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করতো।

www.bjilibrary.com

বাদশাহ ফায়সাল সৌদি সেনাবাহিনীকে বিদ্রোহ করা থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে হঠাৎ একদিনের মধ্যে সকল মিসরীয় সামরিক অফিসারকে মিসরে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পরের দিনই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে নিয়োগ করে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেন। এরপর থেকেই বাদশাহ ফায়সাল পাকিস্তানকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন থেকেই সৌদি বাদশাহর উপাধি হিসেবে 'খাদিমুল হারামাইন শরীফাইন' লেখা শুরু হয়।

বাদশাহ ফায়সাল তখন থেকেই উপলব্ধি করেন যে, কর্নেল নাসেরের আরব জাতীয়তার তুফান থেকে ইসলামই তাকে রক্ষা করেছে। তার বড় ভাই বাদশাহ ইবনে সৌদের আমলে প্রিন্স ফায়সাল দীর্ঘকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে ইসলামের এতোটা ভক্ত ছিলেন না। মাওলানা মওদূদী (র) থেকে শুনেছি যে, ইবনে সৌদ প্রিন্স ফায়সালের আধুনিকতার প্রতি আকর্ষণের কারণে শঙ্কিত ছিলেন। প্রিন্স ফায়সাল প্রাসাদ বিপ্লবের মাধ্যমে বড় ভাইকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর মাওলানা মওদূদী এ শঙ্কার কথা জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে প্রকাশ করেন।

কর্নেল নাসেরের আরব জাতীয়তার বিপ্লব থেকে রক্ষা পাওয়ার পর বাদশাহ ফায়সাল ইসলামের মুসলিম পতাকাবাহীর বলিষ্ঠ ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তখন মাওলানা মওদূদী মন্তব্য করেন, "ইসলামই বাদশাহ ফায়সালকে আরব জাতীয়তার ফেতনা থেকে রক্ষা করেছে। মুসলিম উম্মাহর রক্ষকই ইসলাম। মুসলমানরা ইসলামের রক্ষক নয়। একমাত্র আল্লাহই ইসলামের রক্ষক। মুসলমান জাতি যখনই ইসলামকে রক্ষাকবচ হিসেবে গ্রহণ করেছে, তখনই তারা রক্ষা পেয়েছে।"

ভারতের প্রেসিডেন্ট ডক্টর যাকির হোসাইন সৌদি আরব সফরে গিয়ে বাদশাহ ফায়সালকে বলেন, "ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা পাকিস্তান থেকে কম নয়। উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় মাদরাসা দারুল উলূম দেওবন্দ, মুসলিম বিশ্বের গৌরব আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, পৃথিবীর অন্যতম সুন্দরতম মুসলিম স্থাপত্য শিল্প তাজমহল ভারতে অবস্থিত। কোন দিক দিয়েই পাকিস্তান ভারত থেকে অগ্রসর নয়। পাকিস্তান থেকে ভারত আপনার ভালোবাসা বেশি পাওয়ার দাবিদার।" এ কথার জওয়াবে বাদশাহ বললেন, "ভারত আমার বন্ধু, আর পাকিস্তান আমার ভাই। ভাইয়ের হক তো আলাদা থাকেই।"

পাকিস্তানের সবচেয়ে আধুনিক সুপরিকল্পিত জেলা শহর ব্রিটিশ আমলে কোন ইংরেজ শাসকের নামে 'লায়ালপুর' নামে নির্মিত হয়। বাদশাহ ফায়সালের নামে সে শহর "ফায়সালাবাদ' নাম ধারণ করে। জেলার নামও ফায়সালাবাদ হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে ফায়সালাবাদ শহরে কয়েক বারই গিয়েছি। এমন সুপরিকল্পিত শহর আর কোথাও দেখিনি। শহরটির মাঝখানে বিশাল একটি বেদি। ট্রাফিক পুলিশের দাঁড়াবার মতো উঁচু হলেও বেদিটি গোলাকৃতির এবং যথেষ্ট প্রশস্ত। এটাকে ঘণ্টাঘর বলা হয়। ঐ বেদিতে দাঁড়ালে দেখা যায়, সেখান থেকে সাতটি প্রশস্ত রাস্তা সোজা শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ। দেখতে খুবই চমৎকার দেখায়। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শহরের সাতটি প্রধান রাস্তা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায়। গোল বিরাট বেদির পর রিং রোড ১০০ গজ

www.bjilibrary.com

পর পর সাতটি প্রধান সড়ককে বিদীর্ণ করে। অর্থাৎ প্রধান সাতটি সড়ক ছাড়া শহরের সকল রাস্তাই গোল চাকতির মতো বৃত্তাকৃতির রিং রোডগুলোর দু'পাশে বাড়িঘর ও দোকানপাট। এ শহরটি পাকিস্তানের বস্ত্র শিল্পের রাজধানী।

বাদশাহ্ ফায়সালের শাহাদাতের দিন

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চের কথা। লন্ডনস্থ সৌদি দূতাবাসে কাউন্সিলর মি. সালেম আযযামের সাথে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে তার অফিসে দেখা করতে গেলাম। আমার সাথে ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের সাথী জনাব আবদুস সালাম ও চৌধুরী মঈনুদ্দীন। তখন দুপুর এগারোটা।

মি. সালেম আযযাম সৌদি দূতাবাসের পক্ষ থেকে সকল ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখেন। তিনি তাদের সাথে সহযোগিতা করেন এবং তাদের কর্মতৎপরতায় উৎসাহ যোগান। আশির দশকেই তিনি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে 'ইসলামী কাউন্সিল' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। এর মাধ্যমে ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের সহযোগিতায় তিনি ইসলামের বিরাট খিদমত করেন। ১৯৮০ সালে তিনি 'Universal Islamic Declaration', ১৯৮১ সালে 'Universal Islamic Declaration of Human Rights এবং ১৯৮৩ সালে 'A model of an Islamic Constitution.' নামক তিনটি ঘোষণাপত্র ইংরেজি ও আরবী ভাষায় প্রকাশ করে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানগণ সব দেশের লন্ডনস্থ দূতাবাস ও উল্লেখযোগ্য ইসলামী সংগঠনকে পাঠান। আমাকেও পাঠাতে ভুলেননি। আমি তা সযত্নে হেফাযত করে রেখেছি।

১৯৯৫ সালের আগস্ট মাসে ইসলামী ফোরাম ইউরোপের উদ্যোগে লন্ডনের বিশালতম হলে এক জমকালো আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন উক্ত জনাব সালেম আযযাম। কমিটিতে লন্ডনের উল্লেখযোগ্য সকল ইসলামী সংগঠনের প্রতিনিধি শরীক ছিলেন। আমাকে ঐ সম্মেলনের প্রধান অতিথি করা হয়। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কমিটি আমাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তিনি সম্মেলন উদ্বোধনী বক্তৃতায় আমাকে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় সংবর্ধনা জানান। আল্লাহর রহমতে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। '৯৯ সালে লন্ডনে গেলে তাঁর বাসায় যেয়ে দেখা করা কর্তব্য মনে করেছি।

দীনের একজন বিরাট খাদিম হিসেবে তাঁর পরিচয় দিলাম। সৌদি দূতাবাসের কাউন্সিলর হিসেবেও তিনি দীনের একনিষ্ঠ খাদিম ছিলেন। সে হিসেবেই আমরা তিনজন তাঁর অফিসে দেখা করতে গেলাম। কয়েক মিনিট কুশল বিনিময়ের পর আমি আলোচনা শুরু করতেই টেলিফোন বেজে উঠলো। বিরক্তির সাথে ফোন ধরেই তিনি দূতাবাসের এক্সচেঞ্জকে বললেন, "এখন ফোন দিতে নিষেধ করেছিলাম, তবু দিলে কেন?" সাথে সাথে লক্ষ্য করলাম যে, তিনি অত্যন্ত বিষণ্ন বদনে কথা শুনছেন এবং তার দেহে অস্থিরতার ভাব দেখা গেলো। ফোন ছেড়ে দিয়ে পেরেশান হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "রয়টার ফোনে জানালো যে, বাদশাহ্ ফায়সাল গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।" এ কথা শুনবার সাথে সাথে আমরা জোরে ইন্না লিল্লাহ বলেই নির্বাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। খবরটা বজ্রপাতের মতো আমাদের সবাইকে নিস্তব্ধ করে দিলো। কয়েক মিনিট

www.bjilibrary.com

পর জানতে চাইলাম যে, বাদশাহর অবস্থা সম্পর্কে রয়টার কিছুই বলেনি? একটু পরে জানাবে বলে বললো, এটুকু বলে দু'হাতে কপাল চেপে ধরে থাকলেন। আলোচনা দূরে থাক, কোন কথা বলার পরিবেশই রইলো না। আরও কয়েক মিনিট পর আবার ফোন বাজলো। অধীর আগ্রহে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ঝট করে ফোন রেখেই বললেন, Shotdead. বলেই চেয়ারের পেছন দিকে গা এলিয়ে দিলেন। বাকরুদ্ধ অবস্থায় সবাই চোখ নিচু করে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর সালেম আযযাম সাহেব সোজা হয়ে বসলে আমরা সমবেদনা প্রকাশ করে হাত মিলায়ে বিদায় হয়ে এলাম।

এতো বড় ঘটনা কেমন করে ঘটলো জানার জন্য বাসায় এসে রেডিও'র নিকট বসলাম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় খবর আসতে লাগলো। পরের দিন দৈনিক পত্রিকায় বিরাট গুরুত্বসহকারে বিস্তারিত খবর জানা গেলো। সম্পাদকীয়তে বাদশাহ নিহত হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করা হলো।

যোগ্য ও বলিষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে বেশ প্রশংসাও সম্পাদকীয়তে দেখা গেলো। ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় মন্তব্যের ফটোকপি আমার হাতে পৌঁছলো। শিরোনামটা ভুলবার নয়, 'রাজর্ষি ফায়সাল' নামে সম্পাদকীয়তে বাদশাহর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও আবেগময় শ্রদ্ধার কথাগুলো মনে দাগ কেটেছিলো।

শেখ মুজিব হত্যা

বাদশাহ ফায়সালের হত্যায় গোটা মুসলিম উম্মাহ শোকাভিভূত হয়েছে। তাঁর তিরোধানে উম্মাহর নেতৃত্বে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা এখনও পূরণ হয়নি। তিনি উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। তাই উম্মাহর বর্তমান সংকটে তার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু শেখ মুজিবের হত্যার প্রতিক্রিয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে। রাষ্ট্রপ্রধানের নিহত হওয়া কোন দেশের জন্যই গৌরবের বিষয় নয়। সপরিবারে নিহত হওয়া অবশ্যই বেদনাদায়ক।

১৯৭০, ৭১ ও ৭২ সালে শেখ মুজিব জনপ্রিয়তার যে উচ্চমার্গে অধিষ্ঠিত ছিলেন এর নযীর বিশ্বের ইতিহাসে খুব বেশি নেই। ১৯৭২-এর শুরুতেই ক্ষমতাসীন হওয়ার মাত্র সাড়ে তিন বছর পর এমন নৃশংসভাবে সপরিবারে নিহত হওয়া সত্ত্বেও এর প্রতিবাদে দেশের কোথাও ২০/২৫ জনের একটা মিছিলও বের হলো না। তার দলের নেতৃবৃন্দ, এমপিগণ, বাকশালের স্বেচ্ছাসেবকগণ, এমনকি শেখ মুজিব সরকারের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীবাহিনীও এতো বড় ঘটনার বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিক্রিয়াও প্রদর্শন করলো না। এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কি হতে পারে?

শেখ মুজিবের মৃতদেহ দীর্ঘ সময় সিঁড়িতেই পড়ে রইলো। ঢাকায় জানাযার ব্যবস্থাও কেউ করলো না। সেনাবাহিনীর উদ্যোগে হেলিকপ্টারে লাশ নিয়ে শেখ সাহেবের গ্রামের বাড়িতে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে অল্প কিছু লোক ডেকে দায়সারাভাবে জানাযা পড়া হয়। মুজিব হত্যার মতো এতো বড় ঘটনায় মনে হয় সারা দেশে জনগণ খুশি হলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তা না হলে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেই এলাকার লোক দলে দলে সমবেত হওয়ার কথা।

www.bjilibrary.com

হত্যাকারী সামরিক অফিসাররা সামরিক শাসন কায়েম করতে পারতেন। এ জাতীয় ঘটনার পরিণতি সামরিক শাসনই হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম পরিণতিই দেখা গেলো। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা যে শূন্যের কোঠায় নেমে গিয়েছিলো, সে কথা আওয়ামী লীগ নেতারা, মুজিব সরকারের মন্ত্রী ও এমপিগণ এবং তিন সশস্ত্র বাহিনীর অফিসার ও জোয়ানরা ভালোভাবেই অবহিত ছিলেন। রক্ষী বাহিনী প্রধান তোফায়েল আহমদও তা অনুভব করতে সক্ষম হন।

মুজিব সরকারের মন্ত্রিসভার সিনিয়র মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। মুজিব সরকারের অন্যান্য বেশ কয়েকজন মন্ত্রী নতুন মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবের মনোনীত এমপিগণও নতুন সরকারকে মেনে নেয়। তাই জাতীয় সংসদ ভেঙে দেবার প্রয়োজন হয়নি। জাতীয় সংসদের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল লন্ডন যেয়ে মন্তব্য করলেন যে, "ফিরাউনের পতন হয়েছে"। এমন বিরূপ মন্তব্য করা সত্ত্বেও মালেক উকিল শেখ হাসিনা দিল্লি থেকে ফিরে আসবার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুজিব হত্যার পরও মুজিবের দলই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ-এর আর্মি ক্যু করার পূর্ব পর্যন্ত এ দলই ক্ষমতাসীন ছিলো।

লন্ডনে মুজিব হত্যার প্রতিক্রিয়া

লন্ডনে বিরাটসংখ্যক বাঙালি বসবাস করেন। ইস্ট লন্ডনেই তাদের অধিকাংশের অবস্থান। আমিও ইস্ট লন্ডনেই থাকতাম। স্বাধীন বাংলা আন্দোলনে তাদের বিরাট অবদান রয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবূ সাঈদ চৌধুরী লন্ডনকে কেন্দ্র করে বহির্বিশ্বে এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি ইয়াহইয়া সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রেরিত পাকিস্তান ডেলিগেশনের সদস্য ছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিদ্রোহ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে যোগদান করায় লন্ডনে তিনি এ আন্দোলনের নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করেন। এভাবেই লন্ডন বহির্বিশ্বে এ আন্দোলনের মহাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তাই আমার ধারণা ছিলো যে, মুজিব হত্যার বিরুদ্ধে লন্ডনে প্রচণ্ড প্রতিবাদ বিক্ষোভ হবে। কিন্তু কিছুই দেখলাম না। যাদেরকে বঙ্গবন্ধু প্রেমিক বলে জানতাম তাদেরকেও নিশ্চুপ মনে হলো। এ খবর শুনে কেউ ইন্না লিল্লাহ বলেননি বলে অনেকেই মন্তব্য করলেন।

আমি কীভাবে খবর পেলাম

গ্রীষ্মকালে ঢাকার সময় থেকে লন্ডনের সময় ৬ ঘণ্টা পেছনে। ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত ৩টায় যখন মুজিব হত্যা ঘটে তখন লন্ডনে সন্ধ্যা ৯টা। আরও সাড়ে ৫ ঘণ্টা পর আড়াইটায় (১৫ আগস্ট) আমি জায়নামাযে বসে ফজরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করছি। তখন দিন ১৮ ঘণ্টা দীর্ঘ এবং রাত মাত্র ৬ ঘণ্টা স্থায়ী। ৯টায় মাগরিবের নামায, আর ভোর তিনটায় ফজরের নামায। ফোন বাজলো। এ সময় কখনও ফোন আসে না। মনে করলাম, কেউ ভুলে ফোন করেছে, ছেড়ে দেবে। বেশ কয়েক মিনিট ফোন বাজতেই

www.bjilibrary.com

থাকলো। বিরক্ত হয়ে ফোন উঠালাম। পরম বন্ধু ড. জি. ডব্লিউ চৌধুরীর অতি পরিচিত গলা। বললেন, ঘুম ভাঙালাম নাকি? বললাম, "জেগেই ছিলাম। এ সময় ফোন আসার কথা নয় বলে দেরিতে উঠালাম। ব্যাপার কী?" ঢাকা থেকে মুজিব হত্যার খবর ফোনে পেয়ে সর্বপ্রথম আমাকে জানালেন। খুব বিস্মিত হলাম। ফজরের নামায শেষে রেডিও থেকে সঠিক খবর যোগাড় করতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলাম।

ফজরের নামাযে আমার ভাতিজা (যার বাড়িতে ছিলাম) রিয়াজুদ্দীন আহমদ ও আদরের নাতি শাহীন ছাড়াও একজন মেহমান জামায়াতে শরীক হন। তিনি হলেন অধ্যক্ষ শরীফুল ইসলাম (বর্তমানে মুহাম্মদপুর সেন্ট্রাল কলেজের প্রিন্সিপাল)। তিনি তখনও শিক্ষক সংগঠনের নেতা ছিলেন। সে হিসেবেই তিনি এক আন্তর্জাতিক শিক্ষক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। ঐ দিনই তাঁর ঢাকা রওয়ানা হয়ে আসার কথা ছিলো। তিনি ফিরবার পথে লন্ডন হয়ে আসছিলেন এবং আমি ঐ বাড়িতে থাকি বলে সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি আমার আত্মীয় এবং ছোট ভাই-এর মতো স্নেহভাজন। তাঁর নানা আমার দাদার মামাতো ভাই এবং গ্রামে একই পাড়ার অধিবাসী। তার আম্মা আমার প্রিয় ফুফু ছিলেন।

নামাযের পর তাঁকে বললাম, "খোকা! (তার ডাক নাম) আজ তোমার ঢাকা যাওয়া হচ্ছে না।" সে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললো, কেন, কী হয়েছে? আমার মুখে অপ্রত্যাশিত এতো বড় খবর শুনে সবাই রেডিও নিয়ে বসে গেলো। সর্বপ্রথম রাশিয়ার খবরে এর সত্যতা জানা গেলো। ভারতের রেডিও থেকে কিছুই বললো না। আমরা কেউ রেডিও থেকে সরে যেতে পারছিলাম না। দু'ঘণ্টা পর বিবিসি থেকে খবরটা জানার পর নিশ্চিত হলাম। এতো বড় ঘটনার পর কোন বিমান ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে না মনে করেই খোকাকে ঐ কথা বলেছিলাম।

১৬ আগস্টের পত্রিকা

১৬ আগস্টে প্রকাশিত লন্ডনের সকল দৈনিক পত্রিকায় শেখ মুজিবের একাধিক বড় বড় ফটোসহ বিস্তারিত খবর পড়ে জানতে পারলাম যে, সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টের লোকেরা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করেছে।

পত্রিকায় "Strange Public Reaction" শিরোনামে যা লেখা হয়েছে তাতে বুঝা গেলো যে, মুজিব হত্যায় জনগণ শোক প্রকাশ না করে আনন্দ-উল্লাস করেছে। উক্ত লেখার একাংশ নিম্নরূপ ঃ

It was the 15th August, Friday. Curfew was clamped on the capital city. To facilitate Friday prayers carfew was withdrawn for two hours. People in large number passed the streets in festive mood as if they were observeing a national festival.

অর্থাৎ ঐ দিনটি ১৫ আগস্ট শুক্রবার ছিলো। রাজধানী শহরে কারফিউ লাগানো ছিলো। শুক্রবারের নামাযের সুবিধার জন্য কারফিউ দু'ঘণ্টার জন্য উঠিয়ে নেওয়া হলো। জনগণ বিরাট সংখ্যায় উল্লাস প্রকাশ করে রাস্তায় চলছিলো, যেন তারা কোন জাতীয় উৎসব পালন করছে।

www.bjilibrary.com

১৬০.

মুজিব হত্যার পটভূমি

'৭১ সালে শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দি থাকাকালে এদেশের জনগণ তার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেছে ও রোযা মান্নত করেছে। ১৯৭৩ থেকে মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা এতো দ্রুত শূন্যের কোঠায় চলে যাওয়া সত্যিই এক মহাবিস্ময়। '৭৫-এর ১৪ আগস্ট দিবাগত শেষ রাতে তিনি স্ত্রী ও শিশুপুত্রসহ এমন নির্মমভাবে নিহত হওয়ার মতো চরম বেদনাদায়ক খবর শুনে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে জনগণ সামান্য শোক প্রকাশ করেছে বলেও জানা যায়নি। সর্বস্তরের জনগণ শুধু পরম স্বস্তির নিঃশ্বাসই ফেলেনি; ব্যাপকভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছে। এমন গণপ্রতিক্রিয়ার ফলেই শেখ মুজিবের অন্ধ প্রেমিকরাও দেশের কোথাও সামান্য প্রতিবাদ করার সাহস পায়নি। একমাত্র প্রতিবাদী কণ্ঠ আবদুল কাদের সিদ্দিকী (বঙ্গবীর খ্যাত) দেশের সীমানার বাইরে ভারতে গিয়ে প্রতিবাদ করেন।

শেখ মুজিবের এমন করুণ পরিণতির কারণ নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান লাভ করেছে। এ বিষয়ে তার অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারো নেই। ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপে যে পদ্ধতিতে দেশটি স্বাধীন হয়েছে আমার ধারণা যে, তিনি এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করেননি। তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে বিচ্ছিন্ন করতে অবশ্যই সচেষ্ট হতেন। সে উদ্দেশ্যেই তিনি '৭০ সালেই পূর্ব-পাকিস্তানের বদলে বাংলাদেশ নামকরণ করেন। তাই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধান স্থপতি হিসেবে ইতিহাস শেখ মুজিবুর রহমানকেই স্বীকৃতি দেবে।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিব দেশে ফিরে এসে জনগণের নয়নমণি হিসেবে রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা থাকলে তিনি তার বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর মন জয় করতে সক্ষম হতেন। এতো অল্প সময়ে চরম ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে গণধিকৃত হিসেবে এমন করুণ পরিণতির সম্মুখীন হতেন না।

শেখ মুজিবের ব্যর্থতার কারণ

প্রথম কারণ ঃ শেখ মুজিব রাষ্ট্র পরিচালনার নিরঙ্কুশ সুযোগ পাওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে আওয়ামী লীগের বিজয় হিসেবে গণ্য করেন। সরকারি কর্তৃত্বের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আওয়ামী লীগের লোকদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতাদের চেয়ে অন্যান্য মহলের লোকেরাই মুক্তিযুদ্ধে অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের কেউ আওয়ামী লীগের নেতা ছিলেন না।

হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার একাংশ সরাসরি আওয়ামী লীগের লোক ছিলেন। সর্বমহলের লোকই দেশকে স্বাধীন করার জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

তাই স্বাধীন বাংলাদেশের ঐ পরিবেশে শেখ মুজিব যদি আওয়ামী লীগ সরকারের বদলে জাতীয় সরকার গঠন করতেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যাদের যে ভূমিকা ছিলো এর ভিত্তিতে

www.bjilibrary.com

জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করতেন তাহলে হয়তো তিনি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ রেখে দেশগড়ায় এগিয়ে যেতে পারতেন। সরকারি ক্ষমতা আওয়ামী লীগের কুক্ষিগত রাখায় বহু মুক্তিযোদ্ধা সরকারবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়েছেন।

দ্বিতীয় কারণ ঃ শেখ মুজিব যাদেরকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তাদেরকে বিদ্রোহী হিসেবে গড়ে তুলেছেন বটে; কিন্তু তাদেরকে গণতান্ত্রিক নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি তার দলকে একটি ফ্যাসিবাদী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেন। পেশিশক্তি প্রয়োগ করে নিজের ও দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি তার মজ্জাগত। তার গোটা রাজনৈতিক জীবন এ কথার জীবন্ত সাক্ষী।

কতক উদাহরণ

১. ১৯৪৯ সালে মাওলানা আবদুল হামীদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর বিরাট অবদান ছিলো। অবিভক্ত ভারতে তিনি আসাম প্রদেশের মুসলিম লীগ সভাপতি ছিলেন।

বেঙ্গল মুসলিম লীগ সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশেম গ্রুপ ও খাজা নাযীমুদ্দীন-নূরুল আমীন গ্রুপে বিভক্ত ছিলো। ১৯৪৭ সালে কোলকাতায় বেঙ্গল মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির লিডার নির্বাচনে নাযীমুদ্দীন বিজয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু ঢাকায় মুসলিমলীগের যুব নেতাদের প্রায় সবাই সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশেমের ভক্ত হওয়ায় খাজা নাযীমুদ্দীন গ্রুপ তাদেরকে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কোন দায়িত্বে আসতে দেয়নি।

নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহর বংশধররা খাজা নাযীমুদ্দীন গ্রুপে মর্যাদার আসনে ছিলেন। এ গ্রুপ মাওলানা ভাসানীকেও কোন পাত্তা দিতে রাজি ছিলো না।

সোহরাওয়ার্দী–আবুল হাশেম গ্রুপের নেতারা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করেন।

পাকিস্তান আন্দোলনে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের প্রধান সংগঠক টাঙ্গাইলের শামসুল হককে এ দলের সেক্রেটারির দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ দলের পক্ষ থেকে সভাপতি মাওলানা ভাসানী ঘোষণা করেন, "খাজা নাযীমুদ্দীনের মুসলিম লীগ নওয়াব খাজাদের দল। জনগণ তাদের সাথে নেই। আমরা জনগণের মুসলিম লীগ গঠন করলাম।" জনগণ শব্দের আরবী হলো আওয়াম। তাই আওয়ামী মুসলিম লীগ নাম রাখা হলো। মুসলিম লীগের নেতৃত্বেই পাকিস্তান কায়েম হয়। সে সময় এ নামই জনপ্রিয় থাকায় অন্য কোন নামে দল গঠন না করে এ নামের সাথে আওয়ামী নাম যোগ করা হয়।

এ দলকে দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার তথাকথিত জননিরাপত্তা আইনে এ দলের সেক্রেটারিকে গ্রেপ্তার করে। সেক্রেটারি শামসুল হক কারাগারে বিনা বিচারে আটক থাকাকালে কিছু লোক ষড়যন্ত্র করে শামসুল হকের স্ত্রী অধ্যাপিকা আফিয়া খাতুনের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার ফলে শামসুল হক মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

এ অবস্থায় শেখ মুজিব কৌশলে আওয়ামী মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদটি দখল করেন। তখন শামসুল হকের ভক্তদের মুখে শুনেছি যে, ঐ ষড়যন্ত্রের পেছনে শেখ মুজিবের হাত অত্যন্ত সক্রিয় ছিলো।

www.bjilibrary.com

২. ১৯৫৪ সালে হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হয়। শেরে বাংলা ফযলুল হকের মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কোলকাতায় যেয়ে শেরে বাংলার আপত্তিজনক বক্তব্য দেবার অজুহাতে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী (বগরা) হক মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েম করেন। এরপর যুক্তফ্রন্টের প্রধান দু'দল শেরে বাংলার কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও আওয়ামী মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। সংসদের হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে শেরে বাংলার দল ক্ষমতাসীন হয়।

মাওলানা ভাসানী আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হলেও দলের সেক্রেটারি শেখ মুজিবুর রহমানই দলীয় কর্মীদের নেতৃত্ব দেন। মাওলানা ভাসানী রাজনৈতিক অঙ্গনে নেতৃত্ব দেন। আর শেখ মুজিব দলের সংগঠক ও দলীয় জনশক্তির পরিচালক ছিলেন। তাই দলের নিয়ন্ত্রণ শক্তি তারই হাতে ছিলো। তিনি যখনই যেখানে দলীয় শক্তি প্রয়োগ করতে চাইতেন তাতে বাধা দেবার সাধ্য কারো ছিলো না। নিজ দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপক্ষকে পেশিশক্তি প্রয়োগ করে শায়েস্তা করার জন্য সকল প্রকার কর্মই তার নিকট বৈধ ছিলো। তিনি অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে তাঁর দলীয় জনশক্তিকে এ ফ্যাসিবাদী শিক্ষাদান করতে সক্ষম হন।

১৯৫৬ ও ৫৭ সালে আওয়ামী লীগ (ইতোমধ্যে সংসদের হিন্দু সদস্যদের সমর্থনে ক্ষমতাসীন হওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের দাবি মেনে নিয়ে দলকে অসাম্প্রদায়িককরণের প্রয়োজনে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ উৎখাত করা হয় এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি দলীয় গঠনতন্ত্রে শামিল করা হয়) কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন থাকাকালে মাওলানা ভাসানী সরকারের আমেরিকা ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদে দল থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি গোটা পাকিস্তানের বামপন্থি নেতৃবৃন্দকে ঢাকায় সমবেত করে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তাঁর ফ্যাসিস্ট বাহিনী ন্যাপ গঠনের উদ্দেশ্যে সমবেত পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উপর ১৯৫৭ সালের ২৫ জুলাই বর্বর আক্রমণ চালায় এবং বিকেলে পল্টন ময়দানে ন্যাপের জনসভা বানচাল করে দেয়।

৩. ১৯৬৮ সালে আইয়ূবের স্বৈরশাসনবিরোধী PDM (Pakistan Democratic Movement) পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভার আয়োজন করে। শেখ মুজিব তখন জেলে। তাঁর যোগ্য অনুসারী তাজুদ্দীনের নেতৃত্বে আওয়ামী বাহিনী বিশাল ক্যানভাসে আঁকা শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে PDM-এর মঞ্চ দখল করে তারাই মাইকে বক্তৃতা দেন।

৪. ১৯৭০ সালের ১১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে সর্বপ্রথম বিশাল আকারে নির্বাচনী জনসভা করে। এ সভায় শেখ মুজিব প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তৃতা করেন। আগামী নির্বাচনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের দখলে আনতে হবে, এটাই তাঁর সারকথা। শেখ মুজিবের দল শুধু পূর্ব-পাকিস্তানেই আছে, পশ্চিম-পাকিস্তানে তার দলের কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের নেতা হিসেবে তিনি পাকিস্তানভিত্তিক রাজনীতির যোগ্যতা হারিয়েছেন। পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাভিত্তিক রাজনীতি অচল। সুতরাং পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার বাঙালিদের দখলে আনতে হলে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে পূর্ব-পাকিস্তানের সকল

www.bjilibrary.com

আসন আওয়ামী লীগকেই দখল করতে হবে। এ অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানে আর কোন দলকে রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া যায় না।

১৯৭০ সালের ১৮ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভা করার ঘোষণা শেখ সাহেবের সহ্য হওয়ার কথা নয়। তাই জামায়াতের জনসভার পোস্টার রাতে লাগালে সকালেই ছিঁড়ে ফেলার ব্যবস্থা করা হয় এবং মাইক পাবলিসিটিতে ব্যাপক হামলা করা জরুরি মনে করা হয়। জনসভায় গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েও যখন জনসভা পণ্ড করা গেলো না তখন ঢাকার কাদিয়ানী ডিসি পুলিশের সাহায্যে গুণ্ডাদেরকে ময়দানে ঢুকিয়ে আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য সফল করলেন।

৫. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর শেখ সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার কায়েম হয়। তার তৈরি আওয়ামী ফ্যাসিস্ট বাহিনী তখন সশস্ত্র। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তারা ভারত থেকে অস্ত্র ও ট্রেনিং পেয়ে আরও উগ্রমূর্তি ধারণ করেছে।

শেখ সাহেব তার বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশে আইনের শাসন কায়েম করতে ব্যর্থ হলেন। তার উগ্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। তার তৈরি লোকদের দ্বারা যে দেশ শাসন করা সম্ভব নয় তা প্রমাণিত হয়ে গেলো।

'৭০-এর নির্বাচনী বহু জনসভায় আমি শেখ মুজিবকে সম্বোধন করে বলেছি, "শেখ সাহেব! এ কথা মনে রাখবেন, গুণ্ডামি করে অন্য দলের সভা পণ্ড করা যায়, নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়, ক্ষমতা দখলও করা যায়, কিন্তু গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে দেশ শাসন করা যায় না। যারা পেশিশক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তারা এ কুঅভ্যাস ত্যাগ করতে পারে না।" দেশ শাসনে শেখ মুজিবের চরম ব্যর্থতার আসল কারণ এখানেই নিহিত।

শেখ মুজিবের কুশাসন

শেখ মুজিবুর রহমানের কুশাসনের কিছু খণ্ডচিত্র বিভিন্ন পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি। বিশিষ্ট ভাষা সৈনিক প্রখ্যাত রাজনীতিক ও মুক্তিযোদ্ধা জনাব অলি আহাদের লেখা 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-১৯৭৫' পুস্তক থেকে ঃ

প্রধানমন্ত্রী পদে শেখ মুজিব

"১১ জানুয়ারি (১৯৭২) টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। রিসিভার তুলিয়া একটি অতি পরিচিত কিন্তু অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। কণ্ঠস্বরটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদের। কলেজ জীবন হইতে বন্ধুত্ব কিন্তু কলিকাতায় প্রবাসী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আমাদের মত ভিন্নদলীয় জাতীয়তাবাদীদের সহিত শোভনীয় আচরণ প্রদর্শন করেন নাই। যাহা হউক, টেলিফোনে তাজুদ্দিন কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর আমাকে বলেন, শেখ সাহেবকে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছি ও প্রস্তাবও করিয়াছি। কারণ তিনি যেকোন পদেই বহাল থাকুন না কেন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাতেই রাষ্ট্রপ্রশাসন পরিচালিত হইবে। শেখ সাহেবের মানসিক গড়ন তুমিও জান; আমিও জানি। তিনি সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত। অতএব ক্ষণিকের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য পার্লামেন্টারি কেবিনেট পদ্ধতির প্রশাসন প্রহসনে পরিণত হইবে। তিনি প্রেসিডেন্ট পদে আসীন থাকিলে নিয়মতান্ত্রিক নাম-মাত্র দায়িত্ব পালন না করিয়া মনের অজান্তে কার্যতঃ ইহাকে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির প্রশাসনে পরিণত

www.bjilibrary.com

করিবেন। এদিকে প্রেসিডেন্ট পদে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে নির্বাচনের কথা ভাবিতেছি। তোমার মত কি?

তদুত্তরে তাঁহাকে বলি "তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক। নামমাত্র প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পালন শেখ সাহেবের শুধু চরিত্র বিরুদ্ধ হইবে না; বরং উহা হইবে অভিনয় বিশেষ। কেননা ক্ষমতার লোভ তাহার সহজাত।" তাজুদ্দিন টেলিফোনের অপর প্রান্তে সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "আমি জানিতাম, মৌলিক প্রশ্নে তোমার আমার মধ্যে মতভেদ হইবে না।"

১২ জানুয়ারির এক ঘোষণায় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ও শেখ মুজিবুর রহমান যথাক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন বটে; কিন্তু উত্তরকালে ঘটনা প্রবাহে বন্ধুবর তাজুদ্দিনের সদিচ্ছার শেষ রক্ষা হইল না। (পৃষ্ঠা : ৫৩৫-৫৩৬)

কল-কারখানার রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ কলমের এক খোঁচায় দেশের যাবতীয় কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইল। পূর্ব হইতে কোন ইনভেনটরি তৈয়ার না করিয়া প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে মিল কল-কারখানার পরিচালনার দায়িত্বভার দেওয়া হইল। অবশ্য পূর্বেই পরিত্যক্ত মিল কল-কারখানাগুলোতে প্রশাসক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। এদিকে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর কোন কোন মিল-কারখানার মালিকদের তাদের স্ব স্ব মিলের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা নামধারী শ্রমিকদের অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং সাবেক অভিজ্ঞ ও দক্ষ প্রশাসকদিগকে দালাল আখ্যাদান ও ভীতি প্রদর্শন মিল-কারখানার ব্যবস্থাপনাকে প্রহসনে পরিণত করে এবং সামগ্রিক উৎপাদনসমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অধিকাংশ কল-কারখানাই অযোগ্য প্রশাসক ও শ্রমিক নেতৃত্বের যোগসাজশে লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়। অবশ্য ইহাই ছিল স্বাভাবিক, কেননা যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং কল-কারখানা ধ্বংসের জন্য ভারতীয় মাড়োয়ারি গোষ্ঠী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে নানাভাবে লিপ্ত, তখন শেখ মুজিব এবং তাহার সরকার ত্যাগী, সচেতন ও সজাগ দেশপ্রেমিক শক্তিকে সুসংহত ও সংগঠিত না করিয়া সর্বনাশা সস্তা বুলির আশ্রয়ে আসর বাজিমাত করার তালে ছিলেন। আর তাই অন্য কিছু বিবেচনা ও বাস্তবতা বিচার না করিয়াই জাতীয় শিল্প ও অর্থনীতিকে কলমের এক খোঁচায় ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিতে তাহারা এতটুকু কুণ্ঠিত হন নাই। ভারতীয় অভিজ্ঞ নেতৃত্ব তাদের শিল্প-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার মতো সর্বনাশা পথ কেন মাড়ায় নাই, তাহা অনুধাবন করিবার মতো ধীশক্তি শেখ মুজিব কিংবা আওয়ামী লীগের কোন নেতার ছিলো না। তদুপরি ছিলো রুশপন্থিদের উসকানি। ফলত মুজিব সরকারের চরম অবিমৃশ্যকারিতাই দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া ফেলে। কথায় বলে, দেবদূতগণ যেখানে যাইতে সাহস পায় না মূর্খরা তড়িঘড়ি করিয়া সেখানে প্রবেশ করে।

যুব সমাজের অধঃপতন, দেশময় নৈরাজ্য

দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ও শ্রেণীর লোক মুক্তিযুদ্ধে শামিল হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ছাত্র সম্প্রদায়। "দাসত্ব বরণ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়"—এই ছিল ছাত্র সমাজের দৃঢ় পণ। দেশের স্বার্থে উৎসর্গিত-প্রাণ এই ছাত্রসমাজ ১৬ ডিসেম্বর

www.bjilibrary.com

(১৯৭১) বিজয় দিবসের পর হইতেই নেতৃত্বের চরিত্রহীনতা ও ভ্রান্তনীতির দরুন ত্যাগের মহিমা ও দেশপ্রেমের তাৎপর্য অনুধাবন করিবার মতো অনুকূল আবহাওয়া হইতে নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার কারণে যে নয় মাস তাহারা পড়াশুনা করিতে পারে নাই, সেই নয় মাস ছাত্র-সম্প্রদায় কর্তৃক ত্যাগ হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত ছিল এবং পরবর্তী শিক্ষা বছরের নির্ধারিত পরীক্ষায় তাহাদের যথারীতি অংশগ্রহণ করার মধ্যেই নিহিত ছিল জাতীয় স্বার্থ। পক্ষান্তরে সংক্ষিপ্ত কোর্সে পরীক্ষা দিলে বা বিজ্ঞান পরীক্ষায় প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ব্যতীত ডিগ্রি গ্রহণ করিলে অথবা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অজুহাতে ঢালাও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দাবি আদায় করিলে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হারাইয়া যায় অর্থাৎ ডিগ্রি অর্থহীন হইয়া পড়ে। জ্ঞানার্জনে বা বিদ্যা শিক্ষায় কোন সংক্ষিপ্ত পন্থা নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের নীতিহীনতার কারণে এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও শিক্ষা বিভাগীয় সুপণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী বলিয়া পরিচিত মহল এই সময়ে শিক্ষাঙ্গনে পরীক্ষা ক্ষেত্রে ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে কলঙ্কময় অধ্যায় সংযোজন করিয়াছেন, উহাই যে তরুণ সমাজের নৈতিক অধঃপতনের অন্যতম কারণ বিবেকবান মাত্রই তাহা স্বীকার না করিয়া পারিবেন না। বস্তুত অস্বীকার করার উপায়ও নাই যে, নীতিহীন নেতৃত্ব অস্ত্রের ঝনঝনানির নিকট শিক্ষাগুরুদের আত্মসমর্পণ, শিক্ষাঙ্গনে চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল ও জ্ঞানার্জন বিবর্জিত পরিবেশ সৃষ্টিতে একই শ্রেণীর মতলববাজ মহলের সায় ও উৎসাহ যুবসমাজকে অধঃপতনের আবর্তে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এবং শিক্ষাঙ্গনই যেহেতু এ দেশের নাগরিক সচেতনতার মূল কেন্দ্র, সুতরাং পরিণতিতে দেশময় নৈরাজ্য সৃষ্টিতে দেরি হয় নাই। (পৃষ্ঠা ৫৪১ ও ৫৪২)

পরিতাপের বিষয়, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাহার আওয়ামী লীগ সরকার অস্ত্র উদ্ধার কিংবা আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত নিজস্ব বেসরকারি লালবাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কিংবা ভারতের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত রক্ষীবাহিনীর যথেষ্ট অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ দূরে থাকুক, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসাহ দান করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এমনকি ডাকাতি, রাহাজানি, হত্যা, মারপিট, লুট, বলাৎকার, ছিনতাই, জবর-দখল ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত ও আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কিছুই করা সম্ভব হইত না। কেননা প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, শ্রমিক লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবর্গ এবং সংসদীয় সদস্যগণের নির্দেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ শুধু নয়; বরং বাংলাদেশ রাইফেলস এবং এমনকি সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হইত। প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার আর কাহাকে বলে? কথায় ও কাজে গরমিলের দরুন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অচিরেই আস্থা হারাইয়া ফেলেন। তাই তাহার আবেদন সত্ত্বেও অস্ত্রধারীরা অস্ত্র জমা দেয় নাই, অনেকে স্বীয় আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মারাত্মক মারণাস্ত্রেরও আপন আপন বৈশিষ্ট্য আছে, আর তাহা এই যে, মালিককে অনেকটা বেপরোয়া করিয়া তোলে।

এভাবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের স্বার্থে আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন এমনকি আইন-আদালত পর্যন্ত যথেচ্ছ ব্যবহৃত হইবার ফলে, আইন-কানুন ও প্রশাসনিক সদুদ্দেশ্য ও নিরপেক্ষতার উপর দেশবাসী ক্রমশ আস্থা হারাইয়া ফেলে। যেখানে আইনের শাসনের ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস, সেখানেই অবক্ষয়ের সূত্রপাত। আর কোথাও

www.bjilibrary.com

একবার অবক্ষয়ের সূত্রপাত হইলে তাহা সমাজের বিভিন্ন স্তরে অলক্ষ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। শান্তি ও স্বস্তি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি হয় অপসৃয়মাণ। নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে বাংলাদেশের প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা, অর্থনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন, মূল্যবোধ ও চরিত্র এক কথায় সর্বস্তরে এই অবক্ষয়ের দৌরাত্ম্যই পরিলক্ষিত হইত। প্রশাসন কর্মচারীরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় সর্বক্ষণ ম্রিয়মাণ থাকিতেন। "রাষ্ট্রপতি আদেশ-৯" সরকারি কর্মচারীদের সকল ক্ষমতা, নৈতিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, কর্ম উদ্যোগ ও উদ্যম অপহরণ করিয়া নিয়াছিল। ফলে গোটা প্রশাসন ব্যবস্থাই নতজানু প্রশাসনে পর্যবসিত হইয়া পড়িয়াছিল। (পৃষ্ঠা ৫৪৪ ও ৫৪৫)

১৬১.

আওয়ামী লীগের অবিবেচক রাজনৈতিক পদক্ষেপ

রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক অশান্তি হ্রাস বা দূরীকরণ দেশ ও জাতি গঠনের পূর্বশর্ত। হিন্দু মহাসভা ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী ছিলো। অতীত ভূমিকার সূত্র ধরিয়া পাকিস্তান সরকার হিন্দু মহাসভা কিংবা পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করে নাই; অথবা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাবিরোধী ভূমিকার কারণে কাহাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করে নাই। অথচ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে অপরিণামদর্শী বাংলাদেশ সরকার মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি; জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাবিরোধী রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রাজনৈতিক মতভেদপ্রসূত অতীত ভূমিকার দরুন হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে দালাল আইনে আটক করা হয়। অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির অভাবই উক্ত অবিমৃশ্যকারী পদক্ষেপের জন্য দায়ী। ভারতফেরতা শরণার্থী ও অস্ত্রধারীরা ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে অবস্থানকারী কোটি কোটি মানুষের বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগ আনে এবং স্বীয় ব্যক্তিগত, পরিবারগত ও গোষ্ঠীগত হীনস্বার্থ চরিতার্থ করিবার অপপ্রয়াসে গ্রাম-গ্রামান্তরে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ফলে জনতা হইয়া পড়ে হতোদ্যম, নিরাশ ও হতাশ। (পৃষ্ঠা : ৫৪৫)

শেখ মুজিবের দাসখত

বিরোধীদলীয় কণ্ঠ স্তব্ধ করার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দিল্লী গমন করেন এবং তথায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত ১৩ মে হইতে ১৬ মে পর্যন্ত এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। ১৬ মে স্বাক্ষরিত চুক্তি ও যুক্ত ইশতেহারে শেখ মুজিবুর রহমান কার্যত ভারতের নিকট বাংলাদেশের দাসখত দিয়া আসেন। যেমন—

১. বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বেরুবাড়ী এলাকা ভারতকে দান।

২. বৎসর শেষে বাংলাদেশের আটটি জেলার প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের চুক্তি ব্যতীতই ফারাক্কা বাঁধ চালু।

৩. পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলার মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগের অধিকার দান, অন্যকথায় বাংলাদেশের ভূমির উপর দিয়া করিডোর দান এবং

৪. ভারত-বাংলাদেশ যৌথ অর্থনৈতিক ভেনচার যথা— যৌথ-পাট কমিশন, যৌথ-শিল্প

www.bjilibrary.com

উদ্যম এবং ভারতীয় পণ্য ক্রয় নিমিত্ত আটত্রিশ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ তথা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল করার পরিকল্পনা প্রণয়ন। (পৃষ্ঠা : ৫৫৮)

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি

এদিকে জীবনযাত্রায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য মুজিব সরকারের ভ্রান্তনীতির দরুন সাধারণ ক্রেতার আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এক টাকার গামছার দাম হয় সাত টাকা, পাঁচ টাকার শাড়ির দাম হয় পঁয়ত্রিশ টাকা; তিন টাকার লুঙ্গি পনেরো টাকা বা কুড়ি টাকা, দশ আনা বা বারো আনা সেরের চাউল হয় দশ টাকা, আট আনা সেরের আটা ছয়/সাত টাকা, দুই আনা সেরের কাঁচামরিচ চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, তিন/চার টাকা সেরের শুকনা মরিচ আশি/নব্বই টাকা, আট আনা সেরের লবণ চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, পাঁচ টাকা সেরের সরিষার তৈল তিরিশ/চল্লিশ টাকা, সাত টাকা সেরের নারিকেল তৈল চল্লিশ/পঞ্চাশ টাকা, এক টাকা সেরের মসুরির ডাল আট/নয় টাকা, সাত টাকার লাঙল ত্রিশ/চল্লিশ টাকা, ছয় টাকার কোদাল তিরিশ টাকা, একশত সাতচল্লিশ/দেড়শত টাকা ভরি স্বর্ণ নয়শত/এক হাজার টাকা, পনেরো টাকার কাফনের কাপড় আশি-নব্বই টাকা, দেড় টাকার কাঁচা সাবান আট/নয় টাকা অর্থাৎ এক কথায় জীবনযাত্রার সার্বিক সংকট মানুষকে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করে।

মুদ্রাস্ফীতি ও কালো টাকা মুজিব সরকারের ব্যর্থতার কারণে ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছিলো, আর উহাই হইয়া দাঁড়াইয়াছিল সর্বগ্রাসী দুর্নীতির মূল। দুর্নীতি দমন আইন ও বিধি ছিল বটে; কিন্তু তাহা যেন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। মুজিব সরকারের শাসনদৃষ্টে যে কাহারও মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শাসক, শাসকের অনুগ্রহভাজন ও বিত্তবানদের জন্য এক প্রকার এবং শাসিত জনতা ও বিত্তহীনদের জন্য অন্য প্রকার, দেশে এই দুই প্রকার আইন প্রচলিত। তাই পূর্বে বর্ণিত কারণে শঙ্কিত, সর্বক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত সংশয়াপন্ন ও আড়ষ্ট প্রশাসনযন্ত্র কালো টাকায় বিত্তবান, আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তি, সশস্ত্র বেসরকারি বাহিনী ও তাহাদের আশ্রয়পুষ্ট এবং উপরতলার আশীর্বাদপুষ্ট অথচ জঘন্য অপরাধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে ইতস্তত করিত; পারতপক্ষে আইন প্রয়োগে বিরত থাকিত। ফলে আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনযন্ত্র এমনকি আইন আদালত পর্যন্ত অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে ঘটনারাজির পর্যালোচনা স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে, শেখ মুজিবের আমলে তদীয় সরকারের পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় সত্ত্বেও অমানিশার ঘোর কাটে নাই; অবহেলায় সুবর্ণ সুযোগ অতিবাহিত হইয়াছে; একটি রক্তক্ষয়ী বিপ্লব-প্রসূত মহাত্যাগ বৃথা গিয়াছে। (পৃষ্ঠা : ৫৪৬ ও ৫৪৭)

কলঙ্কময় অধ্যায় ঃ ব্যক্তিশাসন প্রতিষ্ঠা

আগেই বলিয়াছি, পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হইয়াছিল।

গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর গৃহীত সংবিধানটি সত্যায়ন (authenticate) করেন। গৃহীত এই সংবিধান মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরিতাপের বিষয়, নির্বাচন অবাধও হয় নাই; সুষ্ঠুও হয় নাই।

www.bjilibrary.com

১৯৭৩-এর মার্চের এই সাধারণ নির্বাচনে প্রশাসনিক ক্ষমতার মারাত্মক অপব্যবহার, চরম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ও দলীয় বাহিনীর যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও ঢালাও হুমকির সহায়তায় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান তিন শতটি আসনের মধ্যে দুই শত তিরানব্বইটি আসন দখল করেন। ইহা তাহার দ্বারা সাংবিধানিক গণতন্ত্র, নীতি ও আদর্শ তথা ঘোষিত রাষ্ট্রীয় আদর্শসমূহ লজ্ঘনের জ্বলন্ত উদাহরণ। ইহার ফলে সাংবিধানিক নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকার পরিবর্তনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনমনে মারাত্মক সন্দেহের উদ্রেক হয়। বস্তুত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের সর্বগ্রাসী উৎকট ক্ষমতালোভ ও তজ্জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জঘন্য অপব্যবহারের মানসিকতা দেশ ও জাতিকে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে নিক্ষেপ করে। এই সব পরিদৃষ্টে দেশী পত্র-পত্রিকাগুলিতে তো বটেই, ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধকালীন অবস্থায় যেসব বিদেশী পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল, তাহারাও মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দা ও সমালোচনামুখর তথ্যপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ করিতে থাকে। এবং এই সবই শাসকগোষ্ঠীর নাভিশ্বাসের কারণ হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কঠোর সমালোচনার পটভূমিকায় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী বলে দেশে একদলীয় শাসন প্রবর্তন করেন এবং ২৫ জানুয়ারিতে নিজেই একনায়কসুলভ শাসন পদ্ধতির প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার ফলাফল অবশ্যই শুভ হয় নাই। এক সামরিক অভ্যুত্থানে ১৪ আগস্ট দিবাগত রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে পরিবার-পরিজনসহ নিহত হন। (পৃষ্ঠা : ৫৪৭ ও ৫৪৮)

বাকশাল গঠন

যাহা হউক, জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্ষমতালোভী শেখ মুজিবুর রহমান তাহার পুতুল সংসদের সহায়তায় সকল রাজনৈতিক দল বাতিল ঘোষণা করিয়া ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠনের আদেশ জারি করেন। তদনুযায়ী ঃ ১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৩. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি, ৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, ৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ৬. বাংলা জাতীয় লীগ, ৭. বাংলাদেশ জাতীয় কংগ্রেস, ৮. বাংলাদেশ লেবার পার্টি, ৯. জাতীয় গণতন্ত্রী দল, ১০. জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, ১১. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, ১২. ইউনাইটেড পিপলস পার্টি, ১৩. কমিউনিস্ট পার্টি এবং ১৪. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯৭৫ সালের ২০ মে বাংলা জাতীয় লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কো), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও ইউনাইটেড পিপলস পার্টি অফিস তালাবদ্ধ করা হয়। শেখ সাহেব ইহাতেও ক্ষান্ত হইলেন না। নিজ শাসন পাকাপোক্ত করার হীন উদ্দেশ্যেই তিনি সকল সংসদীয় সদস্যকে ২৫ এপ্রিলের মধ্যে 'বাকশালে' যোগ দিবার ফরমান জারি করেন। অন্যথায় সংসদ সদস্যপদ বাতিল। বিরোধী জননেতা আতাউর রহমান খান ২৫ এপ্রিল সাংবাদিক সম্মেলনে বাকশালে যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলেও আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদ্বয় জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সংসদ সদস্যপদ ত্যাগ করা শ্রেয় মনে করেন। (পৃষ্ঠা : ৫৬২)

www.bjilibrary.com

নিম্নোক্ত অঙ্গসংগঠন গঠন করা হয় ঃ

জাতীয় কৃষক লীগ, সাধারণ সম্পাদক- ফনীভূষণ মজুমদার

জাতীয় শ্রমিক লীগ, সাধারণ সম্পাদক- অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী

জাতীয় মহিলা লীগ, সাধারণ সম্পাদক- বেগম সাজেদা চৌধুরী

জাতীয় যুবলীগ, সাধারণ সম্পাদক- তোফায়েল আহম্মদ

জাতীয় ছাত্রলীগ, সাধারণ সম্পাদক- শেখ শহিদুল ইসলাম

এবং নিম্নোক্তদের দ্বারা কার্যকরী সংসদ গঠন করেন ঃ

১. শেখ মুজিবুর রহমান- চেয়ারম্যান,

২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম,

৩. এম. মনসুর আলী সেক্রেটারি জেনারেল,

৪. খন্দকার মোশতাক আহমদ,

৫. আবুল হাসনাত মোঃ কামরুজ্জামান,

৬. আবদুল মালেক উকিল,

৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলী,

৮. শ্রী মনোরঞ্জন ধর,

৯. ড. মোজাফফর আহম্মদ চৌধুরী,

১০. শেখ আবদুল আজিজ,

১১. মহিউদ্দীন আহমদ,

১২. গাজী গোলাম মোস্তফা,

১৩. জিল্লুর রহমান- সেক্রেটারি,

১৪. আবদুর রাজ্জাক- সেক্রেটারি।

পক্ষান্তরে রাজনীতিবিদ, সমর নায়ক, শ্রমিক ও অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থা সরকারি-আধাসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি শিল্পী-সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক মহলগুলোতেও বাকশালে যোগদানের হিড়িক পড়িয়া যায়। এই সব সুবিধাবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পতাকা লইয়া ফুলের মালাসহ দলে দলে শেখ মুজিবের চরণ পূজা করিবার নিমিত্তে তাহার নিকট গমন করে। এমনকি একশ্রেণীর মা-বোনও বাদ যায় নাই। ইহাদের এই ব্যক্তি পূজার মানসিকতায় উৎসাহী হইয়া শেখ মুজিব একদলীয় শাসন টেকসই করার নিমিত্তে যে কোন ধরনের সমালোচনার কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করিবার অসৎ প্রয়াসে ১৯৭৫ সালের ১৭ জুন সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন বাতিল) অর্ডিন্যান্স জারি করেন এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি দৈনিক ব্যতীত সকল দৈনিক পত্রিকা বাতিল ঘোষণা করা হয়। ২৩ জুন (১৯৭৫) সারাদেশকে একষট্টি জেলায় বিভক্ত করিয়া ১৬ জুলাই তারিখে একষট্টি জন গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের সর্বব্যাপক অবাধ দুর্নীতি, রাহাজানি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুণ্ঠন, পাচার, গুম, খুন, দেশবাসীকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সরকারের ব্যর্থ প্রশাসনিক অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক পলিসি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ভারতীয় অর্থনীতির যোগানদার অর্থনীতিতে পরিণত করে, দেখা দেয় এক বিষময় ফল।

www.bjilibrary.com

পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রেতা-সাধারণের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। ক্ষেত-খামারে, কল-কারখানায় উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। ফলে কারখানার কাঁচাপাটের গুদামে শুরু হয় অগ্নিসংযোগ ও স্যাবোটেজ। সর্বত্র দেখা দেয় ভোগ্যপণ্যের তীব্র অভাব; ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যুবরণ করে অসংখ্য দেশবাসী। বিরোধী কণ্ঠকে বিনা বিচারে আটক করার নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন ও ইহার যথেচ্ছ ব্যবহারেও পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হইয়া শেখ মুজিব দেশব্যাপী ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং তদনুসারে জরুরি আইন প্রণয়ন করা হয়। এভাবেই নিজ বুদ্ধির দোষে নিজ কর্মদোষে শেখ মুজিব ও তাহার আওয়ামী লীগ সমগ্র বাঙালি জনতার দুশমনে পরিণত হইতে থাকেন। যে মুজিব ১৯৬৯-'৭০, '৭১ ও '৭২ সালে ছিলেন বাঙালির নয়নমণি, তিনিই ১৯৭৩-'৭৪ সালে রূপান্তরিত হইলেন বাঙালির চোখের বিষে। একদা যিনি ছিলেন জনতার কাতারে, তিনি ক্ষমতা ও কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখার অদম্য স্পৃহায় ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানে ৪র্থ সংশোধনী সংযোজন দ্বারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া এক দলের এক নেতা হিসেবে রাজনৈতিক মঞ্চে আর্বির্ভূত হইলেন। তাহার নিজস্ব ক্ষমতার লোভ ও একশ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন নেতা ও রাজনৈতিক কর্মী, নীতিহীন বুদ্ধিজীবী ও চরিত্রহীন টেন্ডলের যোগসাজশে বাংলার সর্বত্র নগরে, বন্দরে, কল-কারখানায়, গ্রামে-গঞ্জে, ক্ষেতে-খামারে দিল্লীর দাসেরা আওয়াজ উঠাইতে থাকে ঃ "এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ।" (পৃষ্ঠা ৫৬৬ ও ৫৬৭)

আবুল মনসুর আহমদের আন্তরিক প্রচেষ্টা

প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক জনাব আবুল মনসুর আহমদ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তাবিদ ছিলেন। একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক হিসেবে তিনি সর্বমহলেই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান জনাব আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভার সদস্য হবার অল্পদিন পরই কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী হিসেবে যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি ছিলেন। সর্বদিক দিয়ে তিনি শেখ মুজিবের মুরুব্বীস্থানীয় ছিলেন। চাটুকার পরিবেষ্টিত শেখ মুজিবের এটা বিরাট সৌভাগ্য যে, তার মতো একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ও ধীরস্থির পরম শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক পেয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে আবেগপ্রবণ শেখ মুজিব যখন হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, তখন জনাব আবুল মনসুর আহমদ মৌখিক ও দৈনিক ইত্তেফাকের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার জন্য প্রতিটি ইস্যুতেই চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ পথনির্দেশমূলক উপদেশ দিতেন। আমি লন্ডনে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, শেখ মুজিবের সমর্থক ও বিরোধীরা ফটোকপি করে তার লেখা বিলি করতো। তার এসব লেখা পড়ে তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ করতাম। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে দেশে ফিরে আসার পর তার সাথে দেখা করতে গেলাম। তিনি তখন শয্যাগত অবস্থায় ছিলেন। তার সাথে হাত মিলাতেই তিনি শায়িত অবস্থায়ই আমাকে টেনে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি তার স্নেহপরায়ণতায় অভিভূত

www.bjilibrary.com

হলাম। তার স্ত্রী পাশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্নেহমাখা হাসিতে আমাকে আপ্লুত করলেন। লন্ডনে তার লেখার জনপ্রিয়তার কথা শুনালাম। তিনি আফসোস করে বললেন, "যাদের কল্যাণ কামনা করে লিখলাম তারা যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করতো তাহলে দেশের ইতিহাস ভিন্ন হতো।"

তার লেখা 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' নামক বিরাট গ্রন্থ থেকে কতক উদ্ধৃতি পেশ করছি, যা তার আন্তরিকতা, দেশপ্রেম, গণতন্ত্রপ্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রকাশ পায়। ১৯৭৩ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ

নির্বাচনে আশা-প্রত্যাশা

এই নির্বাচনটা ছিল বাংলাদেশের পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রথম পদক্ষেপ। আওয়ামী লীগই দেশকে এই পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সংবিধান দিয়াছে। হঠাৎ দেয় নাই, কারো চাপে পড়িয়াও দেয় নাই। আওয়ামী লীগ আজন্ম পার্লামেন্টারি পদ্ধতির দৃঢ় সমর্থক। সেই কারণেই তারা দেশকে পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা দিয়াছেন। তারা বিশ্বাস করেন, পার্লামেন্টারি পদ্ধতিই বাংলাদেশের জন্য একমাত্র উপযুক্ত পন্থা।

কাজেই আসন্ন নির্বাচনে যাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপিত হয়, সে চেষ্টা আওয়ামী লীগেরই করা উচিত ছিলো। তাদের বোঝা উচিত ছিলো, পার্লামেন্টারি পদ্ধতির অসাফল্য কার্যত আওয়ামী লীগেরই অসাফল্যরূপে গণ্য হইবে।

পার্লামেন্টারি পদ্ধতির ভিত্তিস্থাপন মানে বিরোধী দলের যথেষ্টসংখ্যক ভালো মানুষ নির্বাচিত হউন, সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। সে দৃষ্টিতে যথেষ্ট উদারতা ও সহিষ্ণুতা আবশ্যক। রাজনৈতিক হরিঠাকুর হিসেবে আমি আওয়ামী নেতাদের কাউকে কাউকে আগে হইতেই উপদেশ দিয়াছিলাম। মুখে মুখেও দিয়াছিলাম, 'ইত্তেফাকে' একাধিক প্রবন্ধ লিখিয়াও তেমন উপদেশ দিয়াছিলাম। আমি এ বিষয়ে বিশেষ নজর রাখিবার উপদেশ দেওয়া দরকার মনে করিয়াছিলাম দুইটি কারণে। প্রথমতঃ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই সংগ্রামের মধ্য দিয়া দেশ স্বাধীন হইয়াছে। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার মধ্যে গোটা জাতির একটা ভাবাবেগ মিশ্রিত আছে। দ্বিতীয়তঃ আওয়ামী লীগ নৌকাকেই তাদের নির্বাচনী প্রতীক করিয়াছেন। নৌকা-প্রতীকের সাথে বাংলাদেশের ভোটারদের মধ্যে ভাবাবেগের ঐতিহ্য আছে। '৭০ সালের নির্বাচনে এই প্রতীক লইয়াই আওয়ামী লীগ এমন বিপুল জয়লাভ করিয়াছিলো। তার আগে শেরে বাংলার নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ঐ নৌকা প্রতীক দিয়াই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করিয়াছিলো।

কাজেই নির্বাচনে সরকারি দল আওয়ামী লীগের বিরোধী দলের প্রতি উদার হওয়া উচিত ছিলো। উদার হইতে তারা রাজিও ছিলেন। রেডিও-টেলিভিশনে বিরোধী দলসমূহের নেতাদের বক্তৃতার ব্যবস্থা করিতেও তাদের আপত্তি ছিলো না। কিন্তু পর পর কতকগুলো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য আওয়ামী নেতারা কঠিন হইয়া পড়িলেন।

সরকারি দল হিসেবে দেশের সমস্ত দুর্দশা-দুর্ভাগ্যের জন্য সরকার দায়ী, এই মনোভাব হইতে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা হারাইবার যথেষ্ট কারণ তো ছিলোই, তার উপর

www.bjilibrary.com

বছরের শুরুতেই ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারিতেই, ভিয়েতনাম উপলক্ষে ছাত্রদের মিছিলের উপর গুলি চালানোর দরুন দুইজন ছাত্র নিহত ও অনেক আহত হয়। পরদিন দেশব্যাপী হরতাল হয়। ফলে দৃষ্টতই আওয়ামী লীগ ছাত্রদের মধ্যে জনপ্রিয়তা হারায়। মোজাফফর ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নই সরকারবিরোধী এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেছিলো। এই কারণেই ছাত্রলীগের লোকেরা ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের অফিস পোড়াইয়া দিয়াছে বলিয়া খবর বাহির হয়। তাতেও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ন হয়। এই অজনপ্রিয়তা প্রসারিত হয় মফস্বলে সরকারের বর্ডার প্যাক্ট ও পাটনীতি উপলক্ষ করিয়া।

হিসাবে ভুল

এই দৃশ্যমান অজনপ্রিয়তার অতিরঞ্জিত ওভার এস্টিমেট করিলেন উভয়ই। আওয়ামী লীগাররা ঘাবড়াইলেন। আর বিরোধী পক্ষ উল্লসিত হইলেন। পার্লামেন্টারি রাজনীতির খাতিরে আওয়ামী নেতৃত্ব নির্বাচনে কিছুটা উদার হওয়ার যে ইচ্ছা করিতেছিলেন, পরিস্থিতির এই অতিরঞ্জিত ভুল অর্থের ফলে সে মতের পরিবর্তন হইলো। অপরদিকে বিরোধী দলসমূহের মধ্যে একটা যুক্তফ্রন্ট গড়িয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছিলো তা ভণ্ডুল হইয়া গেলো। ভাবখানা এই যে, আওয়ামী লীগ যেখানে এমনিতেই হারাইয়া যাইতেছে, সেখানে বিরোধী পক্ষের ঐক্য ফ্রন্ট করিবার দরকারটা কি? বিরোধী দলসমূহের আস্থা ও জয়ের আশা এমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিলো যে, একুশের জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যখন বিশেষ করিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিবার জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক জনসভা করিতেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে সর্বদলীয় বিরোধী নেতা মাওলানা ভাসানী সাহেব পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভায় সরকারবিরোধী বক্তৃতা করিতেছিলেন। একই সময়ে এই দুই সভায় দুই জনপ্রিয় নেতা বক্তৃতা করায় কোন্ সভায় বেশি লোকসমাগম হইয়াছিলো, তাহা লইয়া তর্ক পর্যন্ত বাধিয়াছিলো।

এমন অবস্থায় একদিকে আওয়ামী লীগ নির্বাচনী প্রচারে আরও বেশি জোর দিলেন। অপরদিকে বিরোধী দলসমূহের কোন্ দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হইবেন, তাহা লইয়া তাহারা বিতর্কে অবতীর্ণ হইলেন। স্মরণযোগ্য যে, এই সময়ে কথা উঠিয়াছিলো স্বয়ং মাওলানা ভাসানীও নির্বাচনে দাঁড়াইবেন। বিরোধী দল নির্বাচনে জয়লাভ করিলে জনাব আতাউর রহমান খাঁ-ই প্রধানমন্ত্রী হইবেন, অধিকাংশ দলের মতে এটা ঠিক হইয়াই ছিলো। আওয়ামী লীগের কল্পিত আনপপুলারিটি যখন বিরোধী দলসমূহের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলো, তখন মাওলানা সাহেবের দলের এক নেতা প্রকাশ্যভাবেই বলিয়া ফেলিলেন যে, মাওলানা সাহেবের জনপ্রিয়তার সুযোগ লইয়া যেইখানে বিরোধী দল নির্বাচনে জিতিতেছে, সেইখানে মাওলানা সাহেব প্রধানমন্ত্রী না হইয়া অপরে প্রধানমন্ত্রী হইবেন কেন?

আমি কিন্তু ঘরে বসিয়াই স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম, আওয়ামী লীগের ডর ও বিরোধী দলের আশা দুইটাই অমূলক। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ মেজরিটিই পাইবে। আওয়ামী বন্ধুদের কাছে মুখে মুখে যেমন এ কথা বলিতেছিলাম, কাগজেও তেমনি লিখিতেছিলাম ঃ 'আওয়ামী লীগ শুধু আসন্ন নির্বাচনেই নয়' আগামী পঁচিশ বছরের নির্বাচনে জিতিবে এবং দেশ শাসন করিবে। আমি এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ শাসনকে ভারতের কংগ্রেসের পঁচিশ বছরের আমলের সাথে তুলনা করিয়াছিলাম। লিখিয়াছিলাম,

www.bjilibrary.com

নেহরু-নেতৃত্বের কংগ্রেসের মতো মুজিব-নেতৃত্বের আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের পথে দৃঢ় থাকিলেই এটা অতি সহজ হইবে।

এই বিশ্বাসে আমি আওয়ামী নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়াছিলাম, বিরোধী পক্ষের অন্তত জন-পঞ্চাশেক নেতৃস্থানীয় প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করিতে দেওয়া উচিত। তাহাতে পার্লামেন্টে একটি সুবিবেচক গণতন্ত্রমনা গঠনমুখী অপজিশন দল গড়িয়া উঠিবে।

আমার পরামর্শে কেউ কান দিলেন না। বিরোধী দলসমূহের ঐ নিশ্চিত বিজয় সম্ভাবনার উল্লাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে অমন উদার হওয়াটা বোধ হয় সম্ভবও ছিলো না। রেডিও-টেলিভিশনে অপজিশন নেতাদের বক্তৃতা দূরের কথা, যানবাহনের অভাবে তাহারা ঠিকমতো প্রচার চালাইতেও পারিলেন না। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব হেলিকপ্টারে দেশময় ঘূর্ণিঝড় টুওর করিতে লাগিলেন। মন্ত্রীরাও সরকারি যানবাহনের সুবিধা নিলেন।

অপজিশনের স্বপ্ন টুটিলো। মাওলানা সাহেব অসুস্থ হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইলেন। প্রধানমন্ত্রী তাহার সাথে হাসপাতালে দেখা করিয়া তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া সর্বশেষ তুরুপ মারিলেন। নির্বাচনে অপজিশনের ভরাডুবি হইলো। (পৃষ্ঠা : ৬২৪-৬২৬)

১৬২.

নির্বাচন ফল ও কুফল

"৭ মার্চ নির্বাচন হইলো। ৩০০ সিটের মধ্যে ২৯২টি আওয়ামী লীগ ও মাত্র ৭টি অপরপক্ষ পাইলো। একটি সিটে একজন প্রার্থী মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ায় তার নির্বাচন পরে হইলো। সেটিও আওয়ামী লীগই পাইলো। বিরোধী পক্ষের ৭টির মধ্যে জাসদের ৩, জাতীয় লীগের ১ ও নির্দলীয় ৩ জন নির্বাচিত হইলেন। দুইটি ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি কোন সিট পাইলো না। জাতীয় লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান খাঁ নির্বাচিত হইয়া তাহার পার্টির নামটা জীবন্ত রাখিলেন। পরে নির্বাচিত মেম্বরদের ভোটে যে ১৫টি মহিলা আসনের নির্বাচন হইলো তাহার সব কয়টি অবশ্যই আওয়ামী লীগই পাইলো। এইভাবে পার্লামেন্টের ৩১৫ জন মেম্বারের মধ্যে ৩০৮ জনই হইলেন আওয়ামী লীগের। মাত্র ৭ জন হইলেন অপজিশন।

এতে আওয়ামী-নেতৃত্বের আরও বেশি সাবধান হওয়া উচিত ছিলো। সে কর্তব্য অবশ্য শুরু হইয়াছিলো আগেই, নির্বাচন চলাকালেই। গোড়ার দিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে উভয়পক্ষের ভ্রান্ত ধারণা থাকার দরুন আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব উদার হইতে পারেন নাই। কিন্তু নমিনেশন পেপার বাছাইয়ের দিনেই আওয়ামী লীগের বিপুল জয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলো। শেখ মুজিব দুটি আসন হইতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। আওয়ামী লীগের আরও ৭ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইলেন। এই সময়ে আওয়ামী নেতৃত্বের উদার হওয়ার কোনও অসুবিধা বা রিস্ক ছিলো না। বিরোধী দলসমূহের প্রার্থীদের মধ্যে জনাব আতাউর রহমান খাঁ, প্রফেসর মোজাফফর আহ্মদ, ডা. আলিমুল রাযী, জনাব নূরুর রহমান, রাজশাহীর মি. মজিবুর রহমান, জনাব অলি আহাদ, মি. সলিমুল হক খান মিল্কী, মি. আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, মি. যিল্লুর রহিম,

www.bjilibrary.com

হাজী মোহাম্মদ দানেশ, মি. বযলুস সাত্তার প্রমুখ জনপঁচিশেক অভিজ্ঞ সুবক্তা পার্লামেন্টারিয়ানকে জয়ী হইতে দেওয়া আওয়ামী লীগের ভালোর জন্য উচিত ছিলো।

তিন'শ পনেরো সদস্যের পার্লামেন্টে জনপঁচিশেক অপজিশন মেম্বার থাকিলে সরকারি দলের কোনই অসুবিধা হইতো না; বরঞ্চ ঐ সব অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান অপজিশনে থাকিলে পার্লামেন্টের সৌষ্ঠব ও সজীবতা বৃদ্ধি পাইতো। তাহাদের বক্তৃতা বাগ্মিতায় পার্লামেন্ট প্রাণবন্ত, দর্শনীয় ও উপভোগ্য হইতো। সরকার দলও তাহাতে উপকৃত হইতো। তাহাদের গঠনমূলক সমালোচনার জবাবে বক্তৃতা দিতে গিয়া সরকারি দলের মেম্বাররা নিজেরা ভালো ভালো দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ান হইয়া উঠিতেন। বাংলাদেশের পার্লামেন্ট পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের একটা ট্রেনিং কলেজ হইয়া উঠিতো। আর এসব শুভ পরিণামের সমস্ত প্রশংসা পাইতেন শেখ মুজিব।

আওয়ামী-নেতৃত্বের ভ্রান্তনীতি

কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য এই যে, শেখ মুজিব এই উদারতার পথে না গিয়া উল্টা পথ ধরিলেন। এই সব প্রবীণ ও দক্ষ পার্লামেন্টারিয়ানকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করিলেন। জনাব আতাউর রহমানকে হারাইবার জন্য আওয়ামী-নেতৃত্ব যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, সেটাকে কিছুতেই নির্বাচন প্রচারণার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নীতি বলা যায় না। বরঞ্চ আমার বিবেচনায় সেটা ছিলো খোদ আওয়ামী লীগের জন্যই আত্মঘাতী। তার মতো ধীরস্থির অভিজ্ঞ গঠনাত্মক চিন্তাবিদ পার্লামেন্টের অপজিশন বেঞ্চের শুধু শোভা বর্ধনই করেন না, সরকারকে গঠনমূলক উপদেশ দিয়া এবং গোটা অপজিশনকে পার্লামেন্টারি রীতি-কানুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিয়া পার্লামেন্টারি পদ্ধতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এমন একজন ব্যক্তিকে পার্লামেন্টে ঢুকিতে না দিবার সর্বাত্মক চেষ্টা আওয়ামী নেতৃত্ব কেন করিলেন, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি নাই। কারণ এমন চেষ্টা যে মনোভাবের প্রকাশ, সে মনোভাব পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সাফল্যের অনুকূল নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অভিজ্ঞ ও প্রবীণ পার্লামেন্টারি নেতা কিছুতেই এমন আত্মঘাতী নীতির সমর্থক হইতে পারেন না। যদি খোদা-না-খাস্তা শেখ মুজিব কোনও দিন তেমন মনোভাবে প্রভাবিত হন, তবে সেটা হইবে দেশের জন্য চরম অশুভ মুহূর্ত।

কিন্তু আমি দেখিয়া খুবই আতঙ্কিত ও চিন্তাযুক্ত হইলাম যে, নির্বাচন চলাকালে আওয়ামী নেতৃত্ব অপজিশনের প্রতি যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেটা সাময়িক অবিবেচনাপ্রসূত ভুল ছিলো না। তারা যেন নীতি হিসেবেই এই পন্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নির্বাচনের ফলে অপজিশন একরূপ শূন্যের কোঠায় পৌছিয়াছিলো। কয়েকটি দলের এবং নির্দলীয় মেম্বার মিলিয়া শেষ পর্যন্ত তাহারা হইলেন মাত্র ৮ জন। অপজিশন ছাড়া পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই এই ছিন্ন ভিন্ন অপজিশনকে লালন করিয়া আমাদের আইনসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেন্টের রূপ ও প্রাণ দিবার চেষ্টা শাসক দলেরই অবশ্য কর্তব্য ছিলো। শাসক দল সে কর্তব্য পালন তো করিলেনই না, ভিন্ন ভিন্ন দলের মেম্বাররা নিজেরাই যখন একত্রিত হইয়া জনাব আতাউর রহমানকে লিডার নির্বাচন করিলেন, তখনও সরকারি দল তাহাকে লিডার অব দি অপজিশন স্বীকার করিলেন না। নির্বাচনের পরে নয় মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হইয়াছে। এর মধ্যে

www.bjilibrary.com

পার্লামেন্টের দুই-দুইটা অধিবেশনও হইয়া গিয়াছে। তবু আমাদের পার্লামেন্টে কোন লিডার অব দি অপজিশন নাই। তার মানে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সুপ্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতি অনুসারে আমাদের আইনপরিষদ আজও পার্লামেন্ট হয় নাই। যাহা হইয়াছে সেটা আসলে একদলীয় আইনসভা। এটা নিশ্চিতরূপে অশুভ। প্রশ্ন জাগে ঃ আমরা কি একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত হইতেছি? কিন্তু তা বিশ্বাস করিতে মন চায় না। কারণ এটা শুধু আওয়ামী লীগের বিঘোষিত মূলনীতিবিরোধীই নয়, তার নির্বাচনী প্রতীক নৌকারও তাৎপর্যবিরোধী। নৌকা চালাইতে যেমন দুই কাতারের দাঁড়ি লাগে, গণতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালনায়ও তাই লাগে। যদি কোনও দিন নৌকার সব দাঁড়ি এক পাশে দাঁড় টানিতে শুরু করে, তবে সেদিন নৌকা আর যানবাহন থাকিবে না। হইবে সেটা মিউজিয়ামের দর্শনীয় বস্তু। (পৃষ্ঠা : ৬২৬-৬২৯)

জাতীয় ক্ষতিকর বিভ্রান্তি

এইসব বিভ্রান্তির মধ্যে প্রধান এই ঃ 'বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।' এটা সাংঘাতিক মারাত্মক বিভ্রান্তি। অন্যান্য ক্ষতিকর বিভ্রান্তি মোটামুটি এটা হইতেই উদ্ভূত। এই বিভ্রান্তির সর্বপ্রথম ও প্রত্যক্ষ কুফল এই যে, এতে ভারত সরকারকে নাহক ও মিথ্যা বদনাম পোহাইতে হইতেছে। পাকিস্তান যদি ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে ভারতই ভাঙ্গিয়াছে। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হাসিলে ভারত সরকার সক্রিয় ও সামরিক সাহায্য করিয়াছেন। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' যদি মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া থাকে, তবে '৪৭ সালের ভারত বাঁটোয়ারার আর কোনও জাস্টিফিকেশন থাকিতেছে না। কোরিয়া, ভিয়েতনাম ও জার্মানির মতোই ভারতেরও পুনর্যোজনের চেষ্টা চলিতে পারে। ভারতবর্ষের বেলায় সে কাজে বিলম্ব ঘটিলেও বাংলার ব্যাপারে বিলম্বের কোন কারণ নাই। উপমহাদেশের স্থায়ী শান্তি স্থাপনের পক্ষে এই ধরনের কথা ও চিন্তা যে কত মারাত্মক, 'বিদগ্ধ' পণ্ডিতেরা তা না বুঝিলেও ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্র নায়করা তা বুঝিয়াছেন। তাই উভয় পক্ষই কালবিলম্ব না করিয়া এ বিষধর সাপের মাথা ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। ভারত সরকার এক মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া পশ্চিম প্রান্তে একতরফাভাবে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করিয়া পাকিস্তানের দিকে মৈত্রীর হাত বাড়াইয়াছেন। ওদিককার দখলিত ভূমি ও যুদ্ধবন্দি ছাড়িয়া দিয়াছেন। আর এদিকে বাংলাদেশকে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়াছেন। বাংলাদেশের মাটি হইতে ভারতীয় সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করিয়াছেন। বাংলাদেশের সাথে মৈত্রী ও বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছেন। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের মেম্বর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এদিকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম সুযোগেই ঘোষণা করিয়াছেন, "বৃহত্তর বাংলা গঠনের কোনও ইচ্ছা আমার নাই। পশ্চিমবঙ্গ ভারতেরই থাকিবে। আমার দেশের বর্তমান চৌহদ্দি লইয়াই আমি সন্তুষ্ট। অন্যের এক ইঞ্চি জমিও আমি চাই না।"

বাংলাদেশ-নেতৃত্ব আরো একটা ভালো কাজ করিয়াছেন। বাঙালি জাতির সংখ্যাসীমা নির্দেশ করিয়াছেন সাড়ে সাত কোটি। এটা সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের লোকসংখ্যা। এই ঘোষণার দরকার ছিলো। আমাদের বাঙালি জাতীয়তার মূলনীতিতে ভারতের আতঙ্কিত হইবার কারণ ছিলো। ভারতে পাঁচ-ছয় কোটি নাগরিক আছেন, যাহারা গোষ্ঠী, গোত্র ও ভাষায় বাঙালি। ইহারা এককালে ছিলেন সারা ভারতের চিন্তানায়ক। রাজনীতিতেও

www.bjilibrary.com

তাহারা সারা ভারতকে নেতৃত্ব দিয়াছেন। বিশ শতকের তৃতীয় দশকে কংগ্রেস-নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তা গ্রহণ করিবার আগেতক ইহারা বাঙালি জাতীয়তার, বাঙালি কৃষ্টির, বাংলার স্বাতন্ত্র্যের মুখর প্রবক্তা ছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর উপলব্ধিতে সেদিনকার সেই বাঙালি ভাষাবেগের অবলুপ্তি ঘটিয়াছে কি-না, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তাই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় এবং সে রাষ্ট্রের বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্লোগানে ভারতীয় বাঙালিদের মধ্যে 'যুক্তবাংলা' ও 'বৃহত্তর বাংলা'র আকর্ষণে বিভ্রান্তি ঘটা অসম্ভব নয়। এমনিতেই পূর্ব-ভারতে একটু অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। তাহার উপর বাঙালি জাতীয়তার আবেগের ছোঁয়াচ লাগিতে দেওয়া উচিত হইবে না। এই কারণেই বাঙালি জাতীয়তার ব্যাপারে ভারত একটু সতর্ক। আমাদের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির এক নীতি জাতীয়তায় তাই ভারত সরকারের অনীহা। ভারত সরকারের দলিল-দস্তাবেজে, নেতা-মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতিতে আমাদের মূলনীতির তিনটার উল্লেখ থাকে। জাতীয়তাবাদের উল্লেখ থাকে না। বাংলাদেশের নেতৃত্ব ভারত সরকারের ও ভারতীয় নেতৃত্বের এই ইশারা বুঝিয়াছেন। তাই ঐ 'সাড়ে সাত কোটি বাঙালি'র উল্লেখ। বস্তুত ভারতীয় বাঙালিরা আর রাজনৈতিক অর্থে নেশন নন। তারা এখন ভারতীয় নেশন। বাঙালির পলিটিক্যাল নেশনহুডের ওয়ারিসি এখন ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশের উপর বর্তাইয়াছে।

লেজের বিষ

উভয় রাষ্ট্রের এ সুস্পষ্ট দৃঢ়তার লগুড়াঘাতে বিভ্রান্তির সাপের মাথাটা গুঁড়া হইয়াছে সত্য। কিন্তু সাপ আজও তার লেজ নাড়িতেছে এবং সাপের বিষ লেজে। তাই উভয় রাষ্ট্রের কোন কোন অরাজনীতিক ও 'বিদগ্ধ' বুদ্ধিজীবীরা 'পাকিস্তান ভাঙা' 'দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যর্থতা'র একাডেমিক ও থিওরেটিক্যাল 'নির্ভুলতা' আজও কপচাইয়া যাইতেছেন। এই সব বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধিসহ মন-অন্তর ও কলিজা দগ্ধ হইলেও তাহাদের মুখটা দগ্ধ হইতে এখনও বাকি আছে। তাই তাহাদের মুখে 'শাশ্বত বাংলা', 'প্রবহমান বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'হাজার বছরের বাংলা', 'গুরুদেবের বাংলা', 'বাংলার কৃষ্টি', 'বাংলার ঐতিহ্য' ইত্যাদি নিতান্ত ভাবাবেগের কবিত্বপূর্ণ কথাগুলিও রাজনৈতিক চেহারা লইয়া দেশে-বিদেশে বিষ ছড়াইতেছে। আমাদের দিক হইতেও 'বঙ্গবন্ধু', 'জয় বাংলা', 'সোনার বাংলা', 'কবিগুরুর বাংলা', 'রূপসী বাংলা' ইত্যাদি প্রতিধ্বনি করিয়া 'এপার বাংলা-ওপার বাংলা'র ব্যাপারটাকে দুইটা স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের সীমান্তরেখা মসিলিপ্ত হইতে দিতেছি। আমাদের বিশেষ পরিস্থিতি ও অবস্থা, আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত ও ভারতীয় জাতীয় সঙ্গীত একই কবিগুরুর রচনা হওয়াটারও বিকৃতিকরণের সুযোগ করিয়া দিতেছে। পাকিস্তানসহ দুনিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ যে আজও আমাদের দেশকে স্বীকৃতি দিতেছে না, আমাদের দেশবাসীসহ দুনিয়ার সব মুসলমানরা যে ভারত সরকারের প্রতি নাহক ও অন্যায় বৈরীভাব পোষণ করিতেছে, ইহার প্রধান কারণও এই বিভ্রান্তি।

অথচ প্রকৃত অবস্থাটা এই যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাঙ্গে নাই; 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব মতো দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য

www.bjilibrary.com

করিয়াছেন। তাহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নামই পাকিস্তান হয় নাই, তাহাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম-মেজরিটি রাষ্ট্রের' উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি বাংলাদেশ। এতে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নাই।" (পৃষ্ঠা : ৬৩২-৬৩৪)

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর রাজনীতির তিনকাল গ্রন্থ থেকে

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী শেখ মুজিবের পরম ভক্ত, আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক। তার রচিত পুস্তক থেকে বাকশাল গঠন সম্পর্কিত বক্তব্য উদ্ধৃত করছি ঃ

"এর মধ্যে '৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের এক সভা ডাকা হয়। এ সভায় একদলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য শুরু হয়। যারা এর পক্ষে বলেন, তাদের যুক্তির চেয়ে আবেগই বেশি প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন 'বঙ্গবন্ধু আপনি যাই করেন সেটাই ভালো, যে সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই সঠিক এবং যা বলেন, সেটাই শেষ কথা' ইত্যাদি। কাজেই পক্ষে বলাটা খুবই সহজ। কিন্তু এর মধ্যে নেতৃবৃন্দের কেউ কেউ গোপনে আলাপ আলোচনা করে সাব্যস্ত করেন, বাকশাল কোন অবস্থাতেই সমর্থন করা যাবে না। সে হিসেবে সভায় জেনারেল ওসমানী, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ও নূরে আলম সিদ্দিকী অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ জোরালো বক্তব্যের মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থার তীব্র বিরোধিতা করলেন।

সংসদীয় দলের বৈঠকের শেষ দিন, ২১ জানুয়ারি আমি বক্তৃতা করবো স্থির করলাম। আমি হলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু তার সামনের সোফায় উপবিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে সেরনিয়াবাত এবং ফরিদ গাজীর মাঝখানে আমাকে বসতে বললেন। সভার কাজ শুরু হওয়ার পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম আলোচনার সূত্রপাত করলেন এই বলে—"বঙ্গবন্ধু, আপনি সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছেন সেটা আসলে কী এবং কেন এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তা নিজ মুখে বুঝিয়ে বলুন। আপনি যা বলবেন তাই গৃহীত হবে। এবং পরে তা আইনে পরিণত করা হবে।" এই বক্তব্যের পর বঙ্গবন্ধু বলেন, তিনি সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চান। বহুদলীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আগ্রহী। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু আরো বলেন, তিনি কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চান না। উপস্থিত সংসদ সদস্যগণ আলোচনার মাধ্যমে যা স্থির করবেন সেটাই তিনি গ্রহণ করবেন। বঙ্গবন্ধু এই সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে এর উপর আলোচনা করার আহ্বান জানালেন। আমি তখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য দাঁড়াই। আমার সামনে বঙ্গবন্ধু এবং চার সিনিয়র নেতা উপস্থিত। আমি কথা শুরু করার ক্ষণেই তিনি আকস্মিকভাবে দাঁড়িয়ে আহ্বান জানালেন, "যারা আমার বক্তব্য সমর্থন কর, তারা হাত উঠাও।" পলকের মধ্যে সভাস্থলে হাত উঠে গেলো। আড়ালে দু'চারজন হাত না তুললেও এমনভাবে বসেছিলেন, যাতে তারা বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টির আড়ালে থাকতে পারেন। অবশ্য সে সময় জেনারেল ওসমানী ও মইনুল হোসেন সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। সম্ভবত, নূরে আলম সিদ্দিকীও

www.bjilibrary.com

অনুপস্থিত ছিলেন। আমি বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে হাত উঠানো হয়ে গেলো। তখন বঙ্গবন্ধু খুব উচ্চৈঃস্বরে আমাকে বললেন, "বস বস"। এ অবস্থায় আমি আর কি বক্তৃতা করবো। অগত্যা বসে পড়লাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাকে হাত তুলতে নির্দেশ দিলেন। আমি মাথা নেড়ে হাত তুলতে অস্বীকার করলাম। এখানেই সভার সমাপ্তি। সভায় জাতীয় সমস্যা সমাধানে যে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হলো।

আমি আর চা খাওয়ার দিকে না গিয়ে মাগরেবের নামায এবং আমার বাসায় সাপ্তাহিক মিলাদে যোগ দেওয়ার জন্য চলে এলাম। আমার সঙ্গে চাঁদপুরের এমপিরা ছিলেন। গাড়িতে এসে বসার পর চোখে পানি এসে গেলো। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, "আজ বঙ্গবন্ধু শেষ হয়ে গেলেন।" এই আকস্মিক অলুক্ষণে মন্তব্য, যা আমার মনের কথা ছিলো না, সেটা পরে কতোখানি সত্যে পরিণত হয়েছিলো, ইতিহাস তার সাক্ষী। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরে এলাম। (পৃষ্ঠা ১৫৩ ও ১৫৪)

'৭৫-এর ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী পাস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও থেমে যায়। সংশোধনী অনুযায়ী সকল দল মিলে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি মাত্র দল থাকবে। একটি মাত্র দল ছাড়া দেশে অন্য কোন দলের অস্তিত্ব না থাকায় স্বভাবতই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। গোপন দলগুলো দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের প্রতি চোরাগুপ্তা আক্রমণ বাড়িয়ে দেয়।

যা হোক, বাকশাল নিয়ে একটা মহা তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলো। চারদিকে হৈ হৈ রৈ রৈ রব। কে কার আগে বাকশালের সদস্য হবে, তার প্রতিযোগিতা চলতে লাগলো। সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা আতাউর রহমান খান ২৫ এপ্রিল বিবৃতি দিয়ে বাকশালে যোগ দিলেন এবং যারা ১৫ আগস্টের পর বাকশালের সমালোচনায় ছিলেন পঞ্চমুখ, এমন অনেকেই বাকশালের সদস্যপদ সংগ্রহে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, পেশাজীবী, ছাত্র, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষের মিছিলের ঢলে এবং স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত হয়ে চললো। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরের বাড়িতে পুষ্পস্তবক এবং মালার স্তূপ জমে গেলো। ভাবখানা এই, দেশ সঠিক পথনির্দেশ পেয়েছে উপযুক্ত নেতার সঠিক সময়ের সঠিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে।

বাকশাল প্রশ্নে জেনারেল ওসমানী এবং মইনুল হোসেন সংসদ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এ দু'জন সৎ সাহস দেখিয়ে যে বিদ্রোহী ভূমিকা রেখেছেন, এতোখানি সাহস আমি দেখাতে পারিনি সেটা ঠিক। কারণ আগেই বলেছি। তারপরও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আমার যে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক, সেটাতে কোন ঘাটতি ছিলো না। এ সময় অনেকেই আমাকে এসে বলতো, বাকশাল এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন মিলে ২৪৫ জনের যে কমিটি হয়েছে কোথাও আপনার নাম দেখলাম না। এটা শ্রুতিমধুর ছিলো না। তবে এটা ঠিক, যে রাজনৈতিক দর্শনে আমি বিশ্বাস করি না, সেখানে সদস্য না থাকাটাকে আমি ভালোই মনে করেছি। (পৃষ্ঠা : ১৬১)

www.bjilibrary.com

মাওলানা ভাসানীর মন্তব্য

শেখ মুজিবের শাসনামলের প্রথম দিকে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাড়া সরকারি ভ্রান্ত নীতি ও সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস আর কারো ছিলো না। তিনি হক কথা নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মুজিব সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন বলে পত্রিকাটিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এ পত্রিকার বক্তব্যও লন্ডনে ফটোকপি করে বিলি করতে দেখেছি।

মুজিব সরকারের ভারতমুখিতা সম্পর্কে 'আওয়ামী লীগের কথা ও কাজ ওয়াদা ভঙ্গের এক নজীর' নামক পুস্তিকায় মাওলানা ভাসানী ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে লিখেন ঃ

"পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও মুক্তি আমাদের আসে নাই, কেননা আগেকার প্রাদেশিক গভর্নর ও মন্ত্রীদের চাইতে অধিকতর নগ্নভাবে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা নয়াদিল্লীতে সপ্তায় সপ্তায় গমন করেন, সেখান হইতে যে নির্দেশ দেওয়া হয়, ভারতীয় কিসিঞ্জার বাংলাদেশের অসরকারি প্রধানমন্ত্রী ডিপি ধর (হালে ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বস্ত হাত পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ বাবুরা) আসিয়া যে নির্দেশ দিয়ে যান, ঠিক সেভাবেই দেশ চালানোর এন্তেমাল হইতেছে। বাংলাদেশের বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দিল্লীর অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যায় না, বাণিজ্য চুক্তি আলোচনার নাম করিয়া অর্থমন্ত্রী নয়াদিল্লীর প্রভুদিগকে উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া দেখাইয়া আনেন। সবচাইতে লজ্জার ব্যাপার হইলো, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জনগণের পবিত্র সনদ শাসনতন্ত্রটিও খসড়া হইবার পর জনগণের কাছে প্রকাশের আগে দিল্লী পাঠানো হইয়াছে। জুন মাসে (১৯৭২) আইনমন্ত্রী কামাল হোসেন শাসনতন্ত্রের খসড়া বগলদাবা করিয়া বিলাত যাইবার নাম করিয়া দিল্লীর প্রভুদের খিদমতে হাজির হইয়াছেন। মৎস্য বিভাগ এমনকি সমবায়ের মতো অনুল্লেখযোগ্য দপ্তরের মন্ত্রীরাও এদেশের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ লইবার আগে নয়াদিল্লী, কোলকাতা, বোম্বাই দৌড়াইয়া ভারতীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের নির্দেশ ও ফরমায়েশ লইয়া আসেন।"

জনাব আবুল আসাদের লেখা 'একশ বছরের রাজনীতি' গ্রন্থ থেকে (পৃষ্ঠা ৩০৯)

এডভোকেট সা'দ আহমদের 'আমার দেখা সমাজ ও রাজনীতির তিনকাল' গ্রন্থ থেকে ঃ

আর্মি অফিসারদের শেখ মুজিবের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি

১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে কয়েকজন যুব আর্মি অফিসার এমন এক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে, যা পরবর্তীতে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি প্রভাবান্বিত করেছিলো। ঢাকা লেডিজ ক্লাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে মেজর ডালিম আর তার স্ত্রীকে নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত। শেখ সাহেবের ডান হাত ও রেডক্রসের চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার ভাই, মিসেস ডালিমের উপর কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করে। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে গাজীর ভাড়াটে গুণ্ডাবাহিনী যোগ দেয় এবং দম্পতিটিকে বেইজ্জতি করে। ঘটনা শুনে ডালিমের সহকর্মী আর্মি বন্ধুরা এর দাঁতভাঙা জবাব দেয়। দুই ট্রাক ভর্তি সৈন্য সামন্ত নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাংলো তছনছ করে। উভয়পক্ষ শেখ সাহেবের কাছে বিচার চাইলে তিনি মিলিটারি পর্যবেক্ষণ টিম গঠন করেন এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ ২২ জন যুবক আর্মি অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয় কিংবা জোরপূর্বক অবসর গ্রহণে বাধ্য করা হয়। এদের মধ্যে মেজর ডালিম, মেজর নূর, মেজর

www.bjilibrary.com

হুদাও ছিলেন। এতে যুব অফিসারদের মধ্যে শেখ মুজিবের উপর দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, যার পরিণাম হয়েছিলো অত্যন্ত মারাত্মক। (বাংলাদেশের রক্তের ঋণ-এন্টনী ম্যাসকারেনহাস)

রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ

মাওপন্থি সিরাজ শিকদার ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে পুলিশ কর্তৃক চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ পাহারায় তাকে ঢাকা এনে শেখ সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হয়। তিনি তাকে আয়ত্তে আনতে চাইলেন, কিন্তু সিরাজ শিকদার কোন আপসে রাজি হলেন না। শেখ সাহেব পুলিশের হাতে তাকে দিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললেন। সিরাজ শিকদারকে হাতকড়া লাগিয়ে চোখ বাঁধা অবস্থায় রমনা পুলিশ কন্ট্রোল রুমে নিয়ে আসা হয়। তারপর গভীর রাতে এক নির্জন রাস্তায় নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। সরকারি প্রেস নোটে বলা হয় যে, 'পালানোর চেষ্টাকালে' সিরাজ শিকদারকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালে বিচার বিভাগীয় একটি রায়ে রক্ষী বাহিনীর বর্বরতা এবং উদ্যাম ও বেপরোয়া নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের ঘটনাবলি জনসাধারণের দৃষ্টিতে আসে। ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার মাত্র ১৮ বছরের একটি তরুণ শাহজাহানকে পুলিশ ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলের নিকট থেকে গ্রেপ্তার করে রক্ষী বাহিনীর হাতে সমর্পণ করে। রক্ষী বাহিনীর শেরে বাংলানগরস্থ হেড কোয়ার্টারে তাকে ২/১/৭৪ পর্যন্ত রাখা হয়। তারপর সে লাপাত্তা হয়ে যায়। শাহজাহানের ভাই মহসীন শরীফ থানা পুলিশ কোর্ট ইত্যাদি সর্বমহলে শাহজাহানকে উদ্ধারের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে রিট পিটিশন (৪৬/১৯৭৪) দায়ের করেন। রক্ষী বাহিনীর তরফ থেকে বক্তব্য পেশ করে বলা হয়, আসামি শাহজাহান তদন্ত অভিযানকালে তাদের নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আইনের আওতা বহির্ভূত কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট রক্ষী বাহিনীকে দোষী বলে চরম তিরস্কার করেন। সুপ্রিম কোর্ট দেখতে পান যে রক্ষী বাহিনী কোন আইন-কানুন নিয়ম পদ্ধতি ইত্যাদি কিছুই মেনে চলতো না। এমনকি গ্রেপ্তার কিংবা জিজ্ঞাসাবাদের কোন রেজিস্টারও তাদের ছিলো না। (২৭ ডি. এল. আর ১৮৬ বিচারপতি ডি.সি ভট্টাচার্য ও বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী) বিচার বিভাগীয় এসব রায়ে শেখ মুজিব আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না।

শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ ঃ দুঃখজনক পরিণতি

প্রধানমন্ত্রিত্বের বিরাট দায়িত্বে থেকেও শেখ মুজিবের ক্ষমতার মোহ কাটেনি। আরও বেশি ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নেবার পরিকল্পনায় মত্ত হয়ে উঠলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ফ্রান্স/আমেরিকান কায়দায় রাষ্ট্রপতি সরকারের প্রবর্তন করবেন এবং তাই করলেন। দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি করে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখে জনগণকে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেন। নিজের কাজে যেন কোন বাধা না আসে তার জন্য বিচার বিভাগের ক্ষমতা খর্ব করলেন। তারপর জাতীয় সংসদে তার সর্বময় ক্ষমতার পক্ষে সকল আইন পাস করিয়ে নিলেন। এক মাসের কম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ সকল পরিবর্তনে রাবার স্ট্যাম্প প্রদানের কাজ শেষ করলো। শেখ মুজিব এই

www.bjilibrary.com

পরিবর্তনকে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে আখ্যা দিলেন। তার মতে, "এ বিপ্লব শোষণ আর অন্যায় থেকে দুঃখী মানুষের মুক্তি বয়ে আনবে।" তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হলেন। বাংলাদেশের চাটুকার ও সরকারের করুণাভোগী বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্রের কোনদিনই অভাব হয়নি। তারা খুশির চিৎকারে ফেটে পড়লো। লক্ষকোটি মানুষের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়া হলো চাটুকারদের আওয়াজকে বুলন্দ করার জন্য। করুণাভোগীদের সরকার-উচ্ছিষ্ট খাওয়ার পথ আরও সুগম হলো। এটা অবশ্যই দ্বিতীয় বিপ্লব বা কোন বিপ্লব ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিলো, "প্রাসাদ ষড়যন্ত্র," যা দেশ থেকে মূল্যবোধ, গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার আর গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে গলা টিপে হত্যা করেছিলো।

এতেও মিটিলো না আশা। আরও ক্ষমতা চাই। শেখ মুজিব শুরু করলেন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ক্ষমতা তার হাতে কুক্ষিগত করতে। ১৯৭৫-এর জানুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে পাস হয়ে গেলো সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী। এই সংশোধনীর বদৌলতে শেখ মুজিব পার্লামেন্টের উপরও ক্ষমতাসীন হলেন, দেশে একনায়কত্ব কায়েম করলেন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি একদলীয় শাসনব্যবস্থা কায়েমেরও ক্ষমতা পেয়ে গেলেন। ৭ জুন ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করলেন। সকল বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেলো। বাকশালের সদস্য না হয়ে কারও পক্ষে কোন রাজনীতি করার সুযোগ আর রইলো না। (পৃষ্ঠা : ১৭৬ ও ১৭৭)

'মেজর জলিল রচনাবলি' থেকে মাসুদ মজুমদার কর্তৃক সংকলিত।

প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা, মেজর, কমান্ডার, মেজর জলিল রচনাবলি থেকে উদ্ধৃত ঃ

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের মূল্যায়ন যে কোন কারণেই হোক আজো সঠিক অর্থে করা হয়নি। জাতির অগ্রগতির জন্যই ১৫ আগস্টের সঠিক মূল্যায়ন করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত যে শাসনকাল বিস্তৃত ছিলো, সে শাসনকাল সম্পর্কে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী ও দল ব্যতীত বাংলাদেশের সকল মানুষেরই প্রায় একই মন্তব্য এবং ধারণা। সে শাসনকালটি ছিলো চরম দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতিপূর্ণ, দুঃশাসনে ভরপুর একটি দুঃস্বপ্নের কাল। এই দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণসহকারে একটি রাজনৈতিক দল তুমুল গণআন্দোলন গড়ে তুলেছিলো, আর সেনাবাহিনী থেকে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী জনগণ ছাড়া ছুটে এসেছিলো সেই দুঃশাসন মুছে ফেলতে। সেদিন যে দলটি জনগণসহকারে দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সব রকম ঝুঁকি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলো, তাদের বীরত্ব জনগণের কাছে স্বীকৃত, জনগণের আকণ্ঠ প্রশংসা কুড়িয়েছে সেদিনের সরকারবিরোধী নেতৃত্ব। কারণ সহজ, সেই দুঃশাসনের সম্মুখীন হওয়া সেদিন যার তার পক্ষে সম্ভবই ছিলো না। আর তাছাড়া দেশের আপামর জনগণ সেদিন সেই যাতনামূলক দুঃশাসন থেকে প্রতিনিয়তই মুক্তি কামনা করতো। (পৃষ্ঠা : ৮৫)

www.bjilibrary.com

১৬৩.

কুশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ জনগণকে সংগঠিত করে দেশবাসীর সামনে বিকল্প নেতৃত্ব সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক মহলকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলো। মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের কমান্ডার মেজর আবদুল জলিল এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করায় দলটির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

মেজর জলিলের এ জনপ্রিয়তার কারণ ভারতীয় বাহিনীর লুটতরাজের বিরুদ্ধে তার বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা। '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ভারতীয় বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করার ফলে গোটা দেশের কর্তৃত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তগত হয়। তারা প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বন্দি করে ভারতে নিয়ে যাবার সাথে সাথে পাকিস্তান বাহিনীর বিশাল সামরিক সরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রও ভারতে পাচার করতে থাকে। এমনকি ভারতের নিকটবর্তী এলাকা শিল্প নগরী খুলনা থেকে কল-কারখানার যন্ত্রপাতি পর্যন্ত লুট করে নিয়ে যেতে থাকে। মেজর আবদুল জলিল এ লুণ্ঠন ঠেকাতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীর বিরাগভাজন হন। '৭১-এর ৩১ ডিসেম্বর সরকার তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনিই প্রথম রাজবন্দি।

স্বৈরশাসনের ভয়ানক পরিকল্পনা

শেখ মুজিব উপলব্ধি করলেন যে, তার জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠায় নেমে যাচ্ছে, জনগণের মধ্যে ক্ষোভ ও অস্থিরতা বেড়ে চলেছে এবং সকল রাজনৈতিক মহল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এ অবস্থায় রক্ষীবাহিনী ও তার দলীয় সশস্ত্র বাহিনীর লালঘোড়া দাবড়িয়েও তিনি গদি রক্ষা করতে সক্ষম হবেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য স্টেলিনের মতো একনায়ক হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। মস্কোপন্থিরা তো তাকে ঘিরেই ছিলো।

এর প্রথম ধাপ হিসেবে বাকশাল গঠন করলেন। তার দলের নেতারা এতো বড় অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে গ্রহণ করলেন যে, তার মাথায় শাহান শাহ (বাদশাহের বাদশাহ) হবার নেশা চেপে বসলো। তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের মতো ছোট একটি দেশকে ৬১টি অঞ্চলে বিভক্ত করে ৬১ জন বাদশাহ নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদেরকে গভর্নরের মহাউপাধিতে ভূষিত করলেন।

ইংরেজ শাসনামলে অবিভক্ত বঙ্গদেশে গভর্নরের শাসন ছিলো। '৪৭-এর পর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পূর্বপাকিস্তানে গভর্নর নিয়োগ করা হতো। শেখ মুজিব তাঁর বাদশাহী কায়েম করার প্রয়োজনে প্রতিটি মহকুমাকে এক-একজন গভর্নরের শাসনাধীন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ৬১ জন গভর্নর নিয়োগ করে তাদের তালিকাও ঘটা করে প্রকাশ করলেন।

www.bjilibrary.com

সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রত্যেক গভর্নরকে তার এলাকায় এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী করা হলো, যাতে প্রাচীনকালের রাজা-বাদশাহর মতো স্বেচ্ছাচারিতা করতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে না হয়। এলাকার জন্য বরাদ্দ সেনাবাহিনী, পুলিশ, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও রক্ষীবাহিনী গভর্নরের আজ্ঞাবহ থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়া তাদেরকে আর কারো কাছে জওয়াবদিহি করতে হবে না। ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এ রেজিমেন্টেড শাসনব্যবস্থা চালু হবার কথা ছিলো। রাশিয়ার আদলে এ জাতীয় শাসনব্যবস্থা চালু হয়ে গেলে গোটা বাংলাদেশ এক মহাকারাগারে পরিণত হতো এবং জনগণ শেখ মুজিব ও তার গভর্নরদের অসহায় প্রজার করুণ 'মর্যাদা' ভোগ করতে বাধ্য হতো।

অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, যে দলটি ২৫ বছর পর্যন্ত গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে আন্দোলন করলো, সে দলের সকল নেতা ও বিপ্লবী কর্মী বাহিনী বাকশাল ও গভর্নর পদ্ধতির শাসনব্যবস্থাকে বিনা প্রতিবাদে কেমন করে অন্ধভাবে মেনে নিলো? এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দলটি প্রকৃতিগতভাবেই ফ্যাসিস্ট এবং দলপ্রধান দলের সবাইকে এমন প্রশিক্ষণই দিয়েছেন। দলীয় নেতার অন্ধ আনুগত্য ও নির্লজ্জ চাটুকারিতা করাই এ দলের নীতি ও ঐতিহ্য।

আওয়ামী লীগের ২৯২ জন এমপি-র মধ্যে মাত্র দু'জন বাকশাল গঠনের প্রতিবাদে সংসদ থেকে প্রতিবাদ করার হিম্মত করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তারা দু'জন শেখ মুজিবের নিকট প্রশিক্ষণ পাওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাদের একজন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এমজি ওসমানী। তিনি তো আওয়ামী লীগের ক্যাডারই নন। অপরজনও ঐ ক্যাডারভুক্ত ছিলেন না। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রখ্যাত সম্পাদক জনাব তাফাজ্জাল হোসেন মানিক মিয়ার যোগ্য সন্তান ব্যারিস্টার মুইনুল হোসেন। তিনি শেখ মুজিবের হাতে তৈরি লোক নন।

আওয়ামী লীগের তৈরি লোকদের চরিত্র

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তৈরি আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের চাটুকারী স্বভাব সম্পর্কে শেখ মুজিবের পরম ভক্তি ও অনুরক্ত আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সময়ের বিশিষ্ট নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'রাজনীতির তিনকাল' থেকেই বিশ্বস্ত সাক্ষ্য পেশ করছি ঃ

"এখানে একটা মজার অথচ করুণ ঘটনা হলো, ২৫ জানুয়ারি বাকশাল প্রবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু যেদিন প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন, তার আগে শাহ মোয়াজ্জেমকে পাঠিয়ে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহর পদত্যাগপত্র আনিয়ে নেন। ওই সময় মোহাম্মদ উল্লাহ রাষ্ট্রপতি হিসেবে একটি রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করছিলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হলো। মোহাম্মদ উল্লাহকে বাকশাল মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী বানানো হলো। এ সময় দেখেছি, যারা বহুদলীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনপণ করতে প্রস্তুত, এ ধরনের অনেককেই বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে অথবা নিজ প্রচেষ্টায় দেখা করে বাকশাল প্রবর্তনের জন্য তার ভূয়সী প্রশংসা করছেন। সব মানুষই নিজের প্রশংসা শুনতে

www.bjilibrary.com

ভালোবাসে। প্রকাশ্যে যা কিছুই বলুন, ভেতরে ভেতরে প্রশংসা শুনে আনন্দ ও তৃপ্তি পান। মুখে দু'চারটি আপ্ত বাক্য যেমন– "আপনি বাড়িয়ে বলছেন, অথবা যতটুকু বলছেন ততোটুকু না"–এ ধরনের বিনয় করে থাকেন। ব্যাপারটি যদি ওখানেই শেষ হতো, তাহলে কথা ছিলো না। কিন্তু এটা যে শুধু প্রশংসাকারীকে চাটুকারে পরিণত করে তা-ই নয়; প্রশংসিত ব্যক্তির যে কি সর্বনাশ করা হলো তা তিনি উপলব্ধিও করতে পারেন না। প্রশংসা শুনতে শুনতে তিনি ভুলেই যান যে, তার কোন দোষ বা ত্রুটি থাকা সম্ভব। এই ভুলে যাওয়ার কারণে সে ব্যক্তির মধ্যে অহং ও দম্ভ বা আত্মম্ভরিতা অর্থাৎ ফার্সি ভাষায় 'হাম চুঁ দিগার নীস্ত' অর্থাৎ আমি সবার চেয়ে বড় বা আমার চেয়ে বড় কেউ নেই– এই মনোভাব বদ্ধমূল হয়ে এক পর্যায়ে তাকে স্বৈরাচারী করে তোলে। নিজের অজান্তেই তিনি ক্রমে নিজের সৃষ্ট একটা বলয়ের মধ্যে একাকী হয়ে যান। এই একাকিত্ব তাকে দুঃসাহসী করে তোলে। সিদ্ধান্ত নিতে আবার এই চাটুকারদের পরামর্শই গ্রহণ করেন। একথা ভুলে যান যে, চাটুকার কেবল তার আপন স্বার্থেরই বন্ধু। (পৃষ্ঠা : ১৬২)

বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলে সারা দেশের নেতা-কর্মীরা ঢাকায় এসে ভিড় করলো, কিভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিতে নিজেদের স্থান করা যায়। সেই সাথে জেলা গভর্নর এবং সেক্রেটারি হওয়ার তদবিরে ঢাকা শহর এক তদবির-নগরীতে পরিণত হলো। এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতা, বেসামরিক আমলা, সামরিক বাহিনীর শফিউল্লা, জিয়াউর রহমান, পুলিশ, বিডিআর, আনসার, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণী থেকে প্রতিনিধি এনে ২৪৫ জনের সাংগঠনিক অবকাঠামো তৈরি করা হলো। চারদিকে বাকশালের এই রমরমা ভাব, দলে দলে সবাই বাকশালে যোগদান করছেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গবন্ধু একদিন বাকশাল সম্পাদকদের ট্রেনিং কোর্সেরও উদ্বোধন করলেন। এ সময় বাকশালের সাধারণ সম্পাদক মনসুর ভাই ক্যান্টনমেন্ট ঘুরে ঘুরে বাকশাল কর্মসূচির ব্যাখ্যা দিয়ে ফিরছিলেন।" (পৃষ্ঠা : ১৬২)

শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি

বাকশাল কায়েম হবার পর সকল রাজনৈতিক দলই বেআইনী হয়ে গেলো। শেখ মুজিবের বিরোধী বলিষ্ঠ কণ্ঠ মেজর জলিল ও জাসদের নেতৃবৃন্দ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। রাজনৈতিক ময়দানে বাকশালের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ করার মতো কোন মহল অবশিষ্ট রইলো না। '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ভাষা-আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রপতি ও বাকশাল প্রধান কর্তৃক এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে নতুন শাসনব্যবস্থার সরকারি ঘোষণা উচ্চারণের আয়োজন সম্পন্ন করা হলো। ঐ ঘোষণার পরপরই ৬১ জন গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রক্রিয়া শুরু হবার কথা।

এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক রেজিমেন্টে কর্মরত কতক মুক্তিযোদ্ধা জনগণকে স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুক্তির আর কোন বিকল্প উপায় ছিলো না। তারা উপলব্ধি করলেন যে, ১৫ আগস্ট নতুন রেজিমেন্টেড শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবার আগেই স্বৈরশাসকের পতন অপরিহার্য। তাই তাঁরা ১৪ আগস্ট দিবাগত শেষ রাতেই শেখ মুজিবকে হত্যা করার কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

www.bjilibrary.com

নদীর পানি প্রবাহিত হবার স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দিলে পানি স্ফীত হয়ে এক সময় নিজের পথ অবশ্যই করে নেয়। রাজনৈতিক ময়দানেও মতপ্রকাশের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করলে অস্বাভাবিক পন্থায় তা প্রকাশ পাবেই। শেখ মুজিব বাকশাল কায়েম করে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন এর কোন রাজনৈতিক প্রতিকারের পথ থাকলে সেনাবাহিনীর কোন ভূমিকা পালনের প্রয়োজন হতো না। এ ঘটনা সম্পর্কে মিজানুর রহমান চৌধুরীর 'রাজনীতির তিনকাল' গ্রন্থের বিবরণ ঃ

"১৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আমার বিশিষ্ট বন্ধু আবদুল মতিন চৌধুরী ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমন উপলক্ষে অনুষ্ঠানের বিস্তারিত জানালেন। সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে আমাকে বঙ্গবন্ধুর পৌছার অন্তত এক ঘণ্টা আগে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করলেন। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। টেলিফোনে বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে এনে তাস খেলায় বসি। রাত প্রায় একটার দিকে ঘুমাতে গেলেও ঘুম আসছিলো না। রাত তখন ক'টা হবে মনে নেই, হঠাৎ আমার স্ত্রী আমাকে ডাকলেন। তাড়াতাড়ি টেলিফোন ধরতে বললেন। মাত্র ঘুম আসছিলো, এর মধ্যেই হুড়মুড়িয়ে উঠে টেলিফোন ধরি। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে মাওলানা মান্নান খবর দিলেন, ঘটনা ঘটে গেছে। ৩২ নম্বরে গোলাগুলি হচ্ছে। আমিও তখন আমার ইস্কাটনের বাসা থেকে গোলাগুলির আওয়াজ শুনছিলাম। তখন সম্ভবত সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায় আক্রমণ চলছিলো। এরই মধ্যে কিছু পরে আবার টেলিফোন বেজে উঠে। মাওলানা মান্নান বললেন, 'রেডিও ধরেন'। রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠস্বরে ইতিহাসের জঘন্যতম নিষ্ঠুর ঘটনার ঘোষণা শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। ডালিম রেডিওতে সদম্ভে ঘোষণা করে চলেছে, "স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।" সূর্যের ধরণীতলে পতনের মতো এক অবিশ্বাস্য সংবাদ। এও কি সম্ভব! এও কি হয়! কার এমন সাহস, কার এমন বুকের পাটা, যার আবির্ভাব না হলে এ দেশ স্বাধীন হতো না, সমগ্র জাতি যাকে মাথার মুকুট করে রেখেছে, হিমালয়সমান সেই মহীরুহকে কারা হত্যা করলো?" (পৃষ্ঠা : ১৬৫)

মুজিব হত্যা সম্পর্কে জনাব অলি আহাদ রচিত 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে '৭৫' গ্রন্থ থেকে ঃ

১৫ আগস্ট ('৭৫) এবং ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন

এই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ও অমানিশার অবসান ঘটে বাংলা-মায়ের সাতটি সন্তানের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায়। মৃত্যুঘন্টা বাজে মুজিবী জালেমশাহীর। উদয় হয় অরুণরাঙ্গা প্রভাত। অকুতোভয় এই সাতটি দামাল সন্তান যেন বাংলাদেশের সাত কোটি মুক্তিপাগল বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। এক এক কোটির প্রতিনিধি যেন এক-এক জন। ইহারা হইতেছেন বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সাতজন অফিসার ঃ লেঃ কর্নেল রশীদ, লেঃ কঃ ফারুক, মেজর পাশা, মেজর হুদা, মেজর মহিউদ্দীন এবং পদচ্যুত মেজর ডালিম ও মেজর শাহরিয়ার। সেদিন যেমন আপামর বাঙালি জনতা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞতাভরে হৃদয়-নিংড়ানো স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানাইয়াছিল, তেমনি স্বাধীনচেতা বাঙালিমাত্রই চিরকাল এই সাতজন তরুণকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাইবে। বস্তুতঃ জাতীয়

www.bjilibrary.com

নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতা ও বিজাতীয় দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি পাওয়ার সূর্য সম্ভাবনা হিসাবেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট চিরকাল পরিগণিত হইবে। আজাদী-পাগল বাঙালির জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ১৫ আগস্ট সত্যিই এক অনন্য দিবস। ইহা ছিল কার্যতঃ দিল্লী ও দিল্লীর দাসদের অশুভ শৃঙ্খল মোচনের প্রথম পদক্ষেপ ও শুভ সূচনা।

১৫ আগস্ট (১৯৭৫) খন্দকার মোশতাক আহমদ অভ্যুত্থান ও পরিবর্তনের অগ্রদূতদের অনুরোধে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং জাতীয় জীবনের সেই ঝঞ্ঝাসংকুল উত্তাল তরঙ্গে শক্ত ও সুনিপুণ হস্তে রাষ্ট্রীয় তরণীর হাল ধরেন। অভ্যুত্থানের মূল সুরকে রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক ও জনজীবনে রূপদানের মহৎ উদ্দেশ্যেই তিনি ১৯৭৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ তথা এক দলীয় রাজনীতি আইন বাতিল করেন এবং ১৯৭৫ সালের ২৮ আগস্ট বাতিল করেন একষট্টিটি জেলার গভর্নর নিযুক্তি আদেশ। ২২ আগস্ট (১৯৭৫) এক প্রশাসনিক আদেশে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতঃ মূল মালিকের নিকট হস্তান্তর করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ২২ আগস্টেই তিনি রাষ্ট্রপতি আদেশ ৯ (পি. ও. ৯) বাতিল করেন ও সরকারি কর্মচারীদের মনে নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস পান। সর্বোপরি ৩ অক্টোবরের বেতার ভাষণে তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৫ আগস্ট (১৯৭৬) হইতে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ শুরু হইবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৭৭) তারিখে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নতুন সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। তিনি ইহাও ঘোষণা করেন যে, সকল রাজবন্দির বিনা শর্তে মুক্তি প্রদানও করা হইবে এবং অতঃপর রাজনৈতিক কারণে কাহারো বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হইবে না। এভাবেই বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন, বহুদলীয় রাজনীতি প্রতিষ্ঠা, মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রবর্তন ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার নব অধ্যায় সূচিত হয় খন্দকার মোশতাক আহমদের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও সিদ্ধান্তে।" (পৃষ্ঠা : ৫৬৮-৫৬৯)

বিদেশীদের দৃষ্টিতে শেখ মুজিবের পতনের কারণ

প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আবুল আসাদ রচিত 'একশ' বছরের রাজনীতি' থেকে উদ্ধৃত করছি ঃ

"বস্তুত ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্রবাদী ও ভারতঘেঁষা রাজনীতি ও শাসন কর্তৃত্বের পতন ঘটলো। ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব তার পরিবারবর্গসহ মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার একদিন পর একজন বিদেশী সাংবাদিক লিখেছিলেন, "তাঁর (মুজিবের) বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে। প্রথমতঃ সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা করতেন। ..... সামরিক অফিসারদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন। ...... মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত, ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রে-শস্ত্রে, বেতনে-ভাতায়, ব্যয়ে-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। উভয়ের স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।..... মুজিবের

www.bjilibrary.com

পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবনমন অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে। 'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম-পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলো বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই পশ্চাদভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তম অংশকে আহত করেছিলো। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমুআর নামাযের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিলে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে। [এন্থনী মাসকারেন-হাস, সানডে টাইমস, লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫]

শাসনতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষমুখী পরিবর্তন শেখ মুজিবের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়, আরও অনেক বিদেশী পর্যবেক্ষক একথা বলেছেন। শেখ মুজিব নিহত হবার পরপরই লন্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ লিখে ঃ "বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিলো, ক্ষমতায় বসিয়েছিলো। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।" [অমিত রায়, সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫]

"১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই।..... শেখ মুজিবের সাম্প্রতিক রাজনীতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিলো। মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস যে, পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায় যে, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাজ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিলো।.... তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিলো।..... আওয়ামী লীগের ভেতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থি মুসলমান বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন।" [গার্ডিয়ান, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৩০৫-৩০৬)

আগস্ট বিপ্লবের সুফল

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বৈরশাসকের পতনের সুফল সম্পর্কে জনাব অলি আহাদ রচিত 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' নামক গ্রন্থে বর্ণিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদ যেসব পদক্ষেপ নেন তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মনঃপূত হওয়ার কথা নয়। সেদিকে ইঙ্গিত করে জনাব অলি আহাদ ঐ গ্রন্থেই লিখেন ঃ

"খন্দকার মোশতাকের এই দৃঢ়তা দিল্লীর ইন্দিরা গান্ধীর সকল কারসাজিকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। শুধু তাই নয় তাঁহার নেতৃত্বে ঐক্য ও ঈমানের মন্ত্রে দীক্ষিত সাত কোটি বঙ্গ

www.bjilibrary.com

সন্তান অত্যন্ত শৃঙ্খলার সহিত জাতীয় জীবনের সকল অমূলক, অকল্যাণ ও অশুভ প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মুছিয়া ফেলিতেও সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় জীবনের আভ্যন্তরীণ এই কল্যাণ প্রয়াস বহির্বিশ্বেও সমভাবে অভিনন্দিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ সুফল, বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনবহুল ও তৃতীয় বিশ্বশক্তি গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ. এন. লাই. ৩০ আগস্ট (১৯৭৫) তাঁহার বার্তায় বলিয়াছেন, "গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের পক্ষ হইতে সসম্মানে আপনাকে জানাইতেছি যে, চীন সরকার আজ হইতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতেছে। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের দুই দেশের জনগণের চিরাচরিত বন্ধুত্ব দৃঢ়ভাবে বৃদ্ধি পাইবে।" উল্লেখ্য যে, চীনের অভিযোগ ছিলো, শেখ মুজিব এবং তাহার সরকার দিল্লীর পুতুলমাত্র এবং বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। তাই মুজিব আমলে অনবরত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় নাই। এদিকে আরব জাহানের তথা মুসলিম জাহানের মধ্যমণি সউদী আরবও একই কারণে দিল্লীর দাস মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানাইয়া আসতেছিলো। কিন্তু খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশের দায়িত্বভার গ্রহণের পর পরই ১৬ আগস্ট সউদী আরবের বাদশাহ ফায়সাল বাংলাদেশকে কেবল স্বীকৃতিই দেন নাই, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব বজায় রাখিবার ব্যাপারে সউদী আরবের পক্ষ হইতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানেরও আশ্বাস দেন। স্বল্পতম সময়ের জন্য হইলেও খন্দকার মোশতাক আহমদের এই দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশকে দিল্লীর দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার ব্যাপারে তাহার আন্তরিক ও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে।" (পৃষ্ঠা : ৫৭০)

আগস্ট বিপ্লবের সুফল সম্পর্কে জনাব আবুল আসাদ 'একশ' বছরের রাজনীতি' গ্রন্থে লিখেন ঃ

"আগস্ট বিপ্লবের পর দেশের রাজনীতি আবার স্বাধীন ও জাতীয় চেতনায় ফিরে এলো। শাসনতন্ত্রের মৌল ভিত্তির আসন থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বিদায় করা হলো এবং তার জায়গায় প্রতিস্থাপন করা হলো 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। আর শাসনতন্ত্রের শুরু করা হলো আল্লাহর নাম নিয়ে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে। ধর্মীয় নামে অর্থাৎ 'ইসলাম' ও 'মুসলিম' পরিচয় সম্বলিত রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার উপর যে বিধি-নিষেধ শাসনতন্ত্রে ছিলো, তার বিলোপ সাধন করা হলো। এছাড়া শাসনতন্ত্রে একদলীয় শাসনব্যবস্থার যে বিধান ছিলো, তাও উচ্ছেদ সাধন হয়ে গেলো।

এই শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ফলে জাতি অসহনীয় ও অশরীরী এক বন্দিদশার হাত থেকে মুক্তি পেলো, অনুভব করলো স্বাধীনতার স্বাদ। সংবাদপত্র থেকে রাজনীতি, শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই একটা শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ ফিরে এলো। বিলোপ ঘোষিত সংবাদপত্রগুলো আত্মপ্রকাশ করলো, রাজনৈতিক দলগুলো নিষিদ্ধতার কবল থেকে মুক্তি পেলো। সবচেয়ে বড় কথা হলো ধর্মভিত্তিক দলগুলো সাড়ে তিন বছরের বন্দিদশা থেকে মুক্তিলাভ করলো। প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতে পারলো জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ ইত্যাদিসহ ইসলাম ও মুসলিম নাম পরিচয় সম্বলিত রাজনৈতিক দল।

www.bjilibrary.com

এইভাবে ১৯০৬ সালে উপমহাদেশে যে মুসলিম রাজনীতির নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিলো, যে রাজনীতির দান মুসলিম আবাসভূমি হিসেবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ ভূখণ্ড, সেই রাজনীতি আবার ফিরে এলো বাংলাদেশে। অন্যকথায় বাংলাদেশ ফিরে এলো তার স্বরূপে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিপ্লবের ঘোষণাকালে বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু এই ঘোষণাকে পরে রক্ষা করা হয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর বিএনপি ও জাতীয় পার্টি দেশ শাসন করেছে। এ দুটি দল ধর্মনিরপেক্ষ নয়, শাসনতন্ত্রের মতোই এ দুটি দল 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' রাখে এবং ইসলামী মূল্যবোধ অনুসরণের কথা বলে, তবু বাংলাদেশ ইসলামী রিপাবলিক হয়নি কিংবা সরকারের আইন ও আচরণের উৎস কুরআন এবং সুন্নাহ হয়নি। অবশ্য জাতীয় পার্টির শাসনামলে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে 'ইসলাম'-কে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা হয়েছে।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ফলে বাংলাদেশ নীতিগতভাবে 'ইসলামী রাষ্ট্র' এবং বাংলাদেশের রাজনীতি নীতিগতভাবে ইসলামভিত্তিক হয়েছে। কিন্তু কার্যত বাংলাদেশ এখনও ইসলামী রাষ্ট্র হয়নি এবং বাংলাদেশের রাজনীতিও ইসলামভিত্তিক হয়নি।" (পৃষ্ঠা : ৩০৬-৩০৭)

১৬৪.

১৯৭৫-এর সামরিক বিপ্লব

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে সেনাবাহিনীর কতক কর্নেল ও মেজর শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে অসহায় দেশবাসীকে মুক্ত করার মহান উদ্দেশ্যে কোন বিকল্প পথ না থাকায় বাধ্য হয়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করেন। এ ধরনের হত্যাকে মিলিটারি ক্যু বা সামরিক বিপ্লব বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের বহু দেশে সফল সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। কোথাও বিপ্লব সফল না হলে বিপ্লবীরা বিদ্রোহী হিসেবে শাস্তি পেয়েছে।

সফল সামরিক বিপ্লব মানে বিপ্লবীদের বিজয়। যদি সামরিক বাহিনীর অনুগত অংশ বিপ্লব ঠেকাতে ব্যর্থ হয় এবং বিপ্লবীরা বিনাবাধায় সরকার পরিবর্তন করতে সক্ষম হয় তাহলে বুঝা গেলো বিপ্লব সফল হয়েছে। যদি জনগণ এ পরিবর্তনে সন্তুষ্ট বলে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে এটাকে পরম সাফল্য বলা চলে।

বাংলাদেশের আগস্ট বিপ্লবকে বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিপ্লব হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কারণ ঃ

১. বিপ্লবীগণ খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানালে তিনি শর্ত আরোপ করলেন যে, তিন সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের আনুগত্য চাই। তারা বিনা প্রতিবাদে আনুগত্য প্রকাশ করলেন। অথচ তারা সবাই শেখ মুজিবের নিয়োগকৃত ছিলেন।

২. শেখ মুজিবের গদিরক্ষায় নিযুক্ত রক্ষী বাহিনী প্রতিরোধের সামান্য চেষ্টাও করেনি। এ বাহিনী প্রধান শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত সহচর জনাব তোফায়েল আহমদ রক্ষী-

www.bjilibrary.com

বাহিনীকে দিয়ে বিপ্লব ঠেকাবার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩. প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগে কর্মরত সবাই বিপ্লবোত্তর সরকারকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করায় দ্রুত আইন-শৃঙ্খলায় উন্নতি হয়।

৪. সর্বস্তরে জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসে। অদ্ভুত এক জাদুর পরশে যেন দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বিস্ময়করভাবে শান্ত ভাব ধারণ করলো।

৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত লোকেরা পরবর্তী পরিস্থিতিকে অনুকূল মনে করায় দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা দেখা গেলো।

ঐ সময় আমি তো দেশে ছিলাম না। আমি লন্ডনে বসবাসরত বাংলাদেশীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় সবাইকে দেশের ব্যাপারে নিরুদ্বেগই পেয়েছি। দেশের পত্র-পত্রিকা থেকে আমরা দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশান্বিত বোধ করেছি। লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিরূপ রিপোর্ট দেখিনি। তাই আগস্ট বিপ্লবকে অত্যন্ত সফল বিপ্লব বলে স্বীকার করতেই হয়।

মুজিব হত্যার বিচার

শেখ হাসিনার পিতা-মাতা ও ভাইদের নিহত হওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত বেদনাবোধ করাই স্বাভাবিক। এ দিক দিয়ে তার প্রতি সবারই সহানুভূতি বোধ করা উচিত। এটা অবশ্য মানবিক ব্যাপার। কিন্তু যারা তাকে হত্যা করেছেন তারা তাদের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ হাসিল করার জন্য তা করেননি। ইতিহাস সাক্ষী এবং বর্তমানে যাদের বয়স ৪০ এর বেশি এমন কোটি কোটি বাংলাদেশী দেশে ও বিদেশে সাক্ষ্য দেবার জন্য বেঁচে আছে যে, শেখ মুজিবের পতন দেশ ও জাতির জন্য অপরিহার্য ছিলো। তাঁর কুশাসন থেকে জনগণের মুক্তির আর কোন বিকল্প উপায় ছিলো না। এটাকে সাধারণ হত্যা মনে করা একেবারেই অযৌক্তিক।

ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য আপন ভাইকেও হত্যা করে থাকে। নিজের স্ত্রীকেও যৌতুকের লোভে হত্যা করে। রাজনৈতিক স্বার্থেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করতে পারে। এ জাতীয় সকল হত্যারই বিচার হওয়া উচিত বলে সবাই স্বীকার করতে বাধ্য।

দেশ ও জাতির স্বার্থে যখন সফল বিপ্লবের মাধ্যমে কোন সরকারের পতন হয় তখন হত্যাকাণ্ড ঘটেই থাকে। বিপ্লব সফল না হলে তো বিপ্লবীরা ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক দুশমন হিসেবে কঠোর পরিণতিই ভোগ করে থাকে। কিন্তু বিশ্বের কোথাও কোন সফল বিপ্লবের কারণে হত্যার জন্য বিচার হয় না। কারণ বিপ্লবীরাই সফল বিপ্লবের পর ক্ষমতাসীন থাকে। তাই তাদের বিচার করবে কে?

১৯৯৬ সালের জুন মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের পর জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টির সমর্থনে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হবার সুযোগ পাওয়ায় তিনি মুজিব হত্যার বিচার করার জন্য হিংস্র মূর্তি ধারণ করেন। অথচ তাঁর গোটা নির্বাচনী অভিযানে একবারও তাঁর পিতার হত্যার বিচার দাবি জানাননি। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে তিনি বিরোধী দলের লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে এবং ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত জাতীয়

www.bjilibrary.com

সংসদে বিরোধী দলীয় লিডার হিসেবে মুজিব হত্যার বিচার দাবি করেননি। তিনি জানতেন যে, জনগণ এ দাবিকে সমর্থন করবে না।

মুজিব হত্যা যদি সত্যিকার অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে তখনকার আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও জনাব কাদের সিদ্দিকী ছাড়া দলীয় সকল এম.পি-র বিচার হওয়া প্রয়োজন। কারণ তাঁরা হত্যার কোন প্রতিবাদ করেননি। মুজিব হত্যার পর দেশবাসী যেভাবে উল্লাস প্রকাশ করেছে তাতে জনগণের পাইকারি শাস্তি হওয়া উচিত। বিশেষ করে যারা প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন তারা তো অবশ্যই অপরাধী। আর খন্দকার মোশতাক আহমদের ২১ সদস্যের মন্ত্রীসভার মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন শেখ মুজিবের মন্ত্রীসভার সদস্য। বাকী ৫ জনও আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতা ছিলেন।

খন্দকার মোশতাক আহমেদের মন্ত্রীসভা

মন্ত্রী ১০ জন ঃ ১. আবু সাঈদ চৌধুরী (পররাষ্ট্রমন্ত্রী), ২. অধ্যাপক ইউসুফ আলী (পরিকল্পনা মন্ত্রী), ৩. ফণীভূষণ মজুমদার (স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী), ৪. সোহরাব হোসেন (পূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী), ৫. আবদুল মান্নান (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রী), ৬. মনোরঞ্জন ধর (আইন, সংসদ বিষয়ক ও বিচার মন্ত্রী), ৭. আবদুল মমিন (কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রী), ৮. আসাদুজ্জামান খান (বন্দর, জাহাজ ও অভ্যন্তরীন জলযান মন্ত্রী) ৯. ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (অর্থ মন্ত্রী), ১০. ড. মোজাফফর আহমদ (শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি গবেষণা ও আনবিক শক্তি মন্ত্রী)।

প্রতিমন্ত্রী ১১ জন ঃ ১. দেওয়ান ফরিদ গাজী (বাণিজ্য, পেট্রোলিয়াম ও খনিজ), ২. মোমেন উদ্দিন আহমেদ (বণ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানিসম্পদ ও বিদ্যুৎ), ৩. প্রফেসর নূরুল ইসলাম চৌধুরী ৪. শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন (বিমান পর্যটন, ভূমি প্রশাসন ও সংস্কার), ৫. তাহের উদ্দিন ঠাকুর (ইনফরমেশন, ব্রডকাস্টিং, লেবার, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, কালকচারাল অ্যাফেয়ার্স ও স্পোর্টস), ৬. মোসলেম উদ্দীন খান (পাট), ৭. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (যোগাযোগ ও রেলওয়ে), ৮. কে এম ওবায়দুর রহমান (ডাক, তার ও টেলিফোন), ৯. ডা. ক্ষীতিশ চন্দ্র মণ্ডল (সাহায্য ও পুনর্বাসন), ১০. রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ (ভোলা মিয়া) (বন, মৎস্য ও পশু), ১১. সৈয়দ আলতাফ হোসেন (সড়ক, জনপথ ও রোডস ট্রান্সপোর্ট)।

শেখ হাসিনার ভুল হিসাব

শেখ মুজিব অবশ্যই শেখ হাসিনার শ্রদ্ধাভাজন পিতা। কিন্তু তিনি জোর করে তাকে জাতির পিতা বানাবার চেষ্টা করে তার সম্মান হানি করেছেন। ১৫ আগস্টকে সরকারি দাপটে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেছেন। অথচ তিনি ভালো করেই জানেন যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশবাসী শোক প্রকাশের পরিবর্তে মুক্তির আনন্দ প্রকাশ করেছে। জাতি যদি শেখ মুজিবকে সত্যিই পিতা হিসেবে শ্রদ্ধা করতো তাহলে পিতার মৃত্যুতে উল্লসিত হতো না। ভক্তি-শ্রদ্ধা জোর করে আদায় করা যায় না। এমন চেষ্টা করতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

www.bjilibrary.com

মুজিব হত্যার বিচার চলাকালে বিচারপতিগণ বারবার বিব্রতবোধ করায় কয়েকবার বেঞ্চ পরিবর্তন করতে হয়। সন্ত্রাসী কায়দায় আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিচারপতিগণের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল করে বিশ্বে বিরল কলঙ্কময় ইতিহাস সৃষ্টি করা হয়। আওয়ামী শাসনামলে মুজিব হত্যা মামলাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ পর্যন্ত পৌঁছাবার পর মামলা স্থবির অবস্থায় পড়ে আছে।

মুজিব হত্যার ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের সময় শেখ হাসিনা মাথায় ইহরামের রুমাল বেঁধে এবং হাতে তাসবীহ নিয়ে সারা দেশে নির্বাচনী অভিযান চালান। তার পিতার কুশাসনের জন্য দু'হাত জোর করে জনগণের নিকট বারবার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। অত্যন্ত আবেগময় কণ্ঠে জনগণের দরবারে আকুল আবেদন জানিয়ে একবারের জন্য খিদমতের সুযোগ দাবি করেন।

ঐ সময় ভোটার তালিকায় তাদের সংখ্যায়ই বেশি ছিলো, যারা শেখ মুজিবের কুশাসন নিজের চোখে দেখেনি। জাতীয় সংসদে আশাতীত সংখ্যক আসন লাভ করে শেখ হাসিনা ধারণা করলেন যে, জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমা করে দিয়েছে। তিনি হয়তো ধারণা করলেন যে, মুজিব হত্যার সময় উল্লসিত জনগণের পরবর্তী প্রজন্ম জাতির পিতা হিসেবে তাঁর পিতাকে সহজেই গ্রহণ করবে।

এ ভুল হিসাব করেই তিনি ৭ নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব ও সংহতি দিবসের সরকারি ছুটি বাতিল করে দেন এবং ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে সরকারি ছুটি পালন করেন।

২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার পর ৭ নভেম্বর আবার সঠিক মর্যাদায় ফিরে এলো এবং ১৫ আগস্ট জনগণের উল্লাস দিবসে পরিণত হলো। আওয়ামী লীগের বাইরে কোন মহল থেকে এ বিষয়ে কোন আপত্তি উত্থাপন করা হয়নি। শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হয়ে তার পিতার ছবি টাকার নোটে ও সারা দেশে লাগিয়ে দিলেন এবং বহু সেতু, রাস্তা ও প্রতিষ্ঠানে তার পিতার নাম ঝুলিয়ে দিলেন। তার পিতাকে জনগণ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। তিনি তাকে পুনরুজ্জীবিত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করলেন। কিন্তু জাতিকে পিতা বলে স্বীকার করাতে সক্ষম হননি।

সব ভালো যার শেষ ভালো

যদি কেউ শেষ জীবনে প্রশংসনীয় চরিত্রের পরিচয় দিতে পারে, তাহলে পূর্ববর্তী সময়ে যত নিন্দনীয় কাজই করে থাকুক, মানুষ সে কথা ভুলে যায় এবং পরবর্তী জীবনের সুখ্যাতি করতে কার্পণ্য করে না।

এর বিপরীত উদাহরণেরও অভাব নেই। এক সময়ে সবাই যার প্রশংসা করে পরবর্তী জীবনে যদি সে নিন্দনীয় চরিত্রের পরিচয় দেয় তাহলে মানুষ তার পূর্বের প্রশংসা ভুলে যায় এবং শেষ দিকে নিন্দাবাদ নিয়েই তাকে দুনিয়া থেকে বিদায় হতে হয়।

বিশ্বজনীন এ নীতি অনুযায়ী শেখ মুজিবের জীবনকে বিবেচনা করলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন চরম কলঙ্কময়। তাই ১৯৬৯ থেকে ৭২ সাল পর্যন্ত তিনি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করা সত্ত্বেও ৭৫-এর আগস্টে তিনি যখন নিহত হন তখন মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের

www.bjilibrary.com

সময় তিনি ছিলেন জনগণের নয়নের মণি। অথচ শেষ পর্যন্ত চরম স্বৈরাচারী, গণতন্ত্র হত্যাকারী, জনগণের সকল অধিকার হরণকারী ও দুর্নীতির লালনকারী হিসেবে গণমানুষের ধিক্কার ও অভিশাপ বহন করে অপমানজনক অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় হন।

আওয়ামী লীগ মহল ছাড়া আর কোন মহলেই শেখ মুজিবের গৌরবময় সময়ের কোন চর্চা অবশিষ্ট নেই। সর্ব মহলেই তাঁর জীবনের কলঙ্কময় অধ্যায় ব্যাপকভাবে আলোচিত। তাঁর পরম ভক্ত ও অনুরক্ত জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর রচিত 'রাজনীতির তিন কাল' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, শেখ মুজিবের অতি ঘনিষ্ঠজনেরাও তাঁর নিহত হওয়ার পর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করার পরিবর্তে চরম বিরূপ মন্তব্য করেছেন এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। মিজান চৌধুরীর ভাষায় ঃ

"স্বার্থপরতার রাজনীতির কী বিচিত্র রূপ! কয়দিন আগে বঙ্গবন্ধুর কাছে ধরনা দিয়ে যিনি বাকশালের সদস্যপদ নিলেন, সেই আতাউর রহমান খান ঘটনার পরপরই ১৫ আগস্টকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করলেন। সংসদের স্পীকার আবদুল মালেক উকিল সে সময় বিদেশে ছিলেন। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে ঘটনার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, জাতি ফিরআউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। এমনকি বরিশালের মহিউদ্দিন আহমেদ (পরবর্তীতে বাকশালের চেয়ারম্যান) মোশতাকের একটি ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন আদায়ের জন্য মস্কো পর্যন্ত গিয়েছিলেন!

যা হোক, সামরিক শাসন জারি করার পর মোহাম্মদ উল্লাহকে ভাইস প্রেসিডেন্ট, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার ১০ জন মন্ত্রী ও ৬ জন প্রতিমন্ত্রীকে পুর্নবহাল করে মোশতাকের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করা হয়। একই দিনে পাকিস্তান মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতির জনকের মৃতদেহ তাঁর ধানমণ্ডির বাড়ির সিঁড়িতে পড়ে থাকে। পরদিন টুঙ্গিপাড়ায় অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তাঁকে সমাহিত করা হয়। হেলিকপ্টারে তাঁর মৃতদেহের সঙ্গে যে ক'জন সৈন্য যায়, তারা এবং স্থানীয় অন্যান্য নিরাপত্তারক্ষী মিলে কঠোর নিরাপত্তা ব্যুহ সৃষ্টি করে অত্যন্ত দায়সারাভাবে তাঁর জানাযা আদায়ের ব্যবস্থা করে এবং তার কবরের প্রহরায় পুলিশ নিযুক্ত করা হয়। (পৃষ্ঠা : ১৬৮-১৬৯)

শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে বিদেশী কলামিস্টদের মন্তব্য

শেখ মুজিবের হত্যার পর বিদেশী পত্র-পত্রিকায় কলামিস্ট ও সম্পাদকদের মন্তব্য পত্রিকার নাম ও প্রকাশনার তারিখসহ হাফিয মাওলানা মুনীরুদ্দীন আহমদ 'বাংলাদেশ বাহাত্তর থেকে পঁচাত্তর' নামে ৭০০ পৃষ্ঠার এক বিরাট গ্রন্থ সংকলন করেন। খোশরোজ কিতাব মহল কর্তৃক প্রকাশিত এ গ্রন্থটির শেষ দিকে 'বিদেশী পত্র-পত্রিকার মতামত' শিরোনামে ৫৭৯ থেকে ৬৭৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দীর্ঘ ১০০ পৃষ্ঠায় বহু নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা প্রকাশ করা হয়েছে। ঐ সব লেখার সবটুকু পাঠক-পাঠিকাদের জন্য উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় বলে অল্প কিছু পরিবেশন করছি ঃ

মুজিব নিজেই দায়ী —*মার্টিন উলাকট*

"মুজিবের মৃত্যুর নির্মম পরিহাস এই যে, পাকিস্তানিরা তাকে হত্যা করেনি, তার দেশবাসীরাই তাকে হত্যা করেছে। এতে বুঝতে পারা যায়, কত দ্রুত বাংলাদেশ আশার

www.bjilibrary.com

উচ্চ শিখর থেকে হতাশা ও নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে নেমে এসেছিলো, যার ফলে এই সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে।

এর জন্য বহুলাংশে দায়ী মুজিব নিজে। পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র চলাকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মুজিব কোন সংস্কার সাধনে, এমনকি একটি যোগ্য, সৎ প্রশাসন গড়ে তুলতেও চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং দেশে কিছুটা প্রগতি আনার জন্য তার শেষ পদক্ষেপই তার পতন ডেকে এনেছে। বামপন্থি আদর্শে তিনি একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যার ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও সেনাবাহিনী তার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। অথচ তাদের সমর্থনেই তিনি প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীনতার পর থেকে ১২ হাজার মিলিয়ন পাউন্ড বিদেশী সাহায্য পাওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির অবক্ষয় কমেনি। কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের কারসাজিতে দেশের কৃষিনীতিও পঙ্গু হয়ে পড়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগের চাঁই। এ অবস্থায় মুজিব নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের পথ খুঁজছিলেন। তাতে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য মস্কোপন্থি দলগুলো উৎসাহ যুগিয়েছিলো।

গত বছর ডিসেম্বর মাসে মুজিব দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। এ বছর জানুয়ারি মাসে তিনি শাসনতন্ত্র সংশোধন করে কার্যত এক নতুন সংবিধান সৃষ্টি করলেন। প্রেসিডেন্ট হিসেবে মুজিবের হাতে সমস্ত কার্যকরী ক্ষমতা ন্যস্ত হলো, এমনকি বিচার বিভাগের কর্তৃত্বও। জাতীয় দল ছাড়া আর সব রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষিত হলো।

মুজিব মধ্যযুগীয় নৃপতির মত অফিসে-দরবারে বসতেন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মীদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতেন, গল্প বলতেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের বিদায় করতেন। তার নতুন মন্ত্রিসভায় পুরান মন্ত্রীরাই ছিলেন।

আগেই বিরোধীদলগুলো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিলো। জুন মাসে সংবাদপত্রগুলোও সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হলো। আওয়ামী লীগের চাঁই ও মন্ত্রীরা বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবত তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে।

এসব মন্ত্রীদের মধ্যে একজন হচ্ছেন বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ, যিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে সদ্য ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন। ১৯৭১ সালে কোলকাতায় অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী ছিলেন।

খন্দকার ডানপন্থি বলে পরিচিত। সহকর্মী তাজউদ্দীনের ভাগ্য বিপর্যয় থেকে হয়তো তিনি ছবক নিয়েছিলেন।

তাছাড়া আদর্শগত প্রশ্নও ছিলো। মুজিব নতুন জাতীয় দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অনেক মস্কোপন্থী রাজনীতিবিদকে স্থান দিয়েছিলেন। ফলে আওয়ামী লীগের ভিতরে ও বাইরে প্রাচীনপন্থী মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, নতুন শাসকরা বাংলাদেশকে 'ইসলামিক রিপাবলিক' ঘোষণা করেছেন।

সর্বোপরি, স্বাধীনতার পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিবাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ

www.bjilibrary.com

সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ালো। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিলো।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিলো। এর পরেও রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতে দেরাদুনে যেতো। রক্ষীবাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজারে দাঁড়িয়েছিলো। লক্ষ্য ছিলো আরও অনেক বেশি।

যেভাবেই হোক, রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অসন্তোষই হচ্ছে সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ এবং এক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আর এক সেনাবাহিনী গঠন করে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার যে নীতি মুজিব গ্রহণ করেছিলেন তা ব্যর্থ হয়েছে।"

[গার্ডিয়ান, লন্ডন, আগস্ট ১৬, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৬৩-৬৬৫)

অবশ্যম্ভাবী পতন —*কেভিন রেফার্টি*

"বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির সূত্রপাত হয় গত বছরের মাঝামাঝি সময়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মুজিব ভারতে ধান, চাউল ও পাট পাচারের বহর দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে মোট উৎপাদনের শতকরা ১৫ ভাগ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছিলো। অপরদিকে যখন লাখ লাখ বাঙালি না খেয়ে মরেছে, তখন মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহচররা চোরাচালানের ব্যবসায় মোটা অংক কামাই করেছে, রাতারাতি ধনী হয়ে উঠেছে।

চোরাকারবার থামাবার জন্য মুজিব সেনাবাহিনীকে তলব করলেন, কিন্তু তাদের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে রাজি হলেন না; বরং রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার জন্য চাপ দিলেন। চোরাচালানকারী দমনের অভিযান সফল হয়নি। কারণ বেশির ভাগ দোষী ব্যক্তি সরকারের আশ্রয় লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু এই অভিযান চলাকালে সেনাবাহিনী ক্ষমতার কিছুটা আস্বাদ পেয়েছিলো। এতে তাদের অসন্তোষ আরো বেড়ে যায় এবং তারা সুযোগের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে।

নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার মতো সৎ-সাহস শেখ মুজিবের কোন দিনই ছিলো না। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের চাপে একক দল পুরাতন পাপীদের ভিড়ে নতুনত্ব লাভ করতে ব্যর্থ হলো। এদের অনেকেই সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশাকে পুঁজি করে রাতারাতি সম্পদশালী হয়ে উঠেছিলো।

মুজিব তোষামোদপ্রিয় ছিলেন এবং ক্রমেই চাটুকারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে উঠেছিলেন। এই চাটুকারের দল সযত্নে তার কাছ থেকে অপ্রিয় সত্য গোপন করে রাখতো। সংবাদপত্রের উপর নির্দেশ জারি করা হয়েছিলো মুজিবের বড় ফটো ফলাও করে ঘন ঘন ছাপাবার জন্য।

স্বজনপ্রীতির প্রশ্নটি এ বছরে বড় হয়ে ধরা পড়ে। শেখ মুজিবের বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মীরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে, শেখ তার ভাবী উত্তরাধিকারী হিসেবে ভাগিনা শেখ মণিকে গড়ে তুলছেন। প্রতিটি ব্যাপারে তিনি ভাগিনার পরামর্শ নিতেন। দেশব্যাপী সংবাদপত্র নিধন অভিযানের মুখে যে কয়টি পত্রিকা টিকে থাকতে পেরেছে তার একটি হলো শেখ মণির পত্রিকা।

কার্যত মাস কয়েক আগেই অবশ্যম্ভাবী পতনের দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহন দিয়ে শক্তিশালী করা হচ্ছে দেখে

www.bjilibrary.com

সেনাবাহিনী শঙ্কিত হয়ে পড়লো। কয়েকটি রাজনৈতিক উপদলও ক্ষীপ্ত হয়ে উঠলো। কেননা একদিকে তাদের অপসারিত করা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে তাদের চেয়েও বেশি দুর্নীতিবাজদের অবাধ লুটতরাজের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। পদে পদে ভারতের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে দেখে সাধারণ মুসলমানরাও অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো। তাদেরকে পাশ কাটিয়ে একটা পারিবারিক বাদশাহীর ভীত গড়ে তোলা হচ্ছে দেখে মন্ত্রিসভার সদস্যরাও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন।" [ফিনান্সিয়াল টাইমস, লন্ডন, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫]

কিসে ভুল হলো? —*এন্থনি মাসকারেনহাস*

"১৯৭২ সালে নব-প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা। গত সপ্তাহে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহত হয়েছেন। দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তার সম্পর্কে বাংলাদেশের জনগণের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। কিসে ভুল হলো?

মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর উচ্চতর মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ-দুশমনে পর্যবসিত হলেন। তার বিপর্যয়ের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি উপকরণ মিশে আছে।

প্রথমত সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস করতেন। সেনাবাহিনীর বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে, এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।

মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচ্চ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত ইউনিফরমধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতন-ভাতায়, ব্যয়-বরাদ্দে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হতো। উভয়ের মধ্যে স্বার্থের অনেক সংঘাতেই মুজিব অন্ধভাবে রক্ষীবাহিনীকে সমর্থন করতেন।

মুজিবের পতনের দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশ শাসনতন্ত্র ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেওয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তাসূচক প্রমাণিত হয়েছে।

'এক হাজার মসজিদের শহর' বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালিরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম-পাকিস্তানিদের চেয়ে বেশি ধর্মানুরাগী। অপরদিকে, বাঙালি মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিলো বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিলো।

এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে আহত করেছিলো। তাই নতুন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ বাংলাদেশকে ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করে রাতারাতি জনসমর্থন লাভ করেছেন। গত শুক্রবার জুমা'র নামাজের জন্য কারফিউ উঠিয়ে দিয়ে মসজিদে এই জনসমর্থন অভিব্যক্ত হয়েছে।

www.bjilibrary.com

তৃতীয়তঃ মুজিব ক্রমেই জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। আওয়ামী লীগের মোসাহেবেরা তার চারদিকে এমন বেষ্টনী গড়ে তুলেছিলো, যার ফলে জনসাধারণের সঙ্গে তার কোন সংযোগ ছিলো না।

স্পষ্টতই এই বিচ্ছিন্নতা চরমে পৌঁছলো, যখন এ বছর তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র বিলোপ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়াল ও রাশিয়ার একদলীয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক অদ্ভুত শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। মূলত ব্যক্তিগত শাসন পাকাপোক্ত করার জন্যই তা করা হয়েছিলো। বাংলার মানুষ, যারা তিনপুরুষ ধরে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছে, তারা এটা বরদাস্ত করতে পারেনি।

গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যই প্রাক্তন পূর্ব-পাকিস্তান ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়েছিলো। এতদসত্ত্বেও মুজিব তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সাধনে অবিচলিত ছিলেন।

পরিহাস এই যে, এর কোন প্রয়োজন ছিলো না। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায়ও মুজিবের কথায়ই বাংলাদেশ শাসিত হয়েছে এবং তাঁর কথাই ছিলো দেশের আইন। এ ক্ষমতা ও মর্যাদা বাংলার মানুষ জাতির জনককে সরল মনেই দান করেছিলো। মুজিব যখন এ দান আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যক্তিগত করে নিতে চাইলেন তখনই তারা বিদ্রোহ করলো। ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপে তার উপর আঘাত আসলো। আর কোন পথ ছিলো না, মুজিবকে বাঁচিয়ে রাখা ভয়ানক বিপজ্জনক হতো।" [সানডে, টাইমস, লন্ডন, আগস্ট, ১৭, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৬৬-৬৭১)

১৬৫.

শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে —*অমিত রায়*

"বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান নিয়ন্তা হলো শহরের বাসিন্দা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের সমর্থনই মুজিবকে নেতা বানিয়েছিলো, ক্ষমতায় বসিয়েছিলো। কিন্তু শাসনতন্ত্র সংশোধনের ফলে মুজিব তাদের সমর্থন হারিয়ে ফেলেন এবং সেদিন থেকেই নিজেকে অতীতের পাতায় তুলে দিয়েছিলেন।

সমস্যার মোকাবিলা না করে মুজিব গুণ্ডা-বদমাইশ নিয়ে ২৫ হাজার লোকের রক্ষীবাহিনী খাড়া করেছিলেন, যাতে সেনাবাহিনী তার বিদ্রোহ করার সাহস না পায়।

সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রথম অসন্তোষ দেখা দেয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসাররা পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে যখন দেখতে পেলেন যে, তাদের অধীনস্থ অফিসাররা কয়েক ধাপ ডিঙ্গিয়ে কর্তা হয়ে বসে আছেন। গত বছর এই অসন্তোষ প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহের পর্যায়ে এসে পড়েছিলো। সেনাবাহিনীকে মজুতদার ও চোরাকারবারী খুঁজে বের করার কাজে নিয়োগ করা হলো। কিন্তু তাদের অনুসন্ধানের ফলে যখন স্বয়ং মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা জড়িত বলে প্রমাণিত হতে লাগলো তখন তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে পাঠিয়ে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো।

মুজিবের এসব ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন হলেন গাজী গোলাম মোস্তফা, যিনি 'বাংলাদেশের বড় চোর' বলে কুখ্যাত। দুনিয়ার মানুষ দুঃস্থজনের জন্য রেডক্রসের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়েছে, আর বাংলাদেশ রেডক্রসের প্রধান হিসেবে গাজী গোলাম মোস্তফা এসব আত্মসাৎ করে ব্যক্তিগত ধন-সম্পদ বানিয়েছেন।

মোস্তফাকে রেশন-বণ্টন কমিটিরও প্রধান বানানো হয়েছিলো। রেশন দোকানের মালিকরা তারই প্রত্যক্ষ মদদ নিয়ে রেশনের খাদ্যসামগ্রী কালোবাজারে বিক্রি করে দু'হাতে টাকা লুটেছে এবং এ কালো টাকার মোটা অংশ তারা নজরানা হিসেবে মোস্তফার পকেটে তুলে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট কমিটির প্রধান এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি বোর্ডের সদস্য হিসেবেও তিনি খালি জমি ও বাড়ি বিলি-বন্দোবস্তও নিয়ন্ত্রণ করেছেন। এসবের বিনিময়ে তিনি ঘুষ নিয়েছেন দু'হাতে। উপরন্তু ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের প্রধান হিসেবে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির উপরও তিনি কর্তৃত্ব খাটিয়েছেন। মুজিবের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে তিনি ছিলেন আইনের উর্ধ্বে।

ব্যাংক-এ ডাকাতি করে ডাকাতরা পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ গুলী ছুঁড়লো। দেখা গেলো, স্বয়ং মুজিবের বড় ছেলে কামাল আহতদের মধ্যে অন্যতম।

বিগত চার বছরে শেখ মুজিবের আপন ভাই শেখ আবু নাসের যতবার ঢাকা থেকে স্বীয় আদি ব্যবসা-কেন্দ্র খুলনায় গিয়েছেন তার চেয়ে বেশিবার লন্ডনে এসেছেন। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সম্পাদক জিল্লুর রহমান লন্ডনে বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় তিনি ২৩টি বড় বড় বাক্স বোঝাই করে সওদা নিয়ে গেছেন।" [সানডে টেলিগ্রাফ, লন্ডন, আগস্ট ১৭, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৭১-৬৭২)

স্বৈরাচারী শাসনই দায়ী —*লুই সিমনস্*

"বাংলার জ্বলন্ত চুলায় হাত ঢোকাবার জন্য একদিন মিসেস গান্ধীকে অনুশোচনা করতে হবে"— গত বছর এক সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর এ ভবিষ্যদ্বাণী যে এভাবে ফলে যাবে তা হয়তো স্বয়ং ভুট্টোও কল্পনা করেননি।

হঠাৎ এই গতি পরিবর্তন শুধু মিসেস গান্ধীকে নয়; সোভিয়েত ইউনিয়নকেও বিচলিত করতে বাধ্য। এতোদিন তারা চীনকে আগলে রাখার প্রয়াসে বাংলাদেশকে ব্যবহার করে এসেছিলেন।

যদিও এ অভ্যুত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে শেখ মুজিবের স্বৈরাচারী শাসন, তার অযোগ্যতা এবং দুর্নীতিপরায়ণতার কথা তুলে ধরা হয়েছে, তবু প্রথম থেকেই দিল্লী-মস্কোর সাথে বেশি মাখামাখির জন্য জনগণ মুজিবকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলো।

অতীতে যেমন দুঃখ-দুর্দশার জন্য বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ পশ্চিম-পাকিস্তানকে দায়ী করেছে, তেমনি বাংলাদেশ সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যেই অর্থনৈতিক শোষণ চালু করার জন্য ভারত সরকার ও ব্যবসায়ী শ্রেণীকে অভিযুক্ত করছে। পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে উদ্ভূত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে ঘাত-প্রতিঘাতের জন্ম দিয়েছে, তারই ফল হচ্ছে শেখ মুজিবের পতন ও মৃত্যু।

তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সংঘর্ষ মিসেস গান্ধীকে তার বিবদমান প্রতিবেশীকে ঘায়েল করার এক মোক্ষম সুযোগ এনে দিয়েছিলো। সরাসরি পাক-ভারত যুদ্ধ লাগার আগে নয় মাস বাঙালি গেরিলারা সক্রিয় ছিলো বটে; কিন্তু ভারতই তাদের অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছে।" [ওয়াশিংটন পোস্ট, ১৮ আগস্ট ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৭৩)

www.bjilibrary.com

শেখের ট্রাজেডি —*হার্ভে স্টকউইন*

বঙ্গোপসাগর থেকে প্রায়ই যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিবার্তা বাংলাদেশের উপর আসে, শেখ মুজিব ছিলেন তারই মানবীয় রূপ। রাজনৈতিক মঞ্চে তাঁর দীপ্ত পদচারণার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ও আবেগের উচ্ছ্বাসে সবকিছু তলিয়ে গেলো। আজ মুজিব মঞ্চ থেকে চিরকালের মতো সরে গেছেন, কিন্তু দেশকে রেখে গেছেন রিক্ত, নিঃসহায় করে। তাঁর আমলে কি ক্ষতি সাধিত হয়েছে তার চূড়ান্ত হিসাব কেবল এখনি শুরু হতে পারে।

মূলত শেখ ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি ঘটনাবলির পশ্চাতে এগিয়ে গেছেন। বিক্ষোভকারীর সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন। বিক্ষোভকারীর ভূমিকা থেকে নিজেকে কখনো তিনি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি এবং পরিণতিতে বিক্ষোভকারীর মৃত্যুকেই তিনি বরণ করে নিয়েছেন।

শেখের মধ্যে তাঁর গুরু সোহরাওয়ার্দীর রাজনৈতিক সূক্ষ্মতা বা চাতুর্য ছিলো না। ১৯৪৬ সালে দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরূপে সোহরাওয়ার্দী পৃথক বাঙালি জাতীয় রাষ্ট্রের কথা তুলেছিলেন। ২৪ বছর পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সেই বাংলাদেশের সৃষ্টি হলো। কিন্তু সারা জীবন নেতিবাচক রাজনীতি করার ফলে নতুন জাতিকে বাস্তব কিছু দেবার সামর্থ্য তার হলো না। এ রায় কর্কশ শোনাবে। হয়তো আংশিকভাবে এই কঠোর মন্তব্যের উদ্ভব হয় ১৯৫৭ সালে যখন এক কাঁদানে গ্যাসসিক্ত পরিবেশে মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। তিনি তখন পূর্ব-পাকিস্তান মন্ত্রিসভার সদস্য (আমার যদি ঠিক স্মরণ থাকে, তিনি তখন বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী ছিলেন)। আওয়ামী লীগের মোকাবিলা করার জন্য তখন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করা হচ্ছিলো। সিন্ধু প্রদেশ থেকে আসলেন জি. এম. সৈয়দ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আসলেন খান আবদুল গফফার খান। ন্যাপের অপর একজন প্রতিষ্ঠাতা হলেন মাওলানা ভাসানী। ভাসানীকে শেখ মুজিব বরাবরই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখেছেন। কেননা ভাসানীই ছিলেন তার একমাত্র সমতুল্য গণবক্তা।

সকলেরই জানা ছিলো যে, ঢাকার ন্যাপের এই উদ্বোধনী সভা পণ্ড করতে শেখ মুজিব মনস্থ করেছেন। এবং ঠিকই, যেই মাত্র ন্যাপের উৎসাহী সমর্থকরা পল্টন ময়দানে জমায়েত হতে লাগলো, অমনি শেখের ভাড়াটিয়া গুণ্ডারা গোলযোগ সৃষ্টি করতে শুরু করলো। মুহূর্তের মধ্যেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারা জারি করে সভা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করতে লাগলো।

১৯৭১ সালের ঘটনাপ্রবাহ শেখকে জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতার শীর্ষে পৌছে দিলো। কিন্তু যে আশা-আকাঙ্ক্ষা তিনি উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা কার্যত পূরণ করার সামর্থ্য তার ছিলো না। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন, তারপর প্রধানমন্ত্রী এবং এ বছরের জানুয়ারি মাসে আবার প্রেসিডেন্ট হলেন। শেখ ক্ষমতা ও খেতাব নিয়ে খেলা করেছেন, বাংলাদেশের আর্থিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য আদৌ কিছু করেননি। বাহ্যত সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তার কর্তৃত্ব ক্ষয়ে যেতে শুরু করেছিলো।

শেখ কেন কিছুই করতে পারলো না, তার কয়েকটি কারণ রয়েছে ঃ প্রথমত, ক্ষমতা সম্পর্কে তার অত্যধিক নিজস্ব মতবাদ ছিলো। দ্বিতীয়ত, তাঁর মধ্যে একটা গভীর

www.bjilibrary.com

হীনম্মন্যতার ভাব (ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স) ছিলো, যা আংশিকভাবে তার শিক্ষার অভাববোধ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তৃতীয়ত, শেখ কখনোই বাংলাদেশের সুশিক্ষিত তর্কপ্রিয় বুদ্ধিজীবীদের কিংবা বিজ্ঞ সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। এর ফলে শেখ ও বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ব্যবধান বিদ্যমান ছিলো। কোন পক্ষই তা দূর করার চেষ্টা করেননি। বুদ্ধিজীবীদের প্রয়োজন ছিলো শেখের, যেহেতু তার বিপুল জনসমর্থন। আর শেখেরও প্রয়োজন ছিলো বুদ্ধিজীবীদের, কেননা একটা দেশের সমূহ সমস্যাবলি মোকাবিলা করার সাধ্য তার ছিলো না। [ফার ইস্টার্ন ইকনমিক রিভিয়ু, আগস্ট ২৯, ১৯৭৫] (পৃষ্ঠা : ৬৭৪-৬৭৭)

বিদেশী বিখ্যাত কয়েকটি পত্রিকায় সম্পাদক ও কলামিস্টদের লেখা থেকে শেখ মুজিবের পতন সম্পর্কে তাদের মতামত ও মন্তব্য এ কথাই প্রমাণ করে যে, মুজিব হত্যা মোটেই অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক ছিলো না। এ করুণ পরিণতির জন্য শেখ মুজিব স্বয়ং দায়ী। সামরিক বিপ্লব ছাড়া শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির আর কোন পথই ছিলো না। ঐসব লেখা থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, তারা ঐ বিপ্লবকে একটি সফল বিপ্লব হিসেবেই গণ্য করেন। সর্বস্তরের জনগণ ঐ পট-পরিবর্তনকে তাদের জন্য কল্যাণকর হিসেবেই স্বাগত জানিয়েছে। তাই মুজিব হত্যা বিচারযোগ্য কোন অপরাধ ছিলো না।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফের প্রতিবিপ্লব

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ স্বীয় নেতৃত্বে ১৫ আগস্টের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবিপ্লব ঘটাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালান তা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণ করে যে, সেনাবাহিনীর সিপাহীগণ ও জনগণ তা মোটেই সমর্থন করেনি। তখন সেনাপ্রধান ছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। ব্রিগেডিয়ার খালেদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার উদ্দেশ্যে এমন এক অস্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করেন, যার পরিণতিতে তিনি নিজেও নিহত হন এবং আরও অনেক অফিসার সিপাহীদের হাতে প্রাণ হারান।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফের সামরিক বিপ্লব ঘটাবার প্রচেষ্টার পর্যালোচনা করার আগে এ সম্পর্কে তার সমর্থক আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী রচিত গ্রন্থ 'রাজনীতির তিন কাল' থেকে তার বিবরণ প্রথমে উদ্ধৃত করছি ঃ

"এদিকে বঙ্গভবনে অবস্থানকারী ১৫ আগস্টের খুনী মেজর চক্রের লাগামহীন খবরদারিতে ক্যান্টনমেন্টে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। খালেদ মুশাররফের নেতৃত্বে একদল অফিসার সেনাবাহিনীতে চেইন অফ কমান্ড প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। কিন্তু নতুন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান ছিলেন ফারুক-রশীদদের অত্যন্ত আস্থাভাজন। তাছাড়া এই চক্রের কাছে স্বয়ং মোশতাক ছিলেন বাধ্য। ফলে জিয়াউর রহমানও দাবি অনুযায়ী সেনাবাহিনীতে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন না। খালেদ মুশাররফের গ্রুপ বলতে লাগলো, কয়েকজন অফিসার ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে বঙ্গভবনে বসে সব কলকাঠি নাড়বে, তা হতে পারে না। ওদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এসে সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলার মধ্যে আসতে হবে। এ নিয়ে দুই পক্ষে শুরু হয় উত্তেজনা। অবশেষে খালেদ মোশাররফ সিদ্ধান্ত নেন, প্রয়োজনে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে বাদ দিয়েই শক্তি প্রয়োগ করে বঙ্গভবনের মেজরদের সেনানিবাসে ফিরিয়ে আনা হবে।

www.bjilibrary.com

এর পরের কয়েকটি ঘটনা দ্রুত ঘটে চলে। ২ নভেম্বর দুপুর থেকেই সেনানিবাস থেকে ট্রুপস মুভমেন্ট শুরু হয়। ফারুক-রশীদরা বুঝতে পারে, তাদের দিন শেষ হয়ে আসছে। কারণ শো পিস ট্যাংক দিয়ে আর যাই হোক, পুরো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না। তাছাড়া তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন। এদের ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য বিমানবাহিনীর মিগ আকাশে উড়ানো হয়। বিমানগুলো কয়েকবার বঙ্গভবনের উপর দিয়েও চক্কর দেয়। ভাবখানা এমন, প্রয়োজনে বঙ্গভবনেও বোমা ফেলা হবে। ফারুক-রশীদরা ভয় পেয়ে যায়। মোশতাক বুঝতে পারেন এই মেজররাই তার ক্ষমতার ভিত্তি, এরা যদি চলে যায় তার কোন অস্তিত্ব থাকবে না। সে কারণে তার অনুপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের আর কেউ যেন নেতৃত্ব দিতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেন আরেক ঘৃণ্য পরিকল্পনা। ওই দিন গভীর রাতে জিরো আওয়ারের পরে একদল ঘাতক পাঠিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে হত্যা করা হয়। এই জেলহত্যা বঙ্গভবনের সরাসরি নির্দেশে ঘটানো হয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সফল এই চার নেতাকে সরকারি নিরাপত্তা হেফাযতে থাকা অবস্থায় হত্যার সংবাদে পরদিন মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

৩ নভেম্বর দিনের মধ্যেই ফারুক-রশীদরা ক্যান্টনমেন্টের সঙ্গে একটা আপস-রফায় আসেন। তারা বলেন, বঙ্গভবন ছেড়ে তারা আর সেনানিবাসে ফিরে যাবেন না। কারণ তারা বুঝতে পারছিলো, যে চেইন অফ কমান্ড তারা ভঙ্গ করেছে তার শাস্তি এক্ষেত্রে কোর্ট মার্শাল। রক্ত ঝরানো এড়াতে তারা দেশত্যাগের অনুমতি চায়। খালেদ মোশাররফ অযথা আরো প্রাণহানির পথে না গিয়ে তাদের সে প্রস্তাব মেনে নেন। ফলে বঙ্গভবন থেকেই ১৫ আগস্টের খুনিচক্র বিমানবন্দরে চলে যায়। ঢাকা থেকে প্রথমে তারা ব্যাংকক এবং পরে লিবিয়ায় যায়।

৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে মোশতাকের সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠক চলাকালে কর্নেল শাফায়াত জামিলের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র সৈনিক সভাস্থলে উপস্থিত হয়ে সবাইকে হ্যান্ডসআপ করায় এবং মোশতাককে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলে গালিগালাজ করতে থাকে। মোশতাক ও তার মন্ত্রিপরিষদের সব সদস্যকে হত্যা করে ৩২ নম্বর থেকে শুরু করে জেলাখানা পর্যন্ত সব হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। মোশতাকসহ মন্ত্রিপরিষদের সবারই তখন অত্যন্ত করুণ অবস্থা। তারা তাক করা অস্ত্রের সামনে ভীত ভেড়ার মতো কাঁপতে থাকে। এ সময় জেনারেল খলিলুর রহমান উত্তেজিত সৈনিকদের বোঝানোর চেষ্টা করতে গিয়ে ধমক খান। তবে শেষ পর্যন্ত জেনারেল ওসমানী তাদের নিবৃত্ত করেন। এ সময় খন্দকার মোশতাক উদাসভাবে জিজ্ঞেস করেন, "তোমরা আমার কাছে কি চাও?" জবাবে তারা জেনারেল জিয়াকে বরখাস্ত করে তার স্থলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করতে বলে। মোশতাক তাদের এই দাবি মেনে নেন। তাদের দাবি অনুযায়ী বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে প্রধান করে জেল হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। হত্যাকারীদের কি কারণে কি পরিস্থিতিতে দেশত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়, সেটা নিরূপণের দায়িত্বও তদন্ত কমিটিকে দেওয়া হয়। (পৃষ্ঠা : ১৭২-১৭৩)

www.bjilibrary.com

৩ নভেম্বর রাতেই খালেদ মোশাররফকে সেনাবাহিনী প্রধান নিযুক্ত করা হয়। এই খালেদ মোশাররফ মুক্তিযুদ্ধকালে অসীম সাহসী বীরের ভূমিকা রেখেছিলেন। খালেদ মুশাররফের নতুন সেনাপ্রধান নিযুক্তি এবং ১৫ আগস্টের ঘাতকদের দেশত্যাগ সাধারণ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেন ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ক্ষমতায় কারা আসছে। এর মধ্যে পরের দিন ৪ নভেম্বর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থক একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে একটি নাগরিক শোক মিছিল ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আসে। এ মিছিলে জেনারেল খালেদ মুশাররফের বৃদ্ধা মাতাও ছিলেন। পরদিন এই মিছিলের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হলে মুহূর্তে খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগপন্থি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। এ রকম একটা অবস্থার সুযোগ নেয় জাসদ এবং তাদের গোপন সংগঠন বিপ্লবী গণবাহিনী। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে এই সংগঠনটির তৎপরতা আগে থেকেই সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে ছিলো। ক্যান্টনমেন্টে এ রকম একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে তাহেরের অনুসারীরা "দেশ ভারতের দখলে গেলো" বলে কিছু তরুণ অফিসারকে এবং "অফিসারদের এই সুযোগে সাইজ করতে হবে" এ কথা বলে সাধারণ সৈনিকদের সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়।

৪ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে ক্যান্টনমেন্টে থেমে থেমে মাইকে ঘোষণা করা হতে থাকে, "ভারতীয় সৈন্যরা বাংলাদেশ দখলের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং তাদের সহযোগী খালেদ মোশাররফকে হটাতে হবে।" ভারতবিরোধী বক্তব্য ও খালেদ মোশাররফকে ভারতের দালাল বলে প্রচারপত্র বিলি হতে থাকে। এরই মধ্যে নিহত চার জাতীয় নেতার দাফন সম্পন্ন হয়। খালেদ মুশাররফের দাবি অনুযায়ী ৫ নভেম্বর খন্দকার মোশতাক বিচারপতি আবু সাদত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ৬ নভেম্বর জাতীয় সংসদ বাতিল করা হয়। বিচারপতি সায়েম আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জেল হত্যার ঘটনাটি আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সমর্থকসহ সব স্তরেই ভীতির সঞ্চার করে। আমি নিজেও ক'দিনের জন্য গা-ঢাকা দেই। কিছুদিন আগাখানী ইউনুসের বাসায় এবং কিছুদিন শুক্রাবাদে আমার স্ত্রীর বোনের বাসায় আশ্রয় নেই।

কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে সাধারণ সৈনিক এবং এনসিও ও জেসিও র‍্যাঙ্কের অফিসাররা এবারের অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়। 'সিপাহী জনতা ভাই ভাই' এই স্লোগান দিয়ে ৬ নভেম্বর রাতেই এরা রেডিও স্টেশন দখল করে নেয়। জিয়া তখন সেনানিবাসে গৃহবন্দি। এরা জিয়াকে মুক্ত করে। এক পর্যায়ে বঙ্গভবন দখল করে নেয়। খালেদ মোশাররফ, মেজর হুদা ও মেজর হায়দার পালাতে গিয়ে সৈনিকদের গুলিতে নিহত হন। শাফায়াত জামিলসহ কয়েকজন আহত হয়। ৭ নভেম্বর সকালে ঢাকার রাজপথে আবার ট্যাঙ্ক দেখা যায়। সৈনিকরা তাতে জিয়াউর রহমান এবং মোশতাকের ছবি নিয়ে উল্লাস করে। জিয়া মুক্তি পেয়ে বেতার ভাষণের মাধ্যমে নিজেকে সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করে প্রথম বিশ্বাসভঙ্গ করেন তার মুক্তির পরিকল্পনাকারী ৭ নভেম্বরের রূপকার কর্নেল তাহেরের সঙ্গে।

www.bjilibrary.com

এভাবেই ঘটে গেলো ক্ষমতার আরেক দফা পালাবদল। মোশতাক অপসৃত হলেন। ১৫ আগস্টের খুনিচক্র দেশছাড়া হলো। যারা এদের দেশছাড়া করলো, সেই খালেদ মোশাররফও নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন। ক্ষমতায় আসীন হলেন জিয়াউর রহমান।" (পৃষ্ঠা : ১৭১-১৭৪)

৩ নভেম্বরের বিদ্রোহের পর্যালোচনা

খন্দকার মোশতাক আহমদের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার ৭৯ দিন পর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। দেশের কোথাও জনগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সামান্য অসন্তোষের খবরও পাওয়া যায়নি। দেশ ও জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে ঐ বিদ্রোহ করা হয়নি। জনাব মিজান চৌধুরীর বর্ণনা অনুযায়ী কতক কর্নেল ও মেজর প্রেসিডেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে কর্তৃত্ব করছে এবং সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলে ব্রিগেডিয়ার ও সিনিয়র অফিসারদের আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। তাই মুজিব হত্যাকারী জুনিয়র আর্মি অফিসারদেরকে সেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ড মেনে চলতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যেই ঐ বিদ্রোহ করা হয়।

সেনাবাহিনীর মর্যাদা বহাল করা ও চেইন অব কমান্ড কায়েম করাই যদি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের উদ্দেশ্য হতো তাহলে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর জেনারেলদের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা করে ঐ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করা উচিত ছিলো। তিনি সেনাপ্রধানকে গৃহবন্দি করে সকল জেনারেলকে ডিঙ্গিয়ে অন্যায়ভাবে শক্তিপ্রয়োগ করে তাঁকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার জন্য প্রেসিডেন্টকে বাধ্য করলেন। তার এ কর্মটি কি চেইন অব কমান্ডের জঘন্য লংঘন নয়? তার ঐ বিদ্রোহ নিছক ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার হীন উদ্দেশ্য বলেই প্রমাণিত হলো। এ কর্মটি করে তিনি সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করলেন এবং পরিণামে সিপাহীদের হাতে তিনি এবং আরও অনেক অফিসার নিহত হলেন। এতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরাট ক্ষতি হয়ে গেলো। এর জের ধরে আরও অনেক অফিসার চাকরিচ্যুত হন।

১৬৬.

শেখ মুজিবের কুশাসনের আরও কতক তথ্য

ইতঃপূর্বে শেখ মুজিবের কুশাসন সম্পর্কে কয়েকজন প্রখ্যাত রাজনীতিকের লেখা বই থেকে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছি। আগস্ট বিপ্লবের অন্যতম নায়ক এবং রেডিওতে মুজিব হত্যার খবর ঘোষণাকারী মেজর শরিফুল হক ডালিমের (পরবর্তীতে লে. কর্নেল অব.) লেখা প্রায় সাড়ে পাঁচশ' পৃষ্ঠার গ্রন্থটি তখন পড়ার সুযোগ পাইনি। "যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি" নামে লেখাটি পড়ে এমন কতক তথ্য জানতে পেরেছি, যা বিভিন্ন সময় লোকমুখে কিছু শুনলেও সঠিক তথ্য পাইনি। আগস্ট বিপ্লবের পটভূমি সম্যক বুঝতে হলে এবং বিপ্লবের বিস্ময়কর সাফল্য ও বিপ্লবের পক্ষে বিপুল জনসমর্থনের কারণ অনুধাবন করতে হলে মেজর ডালিমের বই-এর মূল্যবান তথ্যসমূহ এখনও সবার জানা প্রয়োজন মনে করি। তাই এ কিস্তিতে তা পরিবেশন করছি। লে. কর্নেল (অব.) ডালিমের লেখা বইটির প্রকাশক নবজাগরণ প্রকাশনী, ৪৩৫/এ বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.bjilibrary.com

লে. কর্নেল (অব.) ডালিমের লেখা বইটি থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তথ্য পাওয়া গেলো, যা মুজিব শাসন ও সেনাবাহিনীর মধ্যে বিরোধের পটভূমি স্পষ্টরূপে তুলে ধরে।

১. সেনাবাহিনীর যেসব অফিসার সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় চরম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকায় তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁরা সেনাবাহিনীতে দায়িত্ব পালনকালেও তাঁদের মধ্যে ঐক্যবোধ বহাল ছিলো।

২. মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর শেখ মুজিবের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হলো তাতে শুধু আওয়ামী লীগের নেতারাই একচেটিয়া কর্তৃত্ব দখল করা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের নিকট তারা আশা করেছিলেন যে, তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে দলীয় স্বার্থের চেয়ে দেশ ও জনগণের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে সরকারে শরীক করলে তাঁরা অবশ্যই খুশি হতেন।

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন সেক্টরে সেনাবাহিনীর অফিসাররাই সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বেই মুক্তিবাহিনীর যোদ্ধারা যুদ্ধে দায়িত্ব পালন করতো। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক কিশোর, তরুণ ও যুবক মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে। এদের মধ্যে যারা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী ছিলো না, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, আনুগত্য ও কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিয়েছে।

৪. মুজিব সরকারের প্রথম এক বছরের শাসনেই মুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসাররা হতাশা বোধ করেন। পবিত্র দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধ করলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার দেশ গড়ার প্রেরণা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে জনগণের খিদমত করবে এবং সকল দিক দিয়ে দেশকে উন্নত করার চেষ্টা করবে– এ আশাই তাঁরা করছিলেন। মন্ত্রী, এমপি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের থেকে শুরু করে সর্বস্তরে আওয়ামী লীগের লোকেরা দেশটাকে নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে সবাই বিত্তশালী হবার প্রতিযোগিতায় লেগে গেলো। শেখ মুজিব নিজের ছেলেদেরকে পর্যন্ত এসব অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করলেন না। এ অবস্থায় হতাশ হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসাররা গোপনে 'সেনা-পরিষদ' নামে সংগঠিত হওয়ার উদ্যোগ নিলেন।

৫. সেনা-অফিসাররা সাধারণত রাজনীতি-নিরপেক্ষই হয়ে থাকেন। যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় থাকে, সে দলের নির্দেশ পালনই তাদের স্বভাব। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা যারা পালন করেছেন তাঁরা শুধু অফিসারের মনোভাব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। শুধু দেশ রক্ষাই নয়, দেশ গড়ার জযবাও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। দেশকে স্বাধীন করার জন্য জনগণের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে জীবনবাজি রেখে তারা যুদ্ধ করেছেন দেশ ও জাতির কল্যাণের আশায়। তাঁরা কোন রাজনৈতিক দলের লোকদের ব্যক্তিগত স্বার্থের সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। তাই তাদের মধ্যে সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু অসন্তোষ নয়, ক্ষোভ সৃষ্টি হবারই কথা।

www.bjilibrary.com

৬. বিভিন্ন কারণে শেখ মুজিব উপলব্ধি করলেন যে, সেনাবাহিনী তাঁর সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় তাঁর গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে রক্ষীবাহিনী নামে বিকল্প সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন এবং সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করার যোগ্য শক্তিতে পরিণত করলেন। রক্ষীবাহিনীর ইউনিফর্ম ভারতের সীমান্তে নিযুক্ত বাহিনীর অনুরূপ হওয়ায় এ সন্দেহও সৃষ্টি হল যে, বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে ঠেকাবার জন্য ভারতের বাহিনীকেও রক্ষীবাহিনী হিসেবে কাজে লাগাতে পারে। এসব কারণে সেনাবাহিনীর অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেলো।

মুজিব সরকারের সাথে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা বিশেষভাবে দায়ী। সেসব ঘটনা আমার ভাষায় প্রকাশ করার চেয়ে কর্নেল ডালিমের লেখা থেকে পরিবেশন করাই আমি অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করি। ঘটনাগুলো নিম্নরূপ ঃ

প্রথম ঘটনা

আন্টি স্মাগলিং অপারেশন সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি। এ থেকেই তৎকালীন সরকারের চরিত্র সম্পর্কে তারা ধারণা করতে পারবেন। দিনাজপুরের অপারেশন কমান্ডার একদিন ঢাকায় কন্ট্রোল রুমে খবর পাঠালো, চারজন মারোয়াড়ী স্মাগলার আর্মির ভয়ে ঢাকায় গিয়ে জনাব মনসুর আলীর ছেলে নাসিমের সাহচর্যে তার বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করে আত্মগোপন করে আছে। ঢাকায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করে মারোয়াড়ীদের গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের হস্তক্ষেপে ঢাকার এরিয়া কমান্ডার জনাব মনসুর আলীর বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত বাদ দিতে বাধ্য হন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চাপের মুখেই আর্মি হেডকোয়ার্টার্স থেকে এ ধরনের হস্তক্ষেপ হয়েছিলো। ঐ ঘটনার পর সরকার আর্মির তৎপরতা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। অপারেশনের ফলে একদিকে সেনাবাহিনীর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অন্যদিকে সরকার ও তার দলের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে পড়ায় ক্ষমতাসীনরা বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এ অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ভেবে উভয় সংকটে পড়লো সরকার ও সরকারি দল। এই অবস্থাতেও দাতাগোষ্ঠীর চাপে সরকার বাধ্য হয়ে সামরিক বাহিনীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলো খাদ্যসামগ্রী দেশের সকল অঞ্চলে সময়মত পৌঁছে দেবার। সেনাবাহিনী শুরু করলো 'অপারেশন ফুড'। এই অপারেশনেও অভূতপূর্ব সফলতা অর্জন করে সেনাবাহিনী তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের মাধ্যমে। এই অপারেশন আর্মির হাতে দেওয়ায় ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয় সরকারি দলের মাঝে। কারণ তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিলো প্রতিক্ষেত্রে। সব পর্যায়ে দলীয় স্বার্থের পরিপন্থী এই সমস্ত অপারেশন বন্ধের জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হলো প্রধানমন্ত্রীর উপর। তিনি দলীয় স্বার্থের খাতিরে জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অবিলম্বে সামরিক বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যাবার নির্দেশ দেন। এতে জনগণের মনে দারুণ ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনী বাধ্য হয়ে ব্যারাকে ফিরে আসে। সরকার প্রধানের এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের ফলে সেনাবাহিনীর সদস্যরা হতাশ হয়ে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে কর্নেল জিয়াউদ্দিন (ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার) অভিমত প্রকাশ করেন, "বর্তমান সরকারের অধীনে সামরিক বাহিনীতে থেকে জনগণের স্বার্থে কাজ করা সম্ভব নয়।

www.bjilibrary.com

সরাসরিভাবে সরকারের বিরোধিতা করাও সম্ভব নয়। তাই সরকারি অপশাসন ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনগণের মাঝ থেকেই গড়ে তুলতে হবে দুর্বার প্রতিরোধ সংগ্রাম।" তার অভিব্যক্তিতে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পেলাম, তিনি সক্রিয় রাজনীতির কথা ভাবছেন। তার অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে সেনাপরিষদের মনোভাব ছিলো—তার বক্তব্য অবশ্যই যুক্তিসম্পন্ন। সরকারবিরোধী আন্দোলনকে বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে গতিশীলতা সৃষ্টি করেই। মূলত এ দায়িত্ব পালনের ভার দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দল ও নেতৃত্বের উপর। তবে আমরাও সেনাবাহিনীর ভেতরে অবস্থান করেও জনগণের আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবো যদি নিজেদের সংগঠিত করতে পারি।

১৯৭২ সালের গ্রীষ্মকালে সাপ্তাহিক হলিডে-তে কর্নেল জিয়াউদ্দীন তার সাড়া জাগানো নিবন্ধ প্রকাশ করেন। এ নিবন্ধের মাধ্যমে তিনি সরাসরি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি ক্ষমতাসীনদের বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। তিনি তার নিবন্ধে লেখেন, "Independence has become an agony for the people of this country. Stand on the street and you see purposeless, spiritless, lifeless faces going through the mechanics of life. Generally, after a liberation war, the new spirit carries through and the country builds itself out of nothing. In Bangladesh, the story is simply other way round. The whole of Bangladesh is either begging or singing sad songs or shouting without awareness. The hungry and poor are totally lost. The country is on the verge of falling into the abyss."

নির্ভীক এই মুক্তিযোদ্ধা এই নিবন্ধে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পঁচিশ বছরের গোপন চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের উল্লেখ করে তিনি বলেন, "We fought without him and won. If need be we will fight again without him."

শেখ মুজিবুর রহমান সে সময় লন্ডনে গলব্লাডার অপারেশনের পর সুইজারল্যান্ডের এক স্বাস্থ্যনিবাসে অবস্থান করছিলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে জানতে পেরে তড়িঘড়ি করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। কর্নেল জিয়াউদ্দিনের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক কষ্টের এবং ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা নিয়ে যে কোন ষড়যন্ত্রের বিরোধিতা করতে আবার প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে দ্বিধাবোধ করবেন না তারা। তার এই লেখা থেকে দেশবাসী প্রথম পরিষ্কারভাবে জানতে পারেন, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। প্রমাদ গুনলেন আর্মি চিফ শফিউল্লাহ। তিনি জিয়াউদ্দিনকে হাতে-পায়ে ধরে অনেক মিনতি করেছিলেন, যেন শেখ সাহেব ফিরে এলে ছাপানো নিবন্ধের জন্য তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। কারণ শফিউল্লাহ বুঝতে পেরেছিলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনের লেখা রাজনৈতিক মহলে বিশেষ করে তরুণ ও ছাত্রসমাজ এবং সেনাবাহিনীতে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সেনাবাহিনীতে কোন প্রকার বিস্ফোরণ যাতে না ঘটে তার জন্যই মিনতি জানিয়েছিলেন তিনি। শেখ মুজিব দেশে ফিরে বিস্ফোরণমুখ অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরে জেনারেল শফিউল্লাহকে জিজ্ঞেস

www.bjilibrary.com

করেন কি করে অবস্থার সামাল দেওয়া যায়? শফিউল্লাহ শেখ সাহেবকে জানালেন, নিবন্ধ ছাপানোর পর কর্নেল জিয়াউদ্দীনের ভাবমূর্তি তরুণ অফিসার এবং জোয়ানদের মধ্যে আরো বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কর্নেল জিয়াউদ্দিনের প্রতি কোন কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হলে আর্মির মধ্যে আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। শেখ মুজিব তার মোড়লি বুদ্ধি দিয়ে ঠিক করলেন কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে ডেকে কিছু বকাবকি করে তাকে দিয়ে কৌশলে মাফ চাইয়ে নেবেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলা হলো জেনারেল শফিউল্লাহকে। গণভবনে জিয়াউদ্দিনকে নিয়ে এলেন শফিউল্লাহ। প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে স্যালুট করে দাঁড়াতেই গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব, "তুমি কোন্ সাহসে এ ধরনের নিবন্ধ ছাপালে? জানো, তোমার অপরাধ রাষ্ট্রদ্রোহিতার সমান? সামরিক বাহিনীতে চাকরিরত অবস্থায় এ ধরনের লেখা ছাপানো বেআইনী। আমি তোমাকে এ ধরনের গুরুতর অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তি দিতে পারি। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তোমার বিশেষ অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এবারের মতো তোমাকে আমি মাফ করবো যদি তুমি শফিউল্লাহকে লিখিতভাবে দাও যে, তুমি অন্যায় করেছো।" একনাগাড়ে বলে গেলেন শেখ মুজিব। সবকিছুই চুপ করে শুনলেন জিয়াউদ্দিন। তিনি জবাব দিলেন, "শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী। আপনার দয়া-দাক্ষিণ্য আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কারণ আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি যা লিখেছি সেটা আমার বিশ্বাস। অতএব ক্ষমা চাওয়ার কিংবা ক্ষমা পাওয়ার কোন অবকাশ নেই এখানে। আপনি ঠিকই বলেছেন যে, চাকরিতে থাকাকালীন অবস্থায় এ ধরনের লেখা ছাপানো অন্যায়। তাই আমি আমার কমিশনে ইস্তফা দিয়েই আমার নিবন্ধ ছেপেছি।" এভাবেই সেদিন শার্দুল সন্তান কর্নেল জিয়াউদ্দিন শেখ মুজিবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে গণভবন থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার বেরিয়ে আসার পর শফিউল্লাহকে শেখ মুজিব অনুরোধ করেছিলেন জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার জন্য। হেডকোয়ার্টার্সে ফিরে এসে জেনারেল শফিউল্লাহ, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ প্রমুখ অনেকেই কর্নেল জিয়াউদ্দিনকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। জিয়াউদ্দিন তাদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন তার শাণিত জবাব দিয়ে। তিনি বলেছিলেন, নিজের আত্মার সাথে বেঈমানী করতে পারবেন না সামান্য চাকরির লোভে। তাছাড়া তাদের মতো মেরুদণ্ডহীন কমান্ডারদের অধীনে একই সংগঠনে তাদের অধীনস্থ হয়ে চাকরি করে তিনি তার আত্মসম্মান খোয়াতে রাজি নন। এভাবেই সেনাবাহিনীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি পরে সর্বহারা পার্টিতে যোগদান করেন। এ ঘটনার কিছুদিন পর অন্যায়ভাবে কর্নেল তাহেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাকে ড্রেজার অর্গানাইজেশনের পরিচালক পদে নিয়োগ করা হয়। এই নতুন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর কর্নেল তাহের জাসদের সশস্ত্র গোপন সংগঠন 'গণবাহিনী' গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেনাবাহিনী থেকে তাকে বের করে দেবার পরও আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি কখনো। আমরা আমাদের স্ব স্ব অবস্থানে থেকে একই লক্ষ্যে কাজ করে যেতে থাকি। [পৃষ্ঠা : ৪০৮-৪১০]

দ্বিতীয় ঘটনা

১৯৭৩ সালের নির্বাচনের আগে অবৈধ চোরাচালানের ফলে রিলিফ বিতরণের ক্ষেত্রে চরম অরাজকতার সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে সরকার চোরাচালান দমন করার জন্য সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করে। সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসার এবং সদস্যরা

www.bjilibrary.com

তাদের সর্বশক্তি দিয়ে চোরাচালান বন্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের আন্তরিকতা অল্পসময়ের মধ্যেই জনগণের মনে আশার সঞ্চার করে। এই অপারেশনের নাম ছিলো 'অ্যান্টি স্ম্যাগলিং অপারেশন'। আমরা সমমনা সবাই সিদ্ধান্ত নেই যদিও তখনো আমরা সুগঠিত নই তবুও যে কোন ত্যাগের বিনিময়েই আমাদের দায়িত্ব পালন করে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটাবো। এ সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে আমাদের। এই অপারেশন করার সময়ই তরুণ অফিসার এবং সৈনিকগণ ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ও টাউট বাটপারদের অসৎ চরিত্র এবং সম্পদ গড়ে তোলার লোভ-লালসার অভিলাষ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করতে সমর্থ হন। রাজনৈতিক নেতা ও টাউটদের সঙ্গে তারা মুখোমুখি দ্বন্দ্বে আসার সুযোগ পান। আমরা অপারেশন কমান্ডার হিসেবে প্রতিজ্ঞা করি পেটের ক্ষুধার তাড়নায় যে ট্রাক ড্রাইভার কিংবা পোর্টার বোঝা বয়ে চোরাচালানের সামগ্রী বর্ডারের ওপারে নিয়ে যাচ্ছে, জীবনে ঝুঁকি নিয়ে তাদের ধরেই ক্ষান্ত হবো না, আমাদের প্রচেষ্টা হবে চোরাচালানের মূল ব্যক্তিদের জনসম্মুখে প্রকাশ করা। ক্ষমতাবলয়ের ঐ সমস্ত অসাধু রুই-কাতলাদের উন্মোচন করা; যারা পর্দার অন্তরালে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতীয় সম্পদের চোরাচালানের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলছে জনগণের লাশের উপরে। অল্প সময়েই জানা গেলো সব সীমান্তে চোরাচালানের মূলে রয়েছে ভারতের একটি প্রভাবশালী মারোয়াড়ী গোষ্ঠী এবং সরকারি দলের ক্ষমতাশালী মন্ত্রী ও নেতারা। শেখ মুজিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ আবু নাসের, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী, তদীয় পুত্র নাসিম, বন ও মৎস্য মন্ত্রী সেরনিয়াবাত তদীয় পুত্র হাসনাত। গাজী গোলাম মোস্তফা সরাসরিভাবে ঐ মারোয়াড়ী চক্রের সাথে জড়িত বলেও তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে এবং সরেজমিনে তদন্তের ফলে। সব ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে আমরা তাদের চরিত্র এবং দুষ্কর্মের ফিরিস্তি তুলে ধরতে থাকি জনগণের কাছে। অফিসার এবং সৈনিকরা পরিষ্কার বুঝতে পারেন দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল এবং নেতারাই হচ্ছে দেশের দুর্গতির মূল উৎস। তাদেরই যোগসাজশে লুটেরারা দেশ ও জাতিকে দেউলিয়া করে তুলছে। সেনাপরিষদের প্রচারণা এবং সরকার সম্পর্কে সংগঠনের মূল্যায়নের সত্যতা নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করার সুযোগ পান সেনা সদস্যরা। তারা বুঝতে পারেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই চাকরি ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেনাপরিষদের নেতৃত্ব এবং সদস্যরা তাদের সচেতনতা বাড়াবার জন্য নিবেদিতপ্রাণ হয়েই সবকিছু করছিলেন। এর ফলে সেনাপরিষদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাও বেড়ে গিয়েছিলো। এভাবেই সেনাবাহিনীতে সেনাপরিষদের ভাবমূর্তি এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। [পৃষ্ঠা : ৪০৭]

তৃতীয় ঘটনা

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে দেশের এক নাজুক পরিস্থিতিতে দিশেহারা মুজিব সরকার নেহায়েত অনন্যোপায় হয়ে আবার সেনাবাহিনীকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং দুষ্কৃতিকারী দমন করে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি সাধনের জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কুমিল্লা সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার তখন কর্নেল নাজমুল হুদা। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত ছিলেন কর্নেল হুদা। সেই সুবাদে কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হোক শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ ভক্তি ছিলো তার। তবে এ বিষয়ে

www.bjilibrary.com

সুশিক্ষিত কর্নেল হুদার মনে দ্বন্দ্বও ছিলো যথেষ্ট। একই সাথে যুদ্ধ করেছি আমরা। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আমাকে ভীষণ আপন করে নিয়েছিলেন। আমাদের সম্পর্ক এতো নিবিড় হয়ে উঠেছিলো যে, আমরা রাজনীতি নিয়ে অবাধে খোলামেলা আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার স্পষ্টবাদিতায় অনেক সময় তিনি আতঙ্কিত হয়ে পড়তেন। অনেক সময় বড় ভাইয়ের মতো উপদেশ দিতেন বেফাঁস কথাবার্তা বলে আমি যাতে নিজেকে বিপদে না ফেলি। তার আন্তরিকতায় আমি তাকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করতাম। অপারেশন অর্ডার আসার পর আমি হুদা ভাইকে একদিন বলেছিলাম '৭২ সালের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিনি নিজেও সে বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। ঠিক করা হলো চিফ অফ স্টাফকে অনুরোধ জানানো হবে, যাতে তিনি সশরীরে কুমিল্লায় এসে অপারেশন সম্পর্কে সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বলেন। এতে করে আমরাও জানার সুযোগ পাবো এবার সরকারের উদ্দেশ্য কি? প্রধানমন্ত্রী কি এবার সত্যিই তার 'চাটার দল' ছেড়ে জনগণের কল্যাণ চান? এর জন্যই কি তিনি আমাদের সাহায্য চাইছেন? সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেনারেল শফিউল্লাহকে কর্নেল হুদা কুমিল্লায় আসার অনুরোধ জানালেন। এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কনফারেন্সে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "৭২ সালের মতো সেনাবাহিনীকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে নাতো এবারও?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "This time 'BangaBandhu' means business. If even his dead father is found to be implicated in any crime then his body could be exhumed for trial. No exception this time whatsoever. This is what he told me personally and I have no reason to disbelieve him." খুবই ভালো কথা। শেখ মুজিব এবার সত্যিই চিনতে পেরেছেন তার সরকার ও দলকে। তিনি তাদের অন্যায়ের প্রতিকার চান। এদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃত অর্থে জননেতা হবার জন্য দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইছেন তিনি। তার এই প্রচেষ্টায় অবশ্যই আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে তাকে সাহায্য করবো সব ঝুঁকি হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে; সে কথাই দেওয়া হয়েছিলো জেনারেল শফিউল্লাকে। অপারেশনকে যে কোন মূল্যে সফল করে তুলবো আমরা। খুশি মনেই ফিরে গিয়েছিলেন তিনি। কুমিল্লা ব্রিগেডকে দায়িত্ব দেওয়া হলো কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং সিলেটে অপারেশন পরিচালনার। আমাকে কর্নেল হুদা (হুদা ভাই) কুমিল্লা অপারেশনের দায়িত্ব দিলেন। সিলেট এবং নোয়াখালীর দায়িত্ব দেওয়া হলো মেজর হায়দার এবং মেজর রশিদকে। Combing Operation শুরু হলো। সরকারি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্ট থেকে জানা গেলো, সব সেক্টরে আওয়ামী লীগ এবং দলের অঙ্গ-সংগঠনগুলোর কাছেই রয়েছে বেশিরভাগ অবৈধ অস্ত্র। প্রভাবশালী নেতাদের ছত্রছায়াতেই নিরাপদে রয়েছে ঐসব অস্ত্র এবং অস্ত্রধারীরা। তাতে কি? এবার মুজিব, তার মরা বাপকেও ছাড়তে রাজি নন। আমরা যার যার এলাকায় সব প্রস্তুতি শেষে অপারেশন শুরু করলাম। সব জায়গায়ই খবর পাওয়া যাচ্ছিলো এলাকার যত দাগী লোক, অবৈধ অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী, লুটেরাদের মাথা হলো আওয়ামী লীগের নেতারা কিংবা নেতাদের পোষ্য মাস্তানরা। সব জায়গাতেই আবার আমাদের সরকারি দলের নেতারাও তাদের তৈরি সন্ত্রাসীদের নামের তালিকা দিয়েছিলেন। কিন্তু তদন্তের ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাদের দেওয়া তালিকাভুক্ত লোকেরা প্রায়ই এলাকায়

www.bjilibrary.com

সৎ এবং নীতিবান বলে পরিচিত। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই সরকার-বিরোধী রাজনীতির সাথে জড়িত কিংবা সমর্থক ছিলেন। আমাদের দায়িত্ব হলো দুষ্কৃতিকারীদের ধরা, সে যেই হোক না কেন। দল বিশেষের প্রতি আমাদের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে নিরপেক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করে যাওয়া। ধর-পাকড় করা হলো অপরাধীদের স্থানীয় বেসামরিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো এবং প্রশাসনের সহায়তায়। যারা ধরা পড়েছিলো তাদের বেশিরভাগই হোমরা-চোমরা চাঁই এবং নেতা-নেত্রীরা। সংসদ সদস্যা মমতাজ বেগম থেকে কুমিল্লার জহিরুল কাইউম কেউই বাদ পড়লেন না। সিলেট, নোয়াখালী, খুলনা, বরিশাল এবং দেশের অন্যান্য জায়গাতে আর্মির হাতে ধরা পড়লো শেখ নাছের, হাসনাত প্রমুখ অনেক নামি-দামি নেতারা। সব জায়গায় একই উপাখ্যান। এলাকার দুষ্কৃতকারীদের বেশিরভাগই সরকার ও সরকারি দলের লোকজন। এই অপারেশনের সময় সেনাবাহিনীর সদস্যরা সরাসরিভাবে আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা পাতি-নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। আর্মি অপারেশনের ফলে সারাদেশে চমক সৃষ্টি হলো। লোকজন ভাবলো শেখ মুজিব আর্মির সাহায্যে 'চাটার-দল'-এর সন্ত্রাস ও দুর্নীতির হাত থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন। ফলে সবখানেই জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন আর্মি অপারেশনে সাহায্য করতে। কয়েকদিনের দেশব্যাপী অভিযানের ফলে সন্ত্রাস কমে গেলো অস্বাভাবিকভাবে। জনগণের মনে আশা ফিরে এলো। দুঃশাসনের ফলে নির্জীব হয়ে পড়া জাতির মধ্যে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার হলো। ধরা পড়া সবার বিরুদ্ধেই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কারো ব্যাপারেই কোন ব্যতিক্রম করা হলো না। যদিও বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল থেকে এমনকি প্রধানমন্ত্রীর সবিচালয় থেকেও অনেকের ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হচ্ছিলো অনবরত। কিন্তু আমরা আমাদের নীতিতে সবাই অটল। কারো ব্যাপারে কোন বাছ-বিচার করা হবে না। আইন সবার জন্যই সমান। হঠাৎ সেনা সদর থেকে কয়েকজন আটক অপরাধীকে ছেড়ে দেবার জন্য নির্দেশ পাঠালেন জেনারেল শফিউল্লাহ। কর্নেল হুদা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন কাউকে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ শুধুমাত্র আইনই এখন তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে। আইনকে নিজের হাতে নেবার কোন অধিকার তার নেই। ব্রিগেড কমান্ডারের এই জবাব জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন। কর্নেল হুদার কাছে ফোন এলো প্রধানমন্ত্রীর। কর্নেল হুদা বিনীতভাবে প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন প্রধানমন্ত্রী যেন তার রাজনৈতিক সচিব জনাব তোফায়েলকে পাঠিয়ে দেন চীফের সাথে সরেজমিনে অবস্থার তদন্ত করার জন্য। তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, আর্মি কারো প্রতি কোন অবিচার কিংবা অন্যায় আচরণ করেছে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর যে কোন শাস্তিই তিনি মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছেন Area Commander হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীর টেলিফোন যখন আসে তখন দৈবক্রমে আমিও Control Room-এ উপস্থিত ছিলাম। প্রধানমন্ত্রীর ফোন, তাই আমি রুম থেকে বের হয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কর্নেল হুদার নির্দেশেই রুমে থেকে যেতে হয়েছিলো আমাকে। কর্নেল হুদার চারিত্রিক দৃঢ়তা সেদিন আমাকে মুগ্ধ করেছিলো। নেতার প্রতি তার অন্ধ আনুগত্য এবং শেখ মুজিবের অতি বিশ্বাসভাজনদের একজন হয়েও কর্নেল হুদা (গুডু ভাই) এ ধরনের জবাব প্রধানমন্ত্রীকে

www.bjilibrary.com

দেবেন সেটা সত্যিই আমি ভাবতে পারিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন অতিসত্তর তিনি লোক পাঠাচ্ছেন তদন্তের জন্য। সেদিনই হেলিকপ্টারে করে এসে পৌঁছালেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। জনাব তোফায়েলকে কিছুতেই তিনি সঙ্গে আনতে রাজি করাতে পারেননি। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জনাব তোফায়েল কুমিল্লায় এলে সবকিছু বিস্তারিত জানার পর মাথা হেট করে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর থাকতো না তার। জেনারেল জিয়ার আগমনের পর কুমিল্লাসহ অন্য সব জেলার শীর্ষ নেতাদের যারা তখনও বাইরে ছিলেন তাদের সবাইকে সেনানিবাসে আমন্ত্রণ জানানো হলো এক মধ্যাহ্ন ভোজে। ভোজপর্ব শেষে একে একে সব ধৃত ব্যক্তিদের কেন এবং কোন্ চার্জে ধরা হয়েছে; প্রমাণাদিসহ তার বিশদ বিবরণ দিলেন Operation Commander-রা। কেউ কোনকিছুর প্রতিবাদ করতে পারলেন না। জেনারেল জিয়া কর্নেল হুদা এবং আমাকে সঙ্গে করে একই হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় সেনা সদরে ফিরে এলেন। সেখান থেকে জেনারেল শফিউল্লাহকে সঙ্গে করে আমরা গেলাম ৩২ নং ধানমণ্ডিতে শেখ সাহেবের সাথে দেখা করতে। সেখানে পৌঁছে দেখি প্রধানমন্ত্রী এবং জনাব তোফায়েল আহমদ আমাদের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘরে ঢুকতেই কর্নেল হুদা এবং আমাকে দেখা মাত্র শেখ মুজিব গর্জে উঠলেন,

–কি পাইছস তোরা? আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশে আর কোন দুষ্কৃতিকারী নাই? জাসদ, সর্বহারা পার্টির লোকজন তোদের চোখে পড়ে না? অবাক হয়ে গেলাম কি বলছেন প্রধানমন্ত্রী! কর্নেল হুদা জবাব দিলেন,

–স্যার আমরা আপনার নির্দেশে অপারেশন করছি প্রকৃত দুষ্কৃতিকারীদের ধরার জন্য। আমরা নির্দলীয়। আমাদের কাছে সবাই সমান। বিভিন্ন এজেন্সির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং আমাদের নিজস্ব এজেন্সি দিয়ে ঐ সমস্ত রিপোর্ট ভেরিফাই করার পরই আমরা এ্যাকশন নিয়েছি। ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগই যদি আওয়ামী লীগার হয়, তাতে আমাদের দোষ কোথায়? কথা বাড়তে না দিয়ে জনাব তোফায়েল কয়েকজনের নাম করে তাদের অবিলম্বে ছেড়ে দিতে বললেন। তাকে সমর্থন করে আমাকে উদ্দেশ্য করে প্রধানমন্ত্রী বললেন,

–যা হবার তা হইছে। এখন এদের ছাড়ার বন্দোবস্ত করো। জবাবে আমি বললাম,

–ধরার বা ছাড়ার মালিক আমরা নই স্যার। চীফের মাধ্যমে আপনার নির্দেশই কার্যকরী করেছি আমরা। ধরার হুকুম দিয়েছিলেন আপনি; ছাড়ার মালিকও আপনি; তবে এ বিষয়ে আইন কি বলে সেটা আমার জানা নেই। ছেড়ে দেওয়াটা যদি আইনসম্মত মনে করেন তবে হুকুম জারি করে আইন সংস্থাকে বলেন তাদের ছেড়ে দিতে। আমরা তাদের ছাড়বো কিভাবে? তারাতো এখন আমাদের অধীন নয়। সবাই এখন রয়েছে আইনের অধীনে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে। আমার জবাব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জেনারেল শফিউল্লাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলে উঠলেন,

–বাজান! কিছু একটা করো নাইলে দেশে আওয়ামী লীগ একদম শেষ হইয়া যাইবো। জেনারেল শফিউল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর 'বাজান' সম্বোধনে বিগলিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় হাতজোড় করে বললেন,

www.bjilibrary.com

-স্যার আপনি অস্থির হবেন না। আমি অবশ্যই একটা কিছু করবো। আপনি আমার উপর ভরসা রাখতে পারেন। কথাগুলো শেষ করে বসতেও ভুলে গিয়েছিলেন সেনাপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর ইশারায় আবার নিজের আসনে বসলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। আমরা সবাই নিশ্চুপ বসে থেকে তার মোসাহেবীপনার কৌতুক উপভোগ করছিলাম কিছুটা বিব্রত হয়ে। After all he is our Chief! ইতোমধ্যে জনাব তোফায়েল শেখ সাহেবের কানে কানে নীচুস্বরে কিছু বললেন। তার কান পড়ায় হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন উঠলেন,

-কুমিল্লার ক্যাপ্টেন হাই, ক্যাপ্টেন হুদা, লেফটেন্যান্ট তৈয়ব, সিলেটের লেটটেন্যান্ট জহির এর বিরুদ্ধে এ্যাকশন নিতে হইবো। তারা বন্দীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করছে। হুদা ভাইকে উদ্দেশ্য করেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন শেখ মুজিব।

-স্যার ওরা সব জুনিয়র Subordinate officer, ওরা যা করেছে সেটা আমার হুকুমেই করেছে। অত্যাচারের অভিযোগ সত্যি নয়। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার পরেও যদি ওদের শাস্তি দিতে চান তবে সেটা সবার আগে আমারই প্রাপ্য। আমাকে ডিঙ্গিয়ে জুনিয়র অফিসারদের শাস্তি দিলে সেটা আমার জন্য অপমানকর হবে, সেক্ষেত্রে কমান্ডার হিসেবে অধিনস্থ সব অফিসার এবং সৈনিকদের কাছে আমি আর ফিরে যেতে পারব না। কর্নেল হুদার জবাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি এবং বললেন,

-ঠিক আছে। আইজ তোরা যা, ডালিম তুই রাইতে খাইয়া যাইস। আমাকে রেখে বাকি সবাই চলে গেলেন। শেখ সাহেব ও আমি বাড়ির অন্দর মহলে ঢুকলাম। রাত তখন প্রায় ১১টা। যথাযথ নিয়মে বারান্দায় খাওয়া পরিবেশন করা হলো। খেতে খেতে শেখ সাহেব বললেন,

-তুই থাকতে কুমিল্লায় আওয়ামী লীগের এই দশা অইলো ক্যান?

-চাচা বিশ্বাস করেন, আমরা কোন দল দেখে অপারেশন করিনি। চিফ কুমিল্লায় এসে আমাদের বলেছিলেন এবার নাকি আপনি আপনার মরা বাপকেও ছাড়বেন না। আমরা সে অনুযায়ী কাজ করেছি। আপনি একবার কুমিল্লায় গিয়ে দেখেন লোকজন কি খুশি। সবাই মনে করছে এবার আপনি সত্যিই চাটার দল এবং টাউট বাটপারদের শায়েস্তা করতে চাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে নেতা হিসেবে জনগণের মনোভাবকেই তো আপনার প্রাধান্য দেওয়া উচিত। আমিতো মনে করি আমাদের এই অপারেশনের পর আপনার জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। এখন যেকোন কারণেই আপনি যদি এদের ছেড়ে দেন তবে কি আপনার লাভ হবে? আমারতো মনে হয় ক্ষতিই হবে আপনার। আপনার পরামর্শদাতারা যে যাই বলুক না কেন আমার মনে হয় বিনা বিচারে কাউকেই ছাড়া আপনার উচিত হবে না। এতে ব্যক্তিগতভাবে আপনিই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন সবচেয়ে বেশি।

-কিন্তু পার্টি ছাড়া আমি চলুম কেমনে? প্রশ্ন করলেন শেখ সাহেব।

-পার্টি আপনার অবশ্যই প্রয়োজন। মনে করেন না কেন, এটা একটা শুদ্ধি অভিযান। খারাপদের বাদ দিয়ে সৎ এবং ভালো মানুষদের নিয়েওতো পার্টি চালানো যায়। কিছু মনে করবেন না চাচা; চোর, বদমাইশ, সন্ত্রাসী, লুটেরা, টাউট-বাটপারদের নেতা

www.bjilibrary.com

হিসেবে পরিচিতি হওয়াটাকি আপনার শোভা পায়? যারাই ধরা পড়ছে তাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগার। তার মানে বর্তমানে আপনার দলে ভালো লোকের চেয়ে খারাপ লোকজনই বেশি। এদের বাদ দেন। দেখেন লোকজন কিভাবে আপনাকে সমর্থন জানায়। চুপ করে শুনছিলেন আমার কথা। মুখটা ছিল থমথমে। খাওয়ার পর পাইপ টানার অভ্যাস তার, পাইপটা টেবিলের উপর পরে থাকলেও আজ তিনি সেটা ধরাননি। চিন্তিত অবস্থায় হঠাৎ করে বলে উঠলেন,

-বাঙ্গালি জনগণরে খুব ভালো কইরা চিনি আমি।

বুঝলাম না তিনি এই উক্তিতে কি বোঝাতে চাইলেন। কিছুক্ষণ পর শোবার ঘরে উঠে চলে গেলেন শেখ সাহেব। ওখানে তার কোন আত্মীয় অপেক্ষা করছিলেন। আমিও উঠতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কামাল এসে উপস্থিত।

-বস দিলেনতো আওয়ামী লীগ শেষ কইরা। কাজটা ভালো করেন নাই। উত্তর দিলাম,

-সব criminals and bad elements যদি আওয়ামী লীগার হয় তার জন্য আমরা দায়ী না। সারা দিনের ধকলে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিলাম ৩২ নম্বর থেকে। বাসায় ফিরে দেখি আব্বা আমার ফেরার অপেক্ষায় তখনও জেগে বসে আছেন। বুঝতে পারলাম কুমিল্লা থেকে নিম্মী ফোন করে আমার ঢাকায় আসার খবর বাসায় জানিয়েছে।

আব্বা জিজ্ঞেস করলেন কি হল? সবকিছুই খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বললেন, "তোরা কি ভেবেছিলি? শেখ মুজিব সত্যিই অপরাধীদের ধরার জন্য তোদের মাঠে নামিয়েছে? আমি ওকে ভালো করে চিনি। যখন এসএম হলে জিএস ছিলাম তখন একসাথে মুসলিম লীগের রাজনীতিও করেছি। ওর নীতি বলে কিছু নেই। সারাজীবন ক্লিকবাজী আর লাঠিবাজীর মাধ্যমে নিজের সুবিধা আদায় করে নিয়েছে সে। চরম সুবিধাবাদী চরিত্রের ধুরন্ধর শেখ মুজিব। তোদের মাঠে নামিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করতে চেয়েছিল শেখ মুজিব। একদিকে বর্তমানের তীব্র সরকার-বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বিশেষ করে জাসদ, সর্বহারা পার্টির সদস্যদের খতম করা, অন্যদিকে সেনা বাহিনী এবং জনগণের দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী অংশের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে সেনা বাহিনীকে তার দলের লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত করার জন্যই সে এই পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তার চালকে বানচাল করে দিয়েছিস তোরা। দেখ এখন সে কি করে। তোদের নিয়েই আমার চিন্তা। I hope you and your other colleauges don't get victimised.

আব্বার কথাগুলো শুনে জবাবে আমার কিছু বলার ছিল না। তার বক্তব্যের সত্যতা ভবিষ্যতেই প্রমাণ হতে পারে। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন আমি ভীষণ ক্লান্ত। তাই কথা না বাড়িয়ে বললেন, "কুমিল্লাতে একটা ফোন করে শুয়ে পড়। Don't over estimate Mujib, he is just an average man." আব্বার কথায় কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। পরদিন সকালে জেনারেল শফিউল্লাহ সেনা সদরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল হুদাকেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। হুদা ভাই আমাকে বললেন, "Chief will go with us to Comilla to release all those

www.bjilibrary.com

people." ভীষণভাবে দমে গিয়েছিলাম এই সিদ্ধান্তের কথা শুনে। হুদা ভাইও ভীষণ Upset. ক্যাপ্টেন নূর জেনারেল জিয়ার ADC. তার কামরায় গিয়ে বললাম, বসের সাথে দেখা করতে চাই। নূরের মাধ্যমে খবরটা পেয়েই তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকে দেখলাম তিনিও গম্ভীর। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে বললেন, "Well I know every thing. Don't loose heart. Allah is there. You have done your duty sincerely so forget about the rest and be at ease." চীফের সাথে একই হেলিকপ্টারে ফিরে এলাম কুমিল্লায়। চিফ নিজে গিয়ে বন্দিদের মুক্তি দিলেন। আমাদের সামনেই ফুলের মালা গলায় পড়িয়ে সমবেত আওয়ামী লীগাররা সদর্পে মিছিল করে চলে গেল শেখ মুজিবের জয়ধ্বনি করতে করতে। বিব্রতকর অবস্থায় intolerable humiliation সহ্য করে নিতে হয়েছিল আমাদের সকলকে। ঢাকায় ফেরার আগে জেনারেল শফিউল্লাহ আমাদের সারমন দিলেন "Prime minister's desire is an order." এ ঘটনার ফলে সারাদেশে deployed আর্মির morale একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। গুজব ছড়িয়ে পড়ল শেখ মুজিব শীঘ্রই আর্মি অপারেশন বন্ধ করে দিচ্ছেন। এরপর আমরা নামে মাত্র অপারেশনে Deployed ছিলাম। আরোপিত দায়িত্ব পালনে কোন উৎসাহ ছিল না কারোই। কোনরকমে সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা।" [পৃষ্ঠা : ৩১৩-৩১৯]

১৬৭.

বিস্ময়কর নাটকীয় ঘটনা

শেখ মুজিবের আশকারা পেয়ে আওয়ামী লীগে এমন সব গড ফাদার সৃষ্টি হয়, যাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী বাহিনী সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারেও সামরিক অফিসারদের উপর পর্যন্ত চড়াও হবার দুঃসাহস করতে দ্বিধা করতো না। দাপট দেখাবার ধৃষ্টতা প্রদর্শনের সাহস থাকায় তারা ধরাকে সরাজ্ঞান করতো।

ঐ গড ফাদারদের একজন ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা। চরম দাম্ভিকতা প্রদর্শন করে তিনি বিয়ের মজলিস থেকে মেজর ডালিমকে তাঁর সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে যান। মেজর ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ের ব্যবস্থাপনায় তিনি নিয়োজিত ছিলেন। মেজর ডালিমের শ্যালক কানাডা থেকে এসে বিয়েতে শরীক হয়। এক কামরায় কয়েকটি ছোট ছোট ছেলে তার সাথে দুষ্টুমি করায় সে একটি ছেলেকে ঘর থেকে বের করে দেয়। ঐ ছেলেটি ঘটনাক্রমে গাজী গোলাম মোস্তফার ঘনিষ্ঠ কেউ হয়ে থাকবে। সে ছেলেটি হয়তো গাজী সাহেবের কাছে নালিশ করেছে। মেজর ডালিমের এ ক্ষুদ্র ঘটনা জানা থাকার কথা নয়। এর প্রতিক্রিয়ায় গাজী সাহেব স্বয়ং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে লেডিস ক্লাবে অনুষ্ঠিত বিয়ের মজলিসে হামলা করে বসলেন।

বিদেশী অনেক পত্রিকায়ও এ ঘটনার খবর বের হয়েছে। দেশে তো অবশ্যই বিস্তারিত প্রকাশ পেয়ে থাকবে। আমার মতো অনেকেই ঐ ঘটনার সঠিক বিবরণ জানার জন্য আগ্রহী থাকতে পারেন। তাই দীর্ঘ হলেও ঐ ঘটনাটি এখানে মেজর ডালিমের ভাষায়ই পরিবেশন করছি ঃ

"১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি ঘটে এক বর্বরোচিত অকল্পনীয় ঘটনা। দুষ্কৃতিকারী দমন অভিযানে সেনা বাহিনী তখনও সারাদেশে নিয়োজিত। আমার খালাতো বোন তাহ্‌মিনার

www.bjilibrary.com

বিয়ে ঠিক হলো কর্নেল রেজার সাথে। দু'পক্ষই আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তাই সব ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছিলো আমাকে এবং নিম্মীকেই। ঢাকা লেডিস ক্লাবে বিয়ের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই বিয়েতে অনেক গণ্যমান্য সামরিক এবং বেসামরিক লোকজন বিশেষ করে হোমরা-চোমরা এসেছিলেন অতিথি হিসেবে। পুরো অনুষ্ঠানটাই তদারক করতে হচ্ছিলো নিম্মী এবং আমাকেই। আমার শ্যালক বাপ্পি ছুটিতে এসেছে কানাডা থেকে। বিয়েতে সেও উপস্থিত। বিয়ের কাজ সুষ্ঠুভাবেই এগিয়ে চলছে। রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফার পরিবার উপস্থিত রয়েছেন অভ্যাগতদের মধ্যে। বাইরের হলে পুরুষদের বসার জায়গায় বাপ্পি বসেছিলো। তার ঠিক পেছনের সারিতে বসেছিলো গাজীর ছেলেরা। বয়সে ওরা সবাই কমবয়সী ছেলে-ছোকরা। বাপ্পি প্রায় আমার সমবয়সী। হঠাৎ করে গাজীর ছেলেরা পেছন থেকে কৌতুকচ্ছলে বাপ্পির মাথার চুল টানে, বাপ্পি পেছনে তাকালে ওরা নির্বাক বসে থাকে। এভাবে দু'তিনবার চুলে টান পড়ার পর বাপ্পি রাগান্বিত হয়ে ওদের জিজ্ঞেস করে,

-চুল টানছে কে?

-আমরা পরখ করে দেখছিলাম আপনার চুল আসল না পরচুলা। জবাব দিলো একজন। পুঁচকে ছেলেদের রসিকতায় বাপ্পি যুক্তিসঙ্গত কারণেই ভীষণ ক্ষেপে যায়; কিন্তু কিছুই বলে না। মাথা ঘুরিয়ে নিতেই আবার চুলে টান পড়ে। এবার বাপ্পি যে ছেলেটি চুলে টান দিয়েছিলো তাকে ধরে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলে,

-বেয়াদব ছেলে মশকারী করার জায়গা পাওনি? খবরদার তুমি আর ঐ জায়গায় বসতে পারবে না। এ কথার পর বাপ্পি আবার তার জায়গায় ফিরে আসে। এ ঘটনার কিছুই আমি জানতাম না। কারণ তখন আমি বিয়ের তদারকি এবং অতিথিদের নিয়ে ভীষণভাবে ব্যস্ত। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার প্রায় সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে হয়ে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর্বও শেষ। অতিথিরা সব ফিরে যাচ্ছেন। অল্প সময়ের মধ্যেই লেডিস ক্লাব প্রায় ফাঁকা হয়ে গেলো। মাহবুবের আসার কথা। মানে এসপি মাহবুব। আমাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। আমরা সব একই সাথে যুদ্ধ করেছি স্বাধীনতা সংগ্রামে। কি এক কাজে মানিকগঞ্জ যেতে হয়েছিলো তাকে। ওখান থেকে খবর পাঠিয়েছে তার ফিরতে একটু দেরি হবে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা সবেমাত্র তখন খেতে বসেছি। হঠাৎ দু'টো মাইক্রোবাস এবং একটা কার এসে ঢুকলো লেডিস ক্লাবে। কার থেকে নামলেন স্বয়ং গাজী গোলাম মোস্তফা আর মাইক্রোবাস দু'টো থেকে নামলো প্রায় ১০-১২ জন অস্ত্রধারী বেসামরিক ব্যক্তি। গাড়ি থেকেই প্রায় চিৎকার করতে করতে বেরুলেন গাজী গোলাম মোস্তফা।

-কোথায় মেজর ডালিম? বেশি বার বেড়েছে। তাকে আজ আমি শায়েস্তা করবো। কোথায় সে? আমি তখন ভেতরে সবার সাথে খাচ্ছিলাম। কে যেন এসে বললো গাজী এসেছে। আমাকে তিনি খুঁজছেন। হঠাৎ করে গাজী এসেছেন কি ব্যাপার? ভাবলাম বোধ হয় তার পরিবারকে নিয়ে যেতে এসেছেন তিনি। আমি তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য বাইরে এলাম। বারান্দায় আসতেই ৬-৭ জন স্টেনগানধারী আমার বুকে-পিঠে-মাথায় তাদের অস্ত্র ঠেকিয়ে ঘিরে দাঁড়ালো। ঘটনার আকস্মিকতায় আমি তো হতবাক! সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং গাজী। আমি অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-ব্যাপার কি? এ সমস্ত কিছুর মানেই বা কি?

www.bjilibrary.com

তিনি তখন ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত। একনাগাড়ে শুধু বলে চলেছেন,

-গাজীরে চেনো না। আমি বঙ্গবন্ধু না। চল্ শালারে লইয়া চল্। আইজ আমি তোরে মজা দেখামু। তুই নিজেরে কি মনে করছস?

অশালীনভাবে কথা বলছিলেন তিনি। আমি প্রশ্ন করলাম,

-কোথায়, কেন নিয়ে যাবেন আমাকে?

আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন তার অস্ত্রধারী অনুচরদের। তার ইশারায় অস্ত্রধারী সবাই তখন আমাকে টানা-হেঁচড়া করে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। বিয়ে উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য পুলিশের বন্দোবস্ত করা হয়েছে; গাড়িতে আমার এস্কট সিপাইরাও রয়েছে। ঠিক বুঝতে পারছিলাম না কি করা উচিত। একটা বিয়ের অনুষ্ঠান। কন্যা দান তখনও করা হয়নি। কি কারণে যে এমন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ দেখলাম বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা আলম এবং চুল্লুকে মারতে মারতে একটা মাইক্রোবাসে উঠালো ৩-৪ জন অস্ত্রধারী। ইতোমধ্যে বাইরে হৈ চৈ শুনে নিম্মী এবং খালাম্মা মানে তাহ্মিনার আম্মা বেরিয়ে এসেছেন অন্দর মহল থেকে। খালাম্মা ছুটে এসে গাজীকে বললেন,

-ভাই সাহেব, একি করছেন আপনি? ওকে কেন অপদস্ত করছেন? কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ওকে? কি দোষ করেছে ও?

গাজী তার কোন কথারই জবাব দিলেন না। গাজীর হুকুমের তামিল হল। আমাকে জোর করে ঠেলে উঠানো হলো মাইক্রোবাসে। বাসে উঠে দেখি আলম ও চুল্লু দু'জনেই গুরুতরভাবে আহত। ওদের মাথা এবং মুখ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিলো। আমাকে গাড়িতে তুলতেই খালাম্মা এবং নিম্মী দু'জনেই গাজীকে বললো,

-ওদের সাথে আমাদেরকেও নিতে হবে আপনাকে। ওদের একা নিয়ে যেতে দেবো না আমরা।

-ঠিক আছে, তবে তা-ই হবে। বললেন গাজী।

গাজীর ইশারায় ওদেরকেও ধাক্কা দিয়ে উঠানো হলো মাইক্রোবাসে। বেচারী খালাম্মা! বয়স্কা মহিলা, আচমকা ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন মাইক্রোবাসের ভিতরে। আমার দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে থাকলো পাঁচজন অস্ত্রধারী; গাজীর সন্ত্রাস বাহিনীর মাস্তান। গাজী গিয়ে উঠলো তার কারে। বাকি মাস্তানদের নিয়ে দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটা কোথায় যেন চলে গেলো। মাইক্রোবাস দু'টি ছিলো সাদা রঙের এবং তাদের গায়ে ছিলো রেডক্রসের চিহ্ন আঁকা। গাজীর গাড়ি চললো আগে আগে আর আমাদের বহনকারী মাইক্রোবাসটি চললো তার পেছনে। এ সমস্ত ঘটনা যখন ঘটছিলো তখন আমার ছোট ভাই মুক্তিযোদ্ধা কামরুল হক স্বপন বীর বিক্রম ও বাপ্পি লেডিস ক্লাবে উপস্থিত ছিলো না। তারা গিয়েছিলো কোন এক অতিথিকে ড্রপ করতে। আমাদের কাফেলা লেডিস ক্লাব থেকে বেরিয়ে যাবার পর ওরা ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা জানতে পারে লিটুর মুখে। সবকিছু জানার পরমুহূর্তেই ওরা যোগাযোগ করলো রেসকোর্সে আর্মি কন্ট্রোল রুমে, তারপর ক্যান্টনমেন্টের এমপি ইউনিটে। ঢাকা ব্রিগেড মেসেও খবরটা পৌঁছে দিলো স্বপন। তারপর সে বেরিয়ে গেলো ঢাকা শহরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করে

www.bjilibrary.com

আমাদের খুঁজে বের করার জন্য। আবুল খায়ের লিটু আমার ছোট বোন মহুয়ার স্বামী এবং আমার বন্ধু। ও ছুটে গেলো এসপি মাহবুবের বাসায় বেইলি রোডে। উদ্দেশ্য মাহবুবের সাহায্যে গাজীকে খুঁজে বের করা।

এদিকে আমাদের কাফেলা গিয়ে থামলো রমনা থানায়। গাজী তার গাড়ি থেকে নেমে চলে গেলো থানার ভিতরে। অল্প কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠে বসলেন গাজী। কাফেলা আবার চলতে শুরু করলো। কাফেলা এবার চলছে সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে। ইতোমধ্যে নিম্মী তার শাড়ি ছিড়ে চুন্নু ও আলমের রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে। সেকেন্ড ক্যাপিটালের দিকে আমাদের নিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। গাজীর মনে কোন দুরভিসন্ধি নেইতো? রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে নাতো? ওর পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। কিছু একটা করা উচিত। হঠাৎ আমি বলে উঠলাম,

-গাড়ি থামাও!

আমার বলার ধরনে ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে দিলো। আমাদের গাড়িটা থেমে পড়ায় সামনের গাজীর গাড়িটাও থেমে পড়লো। আমি তখন অস্ত্রধারী একজনকে লক্ষ্য করে বললাম গাজী সাহেবকে ডেকে আনতে। সে আমার কথার পর গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে গাজীকে গিয়ে কিছু বললো। দেখলাম গাজী নেমে আসছে। কাছে এলে আমি তাকে বললাম,

-গাজী সাহেব আপনি আমাদের নিয়ে যা-ই চিন্তা করে থাকেন না কেন; লেডিস ক্লাব থেকে আমাদের উঠিয়ে আনতে কিন্তু সবাই আপনাকে দেখেছে। তাই কোন কিছু করে সেটাকে বেমালুম হজম করে যাওয়া আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না।

আমার কথা শুনে কি যেন ভেবে তিনি আবার তার গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। কাফেলা আবার চলা শুরু করলো। তবে এবার রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পের দিকে নয়, গাড়ি ঘুরিয়ে তিনি চললেন ৩২নং ধানমণ্ডি প্রধানমন্ত্রীর বাসার দিকে। আমরা হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। কলাবাগান দিয়ে ৩২নং রোডে ঢুকে আমাদের মাইক্রোবাসটা শেখ সাহেবের বাসার গেট থেকে একটু দূরে একটা গাছের ছায়ায় থামাতে ইশারা করে জনাব গাজী তার গাড়ি নিয়ে সোজা গেট দিয়ে ঢুকে গেলেন ৩২নং এর ভিতরে। সেকেন্ড ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন শেখ সাহেবের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। এবার ভাবলাম ওদের ডাকি, আবার ভাবলাম এর ফলে যদি গোলাগুলী শুরু হয়ে যায় তবে ক্রস-ফায়ারে বিপদের ঝুঁকি বেশি। এ সমস্তই চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ দেখি লিটুর ঢাকা ক-৩১৫ সাদা টয়োটা কারটা পাশ দিয়ে হুস্ করে এগিয়ে গিয়ে শেখ সাহেবের বাসার গেটে গিয়ে থামলো। লিটুই চালাচ্ছিলো গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলো এসপি মাহবুব। নেমেই প্রায় দৌড়ে ভিতরে চলে গেলো সে। লিটু একটু গিয়ে রাস্তার পাশে গিয়ে থামিয়ে অপেক্ষায় রইলো। সম্ভবত মাহবুবের ফিরে আসার প্রতিক্ষায়। লিটু এবং মাহবুবকে দেখে আমরা সবাই আশ্বস্ত হলাম। নির্ঘাত বিপদের হাত থেকে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা আমাদের বাঁচিয়ে দিলেন।

লিটু যখন মাহবুবের বাসায় গিয়ে পৌঁছে মাহবুব তখন মানিকগঞ্জ থেকে সবেমাত্র ফিরে বিয়েতে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। হঠাৎ লিটুকে হন্তদন্ত হয়ে উপরে আসতে দেখে তার দিকে চাইতেই লিটু বলে উঠলো,

www.bjilibrary.com

-মাহবুব ভাই সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিয়ে বাড়ি থেকে গাজী বিনা কারণে ডালিম-নিম্মীকে জবরদস্তি Gun point-এ উঠিয়ে নিয়ে গেছে।

একথা শুনে মাহবুব স্তম্ভিত হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীকেই খবরটা সবচেয়ে আগে দেওয়া দরকার কোন অঘটন ঘটে যাবার আগে। গাজীর কোন বিশ্বাস নেই; ওর দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। মাহবুব টেলিফোনের দিকে এগিয়ে যায়। হঠাৎ টেলিফোনটাই বেজে উঠে। রেড টেলিফোন। মাহবুব ত্রস্তে উঠিয়ে নেয় রিসিভার। প্রধানমন্ত্রী অপর প্রান্তে,

-মাহবুব তুই জলদি চলে আয় আমার বাসায়। গাজী এক মেজর আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের ধইরা আনছে এক বিয়ার অনুষ্ঠান থ্যাইকা। ঐ মেজর গাজীর বউ-এর সাথে ইয়ার্কি মারার চেষ্টা করছিলো। উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। বেশি বাড় বাড়ছে সেনা বাহিনীর অফিসারগুলি।

সব শুনে মাহবুব জানতে চাইলো,

-স্যার গাজী সাহেবকে জিজ্ঞেস করুন মেজর ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের কোথায় রেখেছেন তিনি।

-ওদের সাথে কইরা লইয়া আইছে গাজী। গেইটের বাইরেই গাজীর গাড়িতে রাখা হইছে বদমাইশগুলারে। জানালেন প্রধানমন্ত্রী।

-স্যার গাজী সাহেব ডালিম আর নিম্মীকেই তুলে এনেছে লেডিস ক্লাব থেকে। ওখানে ডালিমের খালাতো বোনের বিয়ে হচ্ছিলো আজ। জানালো মাহবুব।

-কছ কি তুই! প্রধানমন্ত্রী অবাক হলেন।

-আমি সত্যিই বলছি স্যার। আপনি ওদের খবর নেন আমি এক্ষুণি আসছি।

এই কথোপকথনের পরই মাহবুব লিটুকে সঙ্গে করে চলে আসে ৩২নং ধানমণ্ডিতে। মাহবুবের ভিতরে যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই রেহানা, কামাল ছুটে বাইরে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে যায়। আলম ও চুল্লুকে রক্তক্ষরণ দেখে শেখ সাহেব ও অন্যান্য সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠেন।

-হারামজাদা, এইডা কি করছোস তুই?

গর্জে উঠলেন শেখ মুজিব। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে নিম্মী এবং আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। খালাম্মা ঠিকমত হাঁটতে পারছিলেন না। কামাল, রেহানা ওরা সবাই ধরাধরি করে ওদের উপরে নিয়ে গেলো। শেখ সাহেবের কামরায় তখন আমি, নিম্মী আর গাজী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। নিম্মী দুঃখে-গ্লানিতে কান্নায় ভেঙে পড়লো। শেখ সাহেব ওকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। অদূরে গাজী ভেজা বেড়ালের মতো কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলো। হঠাৎ ফোন বেজে উঠলো। রেড ফোন। শেখ সাহেব নিজেই তুলে নিলেন রিসিভার। গাজীর বাসা থেকে ফোন এসেছে। বাসা থেকে খবর দিলো আর্মি গাজীর বাসা রেইড করে সবাইকে ধরে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয় সমস্ত শহরে আর্মি চেকপোস্ট বসিয়ে প্রতিটি গাড়ি চেক করছে। ক্যান্টনমেন্ট থেকে কিডন্যাপিং-এর খবর পাওয়ার পরপরই ইয়ং-অফিসাররা যে যেখানেই ছিলো সবাই বেরিয়ে পড়েছে এবং খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে মেজর ডালিম ও তার স্ত্রী নিম্মীকে। সমস্ত শহরে হৈ চৈ পড়ে

www.bjilibrary.com

গেছে। গাজীরও কোন খবর নেই। গাজীকে এবং তার অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদেরও খুঁজছে আর্মি তন্ন তন্ন করে সম্ভাব্য সব জায়গায়। টেলিফোন পাওয়ার পর শেখ সাহেবের মুখটা কালো হয়ে গেলো। ফোন পেয়েই তিনি আমাদের সামনেই আর্মি চিফ শফিউল্লাহকে হট লাইনে বললেন,

-ডালিম, নিম্মী, গাজী সবাই আমার এখানে আছে, তুমি জলদি চলে আসো আমার এখানে।

ফোন রেখে শেখ সাহেব গাজীকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

-মাফ চা নিম্মীর কাছে (নিম্মী ডালিমের স্ত্রী)।

গাজী শেখ সাহেবের হুকুমে নিম্মীর দিকে এক পা এগুতেই সিংহীর মত গর্জে উঠলো নিম্মী,

-খবরদার! তোর মতো ইতর লোকের মাফ চাইবার কোন অধিকার নেই; বদমাইশ।

এরপর শেখ মুজিবের দিকে ফিরে বললো নিম্মী,

-কাদের রক্তের বদলে আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী? আমি জানতে চাই। আপনি নিজেকে জাতির পিতা বলে দাবি করেন। আজ আপনার কাছে বিচার চাই। আজ আমার জায়গায় শেখ হাসিনা কিংবা রেহানার যদি এমন অসম্মান হতো তবে যে বিচার আপনি করতেন আমি ঠিক সেই বিচারই চাই। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজ আপনারা জাতির কর্ণধার হয়ে ক্ষমতা ভোগ করছেন সেইসব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত করে তাদের গায়ে হাত দেওয়ার মতো সাহস কম্বলচোর গাজী পায় কি করে? এর উপযুক্ত জবাব আমি চাই আপনার কাছ থেকে। আজ পর্যন্ত আপনি বলতে পারবেন না ব্যক্তিগতভাবে কোন কিছু চেয়েছি আপনার কাছে, কিন্তু আজ দাবি করছি ন্যায্য বিচার। আপনি যদি এর বিচার না করেন তবে আমি আল্লাহর কাছে এই অন্যায়ের বিচার দিয়ে রাখলাম। তিনি নিশ্চয়ই এর বিচার করবেন।

আমি অনেক চেষ্টা করেও সেদিন নিম্মীকে শান্ত করতে পারিনি। ঠাণ্ডা মেজাজের কোমল প্রকৃতির নিম্মীর মধ্যেও যে এ ধরনের আগুন লুকিয়ে থাকতে পারে সেটা আমার কাছেও আশ্চর্য লেগেছিলো সেদিন। শেখ সাহেব নিম্মীর কথা শুনে ওকে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বলেছিলেন, -মা তুই শান্ত হ। হাসিনা-রেহানার মতো তুইও আমার মেয়েই। আমি নিশ্চয়ই এর উপযুক্ত বিচার করবো। অন্যায়! ভীষণ অন্যায় করছে গাজী, কিন্তু তুই মা শান্ত হ। বলেই রেহানাকে ডেকে তিনি নিম্মীকে উপরে নিয়ে যেতে বললেন। রেহানা এসে নিম্মীকে উপরে নিয়ে গেলো। ইতোমধ্যে জেনারেল শফিউল্লাহ এবং ঢাকা ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল এসে পৌঁছেছে। শেখ সাহেব তাদের সবকিছু খুলে বলে জেনারেল শফিউল্লাকে অনুরোধ করলেন গাজীর পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করতে। জেনারেল শফিউল্লাহ রেসকোর্স কন্ট্রোল রুমে Operation Commander মেজর মোমেনের সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোন তুলে নিলেন,

-হ্যালো মোমেন, আমি শফিউল্লাহ বলছি প্রাইম মিনিস্টারের বাসা থেকে। ডালিম, নিম্মী, গাজী ওরা সবাই এখানেই আছে। প্রাইম মিনিস্টারও এখানেই উপস্থিত আছেন।

www.bjilibrary.com

Everything is going to be all right. Order your troops to stand down এবং গাজী সাহেবের পরিবারের সদস্যদের ছেড়ে দাও। অপরপ্রান্ত থেকে মেজর মোমেন জেনারেল শফিউল্লাহকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া অফিসার ও তার স্ত্রীকে না দেখা পর্যন্ত এবং গাজী ও তার ১৭ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের তার হাতে সমর্পণ না করা পর্যন্ত তার পক্ষে গাজীর পরিবারের কাউকেই ছাড়া সম্ভব নয়। শফিউল্লাহ্ তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মেজর মোমেন তার অবস্থানে অটল থাকলেন শফিউল্লাহ্র সব যুক্তিকে অসাড় প্রমাণিত করে। অবশেষে শফিউল্লাহ্ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেকটা বাধ্য হয়েই প্রধানমন্ত্রীকে Operation Commander-এর শর্তগুলো জানালেন। শেখ সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেলো। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন মেজর মোমেনের সাথে কথা বলতে। আমি অগত্যা টেলিফোন হাতে তুলে নিলাম,

-হ্যালো স্যার। মেজর ডালিম বলছি। Things are under control প্রধানমন্ত্রী কথা দিয়েছেন তিনি ন্যায় বিচার করবেন।

-Well Dalim it's nice to hear from you. But as the Operation Commander I must have my demands met. I got to be loyal to my duty as long as the army is deployed for anti-miscreant's drive. The iddentified armed miscreants cannot be allowed to go escort free. As far as I am concerned the law is equal for everyone so there cant' be any exception. Chief has got to understand this. বললেন মেজর মোমেন।

-Please Sir, why don't you comeover and judge the situation yourself. অনুরোধ জানিয়েছিলাম আমি।

-There is no need for me to come. However, I am sending Capt. Feroz বলে ফোন ছেড়ে দিলেন মেজর মোমেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্যাপ্টেন ফিরোজ এসে পড়লো। ফিরোজ আমার বাল্যবন্ধু। এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

-তুই গাজীরে মাফ কইরা দে। আর গাজী তুই নিজে খোদ উপস্থিত থাকবি কন্যা সম্প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অনেকটা মোড়লি কায়দায় একটা আপসরফা করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

-আমার বোনের সম্প্রদানের জন্য গাজীকে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। ওকে মাফ করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেটা হবে আমার নীতিবিরোধিতা। আমরা দেশ স্বাধীন করেছি রক্তের বিনিময়ে। আমাদের গা থেকে রক্ত ঝরাটা কোন বড় ব্যাপার নয়। ইউনিফর্মের চাকরি করি টাকা-পয়সার লোভেও নয়। একজন সৈনিক হিসেবে আমার আত্মমর্যাদা এবং গৌরবকে অপমান করেছেন গাজী নেহায়েত অন্যায়ভাবে। আপনিই আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন জনগণের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য। অবৈধ অস্ত্রধারীদের খুঁজে বের করে আইনানুযায়ী তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে। সেখানে আজ আমাদেরই ইজ্জত হারাতে হলো অবৈধ অস্ত্রধারীদের হাতে! আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে কথা দিয়েছেন এর উচিত বিচার করবেন। আমরা আপনি কি বিচার করেন সেই অপেক্ষায় থাকবো।

www.bjilibrary.com

ক্যাপ্টেন ফিরোজকে উদ্দেশ্য করে সবার সামনেই বলেছিলাম,

দেশের প্রধানমন্ত্রী যখন বিচারের ওয়াদা করেছেন, সেক্ষেত্রে গাজীর পরিবারের সদস্যদের আর আটকে রাখার প্রয়োজন কি? কর্নেল মোমেনকে বুঝিয়ে তাদের ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করিস।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, ঠিক সেই সময় শেখ সাহেব বললেন,

-আমার গাড়ি তোদের পৌঁছে দেবে।

-তার প্রয়োজন হবে না চাচা। বাইরে লিটু-স্বপনরা রয়েছে তাদের সাথেই চলে যেতে পারবো।

বাইরে বেরিয়ে দেখি ৩২নং এর সামনে রাস্তায় গাড়ির ভীড়ে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। পুলিশ অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা যারাই জানতে পেরেছে আমাদের কিডন্যাপিং-এর ব্যাপারটা; তাদের অনেকেই এসে জমা হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আমাদের দেখে সবাই ঘিরে ধরলো। সবাই জানতে চায় কি প্রতিকার করবেন প্রধানমন্ত্রী এই জঘন্য অপরাধের। সংক্ষেপে যতটুকু বলার ততটুকু বলে ফিরে এলাম লেডিস ক্লাবে। মাহবুবও এলো সাথে। মাহবুবের উসীলায় সেদিন রক্ষা পেয়েছিলাম চরম এক বিপদের হাত থেকে আল্লাহ্ পাকের অসীম করুণায়। বিয়ের আসরে আমরা ফিরে আসায় পরিবেশ আবার আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরে উঠলো। সবাই আবার হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে বিয়ের বাকি আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে কন্যা সম্প্রদান করা হলো।

ঘটনার পরদিন সকালেই আমার ডাক পড়লো আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে। সেখানে উপস্থিত হয়েই জানতে পারলাম চিফ আমাকে ডেকেছেন। কিন্তু তার আগেই ডাক পড়লো জেনারেল জিয়ার অফিসে। মেজর হাফিজ তখন PS-Cord to DCAS. সেই আমাকে খবর দিলো জেনারেল জিয়া আমার সাথে কথা বলতে চান। তিনি আমার অপেক্ষায় আছেন। অনুমতি নিয়ে গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। গতরাতে কি ঘটেছে তিনি জানতে চাইলেন। সবকিছুই বিস্তারিত খুলে বললাম তাকে। সব শুনে তিনি বেশ উত্তেজিতভাবেই বললেন, "This is incredible and ridiculous. This is simply not acceptable. ঠিক আছে দেখো চিফ কি বলে।" তার অফিস থেকে বেরিয়ে আসতেই হাফিজ তার ঘরে নিয়ে গেলো। নূরও ছিলো সেখানে। হাফিজ বললো, "দ্যাখো ডালিম, গতরাতের বিষয়টা শুধুমাত্র তোমার আর ভাবীর ব্যাপারই নয়; সমস্ত আর্মির Dignity, pride and honour are at stake. মানে আমরা সবাই এর সাথে জড়িত। You got to understand this clearly ok? অন্যান্য সব ব্রিগেডের সাথে আলাপ হয়েছে, তারাও এ ব্যাপারে সবাই একমত। This has got to be sorted out right and proper. শেখ মুজিব কি বিচার করবে? আমরা শফিউল্লাহর মাধ্যমে দাবি জানাবো আর্মির তরফ থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে সে দাবি অবশ্যই মানতে হবে। দাবিগুলোও আমরা ঠিক করে ফেলেছি। তুমি শফিউল্লাহ কি বলে সেটা শুনে আসো, তারপর যা করবার সেটা আমরা করবো।"

www.bjilibrary.com

আর্মি হেডকোয়ার্টার্স-এ সমস্ত তরুণ অফিসারদের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। হাফিজের অফিস থেকেই চীফের ADC-কে ইন্টারকমে জানালাম, "I am through with DCAS, so I am free now to see the Chief." "Right Sir." বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলো ADC, কিছুক্ষণ পরই ADC হাফিজের কামরায় এসে জানালো চিফ আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। চীফের অফিসে ঢুকতেই তিনি আমাকে বসতে বললেন। চেয়ার টেনে বসলাম মুখোমুখী।

-How are you?

-Fine Sir.

-How is Nimmi?

-She is ok Sir, but terribly upset.

-Quite natural. But she is a brave girl I must say. The way she talked to the Prime minister was really commendable. এ সমস্ত কথার পর আসল বিষয়ের উপস্থাপনা করলেন জেনারেল শফিউল্লাহ,

-দেখো ডালিম গতরাতের ঘটনায় প্রধামন্ত্রী নিজেই দুঃখ এবং অনুতাপ প্রকাশ করেছেন। I am also very sorry about the whole affair. শেখ সাহেব তো তোমাদেরও আপনজন। অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমাদের দু'জনকেই। তিনি যখন চাইছেন তুমি গাজীকে মাফ করে দাও, তার সে ইচ্ছা তুমি পূরণ করবে সেটাই তো তিনি আশা করছেন। তুমি যদি গাজীকে মাফ করো তবে তিনি খুশি হবেন তাই নয় কি?

-স্যার, তিনি আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। পারিবারিকভাবে আমাদের ঘনিষ্ঠতাও আছে; সেটাও সত্য। তিনি ও তার পরিবার আমাদের ভালোবাসেন। কিন্তু নীতির ব্যাপারে আপস আমি করতে পারবো না, সেটা আপনার সামনেই তাকে আমি বলে এসেছি। And I shall stick to that till the end.

-Well that's up to you then. I have nothing more to tell you.

-Thank you Sir. বলে বেরিয়ে এসে দেখি চীফের অফিসের সামনে AHQ-র প্রায় সব অফিসার একত্রিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চাইলো চিফ কি বললেন। আমি আমাদের কথোপকথনের সবটাই তাদের হুবহু খুলে বললাম। ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো সবাই। একজন ADC-কে বললো, "Go and call him out here, we want to talk to him."

ADC-এর মাধ্যমে অফিসারদের অভিপ্রায় জানতে পেরে বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। চিফ বললেন,

-বলো তোমাদের কি বলার আছে?

-স্যার, গতরাতের ঘটনা শুধুমাত্র মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। আমরা আজ যেখানে দুষ্কৃতিকারী দমনের জন্য সারাদেশে deployed সেই পরিস্থিতিতে বিনা কারণে গাজী ও তার সন্ত্রাসীরা অস্ত্রের মুখে আমাদেরই একজন অফিসার এবং তার স্ত্রীকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এটা সম্পূর্ণ বেআইনী নয়?

www.bjilibrary.com

"It has compromised the honour and the dignity of the whole armed forces particularly army. We can't take it lying. It has got to be sorted out right and proper." কথাগুলো বললো একজন। জেনারেল শফিউল্লাহ জবাবে বলার চেষ্টা করলেন,

-Well, the Prime minister is personally very sorry about the whole affair.

-That's not enough! শফিউল্লাহকে থামিয়ে দিলো একজন।

-Now Sir, you being our Chief and the leader have to shoulder your responsibility to uphold the honour and the dignity of the army. সমগ্র সেনা বাহিনীর তরফ থেকে আমাদের ৩টি দাবি আপনাকে জানাচ্ছি।

১. গাজীকে তার সংসদপদ এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারি পদ থেকে এই মুহূর্তে অব্যাহতি দিয়ে তাকে এবং তার অবৈধ অস্ত্রধারীদের অবিলম্বে আর্মির হাতে সোপর্দ করতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে, যাতে করে আইনানুযায়ী তাদের সাজা হয়।

২. গতরাতের সমস্ত ঘটনা সব প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে দেশের জনগণকে অবগত করার অনুমতি দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে।

৩. যেহেতু গাজী আওয়ামী লীগের সদস্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে পার্টিপ্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে মেজর ডালিম এবং তার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

আপনাকে আমাদের এই ৩টি দাবি নিয়ে যেতে হবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে এ দাবিগুলো মেনে নিতে হবে। এই দাবিগুলো আপনি যদি আদায় করতে অপারগ হন তবে You have got no right to sit on your chair. You will be considered not fit enough to lead this army.

ঘাবড়ে গিয়ে ঢোক গিলতে লাগলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। থতমত খেয়ে বেসামাল অবস্থায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু তার আগেই লেফটেন্যান্ট শমসের মুবিন চৌধুরী বীর বিক্রম তার কোমরের বেল্ট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো জেনারেল শফিউল্লার পায়ের কাছে,

-We serve the army for our pride, honour and dignity. If that is not there then I hate to serve that army any longer.

উত্তেজিতভাবে উপস্থিত সবাই একই সাথে বলে উঠলো,

-Sir, you got to restore our lost honour and dignity. We have had enough humiliation but no more. Sir, Please don't be afraid. We all are with you. Just try to understand the gravity of the problem and be one of us.

বাইরের শোরগোল শুনে জেনারেল জিয়া কখন বেরিয়ে এসেছিলেন আমরা খেয়ালই করিনি। হঠাৎ তিনি তার গুরুগম্ভীর গলায় বলে উঠলেন,

-Boys be quite and listen to me. I have heard everything and I appreciate your sentiment. I have also understood the problem. Your

www.bjilibrary.com

demands are just and fair. Shafiullah you must go with their demands to the Prime Minister and make him understand the gravity of the situation and suggest him to accept the demands for the greater interest of the nation and the armed forces.

জেনারেল শফিউল্লাহ যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেলেন। বললেন,

-আমি এখনই যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর কাছে। তক্ষুণি তিনি বেরিয়ে গেলেন গণভবনের উদ্দেশ্যে। তখন দুপুর পেরিয়ে গেছে। শফিউল্লাহ চলে যাবার পর আমরাও মেসে চলে এলাম লাঞ্চের জন্য। এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। শফিউল্লাহকে যখন ঘেরাও করা হয়েছিলো, তখন সেখানে কর্নেল এরশাদও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য PSO-দের সাথে। তিনি তখন AG (Adjutant General) হিসেবে হেডকোয়ার্টার্স-এ পোস্টেড ছিলেন। এক সময় জেনারেল শফিউল্লাহ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,

-এরশাদ তোমার অভিমত কি?

-Sir, I think their demands quite legitimate. এ ধরনের ঘটনা আপনার কিংবা আমার সাথেও ঘটতে পারতো। যেখানে Army is deployed to maintain law and order and engaged in anti-miscreant drive সেখানে এ ধরনের একটা ঘটনাকে শুধুমাত্র ডালিম-নিম্মীর ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে consider করা উচিত হবে না। It is definitely a question of honour and prestige of the entire army and you being the Chief must make this point clear to the Prime minister and advise the PM correctly to restore the lost honour by accepting the demands.

তার জবাব শুনে আমরা বেশ কিছুটা আশ্চর্যই হয়েছিলাম। কারণ, তিনি ছিলেন একজন Repatriated officer. তিনি সাহস করে ঐ ধরনের স্পষ্ট বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের কাছে ছিলো অপ্রত্যাশিত। এতেই প্রমাণিত হয় পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মাঝে অনেকেই ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। সন্ধ্যার দিকে চিফ ফিরলেন গণভবন থেকে; সারাদিন দরবার করে। রাত ৮টার দিকে তিনি আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন সেনা ভবনে। সেখানে গিয়ে দেখি কর্নেল শাফায়াত এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফও উপস্থিত রয়েছেন। আমরা কুশলাদি বিনিময় করে সবাই বসলাম। চিফ শুরু করলেন,

-আমি প্রধানমন্ত্রীকে তোমাদের দাবিগুলো জানিয়েছি। তিনি সময় চেয়েছেন। Prime minister যখন সময় চেয়েছেন তখন তাকে সময় আমাদের দিতে হবেই। চীফের কথার মাঝে ফোঁড়ন কাটছিলেন কর্নেল শাফায়াত। ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিশ্চুপ বসেছিলেন।

-স্যার 'তোমাদের দাবিগুলো' বলে আপনি কি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে, আপনার ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে? দাবিগুলো ছিলো entire army-র তরফ থেকে। তবে কি আমাদের বুঝতে হবে আপনি বা আপনারা মানে the senior lots are not with us? জানতে চাওয়া হলো জেনারেল শফিউল্লাহর কাছ থেকে। তিনি এ ধরনের কথায় একটু ঘাবড়ে গেলেন। চালাক প্রকৃতির ব্রিগেডিয়ার খালেদ অবস্থা আঁচ করতে পেরে শফিউল্লাহর হয়ে জবাব দিলেন,

www.bjilibrary.com

-Boys don't have wrong impression. Of course we all are together. How could we be different on this issue?

-কিন্তু স্যার মনে হয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দাবি মানবেন না। সময় চেয়ে নিয়ে তিনি প্রথমত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যেতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়ত তার অবস্থানকে পোক্ত করার জন্যই সময় চেয়েছেন তিনি। যদি শেষ পর্যন্ত তিনি আমাদের দাবি মানতে রাজি না হন তবে কি করা হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে জানতে চাই আমরা।

তিনজনই এ কথার কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকলেন।

-Well Sir, if you don't have any idea what to do next then we shall think what needs to be done. বলে চলে এসেছিলাম আমরা। (পৃষ্ঠা ৪২৭-৪৩৯)

এ পর্যন্ত ঘটনার যতটুকু জানা গেলো তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গাজীর আচরণের বিরুদ্ধে সেনা অফিসারদের সবাই ভয়ানক বিক্ষুব্ধ। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ তাদের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করতে গিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।

সেনাপ্রধান অফিসারদের দাবিসমূহ প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করে ফিরে এসে যা বললেন, তাতে অফিসাররা বুঝতে পারলেন যে, তাদের দাবি মানার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রধানমন্ত্রী দাবি না মানলে সেনাপ্রধান কোন প্রতিকারের সামান্য আশ্বাসও দিতে অক্ষম হলেন।

অফিসাররা রীতিমতো সেনাপ্রধানকে হুমকি দিলেন যে, আপনি যদি কিছু করতে না পারেন তাহলে আমাদেরকেই ভাবতে হবে কী করা প্রয়োজন।

১৬৮.

শেখ মুজিবের আজব সুবিচার

অফিসারদের কঠোর মনোভাব বুঝতে পেরে শেখ মুজিবের অন্ধ ভক্ত সেনাপ্রধান ও ব্রিগেড কমান্ডার বিক্ষুব্ধ অফিসারদের হুমকি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য পেরেশান হয়ে সেনা সদর থেকে গোপনে বের হয়ে গেলেন। অফিসাররা টের পেয়ে একজনকে মোটর সাইকেলে পেছনে পেছনে পাঠিয়ে দেন। এ সম্পর্কে মেজর ডালিমের ভাষায়ই পড়ুন ঃ

"আজিজ পল্লীর এক বাসায় বৈঠকে বসলাম আমরা। বিষয়বস্তু, দাবি মানা না হলে আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে। অন্যান্য ব্রিগেডের সাথে যোগাযোগ করে মতামত বিনিময় করা হচ্ছিলো সবসময়। রাত প্রায় ১১টার দিকে খবর পেলাম জেনারেল শফিউল্লাহর সাদা ডাটসন কারে দু'জন লোক সিভিল ড্রেসে চাদর মুড়ি অবস্থায় ২নং গেইট দিয়ে বেরিয়ে ৩২নং ধানমণ্ডির দিকে যাচ্ছে। একজন young officer-কে মোটর সাইকেল নিয়ে গাড়িকে ফলো করতে বলা হলো। রাত প্রায় ১১:৩০ মিনিটে ঐ অফিসার ফিরে এসে জানালো, গাড়িতে ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ এবং কর্নেল শাফায়াত। তারা গিয়ে ঢুকেছিলেন শেখ সাহেবের বাসায়। রাত প্রায় ১২:৩০ মিনিটের দিকে খবর আসতে লাগলো শহরে রক্ষীবাহিনীর মুভমেন্ট শুরু হয়ে গেছে। দুই-এ দুই-এ চার; মিলে

www.bjilibrary.com

গেলো হিসাব। শফিউল্লাহ এবং শাফায়াত শেখ সাহেবের একান্ত বিশ্বাসভাজন বিধায় ৩২ নম্বরে গিয়ে আমাদের সন্ধ্যার আলোচনার সবকিছুই জানিয়ে এসেছেন। তারই পরিপ্রেক্ষিতে শহরে রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে; আর্মির তরফ থেকে যে কোন move-এর মোকাবেলা করার জন্য। নিজেদের প্রতি তার অনুকম্পা আরো বাড়াবার জন্যই ব্যক্তিপূজার এক ঘৃণ্য উদাহরণ! রাত আড়াইটার দিকে বিভিন্ন বর্ডার এলাকা থেকে খবর আসতে লাগলো, মধ্যরাত্রির পর থেকে ভারতীয় বাহিনীর অস্বাভাবিকভাবে তৎপরতা শুরু হয়েছে। তার মানে নিজের নিরাপত্তার জন্য শেখ মুজিব শুধুমাত্র তার অনুগত রক্ষীবাহিনী এবং সেনাবাহিনীর তার তল্পিবাহক নেতৃত্বের উপর আস্থা রেখে স্বস্তি পাচ্ছেন না, তাই বন্ধু রাষ্ট্রের সাহায্যও চেয়ে বসেছেন মৈত্রী চুক্তির আওতায়। আমরা কয়েকজন শহর ঘুরে দেখলাম খবরগুলো সত্যি। দুঃখ হলো, পেশাগত নিজ যোগ্যতায় নয়, শেখ মুজিবের বদান্যতায় যারা এক লাফে মেজর থেকে জেনারেল বনে গেছেন তারা নিজেদের চামড়া পর্যন্ত বিকিয়ে দিয়ে বসে আছেন শেখ সাহেব এবং তার দলের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য। ব্যতিক্রম অবশ্য ছিলো, জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন তেমনি একজন। কিন্তু কথায় আছে Exception is never an example. ধিক্কার এসে গিয়েছিলো আমাদের মনে এ সমস্ত মেরুদণ্ডহীন মতলববাজ সিনিয়র অফিসারদের চারিত্রিক দুর্বলতা জানার পর। পরদিন শফিউল্লাহর ডাক পড়লো গণভবনে। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন তিনি। গত দু'দিনের তুলনায় আজ তাকে বেশি confident দেখাচ্ছিলো,

-Well Dalim, the Prime minister has asked for time as you have been already told. Meanwhile, I am ordering a court of inquiry about the whole matter that has happened so far just for an official record. Once the court of inquiry is finished you will go back to Comilla.

-Right Sir বলে সেল্যুট করে বেরিয়ে এসেছিলাম তার অফিস কক্ষ থেকে। কী অদ্ভুত যুক্তি! দোষ করলো গাজী গোলাম মোস্তফা আর court of inquiry হবে আমার! বর্তমান অবস্থায় চীফের হুকুম মেনে নিয়ে court of inquiry-র পরিণাম পর্যন্ত চুপচাপ থাকতে হবে সিদ্ধান্ত হলো। court of inquiry শেষ করে কয়েকদিন পর কুমিল্লায় ফিরে এলাম।

মাসখানেক পর জুলাই মাসের শেষার্ধে এক সন্ধ্যায় আমার বাসায় একটা পার্টি ছিলো। নিমন্ত্রিত অতিথিরা প্রায় সবাই এসে গেছে। বাইরে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। হুদা ভাবীও এসে গেছেন কিন্তু হুদা ভাইয়ের পাত্তা নেই। বেশ একটু দেরি করেই এলেন কর্নেল হুদা। ভীষণ শুকনো তার মুখ। অস্বাভাবিক গম্ভীর তিনি। এসে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে এককোণায় গিয়ে বসলেন তিনি। বুঝা যাচ্ছিলো, কারো সাথে কথাবার্তা বলার তেমন একটা ইচ্ছে নেই তার। সদা উচ্ছল হুদা ভাই এতো নীরব কেন? ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক ঠেকলো। এক ফাঁকে কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

-কি হয়েছে হুদা ভাই? কোন অঘটন ঘটেনি তো?

-না কিছু না।

www.bjilibrary.com

নিজেকে কিছুটা হালকা করে নেবার জন্য ড্রিংকসের গ্লাসটা হাতে তুলে নিলেন তিনি। নিম্মী অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। হঠাৎ হুদা ভাই নিম্মীকে ডেকে পাশে বসালেন। প্রশ্ন করলেন,

-আচ্ছা নিম্মী ধরো এমন একটা খবর তুমি পেলে, যার ফলে তোমার এই সুন্দর সাজানো সংসারটা ওলট-পালট হয়ে গেলো, তোমাদের এই সুখ কেউ কেড়ে নিলো তখন কি করবে?

নিম্মী অবাক বিস্ময়ে হুদা ভাইকে ভালো করে দেখে নিয়ে বললো,

-আজ আপনার কি হয়েছে হুদা ভাই? কী সব এলোমেলো বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। বলেন না কি হয়েছে? আমিও এরি মধ্যে তাদের সাথে যোগ দিয়েছি।

-ডালিম ঢাকা থেকে কোন খবর পেয়েছো? জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল হুদা।

-না তো। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই পেতাম। প্লিজ হুদা ভাই রহস্য বাদ দিয়ে বলেন না কি হয়েছে? ব্যাপার কি?

-যা হবার নয় তাই হয়েছে। presidential Order No-9 (PO-9) প্রয়োগ করে আর্মি থেকে ৮ জন অফিসারকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তুমি এবং নূরও রয়েছ এই ৮ জনের মাঝে। খবরটা অপ্রত্যাশিত; তাই হজম করতে কিছুটা সময় লাগলো। নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে নিম্মীকে ডেকে বললাম,

-জানো, take it easy. নিজেকে সামলে নাও। Don't get upset and spoil the party. Let this be over then we shall think about it. Now be brave as you have always been and act like a good host OK?

মেয়ে মানুষ, তার উপর ভীষণ স্পর্শকাতর এবং কোমল প্রকৃতির নিম্মী। তবুও সেদিন অতিকষ্টে সব কিছুই সামলে নিয়েছিলো সে। অতিথিদের কেউ-ই কিছু বুঝতে পারেনি কি অঘটন ঘটে গেছে ইতোমধ্যে। খবরটা তখন পর্যন্ত কেউ জানতো না। পার্টি শেষে একে একে অভ্যাগতদের সবাই বিদায় নিয়ে চলে গেলো। থেকে গেলেন শুধু হুদা ভাই ও ভাবী। ভাবীকে খবরটা দেওয়া হলো। খবরটা জেনে ভাবী ভেঙে পড়লেন। আমাদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন তিনি। নিম্মীও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলো না; ক্ষোভে-কান্নায় জড়িয়ে ধরলো ভাবীকে। আমি ও হুদা ভাই দু'জনে তাদের শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম। হুদা ভাই বললেন,

-Come on now both of you hold yourselves, this is not the end of the world. Allah is there and He is great. Please stop crying and think what should be done.

নীলু ভাবী কাঁদছেন আর হুদা ভাইকে বলে চলেছেন,

-Gudu you must do something about this injustice. You have to do whatever necessary. This is simply outrageous. You must not take this lying noway. Get this very clear. নীলু ভাবীর আন্তরিকতায় মন ভরে গেলো।

-I got it Nilu I got it, Please comedown. I Promise you, I shall go out of my way to redress this. Nimmi you too Please stop crying, don't

www.bjilibrary.com

you have faith on your Huda Bhai? আমাকে বললেন,

-কাল তোমাকে নিয়ে আমি ঢাকায় যাবো এবং প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করবো। নিম্মী তুমিও যাবে আমাদের সাথে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঢাকা থেকে ফোন এলো। নূর বললো,

-Sir, we have been sacked under PO-9. We need your presence here as soon as possible. জবাব দিলাম,

-আমি এবং হুদা ভাই কালই আসছি। টেলিফোন রেখে দিলাম। পরদিন ব্রিগেডের সবাই খবরটা জেনে গেলো। কর্নেল হুদা সকালেই CO'S conference call করলেন। সেখানে তিনি বললেন,

-ডালিম এবং আমি ঢাকায় যাচ্ছি। I can assure you all that I personally shall do everything to redress this shocking injustice. এ ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমার অসন্তোষও কম নয়।

ঢাকায় এলাম আমরা। আর্মি হেডকোয়ার্টার্স-এ চরম উত্তেজনা। শফিউল্লাহ অফিসে নেই। তিনি নাকি অসুস্থ। জেনারেল জিয়া আমি এসেছি জানতে পেরে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে ঢুকলাম তার অফিসে। তিনি সিট থেকে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। স্বল্পভাষী লোক। বললেন,

-Have faith in Allah. He does everything for the better. This is just the beginning and I am sure manymore heads will roll.

দোয়া করবেন স্যার। ঠিকই বলেছেন সবকিছুই আল্লাহর ইচ্ছাতেই ঘটে। বললাম আমি।

-We must keep-in touch and you can count on me for everything just as before. For any personal need my doors are always open to you.

-Thank you very much Sir. You are most kind. But you must remain alert as you are our last hope. Future will say what is there in our common destiny.

MS branch থেকে PO-9 এর লিখিত orderটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি ও নূর সেনা সদর থেকে। Retirement orderটা যখন হাতে নিচ্ছিলাম তখন মনে পড়েছিলো শেখ সাহেব সস্নেহে নিম্মীকে বুকে জড়িয়ে ধরে কথা দিয়েছিলেন সুবিচার করবেন তিনি। সেই সুবিচারের ফলেই আজ আমি চাকরিচ্যুত হলাম বিনা কারণে।

সেদিনই সন্ধ্যায় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে কর্নেল হুদা গিয়ে হাজির হলেন ৩২নং ধানমণ্ডিতে। অতি পরিচিত সবকিছুই। কিন্তু এবারের আসাটা কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির তাই পরিবেশটা কিছুটা অস্বস্তিকর। রেহানা, কামাল সবাই কেমন যেন বিব্রত! পরিবেশটাকে হালকা করার জন্য বললাম,

-কি কামাল বিয়ের দাওয়াত পাবো তো? আমার প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে কামাল উত্তর দিলো,

-কি যে বলেন বস! আমি নিজে গিয়ে আপনাকে ও নিম্মীকে দাওয়াত করে আসবো। আপনাদের ছাড়া বিয়েই হবে না। রেহানা চা-নাস্তা নিয়ে এলো। হুদা ভাই চুপ করে বসে সবকিছু দেখছিলেন। বাসায় ফিরে এলেন শেখ সাহেব। ডাক পড়লো আমাদের তিন

www.bjilibrary.com

তলার অতিপরিচিত ঘরেই। একাই বসে ছিলেন শেখ সাহেব। ঘরে ঢুকে অভিবাদন জানাবার পর কর্নেল হুদা বললেন,

-এতোবড় অন্যায়কে মেনে নিয়ে চাকরি করার ইচ্ছে আমারও নেই স্যার। বলেই পকেট থেকে একটা পদত্যাগপত্র বের করে সামনের টেবিলের উপর রেখে তিনি বললেন,

-আমার এই পদত্যাগপত্রের Official copy through proper channel শীঘ্রই আপনার কাছে পৌছবে। তার এ ধরনের আকস্মিক উপস্থাপনায় কিছুটা বিব্রত হয়েই শেখ সাহেব বললেন,

-তোমরা সবকিছুই একতরফাভাবে দেখো। আমার দিকটা একটুও চিন্তা করো না। একদিকে আমার পার্টি আর অন্যদিকে ওরা। আমি কি করুম? পার্টির কাছে আমি বান্দা। পার্টি ছাড়া তো আমার চলবো না। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন,

-তুই আর নূর কাইল আমার সাথে রাইতে বাসায় দেখা করবি।

শেখ সাহেবের সাথে কথা বলার সময় হুদা ভাইয়ের চোখে পানি এসে গিয়েছিলো। পরদিন জেনারেল শফিউল্লাহর অফিসে আমার ডাক পড়লো। চিফ আমাকে নির্দেশ দিলেন কুমিল্লায় আমার আর ফিরে যাওয়া চলবে না। নিম্মীকে পাঠিয়ে জিনিসপত্র সব নিয়ে আসার বন্দোবস্ত করতে হবে। কর্নেল হুদা এই নির্দেশের জোর প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু শফিউল্লাহ তার সিদ্ধান্ত বদলালেন না। কোন ঝুঁকি নিতে চাচ্ছেন না তিনি। কুমিল্লায় ফিরে আমি যদি আবার কোন অঘটন ঘটিয়ে বসি! এভাবেই মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পর যে আর্মি গঠন প্রক্রিয়ায় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলাম রাতদিন; সেই আর্মি থেকে স্বাভাবিক নিয়ামানুযায়ী বিদায় নেওয়ার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছিলো আমাকে। একজন সৈনিকের জন্য এই অবমাননা সহ্য করা খুবই কষ্টকর। আমি ঢাকায় রয়ে গেলাম। হুদা ভাই নিম্মী ও খালাম্মাকে নিয়ে ফিরে গেলেন কুমিল্লায়।

আমাকে কুমিল্লায় ফিরতে না দেওয়ায় অফিসার এবং সৈনিকরা অসন্তোষ-ক্ষোভে ফেটে পড়লো। একদিন দুই ট্রাক সৈনিক কুমিল্লা থেকে আমাদের মালিবাগের বাসায় এসে হাজির। আমাকে ওরা নিয়ে যেতে এসেছে। সরকার অন্যায়ভাবে ক্ষমতাবলে আমাকে চাকরিচ্যুত করেছে; তার উপর যে রেজিমেন্ট আমি শুরু থেকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছি সেই ইউনিটের তরফ থেকে আমাকে বিদায় সংবর্ধনাও জানাতে পারবে না ইউনিটের সদস্যরা; সেটা কিছুতেই হতে দেবে না তারা। সব বাধা উপেক্ষা করে তারা আমাকে নিয়েই যাবে। পরিণামে যা কিছুই ঘটুক না কেন; তার মোকাবেলা করা হবে একত্রিতভাবে; সে সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে ইউনিটে। Emotionally charged অবস্থায় পরিণামের বিষয়টি উপেক্ষা করে যে পদক্ষেপ তারা নিতে প্রস্তুত হয়েছে তার ফল তাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে সেটা তারা ঠিক বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছিলাম। তাই অনেক কষ্টে সবাইকে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমার যুক্তিগুলো মেনে নিয়ে অনেক ব্যথা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো তারা। ফিরে যাবার আগে আমার প্রিয় সহযোদ্ধারা বলেছিলো; "স্যার আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আমরা সবসময় আপনার সাথে আছি; একথাটা ভুলবেন না কখনো। প্রয়োজনে ডাক দিয়ে দেখবেন আমরা সব বাধা পেরিয়ে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবো।"

www.bjilibrary.com

একজন কমান্ডার হিসেবে অধীনস্থ সৈনিকদের কাছ থেকে এ ধরনের দুর্লভ সম্মান পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। এর বেশি আর কি লাভ করা সম্ভব হতো চাকরিতে থাকলেও। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পদভারে অনেক জেনারেল এবং কমান্ডার রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের কতজনের ভাগ্যে এ ধরনের শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস জুটেছে! আবেগ এবং আত্মতৃপ্তির অনাবিল আনন্দে সেদিন নিজেকে সামলে রাখতে পারিনি! খুশির জোয়ার নেমে এসেছিলো দু'চোখ বেয়ে। মনে হয়েছিলো আমার সৈনিক জীবনের যবনিকাপাত অতি আকস্মিকভাবে ঘটানো হলেও স্বল্প পরিসরের এ জীবন আমার সার্থক হয়েছে। শুধু কুমিল্লা থেকেই নয়; দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্ট থেকেও অফিসার-সৈনিকরা সুযোগ-সুবিধামতো আসতে থাকলো সমবেদনা জানাবার জন্য। সবার একই আক্ষেপ, কেন এমন অবিচার; এতোবড় অন্যায়??? জবাবে সবাইকে বলেছি, "স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তারা ক্ষমতার দম্ভে ভুলে যায় ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়; প্রকৃতপক্ষে মানুষের নিজের হাতে কোন ক্ষমতাই নেই। আল্লাহ তাআলাই সব ক্ষমতার অধিকারী। তার ইচ্ছাতেই যে কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে থাকে, কিন্তু তার দেওয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করলে তিনিই আবার শাস্তিস্বরূপ সে ক্ষমতা কেড়ে নেন। সব অত্যাচারীর ক্ষেত্রে তেমনটিই ঘটেছে। আল্লাহ যা করেন তা ভালোর জন্যই করেন; এ ঈমানের জোর আমার আছে। আমি তোমাদের দোয়া চাই আর কিছুই নয়।

হালে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা লন্ডন সফরকালে সেখানে রেডিওতে আমিনুল হক বাদশাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, "আমার বাবা সেনাবাহিনী গড়েছিলেন বলেই মেজররা জেনারেল হতে পেরেছিলেন।" একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তিনি। এটা অতি সত্য কথা যে, মেজর থেকে যাদের জেনারেল বানানো হয়েছিলো তাদের অনেকেরই জেনারেল হবার যোগ্যতা ছিলো না। কিন্তু তবুও তাদের জেনারেল বানানো হয়েছিলো। এর কারণ ছিল শেখ মুজিব চেয়েছিলেন অযোগ্য নেতৃত্বের অধীনে সেনা বাহিনীকে দুর্বল করে রাখতে এবং ঐ সমস্ত অযোগ্য 'খয়ের খাঁ' টাইপের জেনারেলদের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে তার ঠেঙ্গারে বাহিনীতে পরিণত করতে। কিন্তু সেটা ছিলো তার দিবাস্বপ্ন মাত্র। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশের উপর ঐ সমস্ত 'জী হুজুর!' জেনারেলরা কোন প্রভাবই বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। (পৃষ্ঠা : ৪৪০-৪৪৬)

শেখ মুজিবের ইমেজ খতম

সেনা অফিসারদের চরম তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো। শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হওয়ারই কথা। সুবিচারের ওয়াদা করে তিনি যালিমদের রক্ষা করলেন এবং মযলুমদের উপর স্বয়ং চরম যুলুম করলেন।

মেজর ডালিমের লেখা থেকে জানা গেলো যে, তাঁর পিতার সহপাঠি হিসেবে শেখ মুজিবকে তিনি চাচা ডাকতেন এবং উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। এ সত্ত্বেও শেখ মুজিব ডালিম এবং ডালিমের পক্ষে যে অফিসাররা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলেন তাদের সবাইকে চাকরিচ্যুত করলেন।

সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ এ অবিচারের ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। তাঁরা সরাসরি তাঁর সাথে যে বিতর্ক করেছেন তাতে তিনি একেবারেই

www.bjilibrary.com

লা-জওয়াব হয়ে পড়েন। তিনি সেনা-অফিসারদের নিকট যে মোটেই শ্রদ্ধার পাত্র নন তা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনা-অফিসারদের বিপ্লবকে ঠেকাবার জন্য সেনাপ্রধান হিসেবে কেন তিনি কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি তা এখন স্পষ্ট। শেখ মুজিব স্বয়ং সেনাপ্রধানকে ফোন করেও কোন সাড়া না পাওয়ার কারণ এটাই। সেনা-অফিসারদের দাবি মেনে সেনাপ্রধান হিসেবে তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদের আনুগত্য করতে বাধ্য হন এ কারণেই।

গাজীর চরম বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও শেখ মুজিব তাঁর কোন বিচার না করে উল্টো ৮ জন সেনা-অফিসারকে চাকরিচ্যুত করার কারণে গোটা সেনাবাহিনীর সকল অফিসারদের নিকট শেখ মুজিবের ইমেজ একেবারেই খতম হয়ে গেলো। সে সাথে সেনাপ্রধান ও তার সহযোগী দু'একজন সিনিয়রের মর্যাদা চরমভাবে বিনষ্ট হয়ে গেলো। এ পটভূমিতে সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলছিলো তা আরও প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো তখন, যখন গাজী গোলাম মোস্তফার মতো শেখ মুজিবের অনুচর ৬১ জন গভর্নরের অধীনে সেনাবাহিনীকে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

মেজর ডালিমের লেখা থেকে আরও একটা তথ্য জানা গেলো যে, জিয়াউর রহমান সিনিয়র হওয়া সত্ত্বেও শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করায় গোটা সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ বিরাজ করে। অফিসার ও সৈনিকরা মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার ঘোষণা শুনেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কারণেই সেনাবাহিনীর সর্বস্তরে মেজর জিয়ার ইমেজ অত্যন্ত সমুন্নত ছিলো। তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেলো যে, স্বাধীনতার ঘোষক হওয়ার অপরাধেই তাঁকে সেনাপ্রধান করা নিরাপদ মনে করা হয়নি। আরও ধারণা হলো যে, জিয়াউর রহমান সেনাপতি হলে বিকল্প সেনাবাহিনী হিসেবে রক্ষী বাহিনীকে গড়ে তোলা সমর্থন করতেন না।

মেজর ডালিম পদচ্যুত হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে সংলাপের সময় ডালিম জিয়াকে সম্বোধন করে "You are our last hope" বলে যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তা থেকেও জেনারেল জিয়ার প্রতি সেনা-অফিসারদের পরম আস্থার কথাই উচ্চারিত হয়েছে।

১৬৯.

৩ থেকে ৭ নভেম্বরের নাটকীয় ঘটনাবলির তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের ঘটনাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আগস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লব ঘটান এবং ৭ নভেম্বর সিপাহীরা প্রতিবিপ্লব ব্যর্থ করে আগস্ট বিপ্লবকে পুনর্বহাল করেন। এক সপ্তাহের মধ্যে কেমন করে এতো বড় নাটকীয় ঘটনাবলি ঘটে গেলো এর বিবরণ জানার জন্য আমার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে জনাব অলি আহাদের 'জাতীয় রাজনীতি : ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫' নামক গ্রন্থে এবং জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর 'রাজনীতির তিন কাল' গ্রন্থে সামান্যই জানতে পেলাম, যা পূর্বে আলোচনা করেছি। ৩

www.bjilibrary.com

নভেম্বরের পরের ঘটনাবলিতে মেজর ডালিম সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন না। তাই তাঁর লেখা বিবরণ তাঁর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত নয়। তবে মেজর ডালিমের গ্রন্থ থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবকে ব্যর্থ করার ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের ভূমিকাই প্রধান এবং এ সুযোগে কর্নেল তাহের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করে জাসদকে ক্ষমতাসীন করার প্রচেষ্টা চালান। আমি ভাবলাম, তাহলে তো ঐ সময়কার সরাসরি জ্ঞান জাসদের কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি থেকেই যোগাড় করা সম্ভব। সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া গেলো এবং তাঁর কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ও চমকপ্রদ তথ্য যোগাড় করা গেলো, যাতে ঐ সময়কার ঘটনাবলির সঠিক বিশ্লেষণ করা সহজ মনে হলো। উভয় উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিম্নরূপ ঃ

ঘটনাবলির বিশ্লেষণের ভিত্তিমূলক তথ্যাবলি

১. শেখ মুজিবের কুশাসনে হতাশ হয়ে মুক্তিযোদ্ধা সেনা-অফিসাররা 'সেনা পরিষদ' নামে একটি গোপন সংগঠনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়াবাড়ি ও ঐ ঘটনার বিচারের দাবিদার ৮ জন সামরিক কর্মকর্তার পদচ্যুতির পর 'সেনা পরিষদ'-এর সাংগঠনিক তৎপরতা আরও বৃদ্ধি পেলো। বাকশাল গঠনের পর সামরিক বিপ্লবের পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেলো। ৬১ জন গভর্নর নিয়োগের পর বিপ্লব সাধনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলো।

২. কর্নেল তাহের মুক্তিযুদ্ধে এক পা হারান। এ অজুহাতে তাঁকে সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে নারায়নগঞ্জে ড্রেজারের ডাইরেক্টর করা হয়। চাকরিচ্যুত মেজর ডালিমের সাথে কর্নেল তাহেরের মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘনিষ্ঠতার কারণে সব অবস্থায়ই গভীর যোগাযোগ বহাল ছিলো। কর্নেল তাহের জাসদের সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে মেজর ডালিমের নেতৃত্বে জাসদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং কমরেড সিরাজ শিকদারের নেতৃত্বে 'সর্বহারা পার্টির' দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে ব্যাপক তৎপরতার দরুন কর্নেল তাহেরের ধারণা ছিলো যে, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত সেনাবাহিনী সরকার পতনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করা সম্ভব। তাই তিনি সেনা পরিষদের সাথে সম্পর্কিত হওয়া সত্ত্বেও গোপনে 'বৈপ্লবিক সৈনিক সংস্থা' গঠন করেন। জনগণের ময়দানে কর্নেল তাহের 'গণবাহিনী' নামে আরও একটি গোপন সংগঠন গড়ে তুলেন। সিরাজ শিকদারের 'সর্বহারা পার্টি'র পক্ষে কর্নেল জিয়াউদ্দীন গোপন 'সশস্ত্র বাহিনীর' নেতৃত্ব দেন।

৩. সেনা পরিষদ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বাকশাল সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন কায়েম করা সঠিক মনে করেনি। দুর্নীতি দমন ও চোরাচালান রোধে সেনাবাহিনীর যে সুনাম হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্যই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের হাতেই শাসনক্ষমতা থাকা উচিত। সেনাবাহিনী যে ক্ষমতালোভী নয় তা প্রমাণ করা প্রয়োজন মনে করা হয়েছে। শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন খতম করে গণতন্ত্রের পুনর্বহালই সেনা-বিপ্লবের উদ্দেশ্য, যাতে জনগণ স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারে।

www.bjilibrary.com

৪. সেনা পরিষদের পক্ষ থেকে গণতন্ত্রমনা রাজনীতিক তালাশ করতে গিয়ে শেখ মুজিবের পরই আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা, মন্ত্রিত্ব থেকে বিতাড়িত জনাব তাজুদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করলে তারা জানতে পারলেন যে, তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে যারা বাকশাল গঠনের প্রতিবাদ করতে সাহস না করলেও স্বৈরশাসনে অসন্তুষ্ট ছিলেন বলে ধারণা ছিলো তাদের সাথেও যোগাযোগ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম হলো সর্বজনাব কামরুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ, মালেক উকিল ও আবদুল মান্নান। ব্যাপক যোগাযোগের পর সেনাপরিষদ সব দিক বিবেচনা করে খন্দকার মোশতাক আহমদকেই সবচেয়ে সিনিয়র, দেশপ্রেমিক, জনদরদি, বিশ্বস্ত গণতন্ত্রী, আদর্শবাদী ও জনপ্রিয় বলে ঐকমত্যে পৌঁছে। মুক্তিযুদ্ধকালে তাঁকে তাঁরা ভারতের আধিপত্যে বিরোধী বলে মনে করতেন।

৫. জাসদ নেতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য পাওয়া গেলো, যা আর কোন উৎস থেকে জানা যায়নি। শেখ মুজিবের কুশাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অঙ্গনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের কারণে জাসদই সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিলো। অপরদিকে সেনাবাহিনীতে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে কতক অফিসার ও বেশ কিছু সৈনিক সংঘবদ্ধ ছিলো। সিরাজ শিকদার ও কর্নেল জিয়াউদ্দীনের নেতৃত্বে সর্বহারা পার্টিও এক বিরাট ফ্যাক্টর ছিলো। তাদের সাথে জাসদ নেতৃবৃন্দ ও কর্নেল তাহেরের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা অসম্ভব ছিলো না।

তাঁর মতে, এমন একটি সম্ভাবনাময় বিরাট আন্দোলন এক রহস্যময় ব্যক্তির হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, ঐ ব্যক্তিটি দলের কোন পদে না থেকেও দলীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারেই সিদ্ধান্ত দিতেন এবং তা কার্যকর হয়ে যেতো। বিস্মিত হয়ে ঐ ব্যক্তিটির পরিচয় জানতে চাইলাম। তাঁর নাম বললেন সিরাজুল আলম খান। এ নামটি আমার অজানা ছিলো না, কিন্তু দলে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। উৎসুক হয়ে জানতে চাইলাম যে, এ লোকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় কেমন করে? বললেন, সিরাজুল আলম খানের নির্দেশ সামরিক অঙ্গনে কর্নেল তাহের ও রাজনৈতিক ময়দানে হাসানুল হক ইনু কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করতেন। জানতে চাইলাম, জনাব খান সাংগঠনিক দিক দিয়ে কোন দায়িত্বশীল না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্ত কেমন করে বাস্তবায়িত হয়ে যেতো? বললেন, এ রহস্য আমার জানা নেই। তবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক হিসেবে অনেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতো।

নভেম্বরের পয়লা সপ্তাহের ঘটনাবলির পটভূমি

সর্বস্তরের জনগণ, সশস্ত্র বাহিনী ও প্রশাসন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আগস্ট বিপ্লবকে সমর্থন করায় বিপ্লব পূর্ণ সফলতা লাভ করে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। এমনকি চীন ও সৌদি আরব শেখ মুজিব সরকারকে স্বীকৃতি না দিলেও মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দিলো।

www.bjilibrary.com

খন্দকার মোশতাক আহমদের ৭৯ দিনের শাসনকালে জনগণ, প্রশাসন, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমিক সমাজ, ছাত্র অঙ্গন বা অন্য কোন মহলে সামান্য অসন্তোষও দেখা দেয়নি। বরং মোশতাক সরকারের যাবতীয় পদক্ষেপ বিপ্লবপূর্ণ রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতিতে যে অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়।

১৯৭৫-এর অক্টোবরের শেষ দিকে ঢাকা সেনা নিবাসে CGS (চিফ অব জেনারেল স্টাফ, যিনি সেনা প্রধানের সহকারী) ব্রিগেডিয়ার মোশাররফ হোসেন ও ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল (৩য় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি) প্রতিবিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্র করছেন বলে আভাস পাওয়া গেলো। সারা দেশের অন্যান্য সেনা-নিবাসের সেনাপরিষদ থেকে কোন অসন্তোষের খবর পাওয়া যায়নি।

উপরিউক্ত দু'ব্যক্তি আগস্ট বিপ্লবের সুবিধা ভোগ করেই নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তাদের জুনিয়র অফিসাররা বঙ্গভবনে অবস্থান করে দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট মোশতাককে সাহায্য করছেন দেখে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের এ প্রচেষ্টা আগস্ট বিপ্লবের নায়কদেরকে উৎখাত করে নিজেদের হাতে ক্ষমতা নেবার উদ্যোগ হলেও তাঁরা আগস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য হাসিলের দোহাই দিয়েই এ অপকর্মে অগ্রসর হন। অথচ আগস্ট বিপ্লবের নায়কদের সহযোগিতায়ই প্রেসিডেন্ট মোশতাক বিপ্লবের মহান লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

সরকারের পদক্ষেপসমূহ

প্রেসিডেন্ট মোশতাক অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে বিভিন্ন দিকে এমন সব পদক্ষেপ নিতে থাকেন, যাতে আগস্ট বিপ্লবের লক্ষ্য যথাযথভাবে অর্জিত হয়। সে বিষয়ে মেজর ডালিমের ভাষায়ই পড়ুন ঃ

"রেডক্রস-এর চেয়ারম্যান পদ থেকে কুখ্যাত গাজী গোলাম মোস্তফাকে অপসারিত করে বিচারপতি বি.এ সিদ্দিককে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোশতাক এক অধ্যাদেশ জারি করে একদলীয় বাকশালী শাসনব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘোষণা করে দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। মুজিব কর্তৃক দেশকে ৬১টি জেলায় বিভক্ত করে গভর্নর নিয়োগের পরিকল্পনা বাতিল করা হয়। দেশের ১৯টি জেলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকগদের হাতে প্রশাসনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপ-রাষ্ট্রপতি, মুজিব সরকারের ৬ জন মন্ত্রী, ১০ জন সংসদ সদস্য, ৪ জন আমলা এবং ১২ জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের বিচারের জন্য দু'টো বিশেষ আদালত গঠিত হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজবন্দিদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য বিলুপ্ত রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়। সরকারি আদেশে মশিউর রহমান এবং অলি আহাদকে বিনাশর্তে মুক্তি দান করা হয় ২৫ আগস্ট। একই দিনে জেনারেল ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা পদে

www.bjilibrary.com

নিয়োগ করা হয়। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থানে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আর্মি চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিয়োগ করা হয়। বিমান বাহিনীর চিফ অফ স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হন এয়ার ভাইস মার্শাল তোয়াব।

দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক সংবাদ পত্রিকা দুইটি মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ১৬ আগস্ট মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানী নয়া সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে এক বার্তা পাঠান। দেশের প্রায় সমস্ত জাতীয়তাবাদী এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল, নেতা এবং গণসংগঠনের সমর্থনও লাভ করতে সমর্থ হয় নতুন সরকার। তারা সবাই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে তাদের সাহসী পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানান। ৩ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট মোশতাক ঘোষণা করেন, "১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট হতে দেশে বহুদলীয় অবাধ রাজনীতি পুনরায় চালু করা হবে এবং ১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দেশে সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত করা হবে।"

এভাবেই উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নেবার ফলে দেশের সার্বিক অবস্থা অতি অল্প সময়ে শুধুমাত্র স্বাভাবিকই হয়ে উঠেছিলো তাই নয়; দেশের আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং কল-কারখানার উৎপাদনেও অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়। দেশে চুরি-ডাকাতি ও চোরাচালানের মাত্রা কমে যায় বহুলাংশে। দেশে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে পূর্ণমাত্রায়।" (পৃষ্ঠা : ৪৯৫)

সামরিক বাহিনীর পুনর্গঠন

বিপ্লবোত্তর সরকার সামরিক বাহিনীকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেন। এ বিষয়েও মেজর ডালিমের ভাষায়ই দেখুন ঃ

"জাতীয় রক্ষীবাহিনীকে Proper Screening-এর পর সেনাবাহিনীর সাথে একত্রীভূত করে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন করে বিপ্লবের স্বপক্ষ শক্তিকে সুসংঘবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সেনা পরিষদের পক্ষ থেকে এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। বিপ্লবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দানকারী জেনারেল ওসমানীকে নিয়োগ করা হয় প্রেসিডেন্ট মোশতাকের সামরিক উপদেষ্টা। তাঁর মূল দায়িত্ব ছিলো বাংলাদেশের উপেক্ষিত সামরিক বাহিনীর সার্বিক কাঠামো নতুন করে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাঁচে গড়ে তোলা। সেনাবাহিনীর পুনর্গঠনের কাজটি তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো খুবই জটিল এবং দুরূহ একটি কাজ। রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের বাছাই করে তাদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করতে হবে। সেনাবাহিনী থেকে বাকশালীমনা, দুর্নীতিপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষীদের বের করে দিতে হবে। প্রয়োজনমতো ইউনিটগুলোর পুনর্বিন্যাস করতে হবে। কমান্ড স্ট্রাকচারে প্রচুর রদবদল করতে হবে। সর্বোপরি সেনাবাহিনীর প্রতিটি সৈনিককে বিপ্লবের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এ সমস্ত কাজে বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের সেনা পরিষদের সদস্যরাই ছিলো জেনারেল জিয়ার মূল শক্তি। তাদের সার্বিক সাহায্যের উপর ভিত্তি করেই জেনারেল জিয়া তার দায়িত্ব পালন করে চলেছিলেন। আওয়ামী-বাকশালী আমলে অন্যায়ভাবে

www.bjilibrary.com

চাকুরিচ্যুত অফিসারদের সামরিক বাহিনীতে পুনর্বহালের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এই নীতি কার্যকরী করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো জেনারেল জিয়াউর রহমানকে। তিনি প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার দায়িত্ব পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।" (পৃষ্ঠা : ৫০০)

সেনা পরিষদের কর্মসূচি

আগস্ট বিপ্লবের পূর্বেই সেনা পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বিপ্লবের যে উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি প্রণয়ন করেন, খন্দকার মোশতাক সরকার তা-ই বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে থাকেন। সেনা পরিষদের প্রণীত ঐ কর্মসূচি মেজর ডালিম তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এখানে জরুরি অংশটুকু পরিবেশন করছি ঃ

"বিপ্লবের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে জনগণের উপর সামরিক শাসনের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া নয়; তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সুযোগ গ্রহণ করে সামরিক শাসন কায়েম করা হয়েছে, কিন্তু এভাবে সামরিক বাহিনীকে সরাসরিভাবে জাতীয় রাজনীতিতে জড়ানোর পরিণামে সে সমস্ত দেশে উচ্চাভিলাষী সামরিক শাসকবৃন্দের গোষ্ঠীস্বার্থই চরিতার্থ হয়েছে; জাতি ও দেশের কোন কল্যাণ হয়নি। কোন বিশেষ গোষ্ঠীস্বার্থ হাসিল করা আমাদের বিপ্লবের উদ্দেশ্য নয়। এই বিপ্লবের চরিত্র হবে অন্যান্য দেশে সাধারণভাবে সংঘটিত যে কোন ক্যু'দাতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সেনা পরিষদ দেশবাসী এবং সারাবিশ্বে প্রমাণ করবে, বাংলাদেশের সেনা বাহিনীর বৃহৎ অংশ দেশপ্রেমিক; ক্ষমতালিপ্সু সুযোগ সন্ধানী নয়। অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনগণের রক্ষক হয়ে ভক্ষক বনে যাবার অভিপ্রায় তাদের নেই। দেশ ও জনগণের স্বার্থরক্ষায় নির্ভীক, নিবেদিত প্রাণ সৈনিক তারা। জনগণের মৌলিক অধিকার এবং গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যই বিপ্লব। স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো হবে, যাতে করে সুষ্ঠু জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিকাশ ঘটাবার জন্য দেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা সংগঠিত হতে পারেন গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারাবাহিকতায়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে এগিয়ে নেবার দায়িত্ব হবে দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দলসমূহের। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব হবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের। সেনা বাহিনী দেশ ও জাতীয় স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে যাবে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে। প্রমাণ করা হবে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্যরা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক। জাতীয় স্বার্থই তাদের কাছে মুখ্য, ব্যক্তি কিংবা গোষ্ঠী স্বার্থ নয়। অনন্য এই বিপ্লব নিখাঁদ দেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক মাইলফলক হিসেবে স্থাপিত হবে বাংলাদেশের ইতিহাসে।

আসন্ন বিপ্লবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলি

১. রুশ-ভারত নাগপাশ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা।

২. মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩. 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' নামে বাকশাল ও মুজিব সরকারের প্রতারণামূলক কার্যক্রমের প্রকৃত উদ্দেশ্য জনগণের সামনে তুলে ধরা।

www.bjilibrary.com

৪. কৌশলগত কারণে স্বল্পসময়ের জন্য সংসদকে বলবৎ রেখে সাংবিধানিকভাবে একটি দেশপ্রেমিক সর্বদলীয় অস্থায়ী/নির্দলীয় সরকার গঠন করা।

সর্বদলীয় অস্থায়ী/নির্দলীয় সরকারের দায়িত্ব

১. বাকশাল প্রণোদিত শাসনতন্ত্রের ৪র্থ সংশোধনী, সংবাদপত্র ও প্রকাশনা আইন, রক্ষীবাহিনী আইন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আইনের পরিপন্থী শ্রমিক আইন ও অন্যান্য কালা-কানুন বাতিল করা।

২. রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দিয়ে দেশে অবিলম্বে প্রকাশ্য রাজনীতি ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

৩. সকল রাজবন্দির বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া।

৪. সাধারণ নির্বাচনের দিন ধার্য করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৫. জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি যে কোন হুমকির মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা এবং জরুরি ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক সক্ষম ছেলে-মেয়েদের সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা বাহিনীর অবকাঠামো গড়ে তোলা।

৬. সমাজতন্ত্রের নামে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ, স্বেচ্ছাচারী একনায়কত্ব ও সরকারি সহযোগিতায় জাতীয় সম্পদ লুণ্ঠন, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, চোরাচালান ও অবাধ দুর্নীতির ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটিয়ে বিপর্যস্ত দেউলিয়া অর্থনীতির পুনর্বিন্যাসের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৭. জাতীয় জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে দেশে আইনের শাসন প্রবর্তন করা।

৮. প্রশাসন কাঠামোকে দুর্নীতিমুক্ত করা।

৯. রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহে বাংলাদেশী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবনাদর্শের প্রতিফলন নিশ্চিত করার সাথে সাথে সংখ্যালঘু নাগরিকদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা।

১০. পঁচিশ বছরের মৈত্রী চুক্তি বাতিল করা।" (পৃষ্ঠা : ৪৮৮ ও ৪৮৯)

১৭০.

খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের সূচনা

CGS ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ দ্বিতীয় সেনাপ্রধান ব্যক্তি। তিনি যদি সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের যথাযথ আনুগত্য না করেন তাহলে সেনাপ্রধানের কোন সিদ্ধান্তই বাস্তবায়িত হতে পারে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ভূমিকা সম্পর্কে মেজর ডালিম লিখেন ঃ

"কিছুদিন পর একদিন জেনারেল জিয়া জানালেন, তার কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করছে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিল। তাদের সাথে হাত

www.bjilibrary.com

মিলিয়েছে কিছু বাকশালপন্থি অফিসার। ব্রিগেডিয়ার খালেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, কিন্তু ভীষণ উচ্চাভিলাষী। তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য অতি কৌশলে যুদ্ধের সময় থেকেই তিনি তার শক্তি এবং প্রভাব বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা করে আসছিলেন। মুজিব সরকার ও বাকশালীদের সহানুভূতিও ছিলো তার প্রতি। আচমকা বাকশালী সরকারের পতনের ফলে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তাই তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন যে কোন উপায়েই তার পরিকল্পনা কার্যকরী করে তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে। তার এই হীন চক্রান্তমূলক কার্যকলাপ থেকে তাকে কিছুতেই নিরস্ত্র করতে পারছিলেন না জেনারেল জিয়াউর রহমান। ক্ষমতার প্রতি ব্রিগেডিয়ার খালেদের এই দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলো বাকশালী চক্র এবং তাদের মুরুব্বী সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তাদের দোসর ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। ১৫ আগস্ট পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে আগস্ট বিপ্লবের পূর্ব অবস্থায় দেশকে নিয়ে যাবার এক গভীর ষড়যন্ত্রের সূচনা ঘটানো হলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর রিপোর্টেও এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যেতে লাগলো। ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রধান উসকানিদাতা ছিলো কর্নেল শাফায়াত।" (পৃষ্ঠা : ৫০১)

সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া খালেদ ও শাফায়াতের সাথে একান্তে বৈঠক করলেন। তাঁরা সহযোগিতার ওয়াদা করলেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের আচরণ ভিন্ন ছিলো। তিনি সমস্যাটা জেনারেল ওসমানীকে জানালেন। ডালিমের ভাষায় ঃ

"তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না খালেদ এবং শাফায়াত এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজে লিপ্ত হতে পারে! কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগীয় প্রধানরা যখন বিস্তারিত রিপোর্ট তার সামনে পেশ করলেন তখন অসহায় আক্ষেপে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল শাফায়াতকে ডেকে তাদের সাথে জেনারেল জিয়ার বিরোধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে একইভাবে তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলেছিলেন, তাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠেছিলো, এই চক্রান্তে হাত রয়েছে বাকশালীদের একটি চক্র এবং তাদের সার্বিকভাবে মদদ যোগাচ্ছিলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন চেষ্টা চালাচ্ছে আর্মির মধ্যে কিছু লোকের মাধ্যমে একটি প্রতিবিপ্লবী ঘটনা ঘটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে বিভক্তি সৃষ্টি করে দেশকে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে ২৫ বছরের আওতায় বাংলাদেশে সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপ করে জনাব তাজুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার গঠন করে বাংলাদেশকে আবার একটি করদ রাজ্যে পরিণত করা।" (পৃষ্ঠা : ৫০৩)

জনাব জিল্লুর রহমান খান "Leadership Crisis in Bangladesh" গ্রন্থে লিখেছেন, "খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের বিষয়ে জেলে চার নেতা অবহিত ছিলেন। এটা ছিলো একটি মুজিবপন্থি পাল্টা অভ্যুত্থান। কারণ চার নেতা বীরদর্পে জেল থেকে বের হয়ে এসে সরকার গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।" পৃষ্ঠা ৫০৩)

"ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার চামচারা তখন সেনা বাহিনীতে জোর প্রচারণা শুরু করে দিয়েছে জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে। তাদের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, জেনারেল জিয়া

www.bjilibrary.com

যোগ্য বিপ্লবী নন; তার দ্বারা আগস্ট বিপ্লবের উদ্দেশ্যাবলির বাস্তবায়নও সম্ভব নয়। তিনি সর্বময় ক্ষমতাশালী হওয়ার জন্য বিপ্লবের বিরুদ্ধে কারসাজি করে চলেছেন অতি ধূর্ততার সাথে। এক্ষেত্রে সবাইকে তার বিকল্পের কথা ভাবতে হবে। সাধারণ সৈনিকদের কাছে জিয়া ছিলেন আদর্শের প্রতীক। সততার জন্য তার জনপ্রিয়তাও ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু তারই সহযোদ্ধা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি অংশের বিরূপ প্রচারণা সেনা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলো। ফলে পরিস্থিতি হয়ে উঠলো আরও ঘোলাটে।" (পৃষ্ঠা : ৫০৪)

"সময়ের সাথে জেনারেল জিয়া এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো। প্রায় প্রতিদিন রাতেই আমি ছুটে যাচ্ছি সেনা নিবাসে তাদের বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের সবার মধ্যেই পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো খুবই Close and informal. নীতি-আদর্শ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং পদমর্যাদার ভেদাভেদ এসব কিছুর উর্ধ্বে ছিলো সেই সম্পর্ক। যুদ্ধকালীন সময় থেকেই আমাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিলো একের প্রতি অপরের অদ্ভুত নির্ভরশীলতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা। সেই সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতেই আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিলাম খালেদ ভাই এবং কর্নেল শাফায়াতকে বোঝাতে; কিন্তু আমার সেই প্রচেষ্টাতে তেমন কোন লাভ হচ্ছিলো না। শেষ চেষ্টা হিসেবে হুদা ভাইকে অনুরোধ জানালাম ঢাকায় আসার জন্য। কর্নেল হুদা তখন রংপুরের ব্রিগেড কমান্ডার। হুদা ভাই এবং খালেদ ভাই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একেবারে হরিহর আত্মা। হুদা ভাই ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সচেতন, জ্ঞানী, ন্যায়পরায়ণ, স্পষ্ট বক্তা, সৎ এবং উদারপন্থি চরিত্রের। এ ধরনের চরিত্রের লোক ছিলেন বলেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন হয়েও এবং শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধভক্তি থাকা সত্ত্বেও দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আওয়ামী লীগ সরকার সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তার সচেতন মন কিছুতেই আওয়ামী দুঃশাসন মেনে নিতে পারেনি। এর ফলেই কুমিল্লায় ব্রিগেড কমান্ডার থাকাকালে আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন হুদা ভাই। (এ ব্যাপারে আগেই বিস্তারিত লেখা হয়েছে) ভেবেছিলাম হুদা ভাইকে দিয়ে খালেদ ভাইকে বোঝাতে, তাকে ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে। জিয়াবিরোধী চক্রান্ত থেকে নিরস্ত্র করার এটাই হবে আমার শেষ প্রচেষ্টা।

খবর পেয়ে হুদা ভাই এলেন ঢাকায়। তার সাথে আমার বিস্তারিত খোলাখুলি আলাপ হলো। সব কিছু শোনার পর হুদা ভাই কথা দিলেন সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন তিনি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বোঝাতে। পরপর দু'দিন বৈঠক করলেন তিনি খালেদ ভাই এর সাথে। কিন্তু তার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। কোন যুক্তি দিয়েই তাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন না হুদা ভাই। সেই রাতের কথা ভোলার নয়.........।" (পৃষ্ঠা; ৫০৬ ও ৫০৭)

কর্নেল হুদা ব্রিগেডিয়ার খালেদকে বুঝাতে ব্যর্থ হয়ে বললেন, "ডালিম, খালেদ ভীষণভাবে হতাশ করেছে আমাকে। ও কিছুতেই বুঝলো না। জেনারেল জিয়ার ব্যাপারে কোন আপস করতে রাজি নয় খালেদ। তার মতে জিয়া আগস্ট বিপ্লবের উদ্দেশ্যাবলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেই ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্র করে চলেছে, যেটা তোমরাও

www.bjilibrary.com

নাকি বুঝতে পারছো না। তার এ ধরনের চিন্তা এবং একগুঁয়েমির পরিণাম কি হতে পারে সেটা ভাবতেও গা শিউরে উঠছে আমার। শুধু তাই নয়, জিয়ার বিরুদ্ধে আমার সমর্থনও চেয়েছে খালেদ।

আমি তার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রশ্ন করলাম,

-এই অবস্থায় কি করা উচিত বলে আপনি মনে করেন স্যার?

-ঠিক বুঝতে পারছি না to be honest. চিন্তিতভাবে জবাব দিয়েছিলেন হুদা ভাই। এরপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে ছিলাম আমরা।

-খালেদকে বোঝাতে না পারলেও কাছে থাকলে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা যেতো। By the way I don't know whether you know about this or not. Brigadier Nuruzzaman is also with Khaled. খালেদের অনুরোধ আমার পক্ষে সরাসরিভাবে উপেক্ষা করাটাও would be very difficult because of our relation. You know how close we are.

-তা জানি। কিন্তু এতো জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেবার মতো ব্যাপার স্যার।

-ঠিকই বলেছো তুমি। আমি কি করবো সেটা জানি না তবে খালেদকে আমি পরিষ্কারভাবেই বলেছি এই মুহূর্তে যে কোন কারণেই হোক না কেন জেনারেল জিয়া অথবা মোশতাক সরকারের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ জাতীয় স্বার্থবিরোধী বলেই পরিগণিত হবে এবং জনগণ ও সৈনিকরা সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না। তাছাড়া জেনারেল জিয়া সেনা পরিষদের মনোনীত সেনাপ্রধান; সেক্ষেত্রে তার ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকলে সেটা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসনে বাধা কোথায়? I think he has been intrigued and is being used by some unknown quarters. শেষের কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই বললেন হুদা ভাই। চক্রান্ত সম্পর্কে অনেক খবরা-খবরই আমাদের জানা আছে; সে বিষয়ে কোন আলাপ না করে আমি শুধু বলেছিলাম,

-Well Sir, decision is yours. আপনি একজন বিবেকবান পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক এবং মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী; তাই যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন ভবিষ্যতে। অতীতের মতো ভবিষ্যতেও ব্যক্তি সম্পর্কের থেকে জাতীয় স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিবেন আপনি সে প্রত্যাশাই করবো আমি। দেখা যাক কি হয়? আল্লাহ্ ভরসা। সবকিছুইতো পরিষ্কার বুঝে গেলেন। আমি যোগাযোগ রাখবো। আমার অনুরোধ রক্ষা করে রংপুর থেকে ছুটে এসেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলের ঔদ্ধত্য মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো। জেনারেল জিয়ার প্রায় সব নির্দেশই উপেক্ষা করে চলেছেন তারা। প্রতি রাতেই মধ্যস্থতার জন্য ছুটে যেতে হচ্ছে তাদের বিরোধের মীমাংসা করার জন্য। সামরিক বাহিনীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে ভীষণভাবে অস্থিতিশীল করে তুলেছেন তারা।" (পৃষ্ঠা : ৫০৭ ও ৫০৮)

"ক্রমান্বয়ে আর্মির Chain of command-কে অকেজো করে তুলেছে CGS

www.bjilibrary.com

ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং ঢাকা Brigade Commander কর্নেল শাফায়াত জামিল। জেনারেল জিয়া তাদের হাতে প্রায় জিম্মী হয়ে পড়লেন। চিফ অফ আর্মি স্টাফ হিসেবে তার দৈনন্দিন কার্যক্রমেও তারা বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন।" (পৃষ্ঠা : ৫১০)

ব্রিগেডিয়ার খালেদ অনমনীয়

ব্রিগেডিয়ার খালেদকে নিবৃত্ত করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো। ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে মেজর ডালিম বঙ্গভবনে যেয়ে জানতে পারলেন যে কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশীদ প্রেসিডেন্টের সাথে আছেন এবং তাঁর অপেক্ষা করছেন। সেখানে জানা গেলো যে, মেজর হাফিয ও ক্যাপ্টেন ইকবাল ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সব troops in withd raw করে বঙ্গ ভবন থেকে নিয়ে গেছে। খবর পাওয়া যাচ্ছে ক্যান্টনমেন্টে অস্বাভাবিক troops movement হচ্ছে।

বঙ্গ ভবনে জেনারেল ওসমানীও এসে গেলেন। মেজর পাশা, মেজর শাহরিয়ার, ক্যাপ্টেন বজলুল হুদাও পৌছলেন। মেজর ডালিম গৃহযুদ্ধ থেকে সেনাবাহিনীকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ব্রিগেডিয়ার খালেদের সাথে আলোচনার জন্য নিজেই ক্যান্টনমেন্টে যেতে চাইলেন। জেনারেল ওসমানী এ প্রস্তাব সমর্থন করলেন। কর্নেল রশীদ মেজর ডালিমের সেনা সদরে যাওয়া নিরাপদ মনে না করা সত্ত্বেও ডালিম মেজর নূরকে নিয়ে মধ্য রাতেই গেলেন।

এ রাতটি বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সারারাত মেজর ডালিম ও মেজর নূরের তৎপরতা চললো। প্রথম মেজর হাফিজের সাথে তারা দেখা করলেন। ডালিমের ভাষায়ই শুনুন ঃ

"-এ কি করলে হাফিজ! শেষ পর্যন্ত অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লে?

-অঘটন বলছো কেন? জিয়া এবং মোশতাকের ঘোড়েল মনের পরিচয় পাবার পরও তারা যে আমাদের উদ্দেশ্যাবলি সম্পর্কে মোটেও আন্তরিক নয় সেটা তোমরা বুঝেও মেনে নিতে পারছো না কেন? Both of them are betraying our cause. উল্টো প্রশ্ন করলো হাফিজ। ওদের বাদ দিয়েই এগুতে হবে। আওয়ামী লীগের গড়া সংসদকেও আর কাল বিলম্ব না করে ভেঙে দিতে হবে। এই সঠিক উদ্যোগে বিশেষ করে তোমার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, শাহরিয়ার এর মাধ্যমে সেনা পরিষদের সমর্থন এবং সহযোগিতা পাবো আশা করছি আমরা। আমি জানি ব্রিগেডিয়ার খালেদ সম্পর্কে তোমাদের যুক্তিসঙ্গত reservations আছে; সেগুলোকে আমিও অস্বীকার করছি না, কিন্তু এরপরও ব্রিগেডিয়ার খালেদের চিফ হবার lifelong ambition fulfill করে দিলে জিয়ার তুলনায় তাকে দিয়ে more efficiently কাজ করানো যাবে।

-দেখো হাফিজ, আমি স্বীকার আগেও করেছি এখনো করছি, আশানুরূপভাবে আমাদের লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমাদের নিরাশ হতে হচ্ছে জেনারেল জিয়া এবং প্রেসিডেন্ট মোশতাকের জন্য। শুধু তাই নয়; অনেকক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতারও সৃষ্টি করছেন তারা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক, কিন্তু তাই বলে হঠাৎ করে এ ধরনের একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আর্মির মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করে অপশক্তিকে সুযোগ করে দিতে হবে to stage back and reverse the process সেটা কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না এবং আমাদের কাছেও সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। তা যাক, এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক

www.bjilibrary.com

হয়েছে; আমার ধারণা, এ সমস্ত বোঝাবুঝির সময় পার হয়ে গেছে, কারণ যে অঘটন কখনোই সম্ভব হতো না সেটাই ঘটিয়ে বসেছো তোমরা। এই অবস্থায় কোন রক্তপাতের সূত্রপাত যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা স্বেচ্ছায় ছুটে এসেছি। এখন চলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াতকে সঙ্গে করে সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করা যাক এই সংকটের রাহুগ্রাস থেকে দেশ ও জাতিকে কি করে উদ্ধার করা যায়। এ বিষয়ে যদি কোন আপত্তি থাকে তবে সেটাও বলো পরিষ্কার করে। সেক্ষেত্রে আমরা ফিরে যাবো। এরপর যা হবার তা হবে। কি যেন ভাবলো হাফিজ, এরপর বললো,

-ঠিক আছে, তাই হবে। চলো আমাদের সাথে। হাফিজ, আমি, নূর এবং ইকবাল ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। বাইরে বেরুতেই দেখলাম ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার মঈন, ক্যাপ্টেন নাছের, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, কর্নেল রউফ, কর্নেল মালেক প্রমুখ সবাই অফিস ব্লকের সামনে লনে দাঁড়িয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন নিজেদের মধ্যে। আমরা এগিয়ে যেতেই তারা কথাবার্তা বন্ধ করে দিলেন। আমি ব্রিগেডিয়ার খালেদকে অভিবাদন জানাতেই তিনি হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠলেন,

-আরে এসো এসো, welcome, আমি জানতাম তোমরা দু'জন আসবেই। তার কথা শেষ হতেই বললাম,

-শেষটায় অঘটনটা ঘটিয়েই ছাড়লেন।

-What do you mean? It's not my doing. Believe me Dalim it is theirs doing, these young officers. They think Zia can't deliver. They also think he will do nothing to achieve the goals of the 15th August revolution at the sametime he is also totally incapable to protect the interest of the armed forces. Therefore, they want a change.

-বুঝতে পারলাম স্যার, জেনারেল জিয়ার জায়গায় বসে সেই যোগ্য নেতৃত্ব দেবার জন্যই এই সংকট সৃষ্টি করেছেন অথবা করানো হয়েছে।

No no not at all. I don't want to be the Chief. Believe me. I have no such ambition. ছেলেরা আমাকে ডেকে নিয়ে এসেছে তাই আমি এসেছি।

-যাক স্যার, এ বিষয় নিয়ে কথা বাড়াবার সময় এটা নয়; এতে কোন লাভও নেই। আমি ও নূর এসেছি কোন প্রকার রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ যাতে শুরু না হয় সেটা নিশ্চিত করতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে। রশিদ এবং ফারুককে বলে এসেছি আপনাদের সাথে আমাদের আলোচনার ফলাফল জানার আগ পর্যন্ত বঙ্গ ভবনের নিয়ন্ত্রণাধীন ট্যাংক কিংবা ট্রুপস এর কোন মুভমেন্ট করা হবে না। এখন বলেন, আলোচনায় আপনারা রাজি আছেন কিনা? আমার কথার ধরনে তারা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে জবাব খোঁজার চেষ্টা করছিলেন সবাই। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো হাফিজ। সে নিচু স্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে কিছু বললো। হাফিজের কথা শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন, তোমাদের আলোচনার প্রস্তাব মেনে নিলাম আমরা। আলোচনা হবে।" (পৃষ্ঠা : ৫২৮-৫২৯)

www.bjilibrary.com

ডালিম-খালেদ আলোচনা

মেজর ডালিমের সাথে ব্রিগেডিয়ার খালেদের এ আলোচনার ফলেই সেনা বাহিনীর মধ্যে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা দূর হলো এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ ৩ নভেম্বর বিনা বাধায় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হলেন। ঐ আলোচনার বিবরণ ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য বিষয়। তাই সংক্ষেপে হলেও ডালিমের গ্রন্থ থেকেই পরিবেশন করছি ঃ

"স্যার, কোন আলোচনায় বসার আগে একটা বিষয়ে আপনাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই, জেনারেল জিয়ার সাথে এ পর্যন্ত যা করা হয়েছে এর বেশি কিছু করা হলে সেটা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এ ব্যাপারে you have to give me your explicit assurance. বুদ্ধিমান লোক ব্রিগেডিয়ার খালেদ। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন আমি কি বোঝাতে চাচ্ছি। কোন সময় না নিয়েই তিনি জবাব দিলেন,

-Be rest assured. no harm would be done to him. At the most he may be removed as the chief of army staff that's all. Nothing more than that.

আলোচনা শুরু হলো। একদিকে আমি ও নূর অন্যদিকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নেতৃত্বে ওদের তরফের উপস্থিত প্রায় সবাই। শুরুতেই আমি সরাসরি প্রশ্ন রাখলাম,

-দেশে একটি জনপ্রিয় সরকার থাকতে এ ধরনের একটা সংঘাতমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য কি? আমার প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেমন যেন থমকে গেলেন। মনে মনে সবাই প্রশ্নের উপযুক্ত জবাব খুঁজে পেতে চেষ্টা করছিলেন। নিঃশব্দতা ভঙ্গ করে কর্নেল শাফায়াত বলে উঠলেন,

-We want to dismiss the Mushtaq government and the present parliament because the present Parliament is the parliament of Awami-Baksalites. জবাবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

-তারপর?

-We don't want Gen. Zia to remain as our Chief.

-দেশ চালাবে কে? প্রশ্ন করলাম।

-We shall form a 'Revolutionary Council. ক্যাপ্টেন ইকবাল জবাব দিলো। কর্নেল শাফায়াত আবার বলে উঠলেন,

-Khandakar Mushtaq will hand-over power to the Chief justice. ব্রিগেডিয়ার খালেদ ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন

-Continuation must be maintained and therefore. Khandaker Mushtaq will remain as the President but three Chiefs must be removed.

বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না, কোন নির্দিষ্ট blue print ছাড়াই অঘটন ঘটিয়ে বসেছেন তারা। কোন পরিষ্কার পরিকল্পনা কিংবা মতানৈক্য কোনটাই নেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ চক্রের।" (পৃষ্ঠা : ৫৩০ ও ৫৩১)

www.bjilibrary.com

আলোচনায় বিরতির পর আবার শুরু

রাত শেষ হয়ে ৩ নভেম্বর সকালেও আলোচনা অব্যাহত থাকাকালে নাস্তা প্রস্তুত বলে খবর আসলে নাস্তার পর আবার আলোচনা শুরু হলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বললেন, ডালিমের লেখায় ঃ

"তুমি অযৌক্তিকভাবে সব ঘটনার জন্য আমাকেই দোষারোপ করছো। যা ঘটেছে তার জন্য শুধুমাত্র আমি একা দায়ী নই। জিয়ার বিরুদ্ধে তরুণ অফিসাররা অসন্তুষ্ট। তারা বুঝতে পেরেছে কোন বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা তার নেই। মোশতাক এবং জিয়ার উপর বিতশ্রদ্ধ; তাই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে এদের বিরুদ্ধে। বলেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ কর্নেল শাফায়াত, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, ক্যাপ্টেন নাসের, ক্যাপ্টেন কবির প্রমুখদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন। এদের অনুরোধেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।

বুঝলাম, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী চতুর ব্রিগেডিয়ার খালেদ অতি কৌশলে গা বাঁচিয়ে অন্যদের কাঁধে বন্দুক রেখে নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার উদ্যোগ নিয়েছেন।

-জেনারেল জিয়াকে সরিয়ে তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে যোগ্য নেতৃত্ব দেবার দায়িত্বটা কি আপনিই নেবেন স্যার? আমার প্রশ্নের জবাবে নিজের সাফাই দেবার জন্য পাল্টা প্রশ্ন করলেন,

-তুমি কি মনে করো চিফ হওয়ার জন্যই আমি এখানে এসেছি? (পৃষ্ঠা : ৫৩২)

-ডালিম, আমাদের দাবি চারটি ঃ

১. খন্দকার মোশতাকই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।

২. বর্তমানের তিন চিফ অফ স্টাফকে অব্যাহতি দিয়ে তাদের জায়গায় গ্রহণযোগ্য নতুন চিফ অফ স্টাফ নিয়োগ করতে হবে আর্মি, এয়ারফোর্স এবং নেভিতে।

৩. আর্মিতে Chain of command re-establish করতে হবে। বঙ্গভবন এবং শহরে deployed সমস্ত ট্রুপস এবং ট্যাংকস ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

৪. বাকশালী শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে বর্তমানের সংসদ ভেঙে দিতে হবে। বহুদলীয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরা নতুন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালিত হবে সামরিক শাসনের মাধ্যমে।

বুঝতে পারলাম, বর্তমানে জনগণের মানসিকতা এবং গ্রহণযোগ্যতার কথা চিন্তা করেই দাবিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে। অত্যন্ত চতুরতার সাথে সময়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ধারাকে উল্টে দিয়ে ক্ষমতা কুক্ষীগত করার পরিকল্পনা আঁটা হয়েছে। এ ধরনের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা শুধুমাত্র ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার দোসরদের কাজ নয় এবং এর পিছনে যে অজানা চানক্যরা রয়েছেন সেটা বুঝতে মোটেই কষ্ট হলো না আমার। যাই হোক, সব শুনে আমি বললাম,

-ঠিক আছে খালেদ ভাই। প্রেসিডেন্টের সাথে আপনাদের দাবিগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য চলুন তবে বঙ্গভবনে যাওয়া যাক। আমার প্রস্তাবে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যরা কেন জানি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কর্নেল

www.bjilibrary.com

শাফায়াত ব্রিগেডিয়ার খালেদের হয়ে জবাব দিলেন,

-ব্রিগেডিয়ার খালেদ বঙ্গভবনে যাবেন না। তার প্রতিনিধি পাঠানো হবে। জবাব শুনে রসিকতাচ্ছলে ব্রিগেডিয়ার খালেদকে উদ্দেশ্য করে বললাম,

-আমরাতো নিজেরাই ছুটে এসেছি। আপনারা আমাদের সাথে কোন আলোচনা করতে আদৌ রাজি হবেন কিনা সে বিষয়েও আমরা নিশ্চিত ছিলাম না তবু এসেছি। (পৃষ্ঠা : ৫৩৫)

আপনাদের সাথে বসে আলোচনা করতে আমাদেরতো কোন ভয় হচ্ছে না; সেক্ষেত্রে আপনি প্রতিনিধি পাঠাতে চাচ্ছেন কেন? নিজেই চলুন না আমাদের সাথে। ভয় পাচ্ছেন নাকি স্যার? For heaven's sake have a heart! We must have mutual trust and confidence and that is the only basis on which we shall succeed to find out a way to salvage the nation from this uncalled for crisis. Don't you agree with me Sir? আমার রসিকতার কোন জবাব দিলেন না খালেদ ভাই। ঠিক হলো, তাদের তরফের প্রতিনিধি হয়ে কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেক যাবে আমাদের সাথে বঙ্গভবনে। তাদের এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দু'জনকে সাথে করে আমরা ফিরে এলাম বঙ্গভবনে।" (পৃষ্ঠা : ৫৩৬)

বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্টের কামরায়

বঙ্গভবনে পৌঁছে ব্রিগেডিয়ার খালেদের দু'জন প্রতিনিধিকে অন্যত্র বসিয়ে মেজর ডালিম ও মেজর নূর প্রেসিডেন্টের কামরায় গেলেন। সেখানে জেনারেল ওসমানী, কর্নেল রশীদ ও মেজর হুদা ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার খালেদের ৪-দফা দাবি সম্পর্কে আলোচনার পর করণীয় সম্পর্কে একমত হয়ে খালেদের প্রতিনিধিদ্বয়কে ডেকে আনা হলো। প্রেসিডেন্ট মোশতাক জানতে চাইলেন (ডালিমের গ্রন্থ থেকে) ঃ

"-বলো, তোমাদের কি বলার আছে? কর্নেল মান্নাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদদের তরফের দাবিগুলো একটা একটা করে ব্যক্ত করে প্রেসিডেন্টের জবাব জানতে চাইলেন। সব কিছু শুনে খন্দকার মোশতাক ধীরস্থিরভাবে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে দৃঢ়তার সাথে বললেন,

-Well I have heard you patiently. Go back and tell the people at the cantonment. 'if they want me to continue as the president then I shall execute my responsibilities at my own terms for the best interest of the nation and the country. I am not at all prepared to remain as the head of state and government to be dictated by some Brigadier. Before anything I want the chain of command be restored immediately and Khaled should allow my three chief of staffs to come-over to Bangabhaban without any further delay. Khaled should also withdraw the troops from the relay station so that the national radio and TV can resume normal broadcasting at the soonest possible time. My priority at this time is to bring back normality in the country. আমার নির্দেশ যদি খালেদ মানতে রাজি না হয়; তবে তাকে বলবে he should come-over

www.bjilibrary.com

to Bangabhaban and take-over the country and do whatever he feels like. আমি একটা রিক্সা ডাইকা আগামসী লাইনে যামুগা।

প্রেসিডেন্টের জবাব শুনার পর কর্নেল মান্নাফ এবং মেজর মালেকের সঙ্গে ফিরে এলাম ৪র্থ বেঙ্গল হেডকোয়ার্টার্স-এ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং অন্যান্য সবাই আমাদের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হয়ে ছিলেন।" (পৃষ্ঠা : ৫৩৮)

সেনা-সদরে ব্রিগেডিয়ার খালেদের নিকট

বঙ্গভবন থেকে ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রতিনিধিদ্বয়ের সাথে মেজর ডালিম ও মেজর নূর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে গেলেন। সেখানে যা ঘটলো এর বিবরণ মেজর ডালিমের গ্রন্থে নিম্নরূপে পরিবেশন করা হয়েছে ঃ

"কর্নেল মান্নাফ সবার উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টের বক্তব্য হুবহু তুলে ধরলেন। প্রেসিডেন্টের বক্তব্য শুনে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন, খন্দকার মোশতাকের কাঁধে বন্দুক রেখে তার অভিসন্ধি হাসিল করা সম্ভব হবে না। ব্রিগেডিয়ার খালেদের চাল যে করেই হোক না কেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী জনাব মোশতাক ধরে ফেলেছেন এবং তাই তিনি তার ফাঁদে পা দিতে অস্বীকার করেছেন। মুহূর্তে চাপা আক্রোশে ফেটে পড়লো সবাই। কর্নেল শাফায়াত ক্ষোভে বলে উঠলেন,

-How dare he speaks like that? তাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদ বলে উঠলেন,

-Allright, we shall see. বলেই কর্নেল শাফায়াত, ব্রিগেডিয়ার নূরুজ্জামান, ব্রিগেডিয়ার মঈন, মেজর হাফিজ, ক্যাপ্টেন ইকবাল, স্কোয়াড্রন লিডার লিয়াকত, কর্নেল রউফ, মেজর মালেক প্রমুখকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গিয়ে পাশের রুমে রুদ্ধদ্বার আলোচনায় বসলেন। খালেদচক্রের মূল সমস্যা ছিলো সেনা পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি, সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে জেনারেল জিয়ার এবং জাতীয় পরিসরে মোশতাক সরকারের জনপ্রিয়তা। আমাদের সমস্যা ছিলো খালেদচক্রের বাকশালপন্থি চেহারা উন্মোচিত না হওয়া পর্যন্ত বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে ২৫ বছর মেয়াদী চুক্তির আওতায় ভারতীয় প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের সুযোগ না করে দেয়া। মিনিট বিশেক পর তারা ফিরে এলেন নিজেদের মাঝে আলাপ-আলোচনা শেষ করে।

-ডালিম, খন্দকার মোশতাক যখন আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করতে রাজি হচ্ছেন না; সেক্ষেত্রে তাকে প্রধান বিচারপতি জাস্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। বললেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ।

-জাস্টিস সায়েমের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করাটা হবে সংবিধানবিরোধী। তাছাড়া আইনের মানুষ হয়ে জাস্টিস সায়েম কি অসাংবিধানিকভাবে এভাবে রাষ্ট্রপতি হতে সম্মত হবেন? জবাবে প্রশ্ন করলাম আমি।

-well. যেভাবেই হোক না কেন; এই হস্তান্তরকে আইনসম্মত করে নিতে হবে। জাস্টিস সায়েমকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমার।

ব্রিগেডিয়ার খালেদের কথা থেকে আঁচ করতে অসুবিধা হলো না কোন অদৃশ্য সুতার

www.bjilibrary.com

টানে তিনি এ ধরনের সংবিধানবহির্ভূত একটা সমীকরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন; কোন একটা বিশেষ মহলের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য।" (পৃষ্ঠা : ৫৩৯)

মেজর ডালিম ও মেজর নূর ব্রিগেডিয়ার খালেদের প্রতিনিধিদ্বয়কে নিয়েই বঙ্গভবনে ফিরে এলেন। প্রেসিডেন্ট মোশতাক সব শুনে জাস্টিস সায়েমের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ সিদ্ধান্তের কথা জেনে মেজর মান্নাফ ও মেজর মালেক সন্তুষ্টচিত্তে এবং বিজয়ের নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে গেলেন।

৩ নভেম্বর দিবাগত রাত

মেজর ডালিমের গ্রন্থ থেকে জানা গেলো যে, খন্দকার মোশতাক আগস্ট বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট সেনা অফিসারদেরকে সপরিবারে ব্যাংকক যাবার ব্যবস্থা করেন। ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই প্রেসিডেন্ট মোশতাক খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ তাঁর প্রতি-বিপ্লবে সহযোগিতা করার জন্য মেজর ডালিমকে অনুরোধ করায় ব্যাংকক রওয়ানা হবার আগে মেজর ডালিম ফোনে খালেদকে যা বললেন তা তাঁরই ভাষায় শুনুন ঃ

"-স্যার, আমাদের ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ ব্যাপারে আপনি হয়তোবা জেনেও থাকতে পারেন। তবুও কথা দিয়ে এসেছিলাম তাই কথা রক্ষার্থে জানাচ্ছি: রশিদ, ফারুক, শাহরিয়ার, নূর, পাশা, হুদা, রাশেদ, মহিউদ্দিন, শরফুল, মাজেদ, কিসমত, নাজমুল, মোসলেম, হাশেম, মারফত এবং আমি সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রাতেই চলে যাবো আমরা। প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিয়েটের মাধ্যমে। আপনার সাথে সহযোগিতা করার অনুরোধ রাখা সম্ভব হলো না স্যার। দেশ ও জাতির জন্য ভবিষ্যতে আর কিছু করার তৌফিক আল্লাহপাক যদি নাই দেন সেটা মেনে নিতে পারবো; কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে '৭১-এর চেতনা এবং নীতির প্রশ্নে আপস করে জাতীয় বেঈমান হিসেবে পরিচিতির যে গ্লানি সেটা সহ্য করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়; হবেও না কোনদিন।

-রশিদ-ফারুক সম্পর্কে আমাদের বিরূপ মনোভাব আছে, তারা দেশ ছেড়ে যেতে চাইতে পারে কিন্তু তোমরা দেশ ছেড়ে যেতে চাচ্ছো কেন, সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আবার কথাগুলোর পুনরুক্তি করলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ।

মুখে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেও বুঝেছিলাম আমাদের দেশ ত্যাগের খবরটা পেয়ে হাঁফ ছেড়েই বেঁচেছিলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং তার সহযোগীরা, এটা ভেবে যে, তাদের প্রতিপক্ষের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীর threat থেকে রেহাই পেলেন তারা।

এভাবেই দেশ ও জাতিকে একটি সম্ভাব্য আত্মঘাতি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচিয়ে খালেদচক্র ও নব্য চানক্যদের ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করার কৌশলগত কারণেই ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সাল রাত সাড়ে দশটায় বিমানের একটি স্পেশাল ফ্লাইটে আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলাম।" (পৃষ্ঠা : ৫৪২ ও ৫৪৩)

www.bjilibrary.com

১৭১.

৩ ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লব ঃ এক প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয়

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ বিনা রক্তপাতে সামরিক বিপ্লব সাধন করে জেনারেল পদবি নিয়ে সেনাপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলেন। কিন্তু এর পঞ্চম দিনই রক্তাক্ত বিপ্লবে তিনি নিহত হলেন। ৩ থেকে ৭ নভেম্বরে যেসব নাটকীয় ঘটনা ঘটলো এর বিস্তারিত জানার প্রবল আগ্রহের কারণে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেলো।

অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি বই পেয়ে গেলাম, যার লেখক ১৫ আগস্ট-বিপ্লব থেকে জিয়া হত্যা পর্যন্ত অনেক তথ্য দিন-তারিখ উল্লেখ করে লিখেছেন। তাঁর পরিচয় জেনে আমি পরম আস্থার সাথে বইটি পড়লাম। তাই প্রথমে তাঁর পরিচয় তুলে ধরছি, যাতে পাঠক-পাঠিকা পূর্ণ আস্থার সাথে তাঁর লেখাকে গ্রহণ করতে পারেন।

তাঁর লেখা বইটির নাম 'তিন সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা'। ২০০ পৃষ্ঠার এ বইটিতে ১৫ আগস্ট বিপ্লব, ৩ নভেম্বর বিপ্লব ও ৭ নভেম্বর বিপ্লবের চিত্র তারিখ ওয়ারী লিখেছেন। ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখের জিয়া হত্যা ও জেনারেল মঞ্জুরের ব্যর্থ বিপ্লবের বিবরণও দিয়েছেন।

লেখক লে. কর্নেল (অব.) এম.এ হামিদ। তিনি সেনাবাহিনীতে জিয়াউর রহমান ও শফিউল্লাহর সাথে একই ব্যাচে যোগদান করেছেন। তিনি পাকিস্তান থেকে ১৯৭২ সালে পালিয়ে এসে সেনাবাহিনীতে মিলিটারি সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ঢাকার স্টেশন-কমান্ডার থাকাকালেই ঐ তিনটি সামরিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ৭ নভেম্বরের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান তাকে ঢাকার লগ এরিয়ার কমান্ডার নিয়োগ করেন। সেনানিবাসে তাঁর বাসা থেকে জিয়াউর রহমানের বাসা মাত্র ২০০ গজ দূরে ছিলো। ব্যাচমেট হিসেবে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো তাঁরা তুই-তুমি সম্বোধন করতেন। লগ এরিয়া কমান্ডার নিযুক্ত হবার তিন মাস পরই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

লে. কর্নেল হামিদের আরও উল্লেখযোগ্য পরিচয় আছে। বাংলাদেশের খ্যাতনামা দাবাড়ু রানী হামিদ তাঁরই স্ত্রী এবং বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়ার কায়সার হামিদ তাঁর সন্তান। তিনি নিজেও ছাত্র জীবন থেকেই যোগ্য খেলোয়াড় ছিলেন। এখনও তিনি ক্রীড়া সংগঠক।

তাঁর বইটির পরিচয়

তাঁর লেখা আলোচ্য বইটি পড়ে আমার বহুদিনের তৃষ্ণা মিটলো। বই থেকে লেখকের মন-মানসিকতা সম্বন্ধে ধারণা করা আমার অভ্যাস। এ ব্যাপারে আমার নিজের উপর আস্থা রয়েছে যে, আমার ভুল হবার কথা নয়। তিনটি অভ্যুত্থানের যে বাস্তব চিত্র তিনি এঁকেছেন তা যথার্থ বলে আমার বিশ্বাস। তিনি জিয়া হত্যা সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ দিয়েছেন তা খুবই যুক্তিপূর্ণ বলে মনে হয়। আমার মতো জানবার আগ্রহীদের জন্য বইটি অত্যন্ত জরুরি। যারা বইটি পড়তে চান তাদের জন্য বইটির প্রাপ্তিস্থান জানাতে চাই। বইটির ৪র্থ বর্ধিত সংস্করণ নতুন প্রকাশক ছেপেছেন। লেখক পূর্বের ৩টি সংস্করণই বাতিল

www.bjilibrary.com

ঘোষণা করেছেন। হাসি প্রকাশনী, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০। একমাত্র পরিবেশক : হিমি বুকস এন্ড বুকস, ঠিকানা- ঐ।

বইটিতে লেখকের ভূমিকা

যেসব তথ্যের জন্য আমি বিভিন্ন বই থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং কারো কারো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি, তাদের তুলনায় এ বইটির তথ্যের উপর আমার বেশি আস্থার কারণ পাঠক-পাঠিকাদের নিকট জানাবার উদ্দেশ্যেই বইটির ভূমিকা থেকে উদ্ধৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করছি ঃ

"১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর, ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানগুলোর উপর আমার লেখার সুবিধা হলো, ওই সময় সৌভাগ্যক্রমে আমি ছিলাম ঢাকা স্টেশন-কমান্ডার। সে হিসেবে অত্যন্ত কাছ থেকে ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানগুলো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছিলো। এছাড়া অভ্যুত্থানের প্রধান নায়কদের প্রায় সবার সাথে ছিলো আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও সরাসরি জানাশোনা।

অভ্যুত্থানের সর্বাধিক আলোচিত নায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমান ছিলেন আমার কোর্স-মেট। ১৯৫৩ সালে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমিতে আমরা দুই বছর একসাথে ক্যাডেট হিসেবে অধ্যয়ন করি। সে ছিলো আমার বন্ধু। তার সাথে আমার সম্পর্ক ছিলো 'তুই তুকারের'। তাই আমার আলোচ্য বইতে অনেক সময় 'তুমি' সম্পর্কের প্রতিফলন ঘটেছে; বস্তুত এটাই ছিলো আমাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক। তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেকের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু হলেও বহুক্ষেত্রে তার ও আমার মত আর নীতির মিল ছিলো না। বিভিন্ন ব্যাপারে ঝগড়াঝাটি এমনকি গালাগালি চলতো। দুঃখের বিষয় স্বার্থান্বেষী প্রভাবশালী একটি মহলের প্ররোচনায় লগ এরিয়া কমান্ডার থাকাকালীন সময়, তার সাথে সিরিয়াস ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। যার ফলে হঠাৎ করেই আমি স্বেচ্ছায় সসম্মানে সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসি।

বরাবরই জিয়া ছিলো মেজাজী এবং প্রবল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন একজন সৎ ও সচেতন অফিসার। কিন্তু সে অসৎ অফিসারদের কানে ধরে কাজ করাতে সুবিধা হয় বলে মনে করতো। তার সাথে জেনারেল ওসমানী, মোশতাক আহমদ, জেনারেল খলিল প্রমুখদের বনিবনা না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে সবার সাথে একা লড়াই-ফাইট করে উপরে উঠে আসে তা ছিলো অবিশ্বাস্য ব্যাপার, লিডারশীপ কোয়ালিটির এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

জেনারেল এরশাদ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলেন একজন অখ্যাত দুর্বল প্রকৃতির অফিসার। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনিই ছিলেন একমাত্র অফিসার, যার দুর্বলতাই হয়ে দাঁড়ায় তার উর্ধ্বে ওঠার বড় 'প্লাস পয়েন্ট'। তিনি কোহাটের অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাস করা একজন 'অনিয়মিত' অফিসার ছিলেন। বহু পরে নিয়মিত হন। জেনারেল এরশাদ ও আমি একসাথে ১৯৬৭ সালে কোয়েটার স্টাফ কলেজ কোর্সে অধ্যয়ন করি। দক্ষ স্মার্ট অফিসার হলেও তার নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য জাতিকে বহু মূল্য দিতে হয়। সেনা অভ্যুত্থানের অন্যতম ফসল জেনারেল এরশাদ। যিনি জিয়াউর রহমানের বদান্যতায় তড়িৎ প্রমোশন পেয়ে হন জেনারেল এবং ডেপুটি চিফ অব স্টাফ। অতঃপর আকাশ হলো তার সীমানা।

www.bjilibrary.com

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার। কথাবার্তায় চাল-চলনে রাজকীয় ব্যক্তিত্ব। আমার কিছু জুনিয়র থাকায় তার সাথে সম্পর্ক থাকলেও তত ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। অন্যান্যদের মতো তিনিও ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী তার প্রতি সদয় ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের এক বীর সেনানায়ক খালেদ মোশাররফ, নেহায়েত দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে অকালে সৈনিকদের হাতে প্রাণ হারান।

জেনারেল শফিউল্লাহ নম্র, ভদ্র অফিসার। সেও আমার কোর্স-মেট। আগস্ট অভ্যুত্থানের আকস্মিক ঘটনাপ্রবাহ সামাল দিতে না পারায় সমালোচিত হয়। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৪ আগস্ট '৭৫ তারিখে শফিউল্লাহকে সরিয়ে তার স্থলে জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান করা হয়।

আগস্ট অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক মেজর ফারুক ও মেজর রশিদ ছিলো অনেক জুনিয়র অফিসার। তাদের সাথে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও সব সময় তারা আমাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। ফারুক-রশিদই প্রকৃতপক্ষে জিয়াকে সেনাপ্রধানের গদিতে বসায়, কিন্তু পরে জিয়া তাদেরকে এড়িয়ে চলায় তাদের ক্ষোভের অন্ত ছিলো না। ফারুক খুবই স্মার্ট, প্রাণবন্ত, আবেগপ্রবণ অফিসার। রশিদ ছিলো ধীর, শান্ত ও হিসেবী।

কর্নেল তাহেরও ছিলো আমার অনেক জুনিয়র, তাই সরাসরি তার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো না। তাহের ছিলো একজন দৃঢ়চেতা মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর ও কর্নেল জিয়াউদ্দিনের সাথে ছিলো ভালো সম্পর্ক। এ তিনজনই কমবেশি বামঘেঁষা হলেও তারা ছিলো নীতিবান অফিসার। পরবর্তীতে জিয়ার সাথেও তাহেরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে। শ্রেণীহীন সেনাবাহিনীর প্রবক্তা কর্নেল তাহেরই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে নভেম্বর সেপাই বিপ্লবের প্রধান স্থপতি। কিন্তু জিয়ার সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে তাকে প্রাণ দিতে হয়।

৭ নভেম্বর সেপাই বিদ্রোহের দিনগুলোই ছিলো সবচেয়ে কঠিন সময়। সেপাইদের নিয়ন্ত্রণে ছিলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট। সেপাইদের দাপটে অফিসারদের পলায়ন ছিলো কল্পনাতীত ব্যাপার। এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। তিনটি সেনা অভ্যুত্থানের সময়ই আমি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই সপরিবারে অবস্থান করে অরাজক অবস্থা স্বচক্ষে অবলোকন করি।

ঘটনাগুলো যেভাবে ঘটেছে এবং যেভাবে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, সেভাবেই যথাযথ বর্ণনা দিয়েছি। তিনটি সেনা-অভ্যুত্থানেরই বিভিন্ন দিক আমি আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। আমার পক্ষ থেকে সত্য উদ্‌ঘাটনের কোন ত্রুটি রাখিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যারা সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী, তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে সত্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করেছি।

আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলছি, সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করেছি। সত্যের খাতিরে ঘটনাগুলো যথার্থ বর্ণনা দিতে গিয়ে যদি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে গিয়ে থাকে, তাহলে তা ঘটেছে আমার একান্ত অনিচ্ছায়। তাই তাদের কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।"

www.bjilibrary.com

লেখকের নিরপেক্ষতা

লেখক ঘটনাবলির যে বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যি নিরপেক্ষভাবেই দিয়েছেন বলে আমার ধারণা। কিন্তু তিনি আগস্ট বিপ্লবের যে পর্যালোচনা করেছেন, তাতে বিপ্লবের বিপক্ষ বলে পাঠকের মনে হতে পারে। কারণ তিনি ৭৯ থেকে ৮৫ পৃষ্ঠায় যে পর্যালোচনা করেছেন তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি শেখ মুজিবকে 'একজন মহান জনপ্রিয় নেতা' হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'তাঁর ভাগ্যে এ রকম একটি মৃত্যুই কি জাতির কাছ থেকে প্রাপ্য ছিলো?'

পর্যালোচনায় তিনি একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়াউর রহমান, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্নেল শাফায়াত জামিল ইচ্ছে করলে জুনিয়র অফিসারদের বিদ্রোহ দমন করে বিপ্লবকে ব্যর্থ করতে সক্ষম হতেন। কেন তাঁরা কিছুই করলেন না সে প্রশ্নও তিনি তুলেছেন।

লেখক বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন, 'অবাক ব্যাপার! তার করুণ মৃত্যুতে কোথাও টুশব্দটি উচ্চারিত হলো না। তার বিশাল জনপ্রিয়তা হঠাৎ কোথায় যেন হাওয়ায় উড়ে গেলো। কেন তার মৃত্যুতে জনতার বিপ্লব হলো না? কেন জনতার প্রতিরোধ গড়ে উঠলো না?" এ কথাগুলোর মধ্যে শেখ মুজিবের প্রতি সুস্পষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে।

শেখ মুজিবের এ মৃত্যু ব্যতীত স্বৈরশাসন থেকে জনগণকে মুক্তির আর কোন পথই ছিলো না। সে দিকটা লেখক বিবেচনা করেননি। একজন নিষ্ঠাবান সেনা অফিসার হিসেবে জুনিয়র অফিসারদের এ সেনা-বিদ্রোহকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। এর ফলে সেনাবাহিনীতে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং পরে বহু যোগ্য দেশপ্রেমিক অফিসার নিহত হয় এর জন্য তিনি বেদনাবোধ করেন। এ দিক দিয়ে তাঁকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নিরপেক্ষ বলা না গেলেও তথ্যাবলির পরিবেশনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে মনে করা যায়।

বিপ্লবের তথ্যাবলির উৎস

ইতঃপূর্বে আগস্ট বিপ্লবী মেজর ডালিম ও আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর লেখা গ্রন্থদ্বয় থেকে তিনটি বিপ্লব সম্পর্কে তাদের অনেক উদ্ধৃতি কয়েক কিস্তিতে পরিবেশন করেছি। লে. কর্নেল আবদুল হামিদের লেখা বইটিতে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৮১ সালের ৩০ মে তারিখে জিয়া হত্যা পর্যন্ত সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের কোন্দলের বিস্তারিত তথ্য বইটি থেকে জানা গেল। আমি পরিস্থিতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেলাম। সকল ঘটনার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার যাবতীয় তথ্য যোগাড় হয়ে গেলো। যথাসম্ভব সংক্ষেপে তা পরিবেশন করতে চাই।

আগস্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায়ই ৩ নভেম্বর বিপ্লব

আগস্ট-বিপ্লবের পর সর্বস্তরের জনগণ স্বস্তির নিশ্বাস নিয়েছে এবং রাজনৈতিক অঙ্গনেও কোন অস্থিরতা দেখা দেয়নি। প্রেসিডেন্ট মোশতাক জনগণের নিকট যে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও নির্বাচনী সময়সূচি পেশ করেছেন তা রাজনৈতিক মহলে গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে। যদি সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করার

www.bjilibrary.com

প্রতিযোগিতা না হতো তাহলে দেশে দু'এক বছরের মধ্যেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হয়ে যেতো। জুনিয়র অফিসারদের নেতৃত্বে আগস্ট বিপ্লব সফল হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট মোশতাক যদি সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে আস্থায় নিয়ে বিপ্লবী জুনিয়র অফিসারদেরকে ব্যারাকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন তাহলে হয়তো সেনা-অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দল এতোটা প্রকট হতো না।

১৫ আগস্টের পর সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে কেন ও কিভাবে বিভেদ এবং কোন্দল সৃষ্টি হলো এবং ৩ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ কেমন করে ক্ষমতা দখল করলেন, অতঃপর কেন ৭ নভেম্বর তিনি সৈনিকদের হাতে নিহত হলেন—এসব নাটকীয় ঘটনার বিবরণ যা কর্নেল হামিদের বইতে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেখান থেকে তথ্য নিয়ে আমি নিজের ভাষায় লিখলেও সংক্ষেপ হবে না। তাই তার লেখাই সরাসরি পেশ করছি। যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে কতক বাক্য বাদ দিচ্ছি। এবার তাঁরই ভাষায় পড়ুন, সাব হেডিংগুলোও তাঁরই ঃ

আগস্ট পরবর্তী অবস্থা

১৫ আগস্টের পর ঘটনাপ্রবাহ চলছিলো সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকভাবে। একটি সরকারের পরিবর্তন ঘটেছিলো সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে। এ সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিলো সেনাবাহিনীর হাতেগোনা ক'জন জুনিয়র অফিসারের দ্বারা। এখানেই ছিলো ঘটনার যত গণ্ডগোল।

অগাস্ট অভ্যুত্থান প্রকৃতপক্ষে সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিলো না। সেনা বাহিনীতে কোন সিনিয়র অফিসার সরাসরি এতে জড়িত ছিলেন না। আর্মির মাত্র দুটি ইউনিট, দ্বিতীয় ফিল্ড আর্টিলারি এবং বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাংক রেজিমেন্ট) ছাড়া অন্য কোন ইউনিট অর্থাৎ যারা সেনাবাহিনীর মূল বাহিনী, তাদের কোন ইউনিট জড়িত না থাকায় তথাকথিত ঐ অভ্যুত্থানের যৌক্তিকতা নিয়ে ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার শাফায়াত জামিল অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কারণ ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যান্ত্রিক দুটি ইউনিট সরকার উল্টিয়ে দিলো, আর তারা বসে বসে শুধু ঘাস কর্তন করলেন। এটা ছিলো চরম অপমানের নামান্তর।

খন্দকার মোশতাক আহমদ যথেষ্ট দক্ষতার সাথে অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বঙ্গভবনে তাঁকে ঘিরে তখন জেঁকে বসে আছে অভ্যুত্থানের নায়ক তরুণ মেজররা। প্রকৃতপক্ষে মেজর ফারুক, রশিদই তখন সর্বময় কর্তা। মেজর ডালিম, নূর, শাহরিয়ার, পাশা, রাশেদ প্রমুখ জুনিয়র অফিসাররা বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়ে দেশ শাসন করতে থাকে। সিনিয়র অফিসারদের এড়িয়ে জুনিয়র অফিসারদের কর্মকাণ্ড স্বভাবতই সিনিয়রদের পছন্দ হয়নি। এসব ব্যাপারে আর্মির সাধারণ ডিসিপ্লিনের প্রতি ছিলো মারাত্মক হুমকি। উর্ধ্বতন হেড কোয়ার্টারের অনুমতি ব্যতিরেকেই ফারুক-রশিদ আক্রমণাত্মকভাবে বেঙ্গল-ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো বঙ্গভবন ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের আশে পাশে স্থাপন করে। আর্টিলারি ইউনিটের কামানগুলোও সেখানে ছিলো।

অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর সারা দেশে দ্রুত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসলেও

www.bjilibrary.com

ক্যান্টনমেন্টে সামরিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসেনি। বিভিন্ন অজুহাতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগলো।

মেজর রশিদ ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার। তিনিই প্রেসিডেন্ট এবং সেনাবাহিনী প্রধানের মধ্যে যোগাযোগ রাখছিলেন। এসব ব্যাপার মোটেই সহ্য হচ্ছিলো না অনেক সিনিয়র অফিসারের। এদের মধ্যে ছিলেন ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল এবং সি. জি. এস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ। তারা জিয়াকে চাপ প্রয়োগ করতে লাগলেন, অভ্যুত্থানের মেজরদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনার জন্য।

ভগ্নহৃদয় খালেদ

খুবসম্ভব পঁচাত্তরের মে মাসে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব সেনাবাহিনী প্রধান শফিউল্লাকে তার মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জিয়াকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান তো ছিলোই, সেটা জিয়া আগেই জানতেন। এবার মাঝখান থেকে খালেদ মোশাররফের মনটা খারাপ হয়ে গেলো, কারণ শফিউল্লাহ্‌র স্থলাভিষিক্ত তারই হওয়ার কথা ছিলো। তার আশা ভঙ্গ হলো, এখন তাকে আরো তিনটি বছর অপেক্ষা করতে হবে।

নাখোশ শাফায়াত জামিল। তাকে কদলী দেখিয়ে তারই অধীনস্থ অফিসার মেজর রশিদ ও জুনিয়র মেজররা বঙ্গভবনে ক্ষমতার মসনদে সমাসীন। অথচ চার হাজার সৈন্য নিয়ে সে নাকি ঢাকার স্বাধীন সক্রিয় ব্রিগেড কমান্ডার।

মনের গভীরে প্রবল চাপা ক্ষোভ তাদের দু'জনকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলো। খালেদ-শাফায়াত দু'জনই একটা কিছুকে 'ইস্যু' করে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

নাখোশ জিয়া

কিন্তু জিয়ার অবস্থাও ছিলো নড়বড়ে। চতুর খন্দকার মোশতাক জেনারেল ওসমানীকে তার সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন। একই সাথে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে 'চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ' করে জিয়ার উপরে স্থান দিলেন। মোশতাক সামরিক ব্যাপারে জেনারেল ওসমানীকেই প্রাধান্য দিতেন। জিয়াকে পাত্তা দিতেন না। সরাসরি কথাও বলতেন না। এতে জিয়া ভিতরে ভিতরে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের উপর খুবই নাখোশ ছিলেন। এছাড়া জেনারেল ওসমানী ও খলিলুর রহমানের সাথেও জিয়ার এমনিতেই বনিবনা ছিলো না। অথচ মোশতাক এদের কিনা তার উপরে স্থান দিয়ে তার ক্ষমতা খর্ব করার প্রয়াস পাচ্ছিলেন।

এ সময় আমি ছিলাম ঢাকার স্টেশন কমান্ডার। এই সুবাদে প্রায়ই জিয়ার সাথে এসব নিয়ে বন্ধুসুলভ কথাবার্তা হতো। তাঁর অফিসে গেলেই জিয়া রাগে গরগর করতো। ওসমানী ও খলিলুর রহমানকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করতো। আমাকে কয়েকবার ওসমানীর কাছে গিয়ে সরাসরি বুড়োকে সরে দাঁড়াবার কথা বলতো। আমি শুধু হেসে তার রাগ থামাবার চেষ্টা করতাম। জিয়ার অবস্থা তখন খাঁচাবন্দি ব্যাঘ্রের মতো।

খালেদ মোশাররফের রাজনৈতিক শক্তি ছিলো তার ভাই রাশেদ মোশাররফের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ। নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিনের সাথেও তার আলাপ ছিলো। শাফায়াত

www.bjilibrary.com

জামিলের সাথে তার ভালো সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু শাফায়াত আবার জিয়াউর রহমানের সাথেও সমান সম্পর্ক রাখতো। অর্থাৎ সে এদিকেও ছিলো, ওদিকেও ছিলো।

প্রথম দিকে শাফায়াতের সাথে রশিদের সম্পর্কও ছিলো খুবই ভালো। রশিদ ছিলো শাফায়াতেরই অধীনস্থ ইউনিটের কমান্ডার। কিন্তু 'ক্যু' করার পর সে তার 'বস'-কে টেক্কা দিয়ে নিজেই বঙ্গভবনের মসনদে বসে পড়লো। তার সাথে 'ক্যু'র অন্যান্য মেজররা—ফারুক, ডালিম, নূর, হুদা, পাশা, রাশেদ প্রমুখ। এখান থেকেই শুরু হয় যত গণ্ডগোল। এ রকম অবস্থা ছিলো শাফায়াতের কাছে রীতিমতো অপমানজনক। চার হাজার সৈন্যের স্বাধীন পদাতিক ব্রিগেড নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে সে বসে থাকবে ক্ষমতাসীন হয়ে, আর বঙ্গভবনে চুনোপুটি মেজররা করবে দেশ শাসন—এটা অসম্ভব। মেজরদের উৎখাত, আর 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে এবার এক প্লাটফরমে এসে দাঁড়ালেন শাফায়াত জামিল ও খালেদ মোশাররফ। তারা প্রকাশ্যে হুমকি-ধমকি শুরু করলেন। তারা জিয়াকে শক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানালেন।

আসলে জিয়া সার্বিক ব্যাপারটা দেখছিলেন অন্যভাবে। তিনি দেখছিলেন, মেজরদের ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে আনলেই তার সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। 'মোশতাক-ওসমানী-খলিল চক্র' ধূলিসাৎ করতে না পারলে তিনি স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না। এটাই ছিলো ঐ মুহূর্তে জিয়ার সবচেয়ে বড় মাথা ব্যথার কারণ। অতএব তিনি তার আপন পরিকল্পনায় কাজ করছিলেন। গোপনে, অতি সন্তর্পণে। তাহের, খালেদ, শাফায়াতরাও বসে ছিলেন না। সবাই তখন ক্ষমতার মোহে ছিলো আচ্ছন্ন। তারাও নিজ নিজ ছক অনুযায়ী কাজ করছিলো।

এই সময় জিয়ার সাথে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হতো। বিকেলে টেনিস কোর্টেও দেখা হতো। আমি তাকে সেনানিবাসের আকাশে ঝড়ের সংকেত উপলব্ধি করতে বারবার অনুরোধ করি। কিন্তু বার বার তার একই জবাব, "হামিদ, Wait and see. এক মাঘে শীত যায় না।" আমি তার এসব কথার কিছুই মাথামুণ্ডু বুঝতে পারি না। তাকে তার অফিসে গিয়ে বার বার বলি। সে ঘাড় কাত করে অবহেলা ভরে কেবল মুচকি হাসে, চোখ টিপে আর একই উত্তর দেয়, "হামিদ বললাম তো, এক মাঘে শীত যায় না।" আমি বিব্রত হই।

আমার কথার কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় আমি রাগ করে বেশ কিছুদিন তার অফিসে যাওয়াই বন্ধ করে দিলাম। এ সময় জিয়ার জন্য অনেকেই উদ্বিগ্ন ছিলেন। বহু অফিসার আমার কাছে এই সময় এসে বলেছেন, "স্যার, আপনি তো তার বন্ধু মানুষ, কোর্সমেট। তাকে কেন বুঝিয়ে বলছেন না, বিপদ আসন্ন। এক্ষুণি তাকে সতর্ক হতে হবে।" আমি তাদের বলেছি, "ব্রাদার্স, ভেরি সরি, জিয়া আমার কথার কোন আমলই দিচ্ছে না। এতে তারা বড়ই নিরাশ হতেন।"

কর্নেল রশিদও আমাকে বলেছে, সেও জিয়াকে খালেদ-শাফায়াতের সম্ভাব্য অভ্যুত্থান সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। কিন্তু তিনি কোন অ্যাকশন নিতে চাননি। এতে তার মনে তখনই জিয়ার সততা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। তার ধারণা হয়, জিয়া নিজেই তলে তলে কিছু একটা ঘটাতে যাচ্ছেন। গভীর জলের মৎস্য জিয়া। তার আসল মতলব রশিদ

www.bjilibrary.com

অথবা অন্য কেউ কিছুই বুঝতে পারছিলো না। আসলে ভিতরে ভিতরে চলছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি।

আসলেই কি জিয়া ভিতরে ভিতরে কি হচ্ছে তা মোটেই জানতেন না? পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে এর জবাব পাওয়া যাবে।

জিয়া এবং কর্নেল তাহের একে অন্যের প্রতি খুবই বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। উভয়ে একই সাথে একই সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তাহেরকে পঙ্গুত্বের জন্য অবসর দেওয়ার পর জিয়া বরাবর তার সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। তাহের গোপনে জাসদের আর্মস উইং গণবাহিনীর সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তারা জিয়াকে সামনে রেখে চাইনিজ পদ্ধতির সেনা-বিপ্লবের একটা স্বপ্ন দেখছিলেন।

চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল ছিলেন প্রধান প্রতিবাদী কণ্ঠ। তারা সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ঐসব উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেজরদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে বললেন। কিন্তু জিয়া মেজরদের কাছে ছিলেন কৃতজ্ঞ, কারণ তারাই তো তাকে চিফ-অব-স্টাফ বানিয়েছে। অতএব, জিয়া কৌশলে একূল, ওকূল, দু'কূল রক্ষা করেই চলতে থাকেন। যাকে বলে 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' এরকম একটা অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছিলেন তিনি। জিয়া দুই প্রান্তের লোকজনদের সাথেই যোগাযোগ রক্ষা করছিলেন। একদিকে ফারুক-রশিদের পিঠ চাপড়ানো, অন্যদিকে শাফায়াত জামিলের কাঁধে হাত, দুই-ই করছিলেন। আসলে জিয়া বহুদিন গোয়েন্দা সংস্থায় চাকরি করায় এসব কাজে ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

জিয়া তলে তলে আর একটি কাজ করছিলেন। তা হলো, তিনি সবার অজ্ঞাতে জাসদের কর্নেল (অব.) আবু তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। জাসদের আর্মস উইং ইতোমধ্যে আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। শেখ সাহেবকে উৎখাতের জন্য তারাও প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। জিয়া সবার অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার সুহৃদ কর্নেল তাহেরের সাথে গোপন কথাবার্তা চালিয়ে যান। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে একটি সেনাবিপ্লবের লক্ষ্যে জিয়াউর রহমানের সাথে তাদের রীতিমতো পাকাপাকি কথাবার্তা হয়। তার সাথে বেশ ক'টি গোপন মিটিং হয়। যদিও বিপ্লবের ব্যাপারে জিয়ার সদিচ্ছা নিয়ে তাদের উর্ধ্বতন মহলে যথেষ্ট সন্দেহ ছিলো, কিন্তু কর্নেল তাহেরের পীড়াপীড়িতে তারা জিয়ার সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়েন।

জিয়া বনাম মোশতাক-ওসমানী

সত্যি বলতে কি খোদ জিয়াউর রহমানের আর্মির উর্ধ্বতন 'চেইন অব কমান্ড' মোটেই সহ্য হচ্ছিলো না। তিনি নিজেই তা ভাঙতে চাচ্ছিলেন। তার মাথার ওপরে জেনারেল ওসমানি ও খলিলুর রহমানের মাতব্বরী মোটেই পছন্দ হচ্ছিলো না। তিনি চাচ্ছিলেন সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তিনিই যেন সর্বেসর্বা থাকেন। বর্তমান অবস্থায় তার প্রেসিডেন্টের কাছে যেতে হলে দুটি ধাপ পেরিয়ে যেতে হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদও রগচটা লোক ছিলেন। জিয়াউর রহমান তাকে পছন্দ করতেন না। মোশতাকেরও জিয়াকে পছন্দ

www.bjilibrary.com

হতো না। কিন্তু অবস্থার প্রেক্ষিতে সবাইকে এক খোঁয়াড়ে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, মানিয়ে চলতে হচ্ছিলো। বলা যেতে পারে ঐ সময় প্রেসিডেন্ট মোশতাক ও সেনাপ্রধান জিয়ার মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র ছিলো মেজর রশিদ। মেজর রশিদ ছিলেন প্রধান সমন্বয়কারী অফিসার (Chief Co-ordinator)। দু'একদিন পর পরই একগাদা ফাইল বগল দাবা করে বঙ্গভবনে প্রেসিডেন্ট মোশতাকের কাছ থেকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের কাছে আসতেন। আবার জিয়ার কাছ থেকে তার পয়েন্ট নিয়ে মোশতাকের কাছে যেতেন। সরাসরি জিয়া-মোশতাকের মধ্যে বিশেষ কথাবার্তা বা দেখা-সাক্ষাৎও হতো না। ওসমানির সাথেও না। এভাবেই চলছিলো দৈনন্দিন কাজকর্ম।

বঙ্গভবনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য কামরাগুলোতে ক্যু'র মেজররা শক্তভাবে জেঁকে বসে দেশ শাসন করতে লাগলো। তারা নিজস্ব স্টাইলে বঙ্গভবনে একটি অঘোষিত সেক্রেটারিয়েট তৈরি করে বিভিন্ন দিকে নির্দেশ দিতে লাগলো। স্বভাবতই ক্যান্টনমেন্টের অফিসারদের এসব পছন্দ হচ্ছিলো না। কিন্তু মোশতাকও এসব অফিসারদের কিছু করতে পারছিলেন না, কারণ তারা ছিলো তার সূর্যসন্তান। তারাই তো একটি রক্তাক্ত বিপ্লবের মাধ্যমে এই নতুন সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবে সরকার পরিচালনার ব্যাপারে বঙ্গভবন ও ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে মতানৈক্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হলো। জিয়াউর রহমান চুপচাপ, নীরব দর্শক। তার ভাবখানা ছিলো বাঘে-সিংহে লাগুক একটা টক্কর, তাহলে দু'গ্রুপেরই শক্তি ক্ষয় হবে। ফলে তারই সুবিধা হবে।

জুনিয়র মেজরদের সফল অভ্যুত্থান ক্যান্টনমেন্টের কিছু সিনিয়র, এমনকি জুনিয়র অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতায় আরোহণের নতুন প্রেরণা যোগালো। সবাই একে অন্যকে ডিঙিয়ে, টেক্কা দিয়ে কেউ চিফ, কেউ প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো। দেশের সর্বোচ্চ পদটি তখন বন্দুকের নলের ধরাছোঁয়ার নাগালে বলে মনে হতে লাগলো।

রাজনৈতিক অবস্থা ততোদিনে যথেষ্ট স্থিতিশীল হয়ে এসেছে। আসন্ন ফেব্রুয়ারিতে দেশে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণাও দেওয়া হয়। কিন্তু তবুও কোথায় যেন অস্বস্তি ঠেকছে সবার। রাজধানীর 'উত্তর পাড়া' নিয়েই উদ্বিগ্ন সবাই। ওদিকে ঝড় উঠছে, সবার তাই আশঙ্কা। এ রকম একটি অনিশ্চয়তার মধ্যে দ্রুত এগিয়ে এলো ঘটনাবহুল মাস নভেম্বর।

অক্টোবর মাসে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। কিন্তু ক্যান্টনমেন্টে সামরিক অফিসারদের মধ্যে কোন্দল প্রবল হয়ে উঠলো। জিয়া এবং খালেদ গ্রুপের মধ্যে একটি মুখোমুখি সংঘাত প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। বঙ্গভবনে বসে ফারুক-রশিদরাও স্পষ্ট বুঝতে পারলো, এই দু'গ্রুপের সংঘর্ষে তাদের অবস্থানেরও বিপর্যয় ঘটতে বাধ্য। সেনাপ্রধান জিয়াকে বারবার বলা সত্ত্বেও তিনি প্রতিপক্ষ গ্রুপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। এতে বঙ্গভবনে মোশতাক, ওসমানী, খলিল, রশিদ, ফারুক সবাই জিয়ার সততা নিয়ে সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়েন। তাদের আশঙ্কা হয়, জিয়া কি নিজেই একটি অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছে?" (পৃষ্ঠা : ৮৬-৯১)

www.bjilibrary.com

১৭২.

২ নভেম্বর দিবাগত রাত

১৯৭৫ সালের ২ নভেম্বর দিবাগত রাতে দুটো বড় বড় ঘটনা ঘটে। একটা হলো মধ্যরাতে সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়া। অপরটি হলো ঐ রাতের শেষ প্রহরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আওয়ামী লীগের চার শীর্ষ নেতার নির্মম হত্যা।

সেনা বাহিনীর দ্বিতীয় প্রধান পদাধিকারী চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তাঁর ঊর্ধ্বতন পদাধিকারী সেনাপ্রধানকে তাঁরই সরকারি বাসভবনে বন্দি করে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের সূচনা করেন। কতক জুনিয়র অফিসার বঙ্গভবনে বসে দেশ শাসন করবে এটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খন্দকার মোশতাক আহমদকে প্রেসিডেন্টের গদিতে রেখেই তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেনাপ্রধানের পদটি দখল করার সামরিক বিপ্লবের সিদ্ধান্ত নেন।

সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল জিয়াউর রহমান সৈনিকদের মধ্যে এতো বেশি জনপ্রিয় ছিলেন যে, তাঁকে বন্দি করার খবরে সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বঙ্গভবনে আগস্ট বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ সেনাপ্রধানের বন্দি হবার খবর জেনে বুঝতে পারলেন যে, খালেদ মোশাররফ আগস্ট-বিপ্লবের পাল্টা বিপ্লব ঘটাবার ব্যবস্থা করছেন। তাহলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তাঁর আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সমর্থন প্রয়োজন হবে। তাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবপন্থি হিসেবে আওয়ামী লীগের যেসব শীর্ষ নেতা বন্দি ছিলেন, তারা যাতে ময়দানে খালেদ মোশাররফের পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করতে না পারেন সে জন্যই তাঁদেরকে ঐ রাতেই শেষ প্রহরে হত্যা করা হয়। শেষ রাতের এতো বড় খবরটা ৩ তারিখের পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি বলে দেশবাসী, এমনকি সেনাবাহিনীও জানতে পারেনি।

রেডিও-টেলিভিশন সম্প্রচার বন্ধ থাকায় গোটা দেশবাসী চরম অনিশ্চয়তা বোধ করে। প্রতি-বিপ্লবীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খালেদ মোশাররফকে সেনাপ্রধান নিয়োগ করার অপেক্ষায় দেশ স্থবির হয়ে রইলো। সরকারি অফিস-আদালতও অচল অবস্থায় পড়লো। সর্বত্র থমথমে ভাব বিরাজমান।

৩ নভেম্বর সারাদিন আগস্ট-বিপ্লবের নেতৃবৃন্দের সাথে খালেদ-মোশাররফের সমঝোতায় কেটে গেলো। উভয় পক্ষই রক্তপাত এড়াবার পক্ষে থাকায় সমঝোতা হয়ে গেলো এবং আগস্ট বিপ্লবীরা ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই দেশত্যাগ করলেন। জেল হত্যার খবর খালেদ মোশাররফ ৪ তারিখ সকালে জানতে পেরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পুলিশের ডিআইজি ই. এ. চৌধুরীকে শক্তভাবে চার্জ করলেন যে, আগে কেন এ খবর জানানো হলো না, জানলে ওদের কাউকে বিদেশে যেতে দেওয়া হতো না এবং বিচার করা হতো। খবর সরবরাহ বন্ধ থাকায় তারা জেল হত্যার একদিন পরও নিরাপদে বিদেশে চলে যেতে সক্ষম হলেন।

www.bjilibrary.com

আগস্ট-বিপ্লবের নেতারা বিদেশে চলে যাওয়ায় খালেদ মোশাররফ নিশ্চিন্ত হলেন যে, তিনি বিনা রক্তপাতে সহজেই ক্ষমতা দখল করতে পারবেন। প্রেসিডেন্ট মোশতাক পদত্যাগ করবেন বলে জানতে পেরে তিনি এক অফিসার পাঠিয়ে ৩ তারিখ দিবাগত রাতেই জিয়াউর রহমান থেকে পদত্যাগ পত্র সংগ্রহ করে নিলেন। এখন প্রেসিডেন্ট তাকে সেনাপ্রধান নিয়োগ দেবার পথে আর কোন বাধা রইলো না।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে সকাল ১০ টায় বিজয়ীর ভাব নিয়ে বঙ্গভবনে প্রবেশ করলেন। তাঁর সমর্থক আরও কতক সেনা অফিসার এবং সশস্ত্র সৈনিক বঙ্গভবন দখল করলেন। খালেদ মোশাররফ অত্যন্ত ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। সামরিক মেজাজ দেখিয়ে সেনাপ্রধান জিয়ার পদত্যাগপত্র প্রেসিডেন্টের সামনে পেশ করে তাঁকে সেনাপ্রধান নিয়োগের নির্দেশ দিলেই হয়তো কাজ হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি সসম্মানে ভদ্রভাবে কাজ আদায় করতে গিয়ে সমস্যায় পড়লেন।

প্রেসিডেন্ট মোশতাক মন্ত্রিসভার বৈঠক ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত নিতে অস্বীকার করলেন। জেনারেল ওসমানীও প্রেসিডেন্টকে সমর্থন করলেন। খালেদ সারাদিন বঙ্গভবনে দরকষাকষি করতে থাকলেন। মন্ত্রিসভার বৈঠকের অপেক্ষায় রইলেন।

ও দিকে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মনোভাবের কোন খবর বঙ্গভবনে বসে খালেদ টেরও পেলেন না। সে খবর কর্নেল হামীদের ভাষায়ই পড়ুন ঃ

"সারাদিন সেনা ছাউনির সর্বত্র একই জল্পনা-কল্পনা-আর্মি চিফ জিয়াকে কেন বন্দি করে রাখা হবে? এটা কোন্ ধরনের আর্মি? এসব কি ধরনের খেলা? অফিসারদের মধ্যে যদি ক্ষমতা নিয়ে এভাবে কাড়াকাড়ি চলে, তাহলে সেপাইরা কোন দিকে যাবে? এটা কি ভারতীয় চক্রান্ত? খালেদ কি ভারতের চর? ধর্ম-কর্ম কি বন্ধ হয়ে যাবে? চলে ঢালাও কানা-ঘুষা। ক্যান্টমেন্টের ভিতরে বাইরে সর্বত্র অশুভ জল্পনা কল্পনা।

এখানে অবাক হওয়ার ব্যাপার হলো, মাত্র কিছুদিন পূর্বে স-পরিবারে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত হন, কিন্তু তার মৃত্যুঘটনা নিয়ে সৈনিকরা উত্তেজিত হয়নি, বিশেষ মাথাও ঘামায়নি, অথচ জিয়াউর রহমানের বন্দি হওয়ার ঘটনায় অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে সৃষ্টি হলো প্রবল অসন্তোষ। দু'দিন ধরে ক্যান্টনমেন্টে দারুণ অনিশ্চয়তার ছাপ। সেনাসদরে গুঞ্জন। কাজকর্ম সব বন্ধ। অসন্তোষ চরমে।

খবর ছড়িয়ে পড়লো, জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। চাপের মুখেই তা করেছেন। একখানা সাদা কাগজে তার স্বেচ্ছায় পদত্যাগের পত্রে দস্তখত নেওয়া হয়েছে। একই পত্রে পেনশনের আবেদন করেছেন। খালেদের পক্ষ থেকে ব্রিগেডিয়ার রউফ তার কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র সই করিয়ে নিয়ে আসেন। গৃহবন্দি জিয়া পদত্যাগপত্রে সই করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে জিয়ার প্রতি সবার সহানুভূতি আরও বেড়ে গেলো।" (পৃষ্ঠা : ১০০)

www.bjilibrary.com

মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক কর্নেলের হুমকিতে খালেদ ক্ষমতা পেলেন

৪ তারিখ সারাদিন বঙ্গভবনে দেন-দরবার ও আলাপ আলোচনা চলছে। ক্ষমতার সর্বোচ্চ ভবনে অস্ত্রধারী উর্দিপরা বিভিন্ন মতবাদের অফিসারদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রুপের শলা-পরামর্শ চলছে। উন্মুক্ত পিস্তল ও স্টেনগান কাঁধে তরুণ অফিসারদের আনাগোনা।

প্রেসিডেন্টের সামরিক উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী, বিমান বাহিনী প্রধান তোয়াব, নৌ বাহিনী প্রধান এম.এইচ. খান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান জেনারেল খলিল ও সেনাপ্রধান পদপ্রার্থী ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেখানে উপস্থিত।

উত্তপ্ত পরিবেশে প্রেসিডেন্ট মোশতাক ২৬ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভার বৈঠক করছিলেন। বৈঠকে জেল হত্যার তদন্তের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। খালেদ মোশাররফ, তোয়াব ও এম.এইচ খান ভেতরে এসে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলে মন্ত্রীরা গলাখুলে বলতে থাকেন।

খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লবের অন্যতম নেতা ৪র্থ বেঙ্গলের ৪ হাজার সৈনিকের ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিল আশা করেছিলেন যে, সকাল ১০ টায় খালেদ মোশাররফ বঙ্গভবনে আসার পরই তিনি সেনাপ্রধান হয়ে সেনাসদরে ফিরে গিয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করে বিপ্লবের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা শুরু করবেন। বঙ্গভবনে দেন-দরবারে সারাদিন কেটে যাওয়ায় কর্নেল শাফায়াত অস্থির হয়ে গেলেন। ফোনে খালেদের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যর্থ হয়ে কর্নেল মালেককে নিয়ে তিনি সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ছুটে গেলেন। উত্তেজিত অবস্থায় বঙ্গভবনে ঢুকেই চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় খালেদ মোশাররফ? সবাই বললেন, তিনি কেবিনেট রুমে মিটিং এ আছেন। এর পর যা ঘটলো কর্নেল হামীদের লেখায় দেখুন ঃ

সশস্ত্র শাফায়াতের অনুপ্রবেশ

যখন মন্ত্রিসভায় উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা চলছিলো, তখন ঘটে গেলো এক নাটকীয় কাণ্ড। আকস্মিকভাবে সজোরে দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন ডাণ্ডা হাতে কর্নেল শাফায়াত জামিল। পিছনে স্টেনগান হাতে সশস্ত্র অফিসার। ভীত-সন্ত্রস্ত মন্ত্রিসভার সদস্যগণ। তারা আসন ছেড়ে ছুটে পালাতে উদ্যত। মেজর ইকবাল (পরবর্তীতে মন্ত্রী) খন্দকার মোশতাকের দিকে স্টেনগান তাক করে বলতে থাকেন, আপনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার দেখেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর দেখেননি। এখন দেখবেন। ওসমানী অসম সাহসের সাথে মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন, বললেন, খোদার ওয়াস্তে গোলাগুলি করবে না। তোমরা এসব পাগলামি বন্ধ করো। বেঁচে গেলেন মোশতাক। উত্তপ্ত মুহূর্তে উন্মুক্ত স্টেনগান যে কোন সময় গর্জে উঠতে পারতো। বঙ্গভবন চত্বরে ৩২ নম্বর রোডের রক্তাক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে ঘটতে থেমে গেলো।

শাফায়াত জামিল খন্দকার মোশতাকের পদত্যাগ দাবি করে বললেন, আপনি একজন খুনি। আপনি জাতির পিতাকে খুন করেছেন। আপনার সরকার অবৈধ। আপনার ক্ষমতায় থাকার কোন অধিকার নেই। আপনাকে এখনই পদত্যাগ করতে হবে। মোশতাক মাথা নেড়ে তখনই রাজি হলেন।

www.bjilibrary.com

এই সময় শাফায়াত মোশতাকের সাথে বেশ রূঢ় ব্যবহার করে। ওসমানী প্রতিবাদ করে বলেন, ওনার সাথে অশোভন ব্যবহার করা ঠিক হবে না। খোদার ওয়াস্তে তোমরা এসব বন্ধ করো। রক্তপাত ঘটিও না। শাফায়াত বললো, 'আপনি চুপ থাকুন। আপনি উপদেষ্টা হিসেবে এতোদিন কি উপদেশ দিয়েছেন?'

জেনারেল খলিল প্রতিবাদ করে বলেন, "দেখো, ওনাকে এভাবে অপমান করা উচিত হবে না। দয়া করে শান্ত হও।" শাফায়াত জামিলের চিৎকার, "আপনি চুপ থাকুন। আর কথা বলবেন না। আপনি জেল হত্যার কথা জানতেন, তাও ওদের যেতে দিয়েছেন। আপনাকেও অ্যারেস্ট করা হলো।" শাফায়াত এই সময় উত্তেজিত। আর তার অফিসাররা শুধু সংকেতের অপেক্ষায়।

শাফায়াত যখন উত্তেজিতভাবে ভেতরে ঢোকে, তখন খালেদও মিটিং-এ বসে ছিলো। উত্তপ্ত পরিবেশ, নাজুক পরিস্থিতি। জেনারেল ওসমানী উঠে তখন শাফায়াত, খালেদকে এবং অন্যান্যদের শান্ত থাকার আহ্বান জানাচ্ছিলেন। এই সময় কেবিনেট মিটিং-এর পরিবেশ সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যায়। এক সময় কর্নেল মালেক শাফায়াতকে বুঝিয়ে কোনক্রমে কক্ষের বাইরে নিয়ে যান। সবাই এবার হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। মন্ত্রিসভার কার্যক্রম আবার শুরু করা হয়।

ওসমানী তাদের বললেন, তোমাদের যা যা প্রস্তাব তা মিটিং-এ বলে যাও। মিটিং-এ সবই পাস করা হবে। অতঃপর কর্নেল এম.এ. মালেক ভেতরে ঢুকলেন। তিনি পয়েন্টগুলো বলে যাচ্ছিলেন। বেশ কিছু প্রস্তাব গৃহীত হলো।

১. মুজিব হত্যা এবং জেলহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে।

২. খালেদ মোশাররফকে 'চিফ অব স্টাফ' নিযুক্ত করা হবে।

৩. মোশতাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন, যতক্ষণ না অন্য ব্যবস্থা হয়। তবে তিনি অসুস্থতার জন্য পদত্যাগ করবেন বলে সম্মত হন।

৪. বঙ্গভবন থেকে সৈনিকরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবে।

মন্ত্রিসভার বৈঠক চললেও তখন খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল পালাক্রমে ঘোরাফেরা করে পয়েন্ট দিচ্ছিলেন। বন্দুকের নলের মুখে ঐ সময় বেশ কিছু কাগজপত্রে মোশতাকের জবরদস্তি সই নেওয়া হয়। দীর্ঘরাত পর্যন্ত মিটিং চললো। রাত্রি প্রায় ২টায় মিটিং শেষ হলে কর্নেল মালেক মন্ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "ভদ্রলোকগণ, ৪ জন ছাড়া আপনারা বাকি সবাই বাসায় ফিরে যেতে পারেন।"

সর্বনাশ! এটা আবার কোন্ নির্দেশ? চার নেতা তো শেষ। এবার কোন চারজন? সবাই চমকে উঠলেন! শাহ মোয়াজ্জেম, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, ওবায়দুর রহমান, নূরুল ইসলাম মঞ্জু। তারা ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। বাকিরা উর্ধ্বশ্বাসে বঙ্গভবন ত্যাগ করে নিজ নিজ বাসার দিকে ছুটে চললেন। যমদূতের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছেন, এটাই তো আল্লাহর অসীম রহমত।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করে সেনাবাহিনী প্রধান করা হলো। এয়ার মার্শাল তোয়াব ও অ্যাডমিরাল এম এইচ খান হাস্যরত খালেদের

www.bjilibrary.com

কাঁধে মেজর জেনারেলের র‍্যাংক পরিয়ে দিলেন। পরদিন বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার প্রথম পাতায় হাস্যরত খালেদের ছবিটি ছাপানো হয়। দুর্ভাগ্য খালেদের! মাত্র ৭২ ঘণ্টা তিনি মেজর জেনারেলের র‍্যাংকটি ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

দীর্ঘ ম্যারাথন মিটিং-এর পর ক্লান্ত শ্রান্ত বিধ্বস্ত মোশতাক, রাত তিনটায় বঙ্গভবনে তার শোবার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তার এবং তার মন্ত্রিসভার শেষ মুহূর্ত। বর্ষীয়ান উপদেষ্টা জেনারেল ওসমানী তার সাথে কোলাকুলি করে তার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ওসমানী বললেন, Sorry oldman, We played a bad game, Let us forget and forgive.

গভীর রাত। ওসমানী বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তার বাসায় যাওয়ার গাড়ি নাই। বললেন, এখন আমি আর ডিফেন্স উপদেষ্টা নই। সুতরাং সরকারি গাড়ি ব্যবহার করবো না। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কর্নেল মালেক এগিয়ে এসে বললেন, 'স্যার আপনি আমার গাড়িতে আসুন। আমি আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবো। ওসমানী তার গাড়িতে করেই গভীর রাতে বাসায় ফিরলেন।" (পৃষ্ঠা : ১০৩ ও ১০৪)

আওয়ামীপন্থিদের মিছিলের ভয়ানক প্রতিক্রিয়া

৪ নভেম্বর বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থক একদল বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে একটি নাগরিক শোক মিছিল ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। মিছিলে খালেদ মোশাররফের ছোট ভাই ও বৃদ্ধা মাতা শরীক থাকায় খালেদ মোশাররফ আওয়ামী লীগপন্থি বলে চিহ্নিত হয়ে পড়েন। এ খবরে ৪ তারিখ দিবাগত রাতেই গোটা ক্যান্টনমেন্টে সৈনিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরদিন পত্রিকায় মিছিলের ছবি ও খবর বের হয়। জনগণের মধ্যে এ ধারণা জন্মে যে, আগস্ট-বিপ্লবের বিরোধীরা ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। জনগণ আগস্ট বিপ্লবের পক্ষে থাকায় জনমত স্বাভাবিক কারণেই বিক্ষুব্ধ হয়।

সেনা-ছাউনিতে সন্ধ্যার পর থেকে মাইকে প্রচার হতে থাকে, "দেশ ভারতের দখলে গেলো, ভারতীয় সৈন্যরা প্রস্তুতি নিচ্ছে।" সৈনিকদের মধ্যে প্রচারপত্রও বিলি হলো। তাতে লেখা ছিলো "খালেদ মোশাররফকে হটাতে হবে, অফিসারদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে। সৈনিক সৈনিক ভাই ভাই। অফিসারদের রক্ত চাই।"

পরে জানা গেলো যে, সেনাপ্রধানকে বন্দি করায় সৈনিকদের মধ্যে যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় তা কাজে লাগিয়ে জাসদপন্থি কর্নেল তাহের মাইক ও প্রচারপত্র বিলি করার ব্যবস্থা করেন। সংগঠিত প্রচেষ্টা ছাড়া এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে না। খালেদ মোশাররফ ক্ষমতা লাভের দেন-দরবারে বঙ্গভবনে ব্যস্ত। আর এ দিকে সেনা ছাউনিতে খালি ময়দানে কর্নেল তাহেরের ব্যাপক খালেদবিরোধী তৎপরতা চলে।

কর্নেল তাহেরের পৃথক বিপ্লব

সেনাপ্রধান জিয়াকে বন্দি করার প্রতিক্রিয়ায় সৈনিকদের মধ্যে অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। খালেদ মোশাররফ ও শাফায়াত জামিল ক্ষমতা হাসিলের নেশায় মশগুল থাকা অবস্থায় সৈনিকদের মধ্যে ৩ থেকে ৫ তারিখের

www.bjilibrary.com

স্থবির পরিবেশে যে বিদ্রোহের মনোভাব গড়ে উঠলো তাকে কাজে লাগিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধন করার জন্য কর্নেল তাহের সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন।

এক জাসদ নেতা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কর্নেল তাহের সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পরও সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আর্মি হেড কোয়ার্টারে অবাধে যাতায়াত করতেন। মুক্তিযুদ্ধে তিনি এক পা হারাবার কারণে তাঁর প্রতি সবারই যথেষ্ট সহানুভূতি ছিলো। তাই সর্বত্রই তিনি সম্মান পেতেন এবং সকল সিনিয়র অফিসারের সাথে অবাধে সাক্ষাৎ করতে পারতেন। এ সুযোগে কর্নেল তাহের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী অফিসার ও সৈনিকদেরকে গোপনে সংগঠিত করার এমন কি সমাজতন্ত্রের প্রচার করারও সুযোগ গ্রহণ করতেন।

তিনি 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা' নামে একটি গোপন সংগঠনও গড়ে তুলেন। 'বিপ্লবী গণবাহিনী' নামে সশস্ত্র সংগঠনও তিনি জনগণের ময়দানে পরিচালনা করেন। জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে এবং সৈনিকদের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সমাজতন্ত্র কায়েমের পরিকল্পনা নিয়ে কর্নেল তাহের অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিকদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলেন। কর্নেল তাহেরের এ বিপ্লবী আন্দোলনের মাধ্যমেই জিয়াউর রহমান বন্দিদশা থেকে মুক্তি পান এবং খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লব ব্যর্থ হয়।

৫ নভেম্বরের অবস্থা

নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ বীর-উত্তম আর্মি হেড কোয়ার্টারে ৫ তারিখ সকালে মিটিং করেন। বিমান ও নৌবাহিনী প্রধান, রক্ষী-বাহিনী প্রধান, ডি.জি.এফ.আই, আইন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও এটরনি জেনারেলদের সাথে আলোচনা চলে। আইনগত দিক বিচার করে প্রেসিডেন্ট মোশতাক থেকে প্রধান বিচারপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ঐ দিনই রাত দশটায় জেনারেল খালেদ নৌ ও বিমানবাহিনী প্রধানদেরকে নিয়ে বঙ্গভবনে পৌঁছেন। খন্দকার মোশতাক থেকে পদত্যাগপত্র ও অন্যান্য আরও কতক কাগজ শেষবারের মতো সই করিয়ে নেন। রাত সাড়ে এগারোটায় বিদায়ী প্রেসিডেন্ট পুলিশ প্রহরায় বঙ্গভবন থেকে বিদায় হয়ে তাঁর আগামসি লেনের বাড়িতে ফিরে যান।

কর্নেল হামীদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ৫ তারিখ সারাদিন ক্যান্টনমেন্টে বিভিন্ন ইউনিটে সৈনিকদের গোপন বৈঠক চলে। সর্বত্র বিদ্রোহের উত্তাপ। কিন্তু খালেদ-শাফায়াত সম্পূর্ণ বেখবর। তাঁরা ক্ষমতার নেশায় বিভোর। তাঁরা টেরই পেলেন না, তাদের পায়ের তলা থেকে দ্রুত মাটি সরে যাচ্ছে।

অবশ্য ৫ তারিখের পত্রিকায় মিছিলের খবর পড়ে খালেদ তাঁর মাকে ফোন করে বললেন, "মা তোমরা আমাকে শেষ করে দিলে। আমি এখন আর বাঁচবো না। তোমরা কেন এসব করতে গেলে?"

একথার দ্বারা তিনি হয়তো জনগণের মধ্যে মিছিলের বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকতে পারে মনে করে তিনি ঢাকার বাইরের তাঁর বিশ্বস্ত অফিসারদের ইউনিটকে ঢাকা আসতে নির্দেশ দেন। যারা এলেন তারা সেনা ছাউনির অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলেন।

www.bjilibrary.com

৬ নভেম্বরের পরিস্থিতি

৬ নভেম্বর সকাল ৯টায় বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সা'দাত মুহাম্মদ সায়েম দেশের ষষ্ঠ প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। জমজমাট বঙ্গভবন। সকল উর্ধ্বতন সিভিল ও মিলিটারি কর্মকর্তার ভিড়। হাসি-খুশি জেনারেল খালেদ মোশাররফ। আনন্দমুখর পরিবেশে প্রেসিডেন্ট সবার সাথে ঘুরে ঘুরে হাত মিলালেন। সর্বত্র সক্রিয় ক্যামেরা, টেলিভিশন।

ওদিকে সেনানিবাসে অফিসারদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের উত্তেজিত করে বিদ্রোহের উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি হচ্ছে।

বিকেলে নতুন সেনাপ্রধান জেনারেলের ফ্ল্যাগ উড়িয়ে হুটার বাজিয়ে কালো লিমোজিন গাড়িতে চড়ে বঙ্গভবন থেকে বাসায় এসে সন্ধ্যার পরই সেনানিবাস থেকে বের হয়ে যান সারাদিন তিনি মার্শাল ল'র আইন-কানুন ঘাঁটাঘাঁটি করে নিজে চিফ মার্শাল ল' এডমিনিস্ট্রেটর হতে গোঁ ধরেন। আইয়ূব খাঁর উদাহরণ দেন যে, একই সাথে প্রেসিডেন্ট ও CMLA হওয়া যায়। সবাই অনেক অনুরোধ করে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে CMLA করে তাঁকে ডেপুটি হতে রাজি করা হলো।

রাত ১১টায় যখন খালেদ-শাফায়াত মার্শাল ল'র কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত, তখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে সকল ইউনিটের সৈনিকরা প্রস্তুত। আজ সবাই ভাই ভাই। চক্রান্তকারী অফিসারদের আজ রক্ষা নেই। ওদিকে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে জাসদের বিপ্লবী বাহিনীর ইউনিফরম পরিহিত সশস্ত্র লোকজন ইবরাহিমপুর, বালুঘাট, রেলক্রসিং ও বনানী পয়েন্টে হুকুমের অপেক্ষায় প্রস্তুত। কর্নেল তাহের বীর-উত্তম তাদের নেতা, একটা সাদা জিপে তিনি সাড়া ক্যান্টনমেন্টে ঘুরে তাঁর বিপ্লবী সৈনিক সংস্থাকে রেডি করলেন। বাইরে তো বিপ্লবী গণবাহিনী পজিশন নিয়েই আছে। রাত বারোটার পর তাহেরের বিপ্লব শুরু হয়। ঐ রাতেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়।

১৭৩.

বাংলাদেশের ভাগ্য-রজনী

১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর দিবাগত রাত ১২টা থেকে ৭ তারিখ সকাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও আদর্শিক ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। তাই এ রাতটিকে আমি 'বাংলাদেশের ভাগ্য-রজনী' নামে অভিহিত করছি।

বাংলাদেশের ভাগ্যে তিনটি সম্ভাবনা ছিলো ঃ

১. যদি খালেদ মোশাররফ ক্ষমতায় টিকে থাকতে সক্ষম হতেন তাহলে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষতাবাদী সরকার কায়েম হতো এবং আওয়ামী লীগই এ সরকারের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতো।

২. যদি কর্নেল তাহেরের বিজয় হতো তাহলে দেশে জাসদের সমাজতান্ত্রিক সরকার কায়েম হতো। কর্নেল তাহের জেনারেল জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার

www.bjilibrary.com

পুরস্কারস্বরূপ বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার ১২ দফা দাবি আদায় করার উদ্দেশ্যে ঐ দাবিনামায় তাঁর স্বাক্ষর করিয়ে নেন। জিয়া মুক্ত হবার পর যদি জাসদপন্থি অফিসারদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে বাধ্য হতেন তাহলে তাহেরের বিপ্লবী পরিকল্পনা সফল হয়ে যেতো। জেনারেল জিয়ার মুক্তির পরিবেশ কর্নেল তাহেরের প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হলেও যারা জিয়াকে মুক্ত করে আনেন তাঁরা জাসদপন্থি ছিলেন না। সে বিবরণ পরে আসবে। এটা আল্লাহরই খাস মেহেরবানী। তাহের ঐ রাতেই জেনারেল জিয়াকে রেডিও স্টেশনে নিয়ে বক্তৃতা করিয়ে এবং ৭ তারিখ সকাল ৯টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাসদের সমাবেশে বাংলাদেশকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। বন্দিমুক্ত জিয়াকে কর্নেল তাহের দখল করতে ব্যর্থ হওয়ায় বাংলাদেশ রুশ ভালুকের খপ্পর থেকে রেহাই পেয়ে গেলো।

৩. ভারতপন্থি ও রুশপন্থিদের বদলে বাংলাদেশপন্থি অফিসার ও সৈনিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় জেনারেল জিয়াউর রহমান মুক্ত হওয়ায় এবং তাদের হেফাযতে থাকায় কর্নেল তাহেরের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। জিয়া অত্যন্ত হুঁশিয়ারি ও বিচক্ষণতার সাথে নিজেকে তাহেরের খপ্পর থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও সমাজতন্ত্রী হওয়া থেকে রক্ষা পেলো।

কর্নেল হামীদের লেখা তথ্য অনুযায়ী ৪ নভেম্বর কর্নেল তাহেরের উপস্থিতিতে মুহাম্মদপুরে ও এলিফ্যান্ট রোডে কারো বাড়িতে জাসদ বিপ্লবী গ্রুপের গোপন বৈঠক হয়। তাহেরের নেতৃত্বে জিয়াকে মুক্ত করে আনবার মুষ্ঠিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায় সবাই আবদ্ধ হয়। বন্দি হবার পূর্ব মুহূর্তে জিয়া বন্ধুবর তাহেরকে মেসেজ পাঠান, যাতে তাঁকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা হয়।

"সৈনিক সৈনিক ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই" প্রচারপত্র ৫ তারিখ রাতেই প্রচুর বিলি হওয়ায় অফিসাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সপরিবারে ছদ্মবেশে ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালাতে থাকেন।

ক্যান্টনমেন্টের বাইরে-ভেতরে ৬ তারিখ দিবাগত রাতে যখন আঘাত হানার লগ্ন ঘনিয়ে আসছে, তখনো বঙ্গভবনে জেনারেল খালেদ মিটিং করছেন। তাঁর সঙ্গে তখন কর্নেল শাফায়াত, কর্নেল মালেক, কর্নেল হুদা, মেজর হায়দার, জিল্লুর রহমান। রাত ১২টার পর বঙ্গভবনে খবর আসলো যে, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ানের সৈনিকরা অস্ত্র জমা দিতে অস্বীকার করেছে। একটি অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র লুট করেছে। কর্নেল মালেক বঙ্গভবন থেকে ক্যান্টনমেন্টের বাসায় ফোন করলে তাঁর স্ত্রী বললেন, "সর্বনাশ! এখানে সৈনিকরা বিদ্রোহ করেছে। সাংঘাতিক ফায়ারিং চলছে।"

রাত ১২টা বিদ্রোহ শুরু

বিদ্রোহের সূচনা হলো রাত ১২টায় যখন সুবেদার মেজর আনিসুল হকের ইঙ্গিতে টু ফিল্ড রেজিমেন্টের লাইন থেকে একটি ট্রেইসার বুলেট আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে আকাশে উঠলো। এটাই ছিলো বিদ্রোহের সংকেত। সারা ক্যান্টনমেন্টের ভেতর ও বাইরে হাজার হাজার বুলেট ছুটে গেলো আকাশে। চারদিকে গোলাগুলি আর চিৎকার ধ্বনি।

www.bjilibrary.com

কর্নেল হামিদ লিখেন, "ভয়ে ভয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দোতলার ছাদে উঠলাম। দেখলাম বহু লোক এক সাথে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আমার বাসার দিকে আসছে। দু'শ গজ দূরেই জিয়ার বাসা। একটা জীপ মাইক নিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে "সেপাই সেপাই ভাই ভাই"। দেখলাম উন্মাদ সৈনিকবৃন্দ জিয়ার বাসার দিকে ছুটে যাচ্ছে ও জেনারেল জিয়া জিন্দাবাদ শ্লোগান দিচ্ছে। দেখা গেলো, জিয়ার বাসা থেকে একটা জীপ ঠেলে নিয়ে চিৎকার আর নৃত্য করতে করতে বেরিয়ে আসছে। বুঝলাম জিয়াকে মুক্ত করে নিয়ে আসা হচ্ছে। আমিও বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম। সিভিল ড্রেসে আমার অফিসের দিকে হেঁটে চললাম। সেপাইদের অস্ত্রহাতে লাফালাফি আর উল্লাস। জিয়ার বাসা ও টু-ফিল্ডের মাঝামাঝি প্রচণ্ড ভিড়।"

"সেপাই সেপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই" শ্লোগান শুনে কর্নেল চমকে উঠে বাসায় ফিরে গেলেন। হাবিলদার সিদ্দীকুর রহমান ফোন করে তাঁকে জানালেন, "স্যার কোথাও বেরুবেন না। আমরা এসে টু-ফিল্ডে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।" রাত ৩.৪০-এ হাবিলদার সিদ্দীক দু'জন সেপাইসহ এসে তাঁকে নিয়ে গেলো, যেখানে জেনারেল জিয়া অফিসারদেরকে ডেকেছেন। প্রধান অস্ত্রাগার থেকে সৈনিকরা সকল অস্ত্র লুট করেছে। দেখা গেলো জিয়ার অবস্থান এলাকায় অস্ত্রধারী বহু সৈনিক। সিপাইদের বিজয় মিছিল ও উল্লাস চলছে।

মুক্ত জিয়া

কর্নেল হামীদ টু-ফিল্ডে পৌঁছে দেখেন সশস্ত্র সৈনিক গিজগিজ করছে। কর্নেল আমীনুল হক বারান্দায় পায়চারি করছেন। দারুণ খুশি হয়ে কর্নেল হামীদকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে জিয়াকে বললেন, "স্যার স্টেশন কমান্ডারও এসে গেছেন।" দেখেই জিয়া উঠে ব্যাচমেটের সাথে উষ্ণ আলিঙ্গন করে বললেন, "হামীদ বসো, কেমন আছো?"

কর্নেল হামীদের ভাষায় পড়ুনঃ

"মুক্তির পর তাকে অপূর্ব লাগছিলো। তাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তার মুখে চিরপরিচিত সেই মুচকি হাসি। যেন রীতিমতো নায়ক। ৭ নভেম্বরের সেপাই বিপ্লবের প্রকৃত নায়ক জিয়াই বটে। সশস্ত্র সৈনিকরা অফিসারদের বাসায় বাসায় গিয়ে জবরদস্তি করে ধরে এনে টু-ফিল্ডে জড়ো করেছে। বসা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার শওকত। সেপাইরা যখন তাকে ভি.আই.পি গেস্ট হাউজে ধরে আনতে যায়, তখন তিনি প্রাণভয়ে পালাচ্ছিলেন, জিয়ার পাশে বসে তখন সর্বকর্নেল নূরুদ্দীন, আযহার, বারী, আবদুল্লাহ, কাশেম, হাবীবুর রাহমান।"

বন্দি জিয়াকে যেভাবে উদ্ধার করা হলো

খালেদ-শাফায়াত ফার্স্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের একটি প্লাটুন গার্ড দিয়ে জিয়াকে তাঁর বাসভবনেই আটক করে রাখেন। ফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিলো। রাত বারোটায় তাহেরের বিপ্লবী সংস্থা ও অন্যান্য সিপাইরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে বের হয়ে এসে জিয়ার বাসভবনের চারপাশে সমবেত হতে থাকে। বাইরের বিপ্লবী সংস্থার নেতারা এসে বিভিন্ন ইউনিটের এন.সি.ও এবং জে.সি.ও-দের সাথে যোগাযোগ করে যায়।

www.bjilibrary.com

খালেদের প্লাটুন গার্ডকে হটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করাই তাদের উদ্দেশ্য। জিয়াকে মুক্ত করার জন্য টু-ফিল্ডে রেজিমেন্ট আর্টিলারির একটি দল মেজর মহিউদ্দিন, মুস্তফা ও সুবেদার মেজর আনিসুল হক কতক সৈনিক নিয়ে প্রস্তুত থাকেন। জিয়াকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যত ইউনিটের লোকেরা প্রস্তুত হয়েছিলো তাদের কারো সাথে কোন অফিসার ছিলো না। রেজিমেন্ট আর্টিলারির দলটিতে অফিসার থাকায় তারা অতি সহজে সবার আগে জিয়ার বাসভবনে পৌছে। মেজর মহিউদ্দিন, সুবেদার মেজর আনিস টু-ফিল্ডের একদল সৈনিক নিয়ে যখন সেখানে পৌছেন তখন চারদিকে ব্যাপক ফায়ারিং চলছে। ফার্স্ট বেঙ্গলের যে প্ল্যাটুনটি গার্ড দিচ্ছিলো, তারা অবস্থা বুঝে শূন্যে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেলো।

গেট খুলবার কেউ না থাকায় তারা গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকলেন। জিয়ার ড্রাইভার বেরিয়ে আসে। জিয়া ও তাঁর বেগম করিডোরে বের হন। "জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সেপাই সেপাই ভাই ভাই" শ্লোগান দিয়ে বহু সৈনিক বাসায় ঢুকে পড়লো। জিয়া পরিস্থিতি সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি। তাই মেজর মহিউদ্দিন যখন জিয়াকে বললেন, "স্যার আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। আপনি আসুন," তখন জিয়া বললেন, "আমি রিটায়ার করেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই। আমি কোথাও যাবো না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মেজর মহিউদ্দিন দৃঢ়ভাবে বললেন, "আমরা আপনাকে নিয়েই যাবো। আপনাকে আবার আমরা চিফ বানাতে চাই। দোহাই আল্লাহর। আপনি আসুন।" বেগম জিয়া পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এমন গোলাগুলির মধ্যে স্বামীকে নিতে চাচ্ছে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, "দেখুন ভাই, আমরা রিটায়ার করেছি। আমাদের নিয়ে টানাটানি করবেন না। দয়া করে আমাদেরকে ছেড়ে দিন।"

বেগম জিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠা ও আনন্দের সঙ্গে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে লাগলেন। ততক্ষণে আরো বহু সৈনিক জড়ো হয়ে গেছে। জিয়াকে মুক্ত দেখে আনন্দের সীমা নেই। চতুর্দিকে শ্লোগান, "জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ"। তাহেরের বিপ্লবীরা পৌছার আগেই আর্টিলারির সৈনিকরা বিপুলভাবে জিয়াকে ঘেরাও করে নিয়ে গেলো।

তাহেরের ক্ষমতা দখল-প্রচেষ্টা

খালেদ মোশাররফের প্রতি-বিপ্লব ব্যর্থ করা ও বন্দিদশা থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করার ব্যাপারে কর্নেল তাহেরের অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু জিয়া মুক্ত হওয়ার পর ঐ রাতেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে কর্নেল তাহেরের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার ছিলো না। তাহের ও জিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই সম্পর্কে দেশের রাজনৈতিক মহলও তেমন কিছু জানতো বলে মনে হয় না। কর্নেল হামীদ প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে নাটকীয় চিত্রের বিস্তারিত বিবরণ দিলেন এর কোন সামান্য আভাসও মিজানুর রাহমান চৌধুরী, এডভোকেট সা'দ আহমদ ও মেজর ডালিমের বইতে পাওয়া যায়নি।

আমি তাহের ও জিয়ার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই-এর ঘটনাটিকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করি। ইতিহাস সচেতন সবারই এ

www.bjilibrary.com

বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তাই এ ঘটনার বিবরণ কর্নেল হামীদের পুস্তক থেকে তাঁরই ভাষায় পরিবেশন করছি ঃ

মধ্যরাতে ক্ষমতার লড়াই

৬/৭ নভেম্বরের মধ্যরাতে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী ও ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত বিভিন্ন ইউনিটের সৈনিকবৃন্দের যৌথ অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জিয়াউর রহমান গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পুনরায় চিফ অব স্টাফের গদিতে সমাসীন হন।

এবার শুরু হলো প্রকৃত ক্ষমতার লড়াই। মূল অভ্যুত্থান পরিকল্পনা করেছিলেন কর্নেল তাহের। তার সাথে জিয়াউর রহমানের কী সমঝোতা হয়েছিলো, তা শুধু তারা দু'জনই জানেন। জিয়াকে মুক্ত করার কিছুক্ষণ পরই তাহের টু-ফিল্ড রেজিমেন্টে জিয়ার কাছে ছুটে আসেন। তখন রাত প্রায় ২-৩০ মিনিট। ঐ সময় জিয়ার কক্ষে গুটিকয় অফিসার; কর্নেল আমিনুল হক, মেজর মহিউদ্দিন, মেজর জুবায়ের সিদ্দিক, মেজর মুনির, সুবেদার মেজর আনিস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জিয়া ও তাহের উভয়ে একে অন্যকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন। জিয়া বললেন, 'তাহের তোমাকে ধন্যবাদ। আমাকে বাঁচিয়েছো।'

তাহের বললো, 'আপনার সাথে আমার জরুরি কথা আছে। এদিকে আসুন প্লিজ, তাহের তাকে নিয়ে কক্ষের একটি নিভৃত কোণে গেলো। বহুক্ষণ ধরে তাদের মধ্যে গোপন কথাবার্তা চলতে থাকলো। একসময় তাদের মধ্যে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলো। এক ফাঁকে জিয়া বারান্দায় এসে সুবেদার মেজর আনিসকে কানে কানে বললেন, 'আনিস সাহেব, ওকে কোনভাবে সরিয়ে দিন এখান থেকে। সাবধান, বহু পলিটিকস্ আছে।'

তাহের জিয়াকে টু-ফিল্ড থেকে বের করে রেডিও স্টেশনে নিয়ে যেতে চাইছিলো।

রেডিও স্টেশনে তার লোকজন উপস্থিত ছিলো। ওটাকে তারা শক্ত ঘাঁটি করেছিলো। তাহের বললো, 'আসুন, জাতি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।'

জিয়া যেতে চাচ্ছিলেন না সঙ্গত কারণেই। এতে তাহের খুবই রেগে যায়। উপস্থিত কর্নেল আমিন, মুনীর ও সুবেদার মেজর আনিস তারা জিয়ার পাশে থেকে বলেন, রেডিওতে ভাষণ দিতে হলে এখানেই রেকর্ডিং যন্ত্র আনা হবে। তাকে এখান থেকে বাইরে যেতে দেওয়া যাবে না। ভেস্তে যায় তাহেরের প্ল্যান।

সুবেদার মেজর আনিস কর্নেল তাহেরকে বললেন, 'আপনি এখন দয়া করে আসুন।' তাহের কটমট করে তার দিকে তাকালো। বললো, 'আপনি আমাকে চেনেন?'

আনিস বললো, জ্বি স্যার, আপনাকে চিনি। তবে এখন আমার সাথে আসুন। তাহের বুঝে ফেললো, জিয়াউর রহমান কিছুতেই এই মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে তার সাথে বাইরে যাবে না। অগত্যা তাহের তার ভাই ইউসুফ এবং অন্যান্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে রাগে বিড়বিড় করতে করতে অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে টু-ফিল্ড লাইন ত্যাগ করল। সারা ক্যান্টনমেন্ট জুড়ে তখন চলছে সৈনিকদের আনন্দ উল্লাস।

www.bjilibrary.com

ক্ষমতার সিংহাসনে বসার সন্ধিক্ষণে দুই বাদশাহ। এক সিংহাসন। মধ্যরাতের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের নাটক জমে উঠলো। কে কাকে উৎখাত করে! একজনকে মরতে হবেই।

জিয়া তখন টু-ফিল্ডে কমান্ডিং অফিসারের বড় কামরায় অফিসার পরিবেষ্টিত হয়ে বেশ কিছু অনুগত জেসিও সৈনিকও তার পাশে। আসলে তখনও উপস্থিত অফিসাররা কেউ বুঝে উঠতে পারছিলো না, বাইরের অবসরপ্রাপ্ত একজন অফিসার কর্নেল তাহেরকে জিয়া কেন মুক্তির এই আনন্দঘন মুহূর্তে এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন। তার সাথে বিপ্লবের কিইবা সম্পর্ক? কেন তাহের এতো রাগান্বিত, উত্তেজিত? তার সাথে এতোক্ষণ একান্তে কিইবা আলাপ হলো? তার সাথে কি জিয়ার কোন গোপন সমঝোতা রয়েছে? সবার কাছেই ব্যাপারটা বড়ই রহস্যজনক ঠেকলো। কিন্তু মুক্তির আনন্দঘন মুহূর্তে কেউ এসব তলিয়ে দেখার চিন্তা করেনি।

সাধারণ সৈনিকদের ধারণা ছিলো, জিয়াকে মুক্ত করার পরই সেপাই বিদ্রোহ শেষ হয়ে যাবে। তারা ব্যারাকে ফিরে যাবে, কিন্তু বাইরের বিপ্লবী সৈনিক ও বিপ্লবী নেতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো ভিন্ন, অনেক গভীর। টু-ফিল্ডে কর্নেল তাহেরের আগমন এবং জিয়ার সাথে রাত আড়াইটায় উত্তপ্ত কথোপকথনের পরই রহস্য ঘনীভূত হতে শুরু করলো। এবার উন্মোচিত হতে শুরু করলো, বিপ্লবী নেতা কর্নেল তাহেরের দ্বিতীয় পর্বের খেলা।

টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসারের অফিসে বসে আছেন সদ্যমুক্ত জিয়া। তাকে ঘিরে বসে আছেন বাসা থেকে ধরে আনা অফিসারবৃন্দ। অফিসের বাইরে ভেতরে গিজ গিজ করছে ঢাকা সেনানিবাসের হাজার সৈনিক। ক্যান্টনমেন্টের চতুর্দিক থেকে যে বলয় সৃষ্টি করে সৈনিকরা জিয়ার বাসভবনের দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে আসছিলো, তা এখন টার্গেট-পয়েন্টে এসে স্তিমিত হয়ে গেছে। সর্বত্র আনন্দ উল্লাস। তারা মাঝে মাঝে ছুঁড়তে থাকে ফাঁকা গুলী।

সমস্ত প্ল্যান-প্রোগামই ছিলো সাধারণ সৈনিকদের এবং বিপ্লবী তাহের গ্রুপের। শত শত সৈনিকদের পদভারে টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট তখন প্রকম্পিত। এদের মধ্যে বহু সৈনিক দেখা গেলো এলোমেলো খাঁকি ড্রেস। পায়ে ছিলো বুটের বদলে সাধারণ জুতা। অনেকের মাথায় টুপিও নাই। এরাই ছিলো জাসদের বিপ্লবী সংস্থার সশস্ত্র সদস্যবৃন্দ। সেপাই বিদ্রোহের রাতে খাঁকি উর্দি পরে তারা মিশে গিয়েছিলো ক্যান্টনমেন্টের সাধারণ জওয়ানদের সাথে। উপস্থিত শত শত সৈনিকের মধ্যে কে বিপ্লবী সৈনিক, কে আসল সৈনিক, বুঝা মুশকিল হয়ে পড়েছিলো। তারাই অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছিলো। রাতের বেলা আমিও তাদের দেখে চিনতে পারিনি। সকালবেলায়ও বিপ্লবীদের উপস্থিতি বুঝতে পারিনি। দুপুরবেলা টের পেলাম।

সবার অলক্ষ্যে ক্যান্টনমেন্টে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই বন্ধু ক্ষমতার আঙুর ফল নিয়ে করছে কাড়াকাড়ি। জিয়া দ্রুত তার সেনা ইউনিট ও অফিসারদের নিয়ে তাহেরের প্রাথমিক হামলা প্রতিহত করতে সক্ষম হলেন। টু-ফিল্ডে বসেই তিনি বেতার ভাষণ দিলেন। টু-ফিল্ডের অফিসেই রেডিও রেকর্ডিং ইউনিট এনে জিয়ার একটি ভাষণ রেকর্ড করা হলো ভোর বেলা প্রচার করার জন্য।

www.bjilibrary.com

সংক্ষিপ্ত ভাষণে জিয়া ঘোষণা করেন, তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বভার হাতে নিয়েছেন। দেশের এই পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর অনুরোধে তিনি এই কাজ করেছেন। তিনি সবাইকে এই মুহূর্তে শান্ত থেকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বন্ধ হয়ে যাওয়া অফিস-আদালত, বিমানবন্দর, মিল-কারখানা পুনরায় চালু করার অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্ আমাদের সহায়।

জিয়ার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সবাইকে আশ্বস্ত ও উদ্দীপিত করে তুললো।

মধ্যরাতের লড়াইয়ে হেরে গেলেন তাহের। জয়ী হলেন জিয়া। ক্ষণিকের জন্য তাহেরের পশ্চাদপসরণ। সকালবেলা নতুন শক্তি সঞ্চয়ের আশায়।

জাসদের উদ্দেশ্য ছিলো রাজনৈতিক শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, যদিও কর্নেল তাহেরের লক্ষ্য ছিলো অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল। তাহের সৈনিকদের ১২ দফা দাবি প্রণয়ন করে। এগুলোর মধ্যে ছিলো; ব্যাটম্যান প্রথার বিলুপ্তি, অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ব্যবধান দূর, সৈনিকদের মধ্য থেকে অফিসার নিয়োগ, সৈনিকদের বেতন বৃদ্ধি, বাসস্থান ব্যবস্থাকরণ, দুর্নীতিবাজ অফিসারদের অপসারণ, রাজবন্দিদের মুক্তি। বিপ্লবী সৈনিকদের অন্যতম লক্ষ্য ছিলো বিপ্লবের মাধ্যমে ১২ দফা বাস্তবায়ন। তাহেরের মতে, জিয়ার সাথে তার আগেই এসব নিয়ে সমঝোতা হয়েছিলো। তাহের ভেবেছিলো সে-ই অধিক বুদ্ধিমান। জিয়াকে ব্যবহার করে সে ক্ষমতায় আরোহণ করবে! কিন্তু তার সেই ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছিলো।" (পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৬)

সেপাই-জনতার বিপ্লব

মধ্যরাতে জিয়াউর রহমানকে কিছুটা কমান্ডো স্টাইলে বিনাবাধায় মুক্ত করার পর সকালবেলা বিপ্লবীদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে শত শত সৈনিক তাদের ইউনিটের ট্রাকে চেপে স্লোগান দিতে দিতে শহরের দিকে ছুটতে থাকে। তাদের হুকুম দেওয়ার, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। নতুন স্লোগান উঠলো 'সেপাই জনতা-ভাই ভাই।' অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চার! রাস্তায় রাস্তায় স্লোগানমুখর জনতা বেরিয়ে আসে সৈনিকদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করতে।

দেখতে দেখতে সেপাই-বিপ্লব মোড় নেয় ঐতিহাসিক 'সেপাই জনতার' বিপ্লবে। শহরে রাস্তায় মানুষের ঢল। সেপাই জনতা-ভাই ভাই।

ভোরবেলা বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো প্রবল বেগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলো। সারা রাত তারা শান্তভাবে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর কোণে বসে বসে ঘটনা পরখ করছিলো। বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ারের ডাকে ভোর পাঁচটার দিকে তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে শহরের দিকে ধেয়ে যায়। রাস্তায় রাস্তায় ট্যাংক। জনতা প্রবল উল্লাসে ট্যাংকগুলো ঘিরে ধরে সেপাইদের সাথে মিশে গিয়ে নৃত্য করতে থাকে। সেপাই জনতার উল্লাস ব্যাপক উন্মাদনায় রূপ নেয়। সর্বত্র এক অবর্ণনীয় দৃশ্য। সেপাই জনতা-ভাই ভাই। সেপাই বিপ্লব জিন্দাবাদ।

খালেদ আসলেন

সকাল ৭ ঘটিকা। টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সৈনিকদের ব্যস্ততা, দ্রুত

www.bjilibrary.com

আনাগোনা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারা হেলেদুলে ঘুরছে ফিরছে আপন খেয়ালে। অন্যসময় হলে অফিসারদের পাশ দিয়ে যেতে তাদের স্মার্ট স্যালুট দিয়ে চলতে হতো। আজ এসব বালাই নেই। আজ তাদের রাজ্যে তারাই রাজা।

এমন সময় সৈনিকদের ভিড় ঠেলে একটি আর্মি ট্রাক শোঁ শোঁ বেগে এগিয়ে এলো। ভেতর থেকে নেমে এলো একজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। স্যালুট দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "স্যার, জেনারেল জিয়া কোথায়?" জরুরি ব্যাপার আছে। বললাম, "কি ব্যাপার আমাকেই বলো।"

সে বললো, "স্যার, খুবই জরুরি, উনাকে বলতে হবে। আমাকে উনার কাছে নিয়ে চলুন প্লিজ।" ঐদিন প্রটোকলের কোন বালাই ছিলো না। বললাম, "আসো আমার সাথে।"

আমি তাকে নিয়ে জিয়ার কামরায় ঢুকলাম, "তাকে বললাম, এই ছেলেটি তোমাকে কিছু বলতে চায়।" লেফটেন্যান্ট তৎক্ষণাৎ জিয়াকে একটি স্মার্ট স্যালুট দিয়ে বললো, "Sir, I have come to present you dead body of Khaled Musharraf, Col. Huda and Hyder, Sir" জিয়া অবাক! ব্রিগেডিয়ার খালেদের ডেড্বডি। আমার দিকে তাকিয়ে জিয়া বললেন, "দেখতো হামিদ, কি ব্যাপার!" আমি অফিসারকে সাথে নিয়ে বাইরে দাঁড়ানো কালো ট্রাকের পেছনে গিয়ে উঠলাম। সেখানে দেখি ট্রাকের পাটাতনে খড় চাপা দিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে তিনটি মৃতদেহ। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল হুদা ও কর্নেল হায়দার। খালেদের পেটের ভুঁড়ি কিছুটা বেরিয়ে আসছিলো। তাকে পেটের মধ্যে গুলী করা হয়েছিলো, হয়তো বা বেয়নেট চার্জ করা হয়েছিলো। কি করুণ মৃত্যু! আমি জিয়াকে কামরায় গিয়ে বললাম, "হ্যাঁ, খালেদ, হুদা আর হায়দারের ডেডবডি।" সে জিজ্ঞাসা করলো, "এগুলো এখন কি করা যায়?" আমি বললাম, "আপাততঃ এগুলো CMH-এর মর্গে পাঠিয়ে দেই।" জিয়া বললো, "প্লিজ হামিদ, এক্ষুণি ব্যবস্থা করো।"

হায় খালেদ মোশাররফ! তিনি ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলেন বটে। তবে জীবিত নয়, ফিরে এলো তাঁর প্রাণহীন দেহ।" (পৃষ্ঠা : ১৩৫)

১৭৪.

৩ থেকে ৬ নভেম্বর দেশবাসী অন্ধকারে

৩ নভেম্বর থেকে রেডিও-টেলিভিশন বন্ধ থাকায় রাজধানীর রাজনৈতিক সচেতন সবাই চরম উদ্বিগ্ন অবস্থায় ছিলো। ক্যান্টনমেন্ট ও বঙ্গভবনে কী ঘটছে তা জানতে না পারায় অস্থিরতা বেড়েই চলছিলো। গোটা দেশবাসী একেবারেই অন্ধকারে ছিলো। এ রকম অবস্থায় গুজবের মাধ্যমেই মানুষ উড়ো খবর পেতে থাকে। গোটা দেশই স্থবির হয়ে রইলো। দেশে কোন সরকার আছে কিনা বুঝা যাচ্ছিলো না। অফিস আদালতেও তেমন কর্মতৎপরতা দেখা যায়নি।

৪ তারিখ বিকেলে আওয়ামী লীগের মিছিল রাজধানীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করলো। গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আগস্ট-বিপ্লবের বিরুদ্ধে বাকশালীরা আবার জেগে উঠেছে। নিশ্চয়

www.bjilibrary.com

ভারতের সাহায্যে প্রতি-বিপ্লব ঘটেছে। ঐ মিছিলের জয় বাংলা স্লোগান ও শেখ মুজিবের ৩২ নং বাড়িতে গিয়ে শোক প্রকাশ রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করলো। আগস্ট বিপ্লবের নেতারা ৩ তারিখ রাতে বিদেশে নির্বাসনে চলে যাওয়ায় জনগণকে সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ দেখা গেলো না। প্রেসিডেন্ট মোশতাকের পক্ষে কোন সাংগঠনিক শক্তি ময়দানে ছিলো বলে বুঝা গেলো না। কিন্তু সর্ব-সাধারণ আগস্ট-বিপ্লবের পক্ষে থাকায় রাজধানীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা অনেকের মধ্যে ছিলো বলে ৫ তারিখে টের পাওয়া গেলো।

ক্যান্টনমেন্টে কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা মাইকে প্রচার করতে লাগলো যে, ভারত বাংলাদেশ দখল করার চেষ্টা করছে। ভারতের দলখদারদের থেকে সাবধান! তাদের সহযোগী খালেদ মোশাররফকে হটাতে হবে। খালেদ মোশাররফকে ভারতের দালাল বলে সৈনিকদের মধ্যে প্রচারপত্রও বিলি করা হয়। সৈনিকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যে, আমরা কি আর মুসলমান হিসেবে ধর্ম-কর্ম করতে পারবো না?

ঢাকায় জাগ্রত জনতার প্রচারপত্র

৫ তারিখ সকালে ছোট একটি প্রচারপত্র রাজধানীর জনগণের মুখে ভাষা তুলে দিলো। এর শিরোনাম ছিলো, "ভারতের পা-চাটা কুকুর খালেদ মোশাররফ নিপাত যাক।" প্রচারকের নাম দেওয়া হয় জাগ্রত জনতা। অস্থিরতা ও উৎকণ্ঠায় জর্জরিত ঢাকার অধিবাসীদের মধ্যে এ প্রচারপত্রটি অদ্ভুত প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো। তাদের মনের কথা যেন ভাষা পেলো। এক একটি প্রচারপত্র শত শত লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। যার হাতে পড়েছে সে সবাইকে দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। কোথাও বিলি হচ্ছে দেখলে কাড়াকাড়ি করে নিয়ে অন্যদেরকে দেখাচ্ছে। সামান্য সাংগঠনিক প্রচেষ্টার অপেক্ষায় যেন ময়দান প্রস্তুত হয়েই ছিলো। সামান্য একটি প্রচারপত্র গোটা রাজধানীতে এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো।

জেল হত্যার খবরে জনগণের মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গেলো না। মুজিব হত্যায় যেমন জনগণ উল্লাস প্রকাশ করেছে, জেল হত্যায় তেমন না হলেও জনগণ এটাকে আগস্ট-বিপ্লবের পক্ষে বলেই ধারণা করেছে। ঐ সময় বিরূপ পরিবেশের কারণে জেল হত্যার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ মিছিলও বের হয়নি।

উপরিউল্লিখিত ছোট হ্যান্ডবিলটি দ্বারা যে কাজ হয়েছে এতে প্রমাণিত হয় যে, পরিবেশ-পরিস্থিতি ও জনগণের মনোভাব বুঝে যদি অল্প কিছু লোকও সুসংগঠিতভাবে ও সুপরিকল্পিতভাবে জনমত গঠনের চেষ্টা করে তাহলে সামান্য প্রচেষ্টায়ও বিরাট সুফল পাওয়া যায়। এ কাজটি কারা করেছে তা জানার জন্য আমি ঐ সময় ইসলামী আন্দোলনের ঢাকায় অবস্থানরত কয়েকজন দায়িত্বশীলের সাথে আলোচনা করেছি।

ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির সাথে সাক্ষাৎ

আমি ১৯৭৫ সালে লন্ডন থাকাকালে জানতাম যে, ইসলামী ছাত্রকর্মীরা ৭ নভেম্বরের সিপাই জনতার সংহতি মিছিলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাই ৭৫ সালে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহেরের সাথে সাক্ষাৎ করে বিস্তারিত জানার প্রয়োজন বোধ করলাম।

www.bjilibrary.com

পাকিস্তান আমলে ছাত্র অঙ্গনে ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র সংগঠনের নাম ছিলো, 'ইসলামী ছাত্র সংঘ'। শেখ মুজিবের শাসনামলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ইসলামী সংগঠন বেআইনী ছিলো। তাই প্রকাশ্যে ছাত্র সংগঠন হিসেবে তৎপরতার কোন উপায় ছিলো না। কিন্তু ইসলামী সংগঠন করা ফরয বলে অপ্রকাশ্যেই দীনের দাওয়াত পৌঁছানো ও সংগঠিতভাবে যতটুকু তৎপরতা সম্ভব তা করা হচ্ছিলো। ১৯৭৫ সালে অপ্রকাশ্য ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতির নিকট থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছি তার ভিত্তিতেই ৭ নভেম্বরের বিবরণ দিচ্ছি।

১৯৭২ সালের অক্টোবরেই এ ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইসলামকে বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে টিকিয়ে রাখতে হবে। অপ্রকাশ্য জামায়াতে ইসলামীও একই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই এ দুটো সংগঠনই তথাকথিত 'মুসলিম বাংলা' নামে আন্দোলনকে সমর্থন করেনি। এ আন্দোলনের নেপথ্যে যারাই থাকুক, ইসলামী ছাত্রসংঘ ও জামায়াতে ইসলামী এ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়নি।

১৯৭৭ সালে শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামী সংগঠনবিরোধী ধারা বাতিল হয়ে যাবার পর ইসলামী ছাত্র সংগঠনটি 'ইসলামী ছাত্র শিবির' নাম ধারণ করে প্রকাশ্য তৎপরতা চালায়।

১৯৭৫ সালে ইসলামী ছাত্র সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে আবু নাসের মুহাম্মদ আবদুয যাহের ও মীর কাসেম আলী। আমি সভাপতি থেকে জানতে পারলাম, কেন্দ্রীয় শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই তারা ৫ নভেম্বরের পূর্বোক্ত প্রচারপত্র বিলি করে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে এরপর কী ঘটছে সে বিষয়ে বিস্তারিত খবর না জানলেও জনগণের ময়দানে ভারতপন্থিদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শূরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৫ নভেম্বর বিলিকৃত হ্যান্ডবিলের ইতিবাচক ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা প্রকাশ্যে মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আরও একটি প্রচারপত্র বিলির ব্যবস্থা করে।

৭ নভেম্বর সকালে তাদের ক্ষুদ্র জনশক্তি নিয়ে নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে রাজপথে বের হয়। প্রচারপত্রের শিরোনাম ছিলো, "ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, দলের চেয়ে দেশ বড়।" প্রচারপত্রটি ছাত্র সংঘের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক নাযির আহমদ ড্রাফট করেন বলে নিজামী সাহেব ও আবু নাসের থেকে জানা গেলো। এ হ্যান্ডবিলটির বক্তব্য পরদিন দৈনিক ইত্তেফাকে খবর হিসেবে প্রকাশিত হয় বলে আবু নাসের জানালেন।

জানা গেলো যে, এ প্রচারপত্রটি ইসলামী ছাত্র সংঘের সাবেক সভাপতি অধ্যাপক নাযির আহমদ (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর) ড্রাফট করেছিলেন। ৭ নভেম্বর সিপাহী জনতার সংহতি মিছিলে যারা বক্তব্য রেখেছে তারা ঐ প্রচারপত্রে বক্তৃতার প্রয়োজনীয় উপাদান পেয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা, ভারতের আধিপত্য প্রতিরোধ করা ও গণতন্ত্র বহাল করার উদ্দেশ্যে যে আগস্ট বিপ্লব সাধিত হয় এরই ধারাবাহিকতায় ৭ নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব ঘটে। জনগণ এ উভয় বিপ্লবেরই পক্ষে বলে প্রচারপত্রে ঘোষণা করা হয়।

www.bjilibrary.com

খালেদ কিভাবে নিহত হলেন

ব্রিগেডিয়ার খালেদ বিনা রক্তপাতে সামরিক বিপ্লব সাধন করলেন। জেনারেলের মর্যাদা নিয়ে সেনাপ্রধান হলেন। বঙ্গভবনও দখল করলেন। তিন দিনের মধ্যেই তিনি কীভাবে নিহত হলেন? সেনাপ্রধান হিসেবে কি তাঁর দেহরক্ষী বাহিনী ছিলো না? তাঁর সমর্থক বাহিনী ও বিরোধীদের মধ্যে কি কোন সশস্ত্র লড়াই হয়েছিলো? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জওয়াব তালাশ করে পাচ্ছিলাম না। কর্নেল হামীদের বই থেকে এ সবের বিস্তারিত জওয়াব পেলাম ঃ

"৬ তারিখ রাত ১২ টায় সেপাহী বিপ্লবের খবর পেয়ে জেনারেল খালেদ মোশাররফ সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাইভেট কার নিয়ে বঙ্গভবন থেকে দ্রুত বেরিয়ে যান। তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। তার সাথে ছিলো কর্নেল হুদা ও হায়দার। তারা দু'জন ঐদিনই ঢাকার বাইরে থেকে এসে খালেদের সাথে যোগ দেন।

খালেদ প্রথমে রক্ষী বাহিনী প্রধান ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামানের বাসায় যান। সেখানে তার সাথে পরামর্শ করেন। নুরুজ্জামান তাকে খাকি ড্রেস পাল্টিয়ে নিতে অনুরোধ করে। সে তার নিজের একটি প্যান্ট ও বুশ সার্ট খালেদকে পরতে দেয়। ৪র্থ বেঙ্গলে সর্বশেষ ফোন করলে ডিউটি অফিসার লে. কামরুল ফোন ধরে। সে তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে। এবার খালেদ বুঝতে পারেন অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি অবস্থান পরিবর্তন করে শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় গ্রহণ করতে যান। ১০ম বেঙ্গলকে বগুড়া থেকে তিনিই আনিয়েছিলেন তার নিরাপত্তার জন্য।

প্রথমে নিরাপদেই তারা বিশ্বস্ত ইউনিটে আশ্রয় নেন। তখনো ওখানে বিপ্লবের কোন খবর হয়নি। কমান্ডিং অফিসার ছিলেন কর্নেল নওয়াজিশ। তাকে দেওয়া হয় খালেদের আগমনের সংবাদ। তিনি তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে টু-ফিল্ডে সদ্যমুক্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানকে তার ইউনিটে খালেদ মোশাররাফের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেন। তখন ভোর প্রায় চারটা। জিয়ার সাথে ফোনে তার কিছু আলাপ হয়। এরপর তিনি মেজর জলিলকে ফোন দিতে বলেন। জিয়ার সাথে মেজর জলিলের কিছু কথা হয়। তাদের মধ্যে কি কথা হয়, সঠিক কিছু বলা মুশকিল। তবে কর্নেল আমিনুল হক বলেছেন, তিনি ঐ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং জিয়াকে বলতে শুনেছেন, যেন খালেদকে প্রাণে মারা না হয়। ঐ সময় রুমে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তবে টেলিফোনে কার সাথে তার কথাবার্তা হচ্ছিলো, তা অনুধাবন করতে পারিনি।

যা হোক, ভোরবেলা দেখতে দেখতে সিপাই বিদ্রোহের প্রবল ঢেউ ১০ম বেঙ্গলে গিয়ে লাগতে শুরু করে। সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে উঠে। পরিস্থিতি কর্নেল নওয়াজিশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারা খালেদ ও তার সহযোগীদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সিপাহীরা তাদের টেনে হিঁচড়ে বের করে। ইউনিটের অফিসার মেজর আসাদের বিবৃতি অনুসারে কর্নেল হুদা হায়দারকে তার চোখের সামনেই মেস থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে এনে প্রকাশ্যে সৈনিকরা গুলি করে হত্যা করে। বাকি দু'জন উপরে ছিলেন তাদের কিভাবে মারা হয় সে দেখতে পায়নি। তবে জানা যায় হায়দার, খালেদ ও হুদা অফিসার মেসে বসে সকালের নাস্তা করছিলেন। কর্নেল হুদা ভীত হয়ে পড়লেও খালেদ ছিলেন ধীরস্থির, শান্ত। হুদাকে তিনি অস্থির হতে মানা করলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন।

www.bjilibrary.com

জানা গেছে, মেজর জলিল কয়েকজন উত্তেজিত সৈনিক নিয়ে মেসের ভেতরে প্রবেশ করে। তার সাথে একজন বিপ্লবী হাবিলদারও ছিলো। সে চিৎকার দিয়ে জেনারেল খালেদকে বললো, "আমরা তোমার বিচার চাই!" খালেদ শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ঠিক আছে তোমরা আমার বিচার করো। আমাকে জিয়ার কাছে নিয়ে চলো।"

স্বয়ংক্রিয় রাইফেল বাগিয়ে হাবিলদার চিৎকার করে বললো, "আমরা এখানেই তোমার বিচার করবো।"

খালেদ ধীরস্থির, বললেন, "ঠিক আছে, তোমরা আমার বিচার করো।" খালেদ দু'হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলেন।

ট্যা-র-র-র-র! একটি ব্রাশ ফায়ার! আগুনের ঝলক বেরিয়ে এলো বন্দুকের নল থেকে। মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী খালেদ মোশাররফ। সাঙ্গ হলো বিচার। শেষ হলো তার বর্ণাঢ্য জীবনেতিহাস।" (পৃষ্ঠা : ১৩৬ ও ১৩৭)

অত্যন্ত বিস্ময়ের ব্যাপার যে, সেনাপ্রধানের পদ জোর করে দখল করার পর খালেদ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু বঙ্গভবনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে রইলেন যে, তিন দিন থেকে ক্যান্টনমেন্টে গড়ে উঠা সেনা-বিদ্রোহের খবর তাঁকে দেবার মতো একজন বিশ্বস্ত অফিসারও তাঁর পক্ষে ছিলেন না। শেষ মুহূর্তে ৬ তারিখ দিবাগত দুপুর রাতে খবর পেয়ে তাঁকে বঙ্গভবন থেকে পালাতে হলো। তাঁর হেফাজতের জন্য বঙ্গভবনেও সামরিক গার্ডের ব্যবস্থা ছিলো না। খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের যে পর্যালোচনা কর্নেল হামীদ লিখেছেন তা হুবহু পেশ করছি ঃ

"খালেদের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের-একটি পর্যালোচনা

মাত্র ৫ দিন স্থায়ী হয়েছিলো ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের রক্তপাতহীন ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান। আর্মির দু'জন সিনিয়র অফিসারের পরিকল্পনায় সংঘটিত হয়েছিলো এই অভ্যুত্থান, কিন্তু ব্যর্থ হলো শোচনীয়ভাবে। নিহত হলেন অভ্যুত্থানের নেতা খালেদ মোশাররফ। খালেদ ছিলেন একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ অফিসার। কিন্তু নভেম্বর 'ক্যু' সামাল দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বেসামাল হয়ে পড়েন। এর আগে তিনি কখনো এমন অদক্ষতার পরিচয় দেননি।

৩ নভেম্বরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো, ওটার প্রস্তুতি হয়েছিলো ঘটা করে প্রায় সবাইকে জানিয়েই। কিন্তু এসেছিলো অতি নীরবে, নিঃশব্দে, মধ্যরাতে। একটি বুলেটও ফায়ার হয়নি, একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেনি। ভোরবেলা সবাই ঘুম থেকে উঠে জানতে পারে, আর্মির ক্ষমতা বদল হয়েছে। জিয়া আর চিফ অব স্টাফ নেই। তিনি বন্দি। খালেদ মোশাররফ নতুন অধিনায়ক।

কেন ব্যর্থ হলো অভ্যুত্থান?

১. রাজনৈতিকভাবে সময়টা ছিলো অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। বিভিন্ন কারণে ঐ সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভারতবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। খালেদের অভ্যুত্থানকে ভারতপন্থি এবং বাকশালপন্থি মনে করে সবাই ভীত হয়ে পড়ে। সৈনিকদেরও তাই ধারণা হয়। ঐ সময় এ রকম অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা খালেদ মোটেই পর্যালোচনা করে দেখেননি।

www.bjilibrary.com

২. আর্মি চিফ অব স্টাফ জিয়াউর রহমানকে বন্দি করে ধরে রাখাটা ছিলো একটি ভুল সিদ্ধান্ত। এতে বন্দি জিয়ার সপক্ষে সেপাই থেকে নিয়ে সকল স্তরের লোকজনদের সহানুভূতি জেগে ওঠে, যা খালেদের বিপক্ষে চলে যায়। বন্দি জিয়ার ইমেজ, মুক্ত জিয়া থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে শেষ পর্যন্ত 'Counter' অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জিয়ার মুক্তি। খালেদ মোশাররফ তার ভ্রান্ত স্ট্রাটেজির দ্বারা তার অজান্তেই প্রতিপক্ষ জিয়াউর রহমানকে 'হিরো' বানিয়ে দেন।

৩. ৪ তারিখ আওয়ামী লীগের মিছিলে খালেদের মা ও ছোট ভাই নেতৃত্ব দেওয়ায় সবার কাছে খালেদ আওয়ামী লীগপন্থি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এটা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে চলে যায়।

৪. অধিকাংশ সৈনিক ধার্মিক ও নামাযী। তারা বহুদিন পর আল্লাহু আকবার, বিস্‌মিল্লাহ, জিন্দাবাদ ইত্যাদি স্লোগান শুনে মোশতাকের পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। কিন্তু তারা খালেদের প্রত্যাবর্তনকে ধর্মের বিপক্ষে মনে করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

৫. খালেদ-শাফায়াত শুধু বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর নির্ভর করে অভ্যুত্থান করেন। প্রধানত এটা ছিলো ৪৬ ব্রিগেডের বেঙ্গল রেজিমেন্টের ক্যু। এতে স্বভাবতই ঢাকা 'লগ এরিয়া' ইউনিটগুলো, যথা– সিগন্যালস, সাপ্লাই, মেডিক্যাল, অর্ডিন্যান্স, ইএমই, ইঞ্জিনিয়ার্স, এ্যাক এ্যাক, বেঙ্গল ল্যান্সার (ট্যাঙ্ক) টু-ফিল্ড আর্টিলারি এসব ইউনিট ক্ষেপে যায়। তারা একত্রে মিলে পদাতিক ব্রিগেডের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

৬. খালেদের ক্যু'তে মোটেই পাবলিক সাপোর্ট বা জনসমর্থন ছিলো না। এমনকি পূর্ণ সৈনিক সমর্থনও ছিলো না। সৈনিকদের শক্তিকে তিনি কোন পাত্তাই দেননি। কেবল দুজন সিনিয়র ও কিছু তরুণ অফিসারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সেন্টিমেন্টের উপর নির্ভর করে অভ্যুত্থান হয়। তাই এর ভিত্তি ছিলো খুবই নাজুক।

৭. জিয়াকে বন্দি করায় সাধারণ সৈনিকবৃন্দ অফিসারদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে খালেদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। অফিসারদের ক্ষমতার কোন্দলে সেপাইদের জড়ানো কেউ ভালো চোখে দেখেনি। মূলত সৈনিকদের এই সেন্টিমেন্টকে পুঁজি করেই জাসদের 'খালেদ বিরোধী' প্রোপাগাণ্ডা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। আর্মির চিফ অব স্টাফকে বন্দি করে তার অধীনস্থ ডেপুটির জোর করে সেনাপ্রধান হওয়াকে সৈনিকদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য হয়নি।

৮. খালেদের 'ক্যু' ছিলো নরম ও মানবিক। প্রধান প্রতিপক্ষ নায়ক জিয়াউর রহমানকে জীবিত রেখেই তিনি ক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিলেন। অথচ ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্ব বড়ই রূঢ়। এখানে চরম নির্দয়তাই সাধারণত সফলতার প্রধান চাবিকাঠি। খালেদ সে পথে যায়নি, ফলে প্রধান নায়ক জিয়াউর রহমান জীবিত থাকায় অতি দ্রুত তাকে কেন্দ্র করে প্রতিবিপ্লব সংঘটিত হয়।

৯. নভেম্বর অভ্যুত্থান ছিলো প্রাথমিক পর্যায়ে তরুণ মেজরদের দ্বারা পরিচালিত একটি অভ্যুত্থান। তাদের দ্বারা সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা অতি সহজ

www.bjilibrary.com

কাজ হলেও পরবর্তী ধকল সামলানো সহজ ব্যাপার ছিলো না। খালেদ যখন মধ্য পর্যায় থেকে অপারেশন পরিচালনা শুরু করেন, তখন সবকিছু তালগোল পাকিয়ে গেছে। বঙ্গভবনে প্রতিপক্ষ গ্রুপ ততক্ষণে শক্ত 'অপজিশন' নিয়ে ফেলেছে।

১০. খালেদের অপারেশনে 'গোপনীয়তা' বলে কিছু ছিলো না। সবাই জেনে যায়। এতে জিয়ার পক্ষে আগাম counter অ্যাকশন পরিকল্পনা করা সহজ হয়। এছাড়াও তাদের প্ল্যানে কোন গতি, আক্রমণ, আঘাত হানা, ধ্বংস, ক্যাপচার কিছুই ছিলো না। এটা নিছক আলোচনা আর আপসরফার অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। দেখেশুনে মনে হয়েছে, এটা যেন বাবুদের একটি Telephone Battle. খালেদ আলোচনা ও ডিপ্লোমেসিতে অযথা সময় নষ্ট করেন। তিনি ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা সংহত করতে বহু সময় অপচয় করেন, যা তার ধ্বংস ডেকে আনে। ক্যান্টনমেন্টে যখন বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠছে, তখনো তিনি বঙ্গভবনে তার প্রমোশন ও রাজনৈতিক আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। তার মতো একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারের এরকম হেঁয়ালিপনা সবাইকে অবাক করে।

১১. রেডিও, টিভি, সবকিছু বন্ধ রেখে তিনি তার উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সম্বন্ধে জাতিকে ও সশস্ত্র বাহিনীকে কিছুই জানতে দেননি। তিনি যে ক্ষমতায় আছেন, এর সামান্য উত্তাপও কেউ টের পায়নি। জনগণ ও সৈনিকদের প্রভাবিত করার কোন চেষ্টাই তিনি করেননি। এ কয়দিন তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিলেন সৈনিক ও জনগণ থেকে। গণ-মিডিয়া বন্ধ থাকায় সর্বত্র সৃষ্টি হয় নানা গুজব ও বিভ্রান্তি, যা খালেদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে কাজ করে।

১২. বঙ্গভবনে তিনি যখন বেহুদা আলোচনায় রত, তখনই ক্যান্টনমেন্টে তার বিরুদ্ধে সেনা-বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তিনি ছিলেন শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সম্পূর্ণ বে-খবর। ফলে কোন counter ব্যবস্থা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। অসন্তোষকে কেন্দ্র করে সৈনিকরাও যে সংগঠিত হয়ে কমান্ডারদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে বিদ্রোহ করতে পারে, এ রকম ধ্যান-ধারণা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার মাথায় আসেনি।

১৩. তার কমান্ডে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ট্রুপস এক-চতুর্থাংশও তার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো না। সৈনিকদের শক্তিকে তিনি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। তরুণ অফিসারদের উপরই তিনি বেশি নির্ভরশীল ছিলেন।

১৪. খালেদ-শাফায়াত সম্পর্ক ভালো থাকলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (AIM) অভিন্ন ছিলো না। শাফায়াত জামিলের প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, মেজরদের বঙ্গভবন থেকে বহিষ্কার এবং 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠা ও নিজেই ক্ষমতা সুসংহত করা। কিন্তু খালেদ মোশাররফের প্রধান লক্ষ্য ছিলো, ক্ষমতা দখল এবং জিয়াকে সরিয়ে নিজে চিফ অব স্টাফ হওয়া। দুই প্রধান ক্যু-নেতার লক্ষ্যের অভিন্নতা না থাকায় খালেদ শুরু থেকেই ইচ্ছা থাকলেও সর্বোচ্চ ক্ষমতার আসনে সরাসরি আরোহণ করতে পারেননি। এছাড়া নেপথ্যে জিয়ার সাথে ছিলো শাফায়াত জামিলের মধুর সম্পর্ক। প্রাথমিক অবস্থায় সে জিয়াকে 'চিফ' রেখেই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলো। এখন ঐ কাজটিই খালেদ মোশাররফকে নিয়ে করতে হচ্ছিলো।

www.bjilibrary.com

১৫. ফারুক-রশিদের দৃঢ় অভিমত, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেপথ্য নায়ক জিয়াউর রহমান; খালেদ মোশাররফ নয়। অর্থাৎ জিয়া-শাফায়াতের গোপন সমঝোতায়ই ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। জিয়াকে তার বাসায় শাফায়াতের ট্রুপসের তত্ত্বাবধানে 'নিরাপদে' আটকে রাখা হয়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা দখলের ঐ দিনগুলোতে বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন মতলবে ভয়ঙ্কর গোপন খেলায় মত্ত ছিলো, যা উদ্‌ঘাটন করা বেশ জটিল ব্যাপার। এসব ভবিষ্যৎ অনুসন্ধিৎসুদের গবেষণার ব্যাপার। পরবর্তীতে ঐ অভ্যুত্থানের বিদ্রোহীদের, বিশেষ করে শাফায়াত জামিল ও হাফিজ উদ্দিনের প্রতি সদয় ব্যবহার এই ধারণা বদ্ধমূল করে।

১৬. শাফায়াতের ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডের শক্তিকে খালেদ Over Estimate করেছিলেন। পদাতিক ব্রিগেডই সর্বেসর্বা। অন্যান্য সার্ভিস কোরের ইউনিটগুলো সব ফালতু, এমনিতরো ধারণার বশবর্তী তিনি তাদের শক্তি সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করেন। অথচ পরবর্তীতে দেখা গেলো, এসব সার্ভিস ইউনিটগুলোর সম্মিলিত শক্তি তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে এক ঐতিহাসিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

১৭. সর্বোপরি এসব এ্যাডভেঞ্চারের ক্ষেত্রে ভাগ্য (Luck) বিরাট ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে ভাগ্যলক্ষ্মী খালেদের সপক্ষে ছিলো না, যার জন্য মুক্তিযুদ্ধের একজন জনপ্রিয় সমরনায়ক হয়েও শেষ বেলায় তার ভাগ্যে নেমে এলো ব্যর্থতার গ্লানি। সৈনিকদের হাতেই করুণভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো মুক্তিযুদ্ধের এই বীর সেনানায়ককে।" (পৃষ্ঠা : ১১১-১১৪)

সিপাই জনতা ভাই ভাই

৬ তারিখ দিবাগত শেষ রাতে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে আবার সেনাপ্রধান হিসেবে বহাল করে সাধারণ সৈনিকরা চরম আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠলো। তারা সবাই সশস্ত্র। তারা কোন অফিসারের হুকুমের অধীনে ছিলো না। মুক্ত বিহঙ্গের মতো তারা তখন স্বাধীন। হাজার হাজার সৈনিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে সকাল ৫টার আগেই সেনানিবাস থেকে বের হয়ে শহরে ঢুকে পড়লো। তাদের এ মিছিলে ট্যাঙ্ক বাহিনীও শরীক হয়ে গেলো। মিছিলে মিলিটারি জীপও ছিলো। জীপে আর কয়জনের জায়গা হয়? পদব্রজেই সবাই স্লোগান দিতে দিতে এগুচ্ছে। মাঝে মাঝে মন্থর গতিতে জীপ ও ট্যাঙ্ক মিছিলের শোভা বর্ধন করছে। তাদের স্লোগান ছিলো ঃ

নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, জিয়া-মোশতাক জিন্দাবাদ। শেষ রাত ৪টায় রেডিওতে জেনারেল জিয়ার কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থেকে জানা গেলো যে, তিনি দেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। অসময়ে এ খবর যে-ই শুনেছে সে-ই পরম উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সবাইকে জানাতে লাগলো। গত কয়দিন রাজধানীতে চরম উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিলো। ঐটুকু খবর থেকে মানুষ আশ্বস্ত হলো যে, সেনাপতি জিয়া ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়েছেন এবং বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছে।

মহল্লায় মহল্লায় খুব ভোরেই মানুষ রাস্তায় বের হয়ে অবস্থা জানার জন্য জমা হতে লাগলো। আর্মির জীপ শহরে ছড়িয়ে পড়লো। জনগণ আর্মির গাড়ি দেখে দলে দলে

www.bjilibrary.com

ঘিরে ধরলো। নতুন শ্লোগান যোগ হয়ে গেলো, "সিপাহী জনতা ভাই ভাই।" খোলা জীপে সৈনিকরা বিজয় উল্লাসে নৃত্য করতে থাকলো। জনগণও তাদের সাথে হাত তালি দিয়ে নেচে নেচে, লাফিয়ে লাফিয়ে শ্লোগানে শরীক হলো। এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সিপাহী-জনতা একসাথে আনন্দে মেতে উঠেছে। কিসের আনন্দ? সবারই মনের ভাব হলো, "ভারতের দালালদের হাত থেকে দেশটা বেঁচে গেলো। বাকশালী দানবের খপ্পর থেকে বাঁচলাম। মুসলিম জাতি হিসেবে টিকে থাকার সুযোগ পাওয়া গেলো। কী-আনন্দ!"

সশস্ত্র সৈনিকরা আর্মির ট্রাক বা খোলা জীপে চড়ে স্বাধীনভাবে শহরে ঢুকে উল্লসিত জনগণের সাথে মিশে গেলো। একটি আর্মির গাড়ির বিবরণ এমন একজন থেকে সরাসরি শুনলাম, যিনি ঐ গাড়িতে চড়ে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত পুরানো ঢাকা শহরে কমপক্ষে ২৫টি জনসভায় বক্তৃতা করেছেন। তিনি তখন জগন্নাথ কলেজে অনার্সের ছাত্র এবং অতি উৎসাহী ইসলামী কর্মী। বর্তমানে (২০০৪ সাল) তিনি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ-এর এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট। তিনি ইতিহাস গবেষক এবং বেশ কয়টি ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। তাঁর নাম মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

আমি ৭ নভেম্বরের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তাঁর সাক্ষাৎ দাবি করার সাথে সাথে ঐ দিনই সন্ধ্যায় তিনি চলে এলেন। নাশতার পর কথা শুনবো বলে মনে করলাম। কিন্তু তিনি নাশতা শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে পারলেন না। তাঁর বক্তব্য শুরু হয়ে গেলো। তাঁর বর্ণনাভঙ্গি ও উচ্ছ্বাস দেখে মনে হলো, যেন তিনি '৭৫-এর ৭ নভেম্বরের পরিবেশে ফিরে গিয়েই এর বিবরণ দিচ্ছেন।

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলছেন

"৬ নভেম্বর দিবাগত শেষ রাতে গোলাগুলির আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেলো। বাংলাবাজার নিজেদের বাড়িতেই ছিলাম। রেডিওতে জিয়ার কণ্ঠ শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। বের হয়ে দেখলাম রাস্তায় আরও লোক। এগুতে এগুতে বাহাদুর শাহ পার্কে এসে দেখি আর্মির একটা ট্রাকে সশস্ত্র সৈনিকরা শ্লোগান দিচ্ছে—নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবার, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ, সিপাহী বিপ্লব জিন্দাবাদ, সিপাহী জনতা ভাই ভাই।

কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলাম, মাইক হাতে একজন সৈনিক জিয়াকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার আনন্দ প্রকাশ করে সিপাহীদের বিজয় ঘোষণা করছে। কথাগুলোতে উচ্ছ্বাস থাকলেও আকর্ষণীয় ভাষায় বলতে পারছিলো না। ওরা তো আর বক্তা নয়! চারপাশে মানুষের ভিড় বেড়েই চলছে। মাইক আছে, বিরাট জমায়েত উপস্থিত। এ সময়ের উপযোগী বিপ্লবী ভাষা আমার মুখ থেকে উপচে পড়তে চায়। আর থাকতে পারলাম না। লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠেই সৈনিকের হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলাম। উপস্থিত জনতা আমার প্রতিটি কথাকে হাততালি দিয়ে সমর্থন করতে লাগলো। শ্লোগানে শরীক হয়ে বিশাল জনতা নেচে উঠলো। এতো লোক সমবেত হলো যে, মাইকের আওয়াজ হয়তো পৌঁছতে পারছে না, কিন্তু শ্লোগানে সবাই শরীক।

পনেরো-বিশ মিনিট প্রাণ ভরে বক্তৃতা করে ট্রাক থেকে নেমে আসার উপক্রম করতেই

www.bjilibrary.com

সৈনিকরা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, "আপনাকে যেতে দেবো না, আমাদের সাথেই শহরে জনতার সামনে বক্তৃতা করতে হবে। ট্রাক পুরানো শহর ঘুরে দুপুর পর্যন্ত গুলিস্তান এলাকায় পৌঁছা পর্যন্ত কমপক্ষে ২৫টি সমাবেশে বক্তৃতা করে জুমুআর নামাযের জন্য বাইতুল মুকাররমে চলে গেলাম। জুমুআর নামাযে এতো লোক ছিলো যে, নামাযের পর বিশাল মিছিলের আকার ধারণ করলো। মিছিলে নিজামী ভাই ও কামারুজ্জামান ভাইকে দেখলাম।

লক্ষ লোকের আনন্দ মিছিল

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ঐ মিছিলে ছিলেন জেনে তাঁর সাথে যোগাযোগ করলাম। ইসলামী ছাত্র সংঘের তখনকার সভাপতি নাসেরের সাথেও কথা বললাম। তাঁদের কাছ থেকে যা জানলাম তা-ই লিখছি, আবু নাসের (বর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা) থেকে জানা গেলো যে, এ বিশাল মিছিলের জন্য পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী বহু মাইকের ব্যবস্থা করা হয় এবং মিছিল কোন্ কোন্ পথে পরিচালনা করা হবে তাও ঠিক করা হয়। আরও জানা গেলো যে, বাইতুল মুকাররাম মসজিদ থেকে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাঈন সাঈদী ও মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ মা'সূম (মরহুম) মিছিলে শরীক ছিলেন।

মাওলানা নিজামী থেকে জানলাম যে, সেদিন সারা শহরেই মিছিল আর মিছিল। সারাদিনের পরও প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত রাজপথে মানুষ আর মানুষ দেখা যায়। রাজধানী যেন মহাউৎসব পালন করছে। এ মিছিলে কোন বক্তৃতা হয়নি। জুমুআর আগে সারা শহরেই আর্মির গাড়ি বা ট্যাঙ্ককে কেন্দ্র করে অনেকে বক্তৃতা রাখে। পথে যাকেই বক্তৃতা করতে দেখেছে, সৈনিকরা তাদেরকে গাড়িতে ও ট্যাঙ্কে তুলে নিয়ে মাইক ধরিয়ে দিয়েছে বক্তৃতা করার জন্য। এসব বক্তা হয় ছাত্র সংঘের কর্মী, আর না হয় জামায়াতে ইসলামীর যুব-কর্মী। এ পরিস্থিতিতে যারাই বক্তৃতার যোগ্য তারাই সুযোগ পেয়েছে। সৈনিকরাই সুযোগ করে দিয়েছে।

নিজামী সাহেব থেকে আরও একটি শ্লোগানের কথা জানলাম, "রুশ-ভারত সাবধান, আমরা সব মুসলমান।"

১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যেমন শুক্রবার দিন ছিলো, ৭ নভেম্বর ও তেমনি জুমুআবার ছিলো। আগস্ট বিপ্লবের ফলেই জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান হন। ৭ নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবেই তিনি সেনাপ্রধান হিসেবে পুনর্বহাল হন। ৩ নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ আগস্ট বিপ্লবকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালান। ৭ নভেম্বর আগস্ট বিপ্লবকে পুনর্বহাল করে।

১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর জনগণের মধ্যে একই রকম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ১৫ আগস্ট কারফিউ থাকায় জনগণ ৭ নভেম্বরের মতো রাজধানীতে শ্লোগান দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতে পারেনি। শুধু জুমুআর নামাযে যাবার সুযোগে নীরবে চোখে-মুখে ও ভাবভঙ্গিতে আবেগ-উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। আগস্ট বিপ্লব যে অপশক্তিকে উৎখাত করেছে, ৭ নভেম্বর ঐ একই শক্তিকে প্রতিহত করেছে।

www.bjilibrary.com

আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টও শুক্রবার ছিলো। শুধু তাই নয়। রমযানের ২৬ তারিখ ছিলো। দিবাগত রাতটি ছিলো লাইলাতুল কদর। তারাবীহ নামাযের পর সারা রাত আযাদী উৎসবে মেতে ছিলাম। আমি তখন এমএ প্রথম বর্ষের ছাত্র। সেহরীর পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা শহরে মিছিলেই রাত কাটলো। শ্লোগান ছিলো, নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, দীন ইসলাম জিন্দাবাদ।

'৪৭-এর ১৪ আগস্ট, '৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর এ দেশের ইতিহাসের তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং এসব কয়টি দিনই ঘটনাক্রমে জুমুআবার হওয়া বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এ দেশের জনগণ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাঁর রাসূল (স)-কে মহব্বত করে এবং তাঁর কুরআনকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। এ মানবগোষ্ঠী কখনো আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে না, এমন কোন ইশারা এর মধ্যে লুকিয়ে থাকতেও পারে।

১৭৫.

তাহের ও জিয়ার ক্ষমতার লড়াই

আমার ধারণা ছিলো যে, খালেদ মুশাররফের বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর জেনারেল জিয়াউর রহমান সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে সেনাপ্রধান হিসেবে পুনর্বহালের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার লড়াই শেষ হয়ে যায়। বিশেষ করে ৭ তারিখ রাজধানীতে সিপাহী-জনতার অভূতপূর্ব সংহতির ফলে রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিপক্ষ বলতে গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ৭ নভেম্বর সকাল ১০ টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাসদের সমাবেশে জিয়াউর রহমানকে হাজির করার প্রচেষ্টায় কর্নেল তাহের ব্যর্থ হয়ে যায় এবং জিয়ার সমর্থক একদল সৈনিক ঐ সমাবেশকে বিতাড়িত করে দেয়। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জনগণের ময়দানে জিয়ার বিরোধী কোন শক্তি কোথাও সক্রিয় নেই।

কিন্তু ৭ নভেম্বর থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত ক্যান্টনমেন্টে ক্ষমতার ভয়ানক লড়াই চলার কথা কর্নেল হামীদের বই পড়ার আগে কিছুই জানতাম না। সেনানিবাসের বাইরে রাজনীতি সচেতন লোকেরাও কিছুই টের পায়নি। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তাহেরের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তো সেনানিবাসের ভেতরে ছিলোই। বাইরের বিপ্লবী গণবাহিনীও সশস্ত্র অবস্থায় ভেতরেই সক্রিয় ছিলো। এ দু'বাহিনীকে ব্যবহার করে কর্নেল তাহের তাঁর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টায় মরিয়া হয়ে গেলেন। ৭ নভেম্বর সকাল থেকে শেষ রাত পর্যন্ত সেনানিবাসের সক্রিয় চিত্র কর্নেল হামীদের পুস্তক থেকে পরিবেশন করছি।

টু-ফিল্ড ব্যারাক

৭ নভেম্বর। সকাল থেকে টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের অফিস-ব্যারাকে সারা দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এই সেই টু-ফিল্ড রেজিমেন্ট, যারা ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানে কর্নেল রশীদের নেতৃত্বে অভিযানে অংশগ্রহণ করে। এখন থেকে বঙ্গভবন নয়, টু-ফিল্ড ব্যারাকই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। এখান থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পুরো দেশের ভাগ্য। জিয়াউর রহমানের অপারেশনের হেড কোয়ার্টার তখন টু-ফিল্ড ব্যারাক। সবাই ছুটছে টু-ফিল্ড অভিমুখে। এক রাতেই জিয়াউর রহমানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। যেন যুগ যুগ ধরে এ বিপ্লবটিই অপেক্ষা করছিলো তার জন্য।

www.bjilibrary.com

এলেন জেনারেল ওসমানী, এলেন জেনারেল খলিল, এয়ার মার্শাল তোয়াব, অ্যাডমিরাল এমএইচ খানসহ অন্যান্য সকল সিনিয়র অফিসারগণ। সবাই অভিনন্দন জানালেন জিয়াকে। সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টা। দেখলাম একপাল সৈনিক পরিবেষ্টিত হয়ে সিভিল ড্রেসে কে যেন এগিয়ে আসছে। ক্রাচে ভর দিয়ে লে. কর্নেল (অব.) আবু তাহের। এতো লোকজন নিয়ে সরাসরি সে একেবারে জিয়ার কামরায়ই ঢুকে গেলো। আমি ভেবেছিলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের অন্যান্যদের মতো এমনিই হয়তো জিয়াকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। আমার ভুল ভাঙ্গলো অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ পর। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ওখানেই কনফারেন্স হলো। উপস্থিত ছিলেন জিয়া, ওসমানী, খলিলুর রহমান, তোয়াব, এমএইচ খান, মাহবুব আলম চাষী ও কর্নেল তাহের। বিপ্লবী বাহিনীর তাহের শুধু উপস্থিতই ছিলো না, সে তার জোরালো বক্তব্যও রাখলো। বাহিনী প্রধানদের কেউ প্রশ্নও রাখলেন না, কিভাবে পলিসি নির্ধারণ মিটিং-এ একজন বিপ্লবী বাহিনী নেতা উপস্থিত থাকলো!

প্রথমেই রাষ্ট্রপতি কে হবেন, এ প্রস্তাবে জেনারেল ওসমানী খন্দকার মোশতাকের নাম উত্থাপন করলে জেনারেল খলিল এবং আবু তাহের এর বিরোধিতা করেন। সামান্য আলোচনার পর বিচারপতি সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিএমএলএ হিসেবে জিয়া থাকতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তা হয়নি। জেনারেল খলিল রাষ্ট্রপতির হাতেই ক্ষমতা থাকার সপক্ষে যুক্তি দেখান। তাহের তা সমর্থন করেন। সুতরাং সায়েমই সিএমএলএ থাকলেন, জিয়াকে অন্য দুই বাহিনী প্রধানের সাথে ডিসিএমএলএ-র পোস্ট নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। এ সিদ্ধান্ত জিয়ার মনঃপূত ছিলো না, কারণ ভোরেই তিনি CMLA হিসেবে রেডিওতে নিজেকে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

৭ নভেম্বর জিয়ার জন্য খুবই ব্যস্ত দিন। ১২টার দিকে জিয়া ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা দেখার জন্য জীপ নিয়ে বের হলেন। সর্বত্র ঘুরলেন। সিগন্যালস্ অর্ডিন্যান্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, লাইট এ্যাক্ এ্যাক্ সব দিকে চক্কর লাগালেন। কোথাও থামলেন, কোথাও হাত নাড়লেন। সর্বত্র 'জিয়াউর রহমান জিন্দাবাদ'। দু-এক জায়গায় সৈনিকরা বিভিন্ন দাবিও পেশ করলো। তারা কিছু অফিসারের ফাঁসি দাবি করলো। জিয়া বললেন, তোমরা অস্ত্র দাও। শান্ত হও। আমি দাবিগুলো দেখছি।

সন্ধ্যায় জিয়া রেডিও স্টেশনে যান। সেখানে নতুন রাষ্ট্রপতি ও বিদায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ ছিলো। সেখানে কর্নেল তাহেরও উপস্থিত ছিলো। তারা উভয়ে একত্রে বসে ভাষণ শোনেন। ভাষণ শেষে উত্তেজিত সৈনিকরা লিখিতভাবে তাদের ১২-দফা দাবির একখানি কাগজ পেশ করে। প্রায় জোর করে কাগজের উপর তারা জিয়ার সই নেয়। বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় জিয়াকে। অবশ্য জিয়া আগেই অবস্থা অনুধাবন করে সারাক্ষণই তার অনুগত সৈনিকদের দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত করে রাখেন।" (পৃষ্ঠা : ১৩৮-১৪০)

কর্নেল হামীদের দেখা সিপাহী-জনতার উল্লাস

সেনানিবাসের ভেতরে ক্ষমতার লড়াই চললেও ঢাকা শহরে জনগণের অবস্থা কর্নেল হামীদের বর্ণনায় দেখুন ঃ

www.bjilibrary.com

"ঢাকা শহরে জনতার উল্লাস (৭ নভেম্বর)

আমি জীপ নিয়ে একবার শহরের অবস্থা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। শহরে শাহবাগ মোড় পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে। হাইকোর্টের সামনে আর যেতে পারলাম না। হাজার হাজার মানুষ জীপ দেখে 'আল্লাহু আকবার' বলে নৃত্য করতে করতে ছুটে আসলো। আমি বিপদ বুঝে ড্রাইভারকে তাড়াতাড়ি জীপ ঘুরাতে বললাম। কিছুটা শান্ত দেখে কাকরাইলের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম, সেদিকেও একই অবস্থা। মিলিটারি গাড়ি দেখলেই আনন্দের আতিশয্যে জনতা তা ঘিরে ধরছে আর জিন্দাবাদ ধ্বনি দিচ্ছে। রেসকোর্সের কাছে কয়েকটি ট্যাঙ্কের উপর বহু সিভিলিয়ান চড়াও হয়ে ফুর্তি করতে দেখলাম। আমি আর গুলিস্তানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সাহস পেলাম না। কাকরাইল থেকেই ঘুরে পুনরায় শাহবাগ হয়ে দ্রুতগতিতে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে এলাম।

একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, জনতার বেশিরভাগ ছিলো ইসলামপন্থি। তারা ক্রমাগত নারায়ে তাকবীর, আল্লাহ আকবার ধ্বনি দিচ্ছিলো। জাসদের সমর্থক কোন মিছিল দেখলাম না। মনে হলো, সাধারণ মানুষ জাসদের জড়িত থাকার কথা কিছুই জানে না। সবাই ছুটছে এক অপূর্ব আবেগে, মুক্তির আনন্দে। অভূতপূর্ব দৃশ্য!

শহরের রাস্তায় বিভিন্ন স্থানে দেখলাম, সৈনিকরা বিভিন্ন ইউনিট থেকে ট্রাক বের করে এনে রাস্তায় সিভিলিয়ানদের সাথে মিশে মিছিল করছে আর স্লোগান দিচ্ছে, আল্লাহু আকবার। সেপাই জনতা-ভাই ভাই।' জেনারেল জিয়া-জিন্দাবাদ।

সেপাই-জনতার বিজয় মিছিল। চতুর্দিকে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সেপাই-জনতার এমন মিলন দৃশ্য ইতঃপূর্বে আর কখনো দেখিনি। সেপাই বিদ্রোহের সাথে জনতার একাত্মতা ঘোষণা, এক ঐতিহাসিক ঘটনা বটে। রাস্তায় কোথাও কোন অফিসারকে দেখলাম না। দিনটি ছিলো যথার্থই সেপাহীদের দিন। তাদের জন্য এক বিরাট এ্যাডভেঞ্চার। শতাব্দীর এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত!" (পৃষ্ঠা : ১৪১)

৭ তারিখ বিকেল থেকেই সেনানিবাসে শঙ্কা

৭ তারিখ দিবাগত রাত পর্যন্ত রাজধানীর সর্বত্র আনন্দ-উল্লাস চলে। সবাই নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, খালেদ মোশাররফের বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধান পদে পুনর্বহাল হলেন। আগস্ট বিপ্লব নস্যাৎ হওয়া থেকে রক্ষা পেলো। জনগণের মধ্যে এ আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে সারা শহরে।

অথচ জনগণের অগোচরে কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্টে সৈনিক-বিদ্রোহ সৃষ্টি করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলে। "অফিসারদের রক্ত চাই" স্লোগানকে সমাজতান্ত্রিক দর্শন অনুযায়ী শ্রেণী সংগ্রাম হিসেবে চালু করে একই রাতে অনেক অফিসারকে হত্যা করা হয়। ৭ তারিখ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানকে কেমন মারাত্মক সংকটের মোকাবিলা করতে হয় তা জানার পর কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে আমার মনে চরম ঘৃণা জন্মে। বন্দুকের নলে বিপ্লবের দর্শনে বিশ্বাসীদের নিকট তাহের হিরো হতে পারেন, কিন্তু ইসলাম ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসীদের নিকট অবশ্যই ঘৃণ্য। কর্নেল তাহেরের ষড়যন্ত্র সফল হলে সেনাবাহিনী ধ্বংস হয়ে যেতো। তাহের সফল না হলেও সেনাবাহিনীতে যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো, জিয়াউর

www.bjilibrary.com

রহমান কীভাবে এর মুকাবিলা করলেন তা দেশবাসীর জানা অত্যন্ত জরুরি। বাংলাদেশের ইতিহাসে ঐ সংকট যে কত ভয়ঙ্কর ছিলো তা জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এতো বছর পরও আমি তা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি।

তাহের বিজয়ী হলে জিয়াউর রহমানকে অবশ্যই নিহত হতে হতো। তাঁকে নিহত করা ছাড়া তাহেরের বিজয় কিছুতেই চূড়ান্ত হতো না। তাহের বিজয়ী হলে বাংলাদেশ নিশ্চিতভাবে রুশ-ভারতের কর্তৃত্বে চলে যেতো। ফলে বাকশালের চেয়ে অধিক মারাত্মক ব্যবস্থা চালু হতো। ৭ থেকে ১৩ নভেম্বরে ঢাকা সেনানিবাসে বাংলাদেশের ভাগ্যের ফায়সালা কিভাবে হলো এবং কিভাবে জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজের জীবন বিপন্ন করে সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হলেন তা রীতিমতো চমকপ্রদ ঘটনাবলির সমষ্টি।

সেনানিবাসের স্টেশন কমান্ডার কর্নেল আবদুল হামীদ ঐ মহাসংকটে সেনাপতি জিয়ার সহায়ক অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি তাঁর পূর্বোল্লিখিত 'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান' নামক গ্রন্থে গোটা ঘটনার যে চাক্ষুষ বিবরণ দিয়েছেন তা আমার ভাষায় লিখলে পাঠক-পাঠিকাগণ ঐ রোমাঞ্চ ও শিহরণ থেকে বঞ্চিত হবেন, যা আমি বই পড়ে অনুভব করেছি। তাই দীর্ঘ হলেও তাঁরই ভাষায় পরিবেশন করছি। এ দীর্ঘ বিবরণকে কিছুটা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে কোথাও কোথাও কিছু অংশ বাদ দিয়েছি।

৭ থেকে ১৩ নভেম্বর

৭ তারিখ বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে আবার টু-ফিল্ডে গেলাম জিয়ার কাছে। বারান্দায় উঠতেই দেখি একটি কক্ষে বসে আছে কর্নেল তাহের। মুখ তাঁর কালো, গম্ভীর, ভারী। তিন-চারজন অফিসার– কর্নেল মাহতাব, কর্নেল আবদুল্লাহ, কর্নেল আমিন তার সাথে বসে। আমাকে সালাম দিলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার তাহের? তুমি এতো গম্ভীর কেন? বললো, স্যার আপনারা কথা দিয়ে কথা রাখবেন না। মন খারাপ হবে না? আমি তার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কর্নেল আমিন মুচকি হেসে আমাকে বারান্দায় টেনে নিয়ে গেলো। বললো, বুঝলেন না স্যার! ব্যাপারটা তো সব তাহেরের লোকজনই ঘটিয়েছে, এখন জিয়াকে মুঠোয় নিয়ে বারগেন্ করছে। এখন তো সে জিয়াকে মেরে ফেলতে চায়।

এতক্ষণে বুঝলাম 'ডালমে কুচ কালা হ্যায়'। সৈনিকদের ক্যান্টনমেন্টে অন্য কোন বিপ্লবী বাহিনীর উপস্থিতির কথা আমার মাথায়ই আসছিলো না। এখন বুঝতে পারলাম আশেপাশে এলোমেলো গোছের উর্দিপরা লোকজন নিয়মিত সৈনিক নয়, বিপ্লবী বাহিনীর লোক। কর্নেল আমিনুল হককে বললাম, তোমার ফোর বেঙ্গল তোমার কন্ট্রোলে আছে তো?

'অবশ্যই'

"তাহলে তুমি তোমার লোকজন নিয়ে এখনই ডিফেন্স পেরিমিটার তৈরি করে সাবধান থাকো। আমার কাছে তো অবস্থা গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

"জানি না স্যার আজ রাতে কি হবে। তাহের উল্টোসিধা কথা বলছে। তবে আমার লোকজন ঠিক আছে।" আমিন বললো।

www.bjilibrary.com

“এখানে টু-ফিল্ডের খবর কি?”

“টু-ফিল্ড তো সুবেদার মেজর কমান্ড করছে। কোন অফিসার নেই। বিপ্লবীতে ভরে গেছে। দেখছেন না আশেপাশে।”

“জিয়া ভেতরে আছে?”

“স্যার আছেন। আপনি গিয়ে একটু বুঝিয়ে বলুন না। রাত্রে গণ্ডগোল হতে পারে।”

“হ্যাঁ যাচ্ছি?”

আমি ভেতরে তার কক্ষে গিয়ে দেখি জিয়া বসে বসে সৈনিকদের দেওয়া দাবি-দাওয়ার কাগজ পড়ছে। বসতে বললো। তার মেজাজ মোটেই ভালো না। নিজেই বলতে লাগলো, ব্যাটারা কি পাইছে! যেখানে যাই সেখানে দাবি। বললাম, দাবি কয়টা? বিগড়ে গিয়ে বললো, একশোটা। ব্যাটাদের আমি ভালো করে দাবি মিটিয়ে দেবো। আমি বললাম, মনে হচ্ছে আজ রাতে কিছু গণ্ডগোল হতে পারে। তোমার টু-ফিল্ডে থাকা উচিত হবে না। বিপদ কিছুটা সে আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলো। আমার কথা শুনে তার মুখ আরো শুকনো হয়ে গেলো। শুধু বললো, Keep Watch. আমিনকেও বলো চোখকান খোলা রাখতে। আরও বললো, তুমি যাও না। টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিসকে তো চেনো। ওর সাথেও একটু আলাপ করো।

আমার কাছে অবস্থা বড়ই ঘোলাটে মনে হলো।

টু-ফিল্ডের আশেপাশে বিভিন্ন রকমের সৈনিকরা এখানে-ওখানে জটলা করছিলো। তারা কে কোন্ পক্ষের বোঝা মুশকিল হয়ে পড়লো। কর্নেল তাহেরের কথা এবং মুড থেকে আমি স্পষ্ট বুঝলাম, তাহের এবং জিয়ার মধ্যে বড় রকমের মতবিরোধ হয়ে গেছে। তাহেরের ভাষায়, জিয়া বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দু'জনই এখন উন্মুক্ত ময়দানে পরস্পরের মুখোমুখী। রক্তক্ষয়ী সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠলো। বারান্দায় কর্নেল আমিনকে পায়চারী করতে দেখলাম। তার কপালে চিন্তার রেখা। দেখেই বললো; কি স্যার, চীফের সাথে কি কথা হলো? কিছু বললেন নাতো। অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। সে তোমাকে চোখ-কান খোলা রাখতে বলেছে। খুব সাবধান থাকো।

অবস্থা আমার কাছে মোটেই সুবিধার মনে হলো না।

আশেপাশে সৈনিকরা অস্ত্র কাঁধে ঘোরাফেরা করছে। জটলা করে কি যেন ফিশ্‌ফিশ্ আলোচনা করছে। তাদের হাবভাব অন্য রকম। কিছুক্ষণ পর আমি ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করলাম। রাস্তায় দেখি বেশ কিছু অফিসার গাড়ি করে, রিক্‌শা করে, ফ্যামিলি নিয়ে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চলে যাচ্ছে। এমনিতে রাস্তাঘাটে কোন লোকজন নেই। ছম্‌ছম্ অবস্থা। পথে আমার অফিসের সামনে একজনকে দেখলাম। তিনি কর্নেল (পরবর্তীতে মন্ত্রী ও জেনারেল) মাহমুদুল হাসান। তার চোখেমুখে শঙ্কা। ছুটে এসে বললো, স্যার, প্লিজ বলুন কি হচ্ছে? অফিসাররা পালাচ্ছে কেন? আমি তাকে বললাম, ব্রাদার তুমি এক্ষুণি বাসায় ছুটে যাও। পারলে ফ্যামিলি নিয়ে বেরিয়ে যাও। অবস্থা ভালো না। কি হচ্ছে, আমিও জানি না। সে উদভ্রান্তের মতো তখনই বাসার দিকে ছুটে চললো।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে এক অজানা আতঙ্ক সারা ক্যান্টনমেন্টে ছড়িয়ে পড়লো।

www.bjilibrary.com

রাস্তাঘাট সন্ধ্যার আগেই একেবারে ফাঁকা হয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে ঐ মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্টে কমান্ড কন্ট্রোল আর 'ডিসিপ্লিন' বলতে কিছুই অবশিষ্ট ছিলো না। বিপ্লবীদের প্রোপাগাণ্ডা, হাজার হাজার বিপ্লবী লিফলেটস্ ইত্যাদির প্রভাবে ইতোমধ্যে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন এসে গেছে লক্ষ্য করলাম। তারা অফিসারদের প্রতি অবজ্ঞাভরে তাকাচ্ছিলো। ৪র্থ বেঙ্গল এবং টু-ফিল্ড রেজিমেন্টের কিছু বিশ্বস্ত অফিসার জেসিও এবং সৈনিক জেনারেল জিয়াকে আগলে রেখেছিলো। বাদবাকিদের মতিগতি যেন কেমন হয়ে গেলো।

৭ নভেম্বর ক্যান্টনমেন্টে সকালবেলা যে পরিবেশ বিদ্যমান ছিলো, বিকেলে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করলো। অফিসাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা ধীরে ধীরে সরে পড়তে লাগলো। মনে হলো, যে কোন মুহূর্তে তাহেরের জিয়া-উৎখাত প্লান শুরু হয়ে যেতে পারে। দুপুরে সৈনিকরা তিনজন অফিসারের উপর গুলি চালালো।

নিচে কারা যেন কড়া নাড়লো। সমুজ আলী ছুটে গেলো। ভিতরে এসে ঢুকলো সুবেদার আলী ও হাবিলদার সিদ্দিক।

"সর্বনাশ হয়েছে, স্যার। এক্ষুণি তৈরি হয়ে যান। ফ্যামিলি নিয়ে বাইরে চলে যান। আর দেরি নয় স্যার, চলুন বাইরে। আপনার জীপ নিয়ে এসেছি।"

"কেন কি হয়েছে?"

স্যার কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। টু-ফিল্ড লাইনে বিপ্লবীদের মিটিং হয়েছে। জিয়া সাব দাবি-দাওয়া মানেন নাই। আজ রাত্রে সব অফিসারদের মেরে ফেলা হবে। সবাই পাগল হয়ে গেছে। সার চান্স নিয়েন না, এক্ষুণি চলুন।"

"না, না, আমি স্টেশন কমান্ডার। আমি স্টেশন ছেড়ে পালাতে পারি না। তোমরা চাইলে মারতে পারো।"

"দোহাই আল্লার, স্যার, আপনি চলে যান। সব অফিসার চলে যাচ্ছে।"

"না আমি যাবো না। ফ্যামিলিও যাবে না।"

আমার দৃঢ়তা দেখে তারা আর বেশি চাপাচাপি করলো না। তারা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করে বললো, সমুজ আলী তুমি থাকো, আমরা আবার আসছি। আমার জীপ নিয়ে তারা লাইনে চলে গেলো। ২০ মিনিট পর তারা চারজন সেপাই নিয়ে এবং ৬টি অটোমেটিক চাইনিজ রাইফেল নিয়ে আমার বাসায় ফিরে আসলো। বললো, স্যার আমরা মিটিং করে আপনার সেফটির জন্য চারজন ভলন্টিয়ার সেপাই নিয়ে আসলাম। তারা বাসার ভেতর থেকে আপনাকে গার্ড দেবে। আমার ব্যাটম্যান সমুজ আলী বললো, আমার দুইটা রাইফেল আছে। কুছ পরওয়া নাই। দেখি কোন ব্যাটা আসে।

৭/৮ নভেম্বর ঃ রক্তাক্ত রাত

সন্ধ্যা নেমে এলো। কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাঙ্কের ঘড়ঘড় শব্দ শোনা গেলো বড় রাস্তায়। বেঙ্গল রেজিমেন্টের লাইনে পৌঁছে মেজর নাসের ও মেজর গাফ্ফারকে তাদের হাতে তুলে দেবার জন্য চাপ প্রয়োগ করছে। খালেদ

www.bjilibrary.com

মোশাররফের ক্যুর সাথে এ দু'জন অফিসার জড়িত ছিলেন। তারা ৪র্থ বেঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছিলো। বেঙ্গল রেজিমেন্টের কর্নেল আমিন, মেজর মুনীর ও সৈনিকরা অফিসারদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালো। কিছুক্ষণ জোর কথা কাটাকাটির পর ট্যাঙ্কাররা ফিরে গেলো। অফিসারদ্বয় বেঁচে গেলেন।

রাতের আঁধার ঘনিয়ে এলো। চারিদিকে অজানা আতঙ্কের ছায়া। ভয়াবহ ক্যান্টনমেন্ট। মাঝে মধ্যে গুলির শব্দ। রাত আনুমানিক ১২টা। গভীর অন্ধকার। আমার নিচতলায় থাকতেন সিগন্যাল রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল সামস। হঠাৎ গেটে তুমুল চিৎকার, হট্টগোল। গেট ঠেলে ভেঙে ১০/১২ জন সেপাই ঢুকে পড়লো চত্বরে। তারা নিচতলায় কর্নেল সামসের বাসা আক্রমণ করে বসলো। অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে তাকে দরজা খুলতে বলে চিৎকার দিতে লাগলো। কিন্তু কেউ দরজা খুললো না। সেপাইরা ক্রমাগত লাথি মেরে মেইন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়লো। ততোক্ষণে সামস্‌রা সবাই পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেছেন। ঘরে কাউকে না পেয়ে প্রবল আক্রোশে তারা খালি ঘরে গুলি চালাতে লাগলো। মুহূর্তে বাড়ির ভিতর এর ভয়ঙ্কর পরিবেশের সৃষ্টি হলো, আমরা আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম। দুটো গুলি উপরের তলায় একেবারে আমার পায়ের নিচে এসে লাগলো। ভয়ে আমার বাচ্চারা কাঁদতে লাগলো।

নিচতলায় কর্নেল সামস্‌কে না পেয়ে বিপ্লবী সেপাইরা এবার সিঁড়ি বেয়ে আমার বাসার দিকে ধাওয়া করলো। তারা উপর তলায় উঠে আসলো। বারান্দায় আমার ব্যাটম্যান সেপাই সমুজ আলী ও অন্য চারজন সেপাই প্রবলভাবে তাদের বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু তারা ছিলো সংখ্যায় বেশি। সমুজ আলীদের ঠেলে এবার তারা একবারে আমার বেডরুমের দরজায় পৌছে হাঁকা-হাঁকি করে দরজা খুলতে বললো। আমার ব্যাটম্যান সমুজ আলী অসম সাহসে বিপ্লবীদের বলতে লাগলো; দেখুন ভাই সাহেবরা, আমাদের সাহেবকে কিছু করলে কিন্তু আমরা আপনাদেরকে ছাড়বো না। আমি দেখলাম, দরজা না খুললে বিপ্লবীরা দরজা ভেঙেই ভেতরে ঢুকে পড়বে। অতএব, আমি দরজা খুলে বেরুতে গেলাম। আমার স্ত্রী আমাকে থামিয়ে বললো, দাঁড়াও আমিই যাবো, বলেই সে দরজা খুলে একেবারে আক্রমণকারীদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

লেডিজ দেখে বিপ্লবীরা প্রথমে থতমতো খেয়ে গেলো। পর মুহূর্তে সামলে নিয়ে বললো, আপনি সরুন। আমরা আপনাকে চাই না, অফিসারকে চাই। রক্তপাগল সৈনিকরা আমার স্ত্রীকে গুলি করতে পারে ভেবে আমি নিজেই তাড়াতাড়ি দরজার পেছন থেকে বেরিয়ে এলাম। বললাম, আমি কর্নেল হামিদ, তোমরা কি চাও। একজন বিপ্লবী গুলি করার জন্য রাইফেল তুলতেই সমুজ আলী ও অনুগত সেপাইরা সঙ্গে সঙ্গে তাকে জাপটে ধরলো। সমুজ আলী বললো, খবরদার বলছি, ভালো হবে না। তারা বিপ্লবীকে প্রবলভাবে ঠেলে পেছনে নিয়ে গেলো। ঐ ব্যাটাই ছিলো লিডার। মনে হলো এরা ভিন গ্রহের বিপ্লবী সেপাই। বাকিদের দু-তিন জনকে সামসের সিগন্যাল ইউনিটের মনে হলো। আমার সেপাইদের দৃঢ়তা দেখে তারা পিছপা হলো। তারা রাগে গড় গড় করতে করতে ফিরে চললো। একজন বললো, দাবি না মানলে আমরা কোন অফিসারকে জিন্দা রাখবো না। যাহোক আমরা কোনক্রমে এ যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলাম।

www.bjilibrary.com

৭/৮ নভেম্বর ঐ বিভীষিকাময় রাত্রে গভীর অন্ধকারে উন্মাদ সৈনিকরা অফিসারদের রক্তের নেশায় পাগল হয়ে উঠলো। ঘটে গেলো বেশ কয়েকটি হত্যাকাণ্ড। বহু বাসায় হামলা হলো। অনেকে বাসায় ছিলেন না। অনেকে পালিয়ে বাঁচলো। সৈনিকরা মেজর করিম, মিসেস মুজিব, মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করলো, মেজর আজিম ও মুজিব চট্টগ্রামে যাচ্ছিলেন। বিপ্লবী সৈনিকরা তাদের এয়ারপোর্টে পাকড়াও করে। মেজর আজিমকে গুলি করে হত্যা করে। মেজর মুজিব প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। অর্ডিন্যান্স অফিসার মেসে সৈনিকরা হামলা করে তিনজন তরুণ অফিসারকে গুলি করে হত্যা করে। এদের মধ্যে ছিলেন মেজর মহিউদ্দিন, যিনি শেখ সাহেবের লাশ টুঙ্গীপাড়ায় নিয়ে দাফন করেন। সৈনিকরা বনানীতে কর্নেল ওসমানের বাসায় আক্রমণ করে। ওসমান পালিয়ে যান, তারা মিসেস ওসমানকে গুলি করে হত্যা করে। হকি খেলতে এসেছিলো দুইজন তরুণ লেফটেন্যান্ট। তাদের স্টেডিয়ামের পাশে গুলি করে হত্যা করা হয়। অর্ডিনান্স স্টেটে দশজন অফিসারকে এক লাইনে দাঁড় করানো হয় মারার জন্য। প্রথম জন এক তরুণ ই.এম.ই ক্যাপটেন। তার পেটে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। বাকিরা অনুনয় বিনয় করলে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। বেঁচে গেলো তারা অপ্রত্যাশিতভাবে। টিভি ভবনে তিনজন অফিসার মারা পড়লেন। বঙ্গভবনে খালেদের সময় খুবই অ্যাকটিভ ছিলেন, তাদের ধরে গুলি করা হয়। তিনদিন পর তাদের লাশ পাওয়া যায় একটি ডোবায়। সেনাবাহিনী মেডিক্যাল কোরের ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে ব্রিগেডিয়ার) খুরশিদ। বিপ্লবীরা তার বাসা আক্রমণ করে কয়েক ঝাঁক গুলিবর্ষণ করলো। তিনি পিছন দিকে পালিয়ে যান, কিন্তু পরে আবার সেপাইদের হাতে ধরা পড়েন। বিপ্লবীরা তার দুই হাত মুড়িয়ে যখন গুলি করতে উদ্যত, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। হঠাৎ আশুরিক শক্তিতে বনবাদাড় ভেঙে তিনি দেন ছুট। তারা পিছনে গুলি ছুঁড়লেও আর তাকে ধরতে পারেনি। রাস্তার ওপারে অর্ডিন্যান্স স্টেটের অবস্থা ছিলো ভয়াবহ।

উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকরা দল বেঁধে প্রায় প্রতিটি অফিসার্স কোয়ার্টারে হামলা চালায়। ভীতসন্ত্রস্ত অফিসাররা প্রাণ রক্ষার্থে বাসা ছেড়ে অন্ধকারে পেছনের পানির ডোবায়, ঝোঁপে-জঙ্গলে আত্মগোপন করে সারারাত কাটায়। ১২ জন অফিসার মারা পড়েন ঐ রাতে। আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে যান বেশ ক'জন অফিসার। সারারাত চরম আতঙ্কের মধ্য দিয়ে কাটালো। ঐ রাতে বিপ্লবী সৈনিকরা সত্যি সত্যিই অফিসারদের রক্ত-নেশায় পাগল হয়ে উঠেছিলো। ভাগ্যিস অধিকাংশ অফিসার ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে সন্ধ্যার আগেই শহরে তাদের নাগালের বাইরে চলে যান। সেপাইগণ কর্তৃক আপন অফিসারদের উপর হামলা এর আগে কস্মিনকালেও ঘটেনি! এসব অবিশ্বাস্য ঘটনা!

৮ নভেম্বর

ভোর হতে না হতেই সারা ক্যান্টনমেন্টে অফিসারদের মধ্যে গভীর আতঙ্কের ছায়া। আপন সেপাইদের কাছ থেকে অফিসাররা ছুটে পালাতে লাগলো। ঢাকা ইউনিটে, হেডকোয়ার্টারে, অফিসে কোথাও অফিসার নাই। সবাই ছুটে পালাচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে। যে যেদিকে পারছে শহরে ছুটে যাচ্ছে আশ্রয়ের খোঁজে। এদিন সকাল ৮টার

www.bjilibrary.com

সময়ও কয়েকজন অফিসারের উপর গুলি বর্ষণ করা হলো। বহু অফিসারকে সৈনিকরা নাম ধরে খুঁজতে লাগলো।

নিরাপত্তার অভাবে অফিসাররা সেনানিবাস ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। আমি জিয়াকে বহু চেষ্টা করেও কোথাও পেলাম না। আমি তাদের বললাম, আগে প্রাণ বাঁচান। তারপর খবর নিন। কেউ কেউ শহরে আত্মীয়-স্বজন না থাকায় অখ্যাত হোটেলে উঠে আত্মগোপন করলেন।

মহান সেপাই বিপ্লব ৮ নভেম্বর সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করলো। অফিসার দেখলেই সেপাইরা তাড়া করছে। সেপাইরা বাধ্য করলো তাদের কাঁধের র‍্যাঙ্ক নামিয়ে ফেলতে। কেউ র‍্যাঙ্ক পরতে পারবে না। সেনা বাহিনীতে কোন অফিসার থাকবে না। আমি যথারীতি অফিসে গেলাম। আমার ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে আসে আমাকে নিতে। অফিসে আমার সুবেদার সাহেব বললেন, "স্যার আপনাকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি, কিন্তু দয়া করে অফিসের বাইরে গেলে কাঁধে আপনার কর্নেলের র‍্যাঙ্কটা নামিয়ে যাবেন।" চতুর্দিকে মহাবিপদ। সব অফিসার তা-ই করছে। অফিসে আমি র‍্যাংক পরেই থাকলাম, কিন্তু জীপ নিয়ে বেরুবার সময় র‍্যাংক নামিয়ে বেরুলাম। আমি জিয়াকে খুঁজছিলাম। সে পাগলের মতো এখানে-ওখানে ঘুরছিলো। চতুর্দিকে গণ্ডগোল থামাতে ক্যান্টনমেন্টের সবখানে ছুটে গিয়ে সিপাহীদের এসব কাণ্ড বন্ধ করতে বললো। তারা বিভিন্ন দাবি পেশ করলো। জিয়া বললো, আগে তোমার অস্ত্র জমা দাও, আমি সব দাবি মানবো।

কর্নেল তাহেরের ইঙ্গিতে বিপ্লবী সৈন্যরা এখন একেবারে উল্টে গেছে। বিপ্লবীরা জিয়াকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। জিয়া সৈনিকদের ১২-দফা দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। সৈনিকদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যে ১২-দফা দাবির ভিত্তিতে কর্নেল তাহের ও তার বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা সশস্ত্র বিপ্লব ঘটিয়ে জিয়াকে মুক্ত করেছে, সেই দাবিগুলো মানতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিয়া এখন পিছিয়ে গেছে। এখন তারা জিয়াকে হত্যা করবে। সব অফিসারদের হত্যা করবে—বিপ্লবীদের আস্ফালন।

সৈনিকদের বিপ্লব এখন নতুন মোড় নিলো। অফিসারদের রক্ত চাই। রক্ত চাই।

বেলা ১০টার দিকে সৈনিকদের একটা বড় মিটিং হলো ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্ট গ্রাউন্ডে। সুবেদার কাযী জানালো, জিয়া সাহেবকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি আসবেন। তবে আমাকে ওদিকে যেতে মানা করলো। সে একদল সৈনিক নিয়ে ওদিকে চলে গেলো। সৈনিকদের ঐ উন্মুক্ত সভায় বেশ ক'জন বিপ্লবী সৈনিক বিপ্লবী ভাষণ দেয়। বহু দাবির কথা বলা হয়। ঐ মিটিং-এ প্রায় সবাই ছিলো সশস্ত্র। আনাড়িদের হাতেও ছিলো স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। সভাতেই একজনের স্বয়ংক্রিয় রাইফেল থেকে আপনা-আপনি গুলি বেরিয়ে গেলো। দু'জন সৈনিক ঘটনা স্থলেই নিহত হলো এবং কয়েকজন আহত হলো। জিয়া বললেন; আপনারাই দেখুন, ডিসিপ্লিন না থাকলে কি অবস্থা হয়। জিয়া স্পষ্ট ভাষায় সৈনিকদের বললো, আপনারা হাতিয়ার জমা দিন। শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরে আসুন। ব্যারাকে ফিরে যান। অযথা রক্তপাত করবেন না। আপনারা ক্যান্টনমেন্টের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনুন।

www.bjilibrary.com

আসলে ঐ সময় সৈনিকরা খুবই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলো। অফিসারদের তারা ক্যান্টনমেন্টে যেখানেই পেয়েছে, তার র‍্যাঙ্ক খুলে ফেলেছে, ধরে অপমান করেছে। মিটিং-এ একজন বিপ্লবী সৈনিক সম্বোধন করলো, জনাব জিয়াউর রহমান......। সঙ্গে সঙ্গে জিয়া তাকে সংশোধন করলেন, আমি জনাব জিয়া নই, আমি জেনারেল জিয়া। সৈনিক নেতা থতমত খেয়ে গেলো। অতঃপর সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করলো।

সৈনিক সমাবেশে জিয়ার আকুল আহ্বান তারা আমল দিলো না। হিংসাত্মক পরিবেশের কোন উন্নতি হলো না। বরং জাসদ তাদের ১২-দফা দাবি না মানা পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেওয়ার জন্য সৈনিকদের নির্দেশ দিলো। বহু লিফলেট বিতরণ করা হলো।

৮ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। সৈনিকদের সামনেই অফিসাররা ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে পালাতে লাগলো। সৈনিকরা কৌতুক ভরে দেখতে লাগলো। অবশ্য বহু ইউনিটের বিশ্বস্ত সৈনিক নিজেরাই ছাউনির বাইরে তাদের পার করে দিয়ে আসে।" (পৃষ্ঠা : ১৪৩-১৪৮)

১৭৬.

৮ নভেম্বর

সকাল থেকে জিয়া চতুর্দিকে ঘুরছে। সৈনিকদের সাথে সরাসরি কথা বলছে। তবু তারা সেনাপ্রধানের কথায় কান দিচ্ছে না। কমান্ড-কন্ট্রোল ও শৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। আমি এক সময় অনুমান বেলা সাড়ে ১১টার দিকে জিয়াকে আর্মি হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ধরতে পারলাম। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, জিয়া। মলিন মুখে তার চেয়ারে বসে শূন্যে তাকিয়ে আছে। কাছে কেউ নেই। তাকে স্টেশনের এসব অবস্থা অবহিত করলাম। বললাম, অফিসাররা সবাই ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কোন সিকিউরিটি নাই। জিয়া বললো, হামিদ আমি সব দেখেছি। সকাল থেকে ঘুরছি। আমার করবার কিছুই নেই। আমি ওদের বুঝাচ্ছি। কিন্তু কেউ বুঝতে চায় না। তারা পাগল হয়ে গেছে। বলো কি করি? তুমি তো পুরানো অফিসার, স্টেশন কমান্ডার। তুমিও একটু একটু বুঝাও না। তবে সেইফ থেকে ঘুরাফিরা করো। ফ্যামিলিকে পারলে বাইরে পাঠিয়ে দাও। তার সাথে কথা বলে বুঝলাম ঐ মুহূর্তে সেও অসহায়। তাকে এতো অসহায়, এতো বিধ্বস্ত অবস্থায় আমি আর কোন দিন দেখিনি। সৈনিকরা যেখানে অফিসারের নির্দেশ মানা দূরের কথা, তাদের রক্ত চাচ্ছে, সেখানে একা সে কিইবা করতে পারে?

৭ তারিখ সকালবেলা যে ছিলো বিজয়ী বীর, জনপ্রিয় সম্রাট। ৮ তারিখ সকালবেলা তাকে মনে হলো সমস্যা জর্জরিত ভগ্ন-হৃদয় মুকুটহীন এক সম্রাট! দু-চারটি কথার পর আমি চলে আসছিলাম। জিয়া বললো, অফিসারদের ডাকো। আমি তাদের সাথে আগামীকাল নয়টায় হেডকোয়ার্টারে কথা বলবো। রণক্লান্ত জিয়া। ভাবলাম রেস্ট করুক। আমি তার কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। আমি DMO নুরুদ্দীনকে গিয়ে জিয়ার অভিপ্রায় জানালাম।

www.bjilibrary.com

প্রায় সব অফিসারই ক্যান্টনমেন্ট ত্যাগ করে শহরে চলে গিয়েছিলেন। যারা স্টেশন হেডকোয়ার্টারে ফোন করলেন তাদের বললাম অন্য সবাইকে জানাতে যে, আগামীকাল আর্মি হেডকোয়ার্টারে আসতে। খবর পেলাম শহরেও বেশ কয়টি বাড়িতে সৈনিকরা হামলা করেছে অফিসারদের খুঁজতে গিয়ে। ঢাকা সেনানিবাস সেপাহী বিদ্রোহের দিনগুলোতে একটি হিংস্র জঙ্গলের রূপ নেয়। জিয়া সিনিয়র জেসিও-দের মাধ্যমে ক্রমাগত আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, সেপাহীরা যাতে অফিসারদের রক্তপাত না করে তার জন্য সর্বত্র আকুল আবেদন জানাতে লাগলেন।

একা সে কি করবে! জিয়ার আর্মি হেডকোয়ার্টারেও অফিসাররা নেই। প্রাণ ভয়ে সবাই পালিয়েছে। গুটি চার অফিসার আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার পাশে। এর মধ্যে একমাত্র কর্নেল (পরে লে. জেনারেল) নুরুদ্দীনকেই নিয়মিত টেবিলে কার্যরত দেখতে পেলাম। আর সবাই পালিয়েছে। রাত্রেও জিয়ার সাথে বিভিন্ন সৈনিক গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সাথে ঘন ঘন মিটিং হচ্ছিলো। বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা হচ্ছিলো। একই সাথে জাসদ পার্টির কিছু লোকজনও বাসায় গিয়ে তার সাথে আলাদাভাবে আলোচনা করছিলো।

জিয়াই এককভাবে আলোচনা ও কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে জিয়াই জানতেন, ওদের সাথে তার কি সমঝোতা হয়েছিলো। জাসদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মতে, তাদের বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা জিয়ার মুক্তির জন্য নভেম্বরের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জড়িত হয়, তাহেরের সাথে জিয়ার একটা গোপন ১২-দফা ভিত্তিক পূর্ব-সমঝোতার ভিত্তিতে। ১২-দফার দাবিগুলো বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি শ্রেণীহীন বাহিনীতে পরিণত হতো। তাদের প্রস্তাবিত 'বিপ্লবী কাউন্সিল' গঠিত হলে সেখানে জিয়ার ক্ষমতাও বহুলাংশে খর্বিত হয়ে পড়তো। মুক্তি পাওয়ার পর এসব বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করেই জিয়া তাদের দাবি মানতে অস্বীকার করেন।

৮ নভেম্বর সারাদিনই অফিসারেরা পালাতে লাগলো। এমনকি তরুণ ব্যাচেলার অফিসাররাও ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে চলে গেলো। ফ্যামিলিওয়ালাতো সবাই তাদের পরিবার সরিয়ে নিলো। খোদ জিয়ার শ্যালক লে. সাইদ ইস্কান্দারকেও ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালিয়ে যেতে হলো। আগের রাত্রে বিপ্লবীরা ব্রিগেড অফিসার মেস আক্রমণ করলে সাইদসহ অন্যান্য তরুণ অফিসাররা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পেছন দিকে পালিয়ে যায়। আমার স্ত্রীও বললো শহরে তার বোনের বাসায় চলে যেতে, কিন্তু আবার বললাম, স্টেশন কমান্ডারকে যদি সেপাইদের ভয়ে ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে পালাতে হয়, তাহলে আমার আর্মি ছেড়ে দেয়াই উচিত। অন্যদের কথা স্বতন্ত্র।

আমার সুবেদার কাযী ও বিশ্বস্ত হাবিলদার সিদ্দিকও বললো, সব অফিসার রাত্রে ফ্যামিলিসহ চলে গিয়েছেন, আপনি অন্তত ফ্যামিলি শহরে পাঠিয়ে দিন। আমি রাজি হলাম না। বললাম, মারলে তো তোমরাই মারবে। তারা লজ্জায় মুখ ঢেকে বললো, স্যার আমাদের লাশের উপর দিয়ে আপনাকে মারতে পারবে। হাবিলদার সিদ্দিক বললো, একটু আগে আপনার স্টাফ অফিসার মেজর আলাউদ্দিনকে ক্যান্টনমেন্ট পার করিয়ে দিয়ে এলাম বোরখা পরিয়ে।

"বোরখা পরিয়ে?"

www.bjilibrary.com

"জ্বি স্যার, আমাদের জীপে আমার পাশে বসিয়ে মহিলাদের বোরখা পরিয়ে তাকে পার করলাম। কি করবো স্যার!"

সে বললো আরো অনেক বোরখাধারী অফিসারকে এভাবে রাস্তায় দেখা গেছে। তাদের সাথে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতেই কিছুক্ষণের মধ্যে হঠাৎ দেখি রিক্শা চড়ে দু'জন লেডিশ আসছেন। একজন শাড়ি পরা, অন্যজন বোরখাধারী। আমার কৌতূহল হলো। রিক্শা থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? হিমশিম খেয়ে বোরখাধারী মোটা মহিলা বোরখা ফাঁক করে তার চেহারাখানা দেখালেন। বললেন, আসসালামালেকুম স্যার। বোরখার ভেতর কর্কশ পুরুষ কণ্ঠ! সিদ্দিকের কথাই ঠিক। শাড়িপরা মহিলা আসল, বোরখাধারী নকল। বোরখাধারী অফিসারকে আমি চিনে ফেললাম। সেপাইদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার সব রকম উপায়ই তখন অফিসাররা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাকে বললাম, Cheer up এগিয়ে যাও। বাম দিকে গেলে ভালো হবে। একজন গোয়েন্দা সিনিয়র অফিসার মেয়েদের শাড়ি পরে বনানীর দিকে পালানোর সময় সেপাইদের হাতে ধরা পড়েন। তার অবস্থা দেখে সেপাইরা তো হেসে কুটিকুটি।

৮ নভেম্বর অবশ্য অফিসারদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে থাকার মতো কোন পরিবেশ ছিলো না। বিপ্লবী সৈনিকদের প্ররোচণায় সাধারণ সৈনিকরাও ঐদিন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করেছিলো। এসব অবস্থা স্বচক্ষে না দেখলে কারো পক্ষে এখন বিশ্বাস করা কঠিন। বহু বছর পর আজ যখন ঘটনাগুলোর স্মৃতিচারণ করি, তখন মনে হয়, এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমার ইউনিফরমের মর্যাদার জন্য ক্যান্টনমেন্টে ফ্যামিলি নিয়ে অবস্থান করে এতো রিস্ক নেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

৯ নভেম্বর

সকাল নয়টা। শহর থেকে এবং আশপাশ থেকে গোটা ত্রিশেক অফিসার আর্মি হেডকোয়ার্টার-এ সমবেত হয়েছিলেন। তারা প্রায় সবাই সিভিল ড্রেসে। যে কজন ইউনিফরম পরে ছিলেন তাদের র‍্যাংক পরেননি। র‍্যাংক দেখলেই সেপাইরা ধরে টান দিয়ে ছিড়ে ফেলেছে। অদ্ভুত অবস্থা। সবারই চোখে মুখে ভীতির ছায়া। সেপাইদের আক্রমণে অফিসারদের মৃত্যু সংবাদ, লুটপাট, বিচ্ছিন্ন আক্রমণ সবাইকে আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিলো। জিয়া এলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। নিচু স্বরে বললেন, আপনারা সরে পড়েছেন। ঠিক আছে। এই সময় ফ্যামিলি দূরে রাখাই ভালো, আমি চেষ্টা করছি ওদের বুঝাবার। ইনশাল্লাহ শীঘ্র সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ধৈর্য ধরুন। সেপাইরা কিছু উত্তেজিত আছে। হঠাৎ সুর উঁচু করে বললেন, But you must face them........

ক্ষুদ্র ভাষণ দিয়ে তার প্রস্থান। ভীত সন্ত্রস্ত অফিসারগণ তার কথায় কোন আশার বাণী খুঁজে পেলো না। তাড়াতাড়ি যার যার পথে নিরবে প্রস্থান করলো। যাওয়ার পথে জিয়া আমাকে বললেন; হামিদ, আগামীকাল দশটার দিকে আমার কাছে এসো।

৯ তারিখ জিয়াউর রহমান বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও এবং এনসিওদের সাথে বেশ কিছু মিটিং করলেন। তাদের অনুরোধ করলেন, সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরে আসার এবং অস্ত্র জমা দেওয়ার জন্য বুঝিয়ে বলতে। তাদের দাবি-দাওয়া আস্তে আস্তে মানা হবে। তার

www.bjilibrary.com

কথায় জেসিও-রা শান্ত হলেও সেপাইরা অশান্ত থেকেই গেলো। জিয়া তাদের দাবি-দাওয়া না মানাতে তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ঠায় বসে রইলো। বিভিন্ন দিকে তারা মিটিং করতে থাকলো। জিয়া সুকৌশলে জেসিও এবং এনসিও-দের তার কাছে ভেড়াতে সচেষ্ট হলেন। ঐ সময় একমাত্র জিয়া ছাড়া আর সব কমান্ড-চ্যানেল ভেঙ্গে যায়। আর্মি চিফ-অব-স্টাফ জেনারেল জিয়া সরাসরি জেসিও, এমন কি সেপাই প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করছিলেন। টু-ফিল্ডের সুবেদার আনিসুল হক চৌধুরী, আরো ২/৩ জন জেসিও এই সময় জিয়ার পাশে থেকে সৈনিকদের বোঝাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারাদিন কোন বড় রকম হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। অবশ্য পুরো দিন ক্যান্টনমেন্টে কোন অফিসারও ছিলেন না। অফিস কাজকর্ম ছিলো সম্পূর্ণ বন্ধ। সর্বত্র বিরাট অচলাবস্থা। অরাজকতা। অফিস, ব্যারাক সব কিছু সেপাইদের দখলে। বিপ্লবীরা সর্বত্র ঘরে ফিরে সৈনিকদের উত্তেজিত করছিলো, দাবি-দাওয়ার প্রচুর লিফলেট সর্বত্র বিতরণ করছিলো।

অবাক ব্যাপার। ঢাকার শহর ছিলো সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। সাধারণ মানুষ অনেকেই ক্যান্টনমেন্টের এই অস্বাভাবিক ঘটনার কথা কিছুই টেরও পায়নি। ঐদিন বিকেলে জাসদের একটি বিজয় মিছিল ও মিটিং অনুষ্ঠিত হলো বায়তুল মোকাররমে। জিয়ার নির্দেশে গুলি চালিয়ে তা ভেঙ্গে দেওয়া হলো। বিভ্রান্ত জনগণ। একবার শোনে সেপাই বিপ্লব, জাসদের বিপ্লব। আবার দেখে জাসদের মিটিং-এ গুলি। আসল ব্যাপার কি?

১০ নভেম্বর

জিয়া ৯/১০ তারিখ রাত থেকে যশোহর থেকে আনা কর্নেল সালামের (পরে জেনারেল) কমান্ডো ব্যাটালিয়ানের লোকজন দ্বারা সেনা হেডকোয়ার্টার ঘেরাও করে নিজে সেখানে অবস্থান নেন। এভাবে প্রকারান্তরে ব্রিগেডিয়ার শওকত সুকৌশলে তার ব্রিগেডের লোকজন দ্বারা জিয়ার চতুষ্পার্শ্বে বেড়াজাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। জিয়াও এবার নিজেকে বিপ্লবী টু-ফিল্ড, ল্যানসার ও জাসদপন্থীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে সেনাসদরে পৌছে মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে লাগলেন। যদিও তার অজান্তেই মাকড়শার দল তার চারপাশে দ্রুত নতুন ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিলো।

গতরাতে কোন সহিংস ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। কোন গোলাগুলির আওয়াজও শোনা যায়নি। অনেক অফিসার শহর থেকে টেলিফোনে নিজেদের ইউনিটের জেসিওদের সাথে যোগাযোগ রাখছিলেন।

সকাল ১০টায় জিয়া আমাকে ডাকলেন। আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার কাছে গেলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, হামিদ, স্টেশনের খবর কি? আমি বললাম, আজ তো মোটামুটি ভালোই দেখছি। সে বললো, তোমাকে ডাকলাম, আমি তোমাকে লগ এরিয়া কমান্ডার বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তুমি তাড়াতাড়ি ব্রিগেডিয়ার রউফকে রিপ্লেস করো।

লগ এরিয়াতে তোমার বহু কাজ রয়েছে। বুঝতেই পারছো, প্রথম কাজই হচ্ছে এখন কমান্ড কন্ট্রোল ফিরিয়ে আনা। সৈনিকদের ব্যারাকে ফিরিয়ে আনা। তাদের কাছ থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা।

www.bjilibrary.com

বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো কন্ট্রোলেই আছে। সমস্ত সমস্যা দাঁড়িয়েছে তোমার লগ এরিয়া ইউনিটগুলো নিয়ে। সার্ভিস কোরের ইউনিটগুলো একেবারে ওয়াইল্ড হয়ে গেছে। এ ছাড়া তোমার কমান্ডে রয়েছে বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিট। ট্যাংক নিয়ে এরা যা ইচ্ছে তা করে বেড়াচ্ছে। এদের সবাইকে যেভাবেই হোক তোমার কন্ট্রোলে আনতে হবে। ঢাকার ইউনিটগুলোর কাছে তুমি তো ভালোভাবেই পরিচিত। স্টেশন কমান্ডার হিসেবে তোমাকে সবাই চেনে। অতএব, তাড়াতাড়ি টেকওভার করে কাজ শুরু করে দাও। এখন অর্ডার-সর্ডারের অপেক্ষা করো না। কোন অফিস ফাংশন করছে না। তুমি কালকের মধ্যেই টেকওভার করো। এখন যাও।

আমি চলে যাচ্ছিলাম। আবার ডেকে বললো, দেখো, তুমি তো জানো, বহু 'ব্লাডি বিপ্লবী আর্মডম্যান' ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে গেছে। ওদেরকে শক্ত হাতে ট্যাকল্ করতে হবে। ৪৬ ব্রিগেডের কর্নেল আমিনের সাথে যোগাযোগ রাখবে। সে-ই এখন এ্যাকটিং কমান্ডার।

আমি লগ এরিয়া হেডকোয়ার্টারে গেলাম। সেখানে কোন অফিসার ছিলো না। সুবেদার মেজরকে ডেকে বললাম, আগামীকাল আমি আসবো। তারা অবশ্য আমাকে ভালো করেই চিনতো। আমি আসছি শুনে তারা খুবই খুশি হলো। ঐদিন বিকেলের দিকে আবার আর্মি হেডকোয়ার্টারে গেলাম। অপারেশন রুমে নুরুদ্দীনের কাছে কয়েকজন অফিসারকে সিভিল ড্রেসে বসে থাকতে দেখলাম। এমন সময় কে একজন এসে বললো, স্যার চিফ আপনাকে ডাকছেন। আমি সোজা ভেতরে গেলে জিয়া বললো, 'হামিদ তুমি যাও তো, 38 LAA রেজিমেন্টের জওয়ানরা হাতিয়ার জমা দেবে না বলে জানিয়েছে। তারা রাস্তাঘাটে ফায়ার শুরু করেছে। দেখতো কিছু করতে পারো কিনা।' আমি তাকে হেসে বললাম, 'ওরা তো আমার কমান্ডে নয়। ওরা কি আমার কথা শুনবে?' বললো, 'তবু যাও, একটু দেখো। স্টেশন কমান্ডার হিসেবে তোমাকে তারা চিনবে।'

আমি কি আর করি। বললাম, আচ্ছা যাই। আমি DMO কর্নেল নুরুদ্দীনের কামরায় ফিরে এসে দেখি সেখানে আর্টিলারির কর্নেল আনোয়ার (পরে জেনারেল) এবং কর্নেল সুফী (পরে জেনারেল) বসে আছে। আমি আনোয়ারকে বললাম, এই যে, আনোয়ার, তুমি তো আর্টিলারির কমান্ডার। চলো একটু এ্যাক্ এ্যাক্ রেজিমেন্ট ঘুরে আসি। ওখানে গণ্ডগোল হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠলো, স্যার, আমি জানি, কিন্তু যাবো না। Why should I kill myself for nothing. কর্নেল সুফী তার পাশে বসে ছিলো। বললাম, 'চলো সুফী, তুমি আসো।' সে ইনফেন্ট্রির অফিসার, তবু সে রাজি হলো। এমন সময় টু-ফিল্ড আর্টিলারির সুবেদার মেজর আনিস এসে হাজির। আমি তাকে বললাম, 'চলুন আনিস সাহেব, ৩৮ এ্যাক এ্যাক রেজিমেন্টের জওয়ানরা হাতিয়ার জমা দিচ্ছে না। গোলমাল করছে। চলুন একটু ঘুরে আসি।' তিনি রাজি হলেন। সুফীকে ধন্যবাদ দিয়ে আনিসকে আমার জীপে বসিয়ে ওদিকে চললাম।

এয়ারপোর্ট বড় রাস্তার উপর পৌঁছে দেখি সেখানে ক্রমাগত ফায়ারিং হচ্ছে। রাস্তায় যান বাহন চলাচল বন্ধ। আমরা দু'জন রেল ক্রসিং এর কাছে গাড়ি থেকে নেমে টুপি খুলে বারবার ইশারা করতে লাগলাম গোলাগুলি থামাতে। প্রায় পাঁচ মিনিট চেষ্টার পর তারা ফায়ারিং বন্ধ করলো। আমি তখন জীপ চালিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাছে

www.bjilibrary.com

যেতেই আবার কয়েক রাউণ্ড গুলি আমাদের মাথার উপর দিয়ে ফায়ার করলো। সুবেদার মেজর আনিস বললো, আর এগুনো ঠিক হবে না স্যার, আপনি একটু বসুন। প্রথমে আমি তাদের সাথে কথা বলি। তারপর আপনি আসুন। খুবই সাহসী জেসিও বটে।

সে বেপরোয়াভাবে সামনে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললো, শোনো! আমি টু-ফিল্ডের সুবেদার মেজর আনিস। ফায়ার থামাও। বলেই তিনি সোজা তাদের কাছে গিয়ে কথাবার্তা বলতে থাকলেন। ওখানে আরো কয়েকজন জেসিও এগিয়ে এলো। সেপাই অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে সুবেদার মেজর আনিস ছিলো একজন বড় মাপের সৈনিক-নেতা। দেখলাম তার সাথে সবাই শ্রদ্ধাভরে কথা বললো। ৩/৪ মিনিট কথা হলো। সে ফিরে আসলো, বললো, স্যার ফিরে চলুন। আপনার যাওয়া লাগবে না। আজ সন্ধ্যার আগেই তারা সব হাতিয়ার জমা দিতে রাজি হয়ে গেছে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জীপ ঘুরিয়ে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে জিয়াকে বললাম, ফায়ারিং বন্ধ হয়েছে। তারা সন্ধ্যার আগেই অস্ত্র জমা দেবে। জিয়া বললো, থ্যাংক ইউ। বললাম, সুবেদার মেজর আনিসকে সাথে নিয়েই গিয়েছিলাম। বললো, He is very useful JCO. তাকে এখানে থাকতে বলো। আমিও কথা বলবো।

কমান্ডার লগ এরিয়া

আমি ১১ তারিখ লগ কমান্ডারের অফিসে গিয়ে কমান্ড নিলাম। অর্থাৎ খালি চেয়ারে গিয়েই বসলাম। ব্রিগেডিয়ার রউফকে তখন গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছিলো। হেড কোয়ার্টারে তখন কোন অফিসার নাই। সুবেদার মেজর, ক্লার্ক, সেপাইরা ছিলো। আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দেওয়ার মতোও কেউ ছিলো না। সব কিছুই গোলমেলে। আমি সুবেদার মেজরকে বললাম, আগামীকাল থেকে আমি নিয়মিত অফিসে বসবো। সব ইউনিটে যেন তা অফিস-অর্ডারের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়।

৪৬ ব্রিগেডের কর্নেল আমিনুল হককে ফোন করলাম। আমিন খুব খুশি হলো। বললো স্যার, আমার ব্রিগেডের ট্রুপস্ সব কন্ট্রোলে আছে। এখন আপনি লগ এরিয়ার ইউনিটগুলো কন্ট্রোলে আনেন। দরকার হলে আমিও সাপোর্ট দেবো। জেনারেল জিয়া এখন খুবই অসুবিধায় আছেন। চিফ আমাকেও বলেছেন, আপনার সাথে যোগাযোগ রেখে ক্যান্টনমেন্ট ইউনিটগুলোতে কমান্ড-কন্ট্রোল ফিরিয়ে আনতে।

প্রকৃতপক্ষে কর্নেল আমিনুল হকই গত ২/৩ দিন ধরে ৪র্থ বেঙ্গলের কিছু বিশ্বস্ত ট্রুপ নিয়ে জিয়াকে আগলে রেখেছিলো। এর মধ্যে যশোহর থেকে কর্নেল (বর্তমানে জেনারেল) সালামের কিছু কমান্ডো ট্রুপ নিয়ে আসা হয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও জিয়া তার কিছু বিশ্বস্ত সৈনিক তার পাশে জড়ো করতে সক্ষম হয়েছেন। জিয়া এই সময় বিভিন্ন ইউনিটের জেসিও, এনসিও, এমনকি সেপাহীদের প্রতিনিধিদের সাথে অফিসে, বাসায়, ঘনঘন সরাসরি আলোচনা চালিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন।

আমি লগ এরিয়া কমান্ডারের দায়িত্ব গ্রহণ করে পরদিন থেকে একা একাই স্টাফ-কার নিয়ে ঢাকার ইউনিটগুলোতে চক্কর দিতে থাকি। সিগন্যাল্স্, সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন, মেডিক্যাল, অর্ডিন্যান্স, ইএমই, বেইজ ওয়ার্কশপ, সিওডি, এমপি সবগুলো ইউনিটেই অরাজক অবস্থা। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ইউনিটগুলোর সৈনিকদের মুখোমুখি হয়ে

www.bjilibrary.com

তাদের বুঝাতে থাকি। এসব ইউনিটগুলোর সৈনিকদের বেশিরভাগই ছিলো শিক্ষিত। তারা ১২ পয়েন্ট দাবির যৌক্তিকতার কথা সর্বত্র আমাকে তুলে ধরলো। ব্যাটম্যান প্রথা, তাদের বেতন ভাতা, তাদের ধীরগতি প্রমোশন, তাদের বাসস্থান, তাদের পজিশন ইত্যাদি সবগুলো পয়েন্টই ছিলো যথার্থ। আমি বললাম, আমিও তোমাদের অধিকাংশ দাবি সমর্থন করি। আমি নিজে চিফকে অনুরোধ করবো এগুলো মেনে নিতে। তারা বললো, স্যার জেনারেল জিয়াকে আমরা মুক্ত করেছি, খালেদকে মেরেছি, কিন্তু তিনি এখন আমাদের দাবিগুলো মানতে অস্বীকার করেছেন। তিনি কথা দিয়ে কথা ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি ব্যারাকে গিয়ে তাদের বুঝাতে লাগলাম, জিয়া এসব দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি আইন-শৃঙ্খলা ফিরে আসলেই এক এক করে ব্যবস্থা নিবেন। তাকে একটু সময় দিতে হবে। তারা আশ্বাস দিলো আর কোন গণ্ডগোল হবে না।

সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি ছিলো বেঙ্গল ল্যান্সার রেজিমেন্টে। ফাইটিং ইউনিট, শক্তিশালী ট্যাংক। ১৩ তারিখ উন্মুক্ত মাঠে পুরো উইনিটের ছয়-সাতশো সৈনিকদের একত্র করে তাদের সামনে ভাষণ দিলাম। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল মোমেনও উপস্থিত ছিলেন। তাদের কাছে আকুল অনুরোধ জানালাম, অস্ত্র নামিয়ে শৃঙ্খলায় ফিরে আসতে। তারা বেশ ক'টি প্রশ্ন রাখলো, বললো, জিয়াউর রহমান কথা রাখে নাই। প্রকাশ্যে মিটিং-এ দু'তিন জন বিভিন্ন প্রশ্ন তুললো। বিপ্লবী সুবেদার সারওয়ার কড়া দাবি রাখলো। আমি সবাইকে আশ্বাস দিয়ে আশ্বস্ত করলাম। তারা শান্ত থাকবে বলে আমাকে হাত তুলে কথা দিলো। কথা দিলো এখন আর কোন গণ্ডগোল করবে না।

আমি সেখান থেকে সরাসরি আর্মি হেডকোয়ার্টারে জিয়ার কাছে গেলাম এবং তাকে ল্যান্সার সৈনিকদের সাথে আমার মিটিং-এর কথা অবগত করলাম। জেনারেল শওকত বসেছিলেন। তিনি ঐ মুহূর্তে বাহ্যত সিজিএস-এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। শওকত বললেন, এদের তোষামোদ করে কোন লাভ নেই। জিয়াও তাকে সমর্থন করলেন, বললেন, হ্যাঁ, আর তোষামোদ নয়, আমি তাদের ইনফেন্ট্রি ডিভিশন দিয়ে ঠাণ্ডা করবো। Just wait and see. আমি বুঝালাম, 'এসব দরকার হবে না। তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। এখন এমনিতেই শান্ত হয়ে যাবে।' কিন্তু তিনি আমার সাথে দ্বি-মত পোষণ করলেন। শওকতের কথাই ঠিক, তিনি বললেন।

এ কয়দিন আমি প্রতিটি বিদ্রোহী ইউনিটে ছুটে বেড়ালাম। সবখানেই সৈনিকরা আমাকে অকপটে শান্ত থাকবে বলে কথা দিলো। অবস্থার উন্নতি হওয়ায় আমি লগ এরিয়ার সকল অফিসারদের ইউনিটে ফিরে আসার জন্য শক্ত নির্দেশ পাঠালাম। প্রায় সবগুলো ইউনিটেই অফিসাররা ফিরে আসলেন। অনেকে ফ্যামিলি নিয়েও ক্যান্টনমেন্টে ফিরলেন। অনেক ইউনিটে জেসিও এবং সৈনিকরা নিজেরা গাড়ি করে অফিসারদের সসম্মানে ফিরিয়ে আনলো।

আমার অধীনস্থ লগ এরিয়ার ১৩টি ছোট বড় ইউনিটগুলোর সৈনিকরাই ছিলো সবচেয়ে বেশি বিদ্রোহী। ১২ তারিখ থেকে বেশিরভাগ অফিসার ক্যান্টনমেন্টে নিজ নিজ ইউনিটগুলোতে ফিরে আসতে শুরু করেন। ১৪/১৫ তারিখের দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো।

www.bjilibrary.com

এবার সেপাই-অফিসার ভাই ভাই

সৈনিকগণ তাদের অফিসারদের আবার যথাযথ সম্মান দেখানো শুরু করলো। তাদের পূর্ব ব্যবহারের জন্য সবাই দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। প্রায় প্রতিটি ইউনিটে এখন সৈনিকগণের সাথে অফিসারদের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠান করে পুনর্মিলন পালন করা হলো। রক্তাক্ত যুদ্ধের পর এসেছে শান্তি। এবার 'সেপাই-অফিসার ভাই ভাই।' করমর্দন, গলাগলি, কোলাকুলি, হাসি-মশকরা সর্বত্র আনন্দমুখর দৃশ্য। এসব দৃশ্য এখন মনে হলে রীতিমতো হাসির উদ্রেক হয়।

এই সময় জেনারেল জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে প্রায় সবগুলো বিদ্রোহী লগ এরিয়া ইউনিট পরিদর্শনে গেলাম। অবশ্য আমার ইউনিটগুলোতে নিয়ে যাওয়ার আগে জিয়া বারবার আমাকে বলে দেয়, কোন সেপাই তার কাছে ১২-দফার দাবির কথা তুলতে পারবে না। তাদের দাবি শুনতে শুনতে সে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। অতএব, আমি আগে থেকেই সিনিয়র জেসিও-দের সেইভাবে নির্দেশ দিয়ে রাখি। COD-র বিশাল অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গিয়েছিলো। এসব লুণ্ঠিত অস্ত্র দিয়েই গত ক'দিন ধরে বিপ্লবীরা সারা ক্যান্টনমেন্টে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। জিয়া আমাকে নিয়ে সিওডি ভিজিটে গিয়ে এসব বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে তাদের অফিসারদেরকে সেপাইদের সামনেই দারুণ বকাবকি শুরু করলো। তাদের কমান্ডার কর্নেল বারী অনুপস্থিত ছিলেন, ডাইরেক্টর কর্নেল (পরে জেনারেল) মান্নান সিদ্দিকীকে সামনে পেয়ে খুব একচোট নিলো। বললো, এখানে তোমরা সব মেরুদণ্ডহীন অফিসার। একজন অফিসার সেপাইদের সামনে দাঁড়ালে এমনটি ঘটতো না।

জিয়া এই সময় বিভিন্ন ইউনিট পরিদর্শনে যাওয়ায় নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্রুত উন্নতি ঘটলো। অফিসারদের মধ্যেও প্রবল সাহসের সঞ্চার হলো। সবাই বুঝতে পারলো সেনাপ্রধান এখন আর অসহায় নন, তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম। এর ফলে ইউনিট কমান্ডাররাও দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠলো। অতঃপর এসব পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানরা সুযোগের অপেক্ষায় থাকলো। বিভিন্ন জন বিভিন্ন মতলবে এবার জোঁট বেধে সেনাপ্রধানের কাছে ভেড়ার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো, তারাও যারা ক'দিন আগেও জিয়ার নাম শুনলে নাক সিঁটকাতো। (পৃষ্ঠা : ১৪৯-১৫৭)

ব্রিগেডিয়ার খালেদ ও কর্নেল তাহের

মেজর ডালিম ও কর্নেল হামীদের লেখা গ্রন্থে এ দু'জনের যে পরিচয় পেলাম তাতে যোগ্য সেনা অফিসার হিসেবে দু'জনের প্রতিই আমি শ্রদ্ধাবোধ করছি। মুক্তিযুদ্ধে দু'জনের বিরাট অবদান দু'গ্রন্থেই প্রশংসিত।

কিন্তু ব্রিগেডিয়ার খালেদের ক্ষমতার অদম্য লোভ নিজেকে তো ধ্বংস করলোই, সেনাবাহিনীতে চরম বিশৃঙখলা সৃষ্টি করলো। তিনি সেনাপ্রধান জিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করলে কর্নেল তাহের সিপাহী বিপ্লবের কোন সুযোগই পেতেন না। যোগ্য লোকদের সঠিক পদক্ষেপে যেমন বিরাট কল্যাণ সাধিত হয়, তেমনি তাদের ভ্রান্ত তৎপরতা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে।

www.bjilibrary.com

খালেদ মুশাররফের একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপের প্রতিক্রিয়ায় সেনা বিদ্রোহীদের হাতে কত যোগ্য অফিসার নিহত হয়ে গেলো। কর্নেল হামীদের মতে, জিয়াউর রহমানের গোটা শাসনামলে বিদ্রোহীদেরকে শায়েস্তা করার অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবার পরিণামে সেনাবাহিনীতে ১৮টি বিদ্রোহ হয়েছে এবং তাতে শত শত সৈনিক ও বহু অফিসারের ফাঁসি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জিয়াকেও সেনাবাহিনীর হাতেই নিহত হতে হয়। জিয়া হত্যাকারীরাও নিহত হয় এবং এ হত্যার বিচারে বহু যোগ্য অফিসারের ফাঁসি হয়। এভাবে খালেদের জের চলে।

বিস্ময়ের বিষয় যে, সেনাপ্রধান হিসেবে জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা সংহত হবার পরও সেনা-বিদ্রোহের জন্য প্রধান দায়ি কর্নেল তাহেরের বিরুদ্ধে অফিসার হত্যা অভিযানের অভিযোগে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পূর্বোল্লিখিত জাসদ নেতার মতে, কর্নেল তাহের ক্ষমতা দখলে ব্যর্থ হবার পরও জিয়াকে উৎখাত করার পরিকল্পনা জারি রাখেন। ৭৫-এর ২৮ নভেম্বর আর একটি অভ্যুত্থান ঘটাবার উদ্দেশ্যে ২৩ নভেম্বর সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এক হাউজ-টিউটরের বাসায় বৈঠকরত অবস্থায় কর্নেল তাহের গ্রেফতার হন এবং সামরিক আদালতের বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। ৭৬-এর ২১ জুলাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁর ফাঁসি হয়।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

www.bjilibrary.com

কামিয়াব প্রকাশন। ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.bjilibrary.com